শঙ্খদ্বীপের নাও

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

SANKHA DIPER NAO

by

BROJO MADHAB BHATTACHARYA

প্রকাশ করেছেন---
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ

জানুয়ারী
১৯৬৪

ছেপেছেন
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

আলোক চিত্রশিল্পী : লেখক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

বন্ধুবরেষু—

ব্যাঙ্ককের দণ্ডায়মান বুদ্ধ।

—চুলালঙ্করণ রাজপ্রাসাদ
ব্যাঙ্কক

সেণ্ট্রাল পার্ক।
সিঙ্গাপুর

কল্যাণীয়াষু,
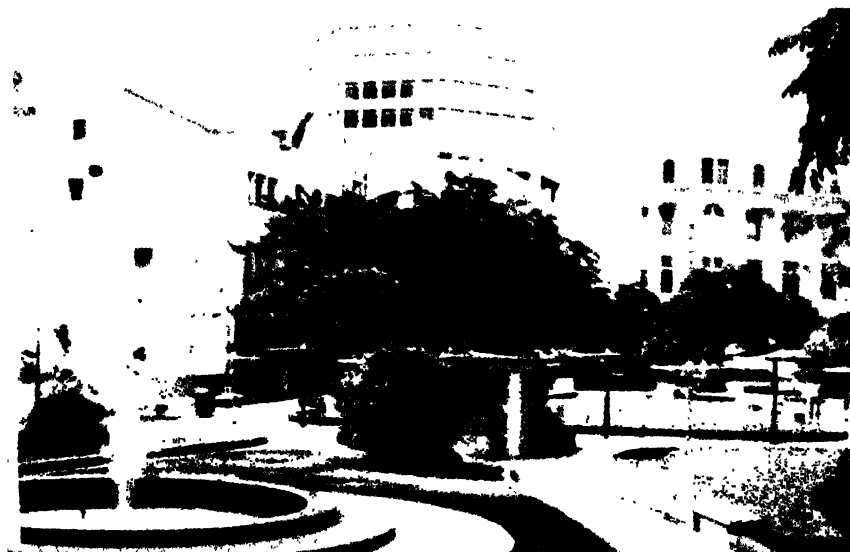
জানো পদ্মা, তোমার চিঠি পেলাম, মনে হোলো একটা দিক খুলে গেলো। দূরে ভারতবর্ষ থেকে বাতাস এলো। আজ এ দেশে দেওয়ালী। এদের রকারী ছুটী; এবং সোমবার ছুটী হওয়ার দরুণ দীর্ঘ 'উঈক্-এণ্ড্'। র্থাৎ এরা দৌড়ুবে এ-দ্বীপ, ও-দ্বীপ বালু সৈকতের তালাশে। সঙ্গিনী নুরঙ্গিনী নেবে, বোতল এবং দেহ মন ভরা জোয়ারের ডাক। অমাবস্যার মুদ্রেরই বা কী তরঙ্গ, এদেরই বা কী! বোঝাপড়া।

তার ওপর স্কুল কলেজের মাধ্যঙ্গিনী চাতুর্মাস্য ছুটী শুক্রবার। এরা লে 'মীড্ টার্ম হলিডে'। এখানে শনি-রবি বরাবরেরই ছুটী। শুক্র শনি বি সোম—লম্বা ছুটী! আর এই মুখে, ভাই দ্বিতীয়া মাথায় বয়ে তোমাব চঠি। ভালো লাগলো। ভাবলুম কী দিই তোমাকে। তোমাকে দেওয়া ঠিন। সব দিয়েও যে তোমাদের খালি ভরাতে পারিনে।

তাই ভাবলুম লম্বা চিঠি দেবো। বেশী লম্বা নয়, এই শ পাঁচেক াতার মতো!

ভাবছো এ কী উন্মাদ পরিকল্পনা? উন্মাদ নয়, 'উন্মদ' বলতে পারো। ফাৎ কম। যোগই বলো আর প্রেমই বলো, রসিকজনের বয়ান যে উন্মদতা ার উন্মাদ-তা রস-রাসের পরিক্রমায় নাকি অবশ্য ক্রমনীয় চক্র। মানে, বাংলা ায়,—প্রেমেতে পাগল হওয়াই ধর্ম। আমায় দে-মা পাগল করে।—

ভাবলুম এবার তো চুটীয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারতের ঐতিহ্য-ডত, বহুধ্বনিত দেশ ও দ্বীপগুলি দেখে আসা গেলো। "তিন সাগর"-এ

য়োরোপ লিখেছিলাম।' 'ক্যারাবিয়ানের সূর্য'-তে লাতিন আমেরিকার স্বপ্নাবেশে মোড়া প্রবালদ্বীপ আর আগ্নেয় দ্বীপগুলোর কথা বলেছিলাম। এবার বলি প্রশান্ত মহাসাগরের কথা।

সে বলতে পারতাম চিঠি না লিখেও। কিন্তু হঠাৎ ভালো লেগে গেলো তোমার চিঠি। তা ছাড়া তোমার দিদি এখানে নেই। পরকীয়ার সুনাম সিদ্ধাইয়ের ক্ষেত্রে জবর।

তাই ঠিক করলাম এ ৫00 পাতা তোমাকেই গিয়ে আক্রমণ করুক। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে লিখবো। তোমার ভাণ্ডারে জমা হবে।

ফলে, তোমায় মনে করে লেখার রসটা হবে মধুর।

কিন্তু যে দেশ ও যাদের নিয়ে লিখবো তাদের গুণগান করে তৃপ্তিলাভ আমার কপালে নেই গো।—গুণগান করতে গেলেই অগুনে বিগুণে পড়ে যাই। এবং তাই নিয়েই বেসামাল।

বুঝিয়ে বলি। গুণ গাইতে গেলেই কণ্ঠরোধ হয়। বাষ্প-কলুষিত হয় নয়ন। সোনার দেশ ছারেখারে দিলে। সে দেশবাসীরা নিরীহ। মরে আছে। অন্ততঃ বেঁচে যে নেই সে কথা আমি ধীরে ধীরে প্রকাশ করবো।—

কিন্তু যারা দিলো তাদের সম্পর্কে কোনো 'সত্য' কথা বলার দায় আছে। এ দায় পুইয়েছেন লুমুম্বা, এন্-ক্রুমা, পাপাদিপেলস্, নাস্-সের, মাজারীক্, এ্যালেণ্ডী, মাকারিঅস্;—দায় পোয়াচ্ছেন অনেকে, যথা ইন্দিরা গান্ধী, গদ্দাফী আরাফাৎ—কী করবো নাম গেয়ে। ব্রজমাধব ভট্‌চাজ্যির নামেও একদা এসে যাবে এ দায়। ঝড়ের পূর্বাভাস দেখেছি, দেখছি।

দেখেছি যে ইয়াঙ্কী সিঁদ কাঠির ধার, মাপ ও গতি পরীক্ষা করতে গিয়েছি বলে আমার দেশের পত্র পত্রিকার স্তম্ভে আমি অপাংক্তেয়; বিতাড়িত দেখেছি জাতে-কুলে-শীলে স্তম্ভে চড়ার ঢালাও পাসপোর্ট যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা বিদেশী সরকারের পার্বণীর দৌলতে দেশী বিদেশী স্তম্ভে লাফালাফি করছেন ……এবং শুনতে পাই ওই সব স্তম্ভের পালিশ-মালিশ পলেস্তারা যাঁরাই করুন, যাঁরাই বলুন তাঁরা আসল মালিক ন'ন্; দাদনভোগী ধান-চাষের বলদ ছাড়া কিছু নন তাঁরা। বলদে যত বল আছে তার বেশী বল তাদের নেই। বড় ঘরের ঘরণী হলেও রক্ষিতার জাঁক জমকের হালফিলে ফাঁসবার মেয়ে যেমন তুমি নও,—স্তম্ভে চড়ার জৌলুষে মুগ্ধ হয়ে আত্মসম্মান খোয়াবার বান্দাও তেমনি আমি নই।—

লেখা আমার ধর্ম। আমি না—পোষাকী পর্যটক; না—"নিজস্ব-সংবাদ দাতা"র উর্দী আঁটা ভাড়াটে মসীজীবী। আমি আমি, স্বয়ম্ভুর সেবক। তা বলে ভুঁইফোঁড় নই। গাঁটের কড়ি—খরচা করে ঘুরে মরি মানুষের জঙ্গালে

াই সেই মহামানবের মহান আত্মার তালাশ করি যা সূর্য-সেঁচা সামন্তকের
গ চির থেকে চিরকালে প্রদীপ্ত ও শক্তিমান। যা সোনা ফলায় প্রহরে
রে ; যা শক্তি ধরে পরমা শক্তির আধার বোলে।—

খুঁজে মরি ভাই, বোন, মা,—মানুষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সেই সব
ুহিত, বিধ্বস্ত, চুষে খাওয়া সমাজের কঙ্কালের অমর ভাষা।—আমি খুঁজে
। দিন রাত, তাদের যারা উদয় অস্ত সারা জীবনের পরিশ্রম হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে
াণ দিয়েও একটি সূর্যোদয়ের মহিমা বা একটি সূর্যাস্তের শান্তি মন দিয়ে
াগ করতে পারেনি।

তেমনি দেশ এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এ দেশে ভারতের আত্মা বিধৃত ;
রতের আত্মীয় বাস করে ; ভারতের ভাষা ও ধর্ম গুনগুন করে। আর
রতেরই মতো এ দেশ পাটলীপুত্রের উই-কাটা দারু-প্রাসাদের মতো গৌরবময়
তহ্য চেটে চেটে আর বাঁচতে পারছে না। ধ্বসে পড়া অনিবার্য জেনেই
া ধ্বসিয়ে ফেলার ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে।—

এদের কথা বলবো।

বলবো না, "ওঃ কী যে সব দেখে এলাম! আশ্চর্য রঙ্, বিরাট প্রাসাদ,
ালো জমকালো মন্দির, পণ্যরুদ্ধ রাজপথ, অর্থলুব্ধ ব্যাঙ্ক, আর জীবন্ত
ুত পশুশালা, আজায়েব ঘর, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, হাই-ওয়ে এবং লালসা
ানো ললনা এবং বিদেশী মোটর-গাড়ি।"—না, না ; এ সব বলবো না।
বানিয়া কাব্য লেখার জন্য কলম ধরি নি। আমি লিখবো শ্মশান-বাসিনী
্যার কথা, নাগে ধরা দময়ন্তীর কথা, পরিত্যক্তা সীতার কথা, দুঃশাসন-
তা দ্রৌপদীর কথা, সন্তান-বিসর্জন-বিধুরা কুন্তীর কথা।—এরা তো দেশে
ণ, ছিলো ; আজও আছে ; কতো কাল থাকবে জানা নেই। জাঁক থাকলেই
ক আসবে। যৌবন থাকলেই ধর্ষণের ডর। সোনার দেশ মানেই ডাকাত
ীর ডাক। সজাগ না থাকো, লুঠ হবে। 'স্বাধীনতা'র মানে দাঁড়িয়েছে
,—বেঁচে সুখ না পাও মরে শান্তি পাবে!.....কিন্তু এ সব দেশে
াও শান্তি নেই!

এ কথা শোনানোর দায় আছে। দুর্যোধন বেঁচে থাকতে ব্যাসও রচনা করতে
ান নি মহাভারত ; রাবণ বেঁচে থাকা কালীন রামায়ণ লিখিয়েকে রাবণায়ণ
তে হোতো। ফারদৌসী, কল্হণ, ভূষণদের কাছে ইতিহাস ততো ঋণী
যতো ঋণী খফী খাঁ-দের কাছে, ফা-হিয়েনদের কাছে, য়ু-এং চোয়াংদের কাছে।
কাকে বলি? সামনে পরীক্ষিৎ বসে না থাকলে শুকদেবের ভাগবতেও
থাকতো না। তাই তোমায় সামনে রেখে এ কথা আরম্ভ করবো। সময়
? রাজী? নাকি হাত জোড়া?

*　　　*　　　*

তুমি তো আর দম্‌দমে এলে না। বৌ বাজারের মোড়টা আত্মীয়া তালাশ করার খুব যে একটা গোছালো অনুমোদিত জায়গা,—তা ন: তবুও তপতী, হারু, আমি এবং টুনটুন চেয়ে চেয়ে দেখি। যতই দে কেবলই সুন্দর সুন্দর মুখ। আমাদের মাথাখাওয়া সেই সুন্দরতর ড্যাবডো মুখখানা আর দেখি নি। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া দুরূহ, জানি তবু পোড়া মন আশা করে বসে আছে। এয়ার পোর্টে দু ফোঁটা চোখে জলে দুটো দিঘী ভরা চাওয়া—এটি কি এবার কপালে জুটবেই না?

জোটে নি। তুমি যথারীতি হাসপাতাল বুকে করে শারদপ্রাতে নিশি ছিলে। আমরা দম্‌দমে পুরোদমে চলে এলাম নিষ্পদ্ম ভ্রমরবৎ।

তপতী বোধহয় এই প্রথমবার তার বাবাকে বিদায় দিতে কেঁদে ফেললে হারুর অবস্থাও বোঝাচ্ছিলো ও বুড়ো হয়েছে।—এই আসা যাওয়া এতোকা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ওরা যখন বিদায় ব্যথায় সজল হয়ে পড়ে ত: আমি ঠিক ওদের ধাপ অবধি উঠতে পারি না। ওরা ভাবে ঠাণ্ডা মে গেছি। ভাবে হেডমাস্টারী ডিসিপ্লিন। এমন কি নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্তির ছোঁয় লাগা ভণ্ডও ভাবতে পারে। কিন্তু এই যে আসি-যাই তার ফলে ঐ ঢাউ ঢাউস বাড়িগুলোর পাঁজরা ভেদ করে ঢাউস ঢাউস লোহায় গড়া পাখিগুলো পেটে সেঁদিয়ে যাওয়াটা খুবই যান্ত্রিক ব্যাপার। আজকাল আবার লেগে এরোপ্লেন লুঠ করা-করির রঘু ডাকাতরা। রবিনহুড, রঘুডাকাত, শিবাজী বলো আর লঙ্কায় হনুমানই বলো,—ব্যাপারটা তো গেরিলা, অর্থাৎ রাজনৈতি ডাকাতির চড়াও এবং হাঙ্গামা।—কাজেই কোম্পানীর ওরা প্রতিক্রিয়াশীল বৃদ্ধ মতো মানুষের আগাপাশতলা পরীক্ষা করে। মেয়েদের আবার সব মোক্ষ মোক্ষম চক্রব্যূহ আছে তাই ওদের জন্য বিশেষ বিশেষ পুলিস বরাঙ্গনা আছেন।

মানুষের, বিশেষ আধুনিকাদের পরমগোপ্য মন্ত্রের আখড়া হোলো 'ফুটান পেটিকা',—বাংলায় যাকে বলে ভ্যানিটী ব্যাগ্। ওর ভিতরে নেই কী বলো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে যাতায়াতের অবসরে কতো সেক্রেটারীর কতো রব রামবাণ লক্ষণবাণ ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ুবাণ পঞ্চবাণ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যবস্থাও যেম কোডোপায়রিণ থেকে এ কালের কতো পিল্ পিলপিল করে ওতে ঢুকে বসে থাকে এমন গূঢ় ব্যাপার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা,—হ্যাঁ বদ্‌তমীজী, মানি; কি যাবৎ না রবিনহুডরা গুণ্ডা-গিরি ছাড়ছে তাবৎ ঐ হাঁড়ি হাতড়ানোটা সভ্য জগতের আদর-বিহীন কায়দা হয়ে রইলো।

মনে পড়ছে একবার বার্মুদায় এক ফরাসী প্লেনে চড়ছি। বার্মুদা

রাই আসেন যাঁরা শাসমল জয়মল ব্যাপার। এক নয় একালের বেনে, নয় কালের রাজা। আমি তো চিরকালের না এস্‌পার না ওস্‌পার। সারাদিন রে ফূর্তি করে কেটেছে। কাষ্টম্‌স্‌-এর হাড়িকাঠ থেকে ছাড়ান পেয়েছি। ইলেক্‌ট্রনিক ফাটক পার হতে হবে। পকেট খালি করার পর দেহের নীচু যে কোনো তালায় যন্ত্র তন্ত্র থাবড়ে থুবড়ে পকেট ঝাড়ন দেখিয়ে ড়ান পেলাম। হাতের ঝোলাগুলো ঝোলাগুড় করে ছাড়লো। প্লেনের খোলা দেখা যাচ্ছে। ঢুকে পড়বো। এ হেন সময়ে—

সামনের এক ফরাসী-দিদি যেন এক জর্মন চিৎকার করলেন। তাঁর ছ ুটী আত্ম-রক্ষক বল্লে কী হয়েছে।

আমার দাঁত!

দাঁত?

হারিয়ে গেছে!

এ হেন নাটকীয় পরিস্থিতিতে আমাদের অনেকেরই দাঁত প্রায় বেরিয়ে ড়ে আর কি। কিন্তু ভদ্র মহিলার দাঁত নেই শোনার পর আমাদের দাঁত র করে দেখানো অসমীচীন।

যাক সামলালাম।

কিন্তু লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে নারলাম।

ছ ফুট তো অবাক। দাঁত নেই! হারিয়ে গেছে! কিন্তু প্রিয়ে (ডার্লিং) ামার হাসির ফাঁকে দাঁত যে স্পষ্ট—

সে কথা শেষ হতে দিলে অশেষ কাণ্ড হোতো।—

আমি সে মুখের দিকে চেয়ে হিড়িম্বার প্রেম স্মরণ করলাম। ভীম ল অমন মুখ দেখেও প্রেমে ব্যাকুল হতে পারে। ভদ্রলোককে সামলে দিয়ে লাম,—এক্‌স্‌-ট্রা দাঁত বোধ করি!

ফরাসিনী সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—ইণ্ডিয়ানও যা বুঝতে পারে তোমার পক্ষে ও বোঝা এতো কষ্টকর! ভাষাটা অবশ্য বেশ কায়দা মাফিক মার্জিত ছিলো।

ইত্যোমধ্যে ত্বরিতা, স্খলিতা, বিদ্যুল্লতেব এক অপ্সরা না কিন্নরী (এয়ার স্টস্‌ এর একটা রোম্যান্টিক সংস্কৃত নাম হওয়া দরকার)। এসেই এক ল হাসি গল্‌ গল্‌ করে মহিলার মেজাজের ওপর এবং মহল-টির ফাঁড়ার পর ঢেলে ফিরে বললেন,—এই যে আপনার দাঁত। স্যরি। তাড়াতাড়িতে াধহয়,—

সে দাঁত ছিলো সোনা বাঁধানো।

আচ্ছা পদ্ম বলতে পারো তোমরা যখন শাদা—মাটা দাঁতে হেসে হেসে মাদের মোরব্বা করে রাখো, তখনও সোনার তোলা-দাঁত তুলে রাখো কোন

সার্থকজন্মা ভাগ্যবানদের মোরব্বাতরো চাটনী বানাবার সুখ কল্পে? সো
খিঁচুনী কি খারাপ জিনিষ? তাই কি খিঁচুতে ওর ব্যবহার নিষিদ্ধ?

এই যে আকাশে ডাকাতি এ একটা নতুন জিনিষ। এবং আকা
আকাশে ঘোরাফেরার মধ্যে এই সব পুলিসী ব্যবস্থার অনুমোদনও আবশ্যক
ঝামেলা। মানতেই হয়।—

* * *

এ প্লেনটা জাম্বো জেট। দোতলা প্লেন। শ তিনেক যাত্রী নে
ভাগ্যি প্লেনটা ভরা ছিলো না। সর্বরক্ষে। একবার ঐ এক জাম্বো গে
এথেন্স থেকে দিল্লী আসি। কোনো স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কারণে পাল
এয়ার পোর্টে একই সঙ্গে তিনখানি জ্যাম্বো। ব্যস্, যার-নাম ট্রাফিক জাম
এয়ার পোর্ট থই থই। কাস্টম্‌স্ থেকে নিয়ে টীকে-দারোগারা পর্যন্ত স
হন্ত দন্ত। অমন সব কাণ্ড অন্যত্রও দেখেছি। ত্রিনিদাদের পিয়াকো এ
পোর্টে হামেসাই হেন জগরঝম্প হয়; আম্‌স্টারডামে দেখেছি; বার দুয়েক

এ বিষয়ে তোফা জাত—জাপান। ওদের ব্যবস্থা একেবারে সহজ।
করে, ও কেন সহজ বলতে পারবো না। কিন্তু ওরা সব জিনিষ ঢের ে
শান্ত ও সহজ ভাবে করে। পকেট তো পকেট; তোমার গলা কাটবে, ত
শান্ত সহজ ভাবে, মোলায়েম কায়দায়। তার পরিচয় দেবো যখন জাপান
শোনাবো। শোনার মতো কথা।—মার্কিন, জর্মন, ইংরেজ, ফরাসী একত্র বে
যদি এক তাল সভ্যতা তৈরী করো,—তাও জাপানের একটু ট্যেরা হা
ধারে কাছে যেতে পারেনা। য্যেয়সা আদব, ত্যেয়সা কারামাৎ, ত্যেয়
নিখুঁত সব।—টোকিও একটিমাত্র এয়ারপোর্ট যেখানে আমায় পাসপো
দেখানো ছাড়া অন্য কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি। টোকিওতে ডাক
'চেক্' করার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা 'অটোমেটিক' এবং নিখুঁত।—

জ্যাম্বো জেট আমার ভালো লাগেনা। অথচ জাহাজ ভালো লাগে
ত্রিনিদাদ থেকে লণ্ডন একবার সপরিবার জাহাজে করে ফিরেছিলাম। ইতালি
জাহাজ। যাত্রী সংখ্যা ছিলো প্রায় দু-হাজার। কিন্তু ভীড় লাগেনি; খা
লাগেনি। একে তো ছিলো আকাশ জলের দিগ্বলয়ের অবাধ আলিঙ্গ
তার ওপরে জন অরণ্যের কুৎসিত ভীড়টাকে ওরা তালায় তালায় পরতে পর
গুঁজে রেখেছিলো। রাশি রাশি বই বুকে নিয়েও বরোদা লাইব্রেরি ে
ছিমছাম। খানকতক পড়ার বই দিয়েই গোরা আতুর পড়ার ঘরে ভীষণ ভী
তেমনি জাম্বো জেট। তাও গোছানো। সারি সারি লোক। কিন্তু এক
সারিতে ১২ থেকে ১৪ জন মানুষ। অথৈ মানুষ। কিন্তু নট নড়ন
নট কিচ্ছু। জাহাজের অবকাশ তো নেই-ই, জাহাজের গতিক্রমের অনুভ

নেই। সব বোবা। সব বন্ধ। সব থেমে আছে। কিছু নড়ে না। টোকিও থেকে ভ্যাঙ্কুবারে গেলুম; সময়ও নড়লো না। ২৮ তারিখে টোকিওতে—২৮শের সূর্যোদয় দেখলুম। পুনশ্চ ভ্যাঙ্কুবারে ২৮ তারিখের সূর্যোদয় দেখলুম। অর্থাৎ ২৮শে ছেড়ে ২৭শে পেঁছুলুম।—এমনি থেমে থাকার মধ্যে মানুষের মন বিস্বাদ না হয়ে পারেনা। জীবনের শাশ্বত রসই বোধকরি গতিশীলতা, প্রগতি। জীবনের পরমবেদই বোধহয় চরৈবেতি।—

প্লেনের মধ্যেই বন্ধু খুঁজছিলাম। সীট তো বদলাবার জো নেই। কিন্তু উভয়ে উভয়কে চিনে নিলাম। আসল ঘটনাটা ঘটেছিলো দমদমেই।—

শুনেছিলাম দমদম এয়ারপোর্ট নাকি দারুণভাবে কায়াল্টাক্তে ব্যস্ত। নবকলেবরে ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্টের দরবারে পাঁতি পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। দম্‌দম এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে যাওয়া এই প্রথম। এয়ারপোর্টটি এখনও গড়ন্ত। প্লেনে চড়ার জন্য ওপর তলায় ওঠার সিঁড়ির পাশেই সেই হ্যান্ড ব্যাগ পরীক্ষা। আমি ইচ্ছে করেই দেরী করেছি। ভাবছি যতোটা পারি তপতীর কাছে কাছেই থাকি। বার তিনেক ডাক দেবার পর কাষ্টমস্‌ শেষ করে এলাম সেই সিঁড়ির মুখে। আজকাল ওজন ওঠানো আর সিঁড়ি চড়াটা মানুষের মতোই করি। সেকালের জয় হনুমান্‌-জী মার্কা তেজ এ বয়সে তোমরাই সইতে চাও না, দেওনা। কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ে লেখা 'এস্‌কালেটর চলছে না'। অগত্যা সিঁড়ি-ই ধরি। আমার ঝোলা পরীক্ষা করার আগে একটী সুশ্রী যুবককে সবে ছেড়েছে। তাঁর সঙ্গের আরও সুশ্রী মেয়েটি যে কেন অনেকটা এগিয়ে আছেন জানিনা। কিন্তু আমি যখন সিঁড়ির মাঝামাঝি, ওই যুবকটির ডাক পড়লো পুনশ্চ। বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক। অথচ জানি অস্বাভাবিক কোনো সন্দেহ যদি হয়েই থাকে,—বিরক্ত করাটাই আরও স্বাভাবিক।—

যাক্‌, দেখেশুনে আবার ছাড় পেলেন ভদ্রলোক। প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম ছেলেটি,—গোরার বয়স হবে।—কিন্তু সঙ্গে সুন্দরী মহিলা, গলায় বাঁধা সিল্কের টাই,—গায়ে মাথায় বিদেশী মার্কা সেরা সেরা গন্ধ।—ভদ্রলোকই বলি।

চড়লাম এয়ারপোর্ট—বাসে। বাস নিয়ে যাবে রাণওয়েতে,—যেখানে প্লেন। বড় প্লেন বিল্‌ডিংয়ের কাছে আসেনা।—হঠাৎ স্টার্ট দেওয়া বাস আবার থামলো। উর্দী পরা কে দৌড়ে এলো; ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার তলব আবার হোলো। ভদ্রমহিলা বললেন,—'আবার ?'

ভদ্রলোক বললেন,—'ছুডোলোগ্‌ !'

কিন্তু যেতে হোলো।

ও'রা অচিরাৎ ফিরলেন। গাড়ি ছাড়লো।

প্লেনে আমার সারের দু সার পরে ও'রা বসে। আমার ধারে দুটো সীট খালি। অন্য সময় হলে মাঝের হাতল টেনে তুলে বেশ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তুম। কিন্তু মনে মনে একটা সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি মারে।

ঐ যে "আবার!", ঐ শব্দটির মধ্যে বহু যুগ ধৃত, বহু রক্ত স্নাত, শালীন, মার্জিত পরিবারের নিয়মসীমিত কুশলী ধ্বনিটি রণিত। অথচ তার পাশে 'ছুডোলোগ্' যেন মুর্গীহাটায় জগন্নাথের ভোগ; নারকোল-বড়া পান্তা-ভাতের টেবিলে বারবাকিউ সহ শ্যাম্পেন। ওরা কে?

নাক গলানো নয়। আমি যেন মনে মনে গোয়েন্দা হয়ে গেছি। কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। কিছু একটা হতে যাচ্ছে, হবে। এবং আমায় চুপ করতে দিতে আমি নারাজ।...যে কাস্টম্‌স্ আমাকে অতো সহজে ছেড়ে দিলে সেই কাস্টম্‌স্ ওদের ছেড়ে দিয়েও রগড়ায় কেন। কল্‌কাতা কাস্টম্‌সে রসিক নেই এ কথা শত্রুও বলবেনা। অমন সুন্দরী মেয়েটিকে আর একবার দেখার লোভ যদি তারা করেই থাকে তা আর কেউ না বুঝুক সুন্দরী নিজে তো বুঝতে পারবেই। ওদিকের ফুটপাথ থেকে তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে যে মানুষটার চোখ কানা হবার জো তার নামে নালিশ তো হামেশাই আমায় শুনতে হোতো তোমার বোনেদের কাছে। শুধু তোমায় কখনও আপত্তি করতে শুনিনি। কারণ তোমার দিদিরা বলেন তুমি নাকি বরাবরই চাপা।... কিন্তু তা হলে তো মেয়েটি খুশীই হবে! 'আবার!' বলবে কেন?

'ছুডোলোগ্' ও 'আবার' দুটো শব্দ যেন আমায় নাগরদোলায় চাপিয়ে দিলো।—

আমি উঠলাম। সাহস করে গেলাম। নমস্কার করে বললাম আমার নাম, এবং অনুরোধ করলাম যে সফর দীর্ঘ, যদি ও'রা আমার কাছাকাছি এসে বসেন, দুটো সীটই খালি।—

'চলুন তাজমুল সাহেব। কষ্ট পাবেন না।' বলেই প্রথম কোপ মারলুম।

'ছীট বদলাইলে কে-ও কিছু কবে নাতো?'

লক্ষ্য করলুম তাজমুল সাহেব নারাজ। যেন ভয় পেয়েছেন।

সঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'চলো তাজমুল। উনি লেখক। আপনিই "ভাস্বর দিগন্ত" লিখেছেন?—চমৎকার বই।'

আমি চুপি চুপি বললাম, 'ধন্যবাদ কণিকা।'

তাজমুল চমকে গেলো। 'আপনে কণিকারে জানেন?'

'ভক্তকে বোদাতম ভগবানও জানেন। নৈলে নৈবিদ্য জুটবে না।'

তারপরে আর বাধা রাইলো না।—কণিকাই প্রথম দিকে ছিলো। ওরা উঠে এলো।—

কিন্তু তাজমুল প্রশ্ন না করে পারলো না,—আমাগোর নাম জানলেন কী কইর‍্যা ?

কণিকা ছোট্টো করে বললো,—আশ্চর্য !

ওদিকে প্লেন কোম্পানীর বিদ্যাধরীরা দেখাচ্ছে কোনো কারণে প্লেনের বিপর্যয় হলে কোথা থেকে কোন্ পোষাক সংগ্রহ করে কী ভাবে পোরে বেঁধে বুঁধে নিলে প্রাণপাখি ডানাহীন হওয়া সত্ত্বেও শূন্যে উড়তে পারবে।—কণিকা মনোযোগে দেখছিলো, আমি বললাম, দেখে কী করবে ? ওর চেয়ে 'পড়লাম আর মরলাম' অনেক সহজ। তা ছাড়া ও যদি পরিত্রাণ দেয় তবে রাম-নামও পরিত্রাণ দেবে। নামের মাহাত্ম্য যাঁরা গান তাঁরা দেখতে এতো চমকদার না হলেও আরও ঝকমকী কথা বলেন।

মনঃপূত হোলোনা কণিকার। নিশ্চয় কিছু হয়। নৈলে এ সব করেছে কেন ? আপনি 'এয়ার-পোর্ট'' সিনেমা দেখেছেন ?

হাসি।

কণিকার রাগ হোলো। হাসবার কী আছে ? লেখক বলেই কি এতো তাচ্ছিল্য করা উচিৎ ?

সত্যিকার রাগ যে করোনি তা তোমার চোখের হাসি দেখেই ধরেছি। কিন্তু কাগজে তো কতো প্লেন ক্র্যাশ্-এর খবর পাও। তার মধ্যে এই সাজ-সজ্জা পোরে কজন ঝাঁপাতে পেরেছে খবর পেয়েছো ? ঐ 'এয়ার পোর্টে'-ই বা ক'জন তা পরেছিলো ? ব্রাজিল না পেরুতে পথ হারিয়ে পাহাড়ের খাঁড়িতে যে ক্রাশ্‌টা হয় তাতে যারা বেঁচেছিলো তারা একজনও এ সাজ পরেনি।

নিশ্চয় তারা রাম নাম নিয়েছিলো।

অথবা ক্রাশটাকেই ক্রাশ বলে মেনে নিয়েছিলো। জীবনেই বলো, মরণেই বলো,—প্লেন ক্রাশই বলো, আর প্রেম ক্রাশই বলো, হলেই ধপাস্। বাঁচলে তো গুরুবল। তোমার বল জীরো।

আকাশচারিণী বিদ্যাধরী পানীয় রস ও লজেঞ্জস্ এনে ধরলেন।

তাজমুল একটি মুঠো ভ'রে লজেঞ্জস্ নিতে যাচ্ছিলো। কণিকার মুখের দিকে চেয়ে মাত্র তিনটে নিলো।

আমরা শুধু লেবুর রসের গেলাস নিলাম।

তাজমুলের আমূল জানা চাই। পুনশ্চ প্রশ্ন করে, জানলেন ক্যেমনে আমর কে ?

জানলাম ? কী জেনেছি তোমাদের ? কিছুই তো জানি না। একটু আগে ভাগে এসে মিস দাসের মতো লিস্ট্ অব--রিজার্ভেশনটা দেখছিলাম কোনো বাঙ্গালী যাচ্ছেন কিনা। কণিকা দাস দেখলাম। মনে হোলো বাঙ্গালী। তারপর কাস্টম্‌স্ এ দেখলাম হাতে ধরা লেফাফায় মিস কে-দাস লেখা।—ওটা সহজ। আর ভাই তোমার তো ব্যাগের ওপরেই তাজমুল হুসেন লেখা। কণিকার দিকে চেয়ে বলি, আমার নামটা নেহাৎ আটপৌরে নয় তাই আপনার চোখে পড়ে গিয়েছে।

তাজমুল অবাক্! আপনে উর্দু জানেন ?

তুমি জানলে আমি জানবোনা কেন ? দু-জনাই তো আমরা বাংলার ছেলে।

আমি মুসলমান। আপনে তো মুসলমান না!

কে বললে না ?

আপনে ভট্টাইজ্জো।

তাতে কী মুসলমান হতে বাধে ? উর্দু জানলে যদি মুসলমান হওয়া যায় আমি মুসলমান। ঠেকায় কে! কিন্তু ভাষা কি হিন্দু মুসলমান হয় তোমার ভাষা বাংলা। দেশ বাংলা দেশ।···উর্দু তবু ধরে আছো। এবং নয় তুমি দেশ-ধর্মহীন ব্যবসায়ী; নৈলে এখনও ভাবছো কী জানি আবার কখন পাকিস্তানী হয়ে যেতে হয়।

এই এই দ্যেখেন তো কারবার। কৈলো কেডা আমি বাংলা দেশী পাকিস্তানী হইতে চাই, কয়েন কীরে মশায় ?

ঐ যে বললে, 'ছুডোলোগ!' তাতেই। তা ছাড়া তোমার বাড়ি যে ঢাকা তা বোঝা যায়! তোমার পাসপোর্ট দেখলাম বাংলা দেশের।·· আমি ভাবছি,—যাক্; প্লেনে ভাবনা বেশী করতে নেই। খাবার দেবে এবার কিন্তু রেঙ্গুনে পেঁছাবার আগেই অন্যত্র বিমান নামানো হচ্ছে! ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আমি যে খুব তাড়াতাড়ি তড়বড়িয়ে উঠেছিলাম তা নয়। জানোই তো ধীরে সুস্থে চলি। গিয়ে বসে পেটীকাযন্ত্রে নিজেকে বাঁধলাম।—

প্লেন সত্যিই নামতে লাগলো।

তাজমুল জিজ্ঞাসা করলো, ভয় কর্তে আছে নাকি দাদা ?

বাইরের ? না ভেতরের ?

হেসে ফেললো কণিকা।

আমি পুনশ্চ বলতে থাকি, বাইরে সত্যিই কোনো ভয় আছে কি না জানি না তো! জানলেও ভয় পাওয়া ছাড়া আর আমরা কীই বা করতে

পারি। যখন ভয় পেতাম তখন ভয় পেয়ে দেখেছি বিপদে ভয় যতই করো কাজ এগোয় না ; বরং কাজ বাড়ে।

আচ্ছা ভয় আপনার ক্যেন করতাছে না ?

কী করে জানলে করছে না ? খুব করছে। তোমার ভয় যতো দেখছি আমার ভয় ততো বাড়ছে।

আবার হাসে কণিকা।

এবার তাজমুল চটেছে। খামাকা হাসো ক্যেন কওতো ?

অনেকে ভয় পেলে হাসে। হিস্টিরিক বলতে পারো। কণিকার হাসিও তাই। আমারও হাসি পাচ্ছে। কিন্তু চারধারে যা ব্যাপার—

বিদ্যাধরীরা ল্যাভেন্ডারে ভেজা গরম ন্যাপকিন বিলি করছে। ভেতরটায় তখন ছত্রভঙ্গ, লন্ডভন্ড। কে যে কেত্তো সাহসী, কে যে কতো কেতা দুরস্ত্ সব জাহির।

সবটা প্রকট হোলো লাউঞ্জে গিয়ে। বেতারে খবর এসেছে যে জাহাজের খোলে কোথাও কেউ বোম লুকিয়ে রেখেছে। টাইম বম। মাঝপথে ফাটবে ; তাই সদ্য সদ্য নামা।—বেতারের খবর এন্তার আসে। সব সত্য নয়। সত্য এই নাজেহাল হওয়া।

প্রায় দু ঘণ্টা দেরী হয়ে গেলো।

বাইরে তখনও চাঁদের আলো ছিলো। আমি সিনেমা না দেখে বাইরে বসে আছি। দূরে রাণওয়েতে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের মতো প্লেনখানা। মন ভেসে গেছে নানা ছুট বিষয়ে। যন্ত্র সভ্যতা ; পৃথিবীর দূরত্ব ; মনের মানুষ হঠাৎ কেমন সহজে ছিঁড়ে চলে যায় দূরে ; মানুষের সঙ্গে মানুষের, জীবনের সঙ্গে সংসারের বন্ধন বলে যে সব দৈনন্দিনকে আমরা আঁকড়ে ধরে থাকি,—তারা কতো অলীক ইত্যাদি এলোমেলো তত্ত্ব যা এলোমেলো আসে। যেন মূলহারা ফুলের বাহার। মৃত্যুর ওপার থেকে জীবনকে দেখা যাবে কি-না জানিনা, দেখা গেলে কী দেখতাম,—বেশ কতকটা বোঝা যায় এই সব রগ ঘেঁসে বেরিয়ে যাওয়া মুহূর্তে।

—শুনলাম আমরা রেঙ্গুন যাচ্ছি। রাতটা থেকে কাল ব্যাঙ্ককে যাবো।

তুমি একা ? তাজমুল ? সে কৈ ?

প্রথম দিকটায় রাগ করছিলো। আপনি প্লেনে বসে ক্রাশ্ হওয়া নিয়ে সব অপয়া কথা বলছিলেন। ওর বিশ্বাস তাতেই দুর্দৈবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। গেছে কোথায়। মনে হয় নমাজ পড়ছে।···রেঙুন! রেঙুন মনে হলেই কী মনে হয় বলুন তো!

তোমার কী মনে হচ্ছে বলতে পারি। তা বোলে তুমি কিছুতেই যে কিরণময়ী হতে পারোনা তা জানি। ও-ও দিবাকর নয়।

নয় ? কী তবে বলুন তো !

ধরতে পারা কঠিন। এবং সে চেষ্টাও করছিনা। ও চেষ্টা করা কেবল ক্যুরিওসিটি।

কিন্তু আপনাকে বলে রাখা ভালো। কতো বই আপনি লিখেছেন। আমি বাংলা দেশের মেয়ে। এতো সবের পরেও আমি ছাড়িনি ও দেশ। কিন্তু শেখ সাহেব শহীদ হলেন ; এর পরে আর যা হতে পারে ভেবে আর আমার থাকা চলে না। বাবাকে চট্টগ্রামে প্রাণ দিতে হয়েছে। মা গলায় দড়ি দিয়েছেন। আমি আর আমি নেই ! কিন্তু তবু ফেণীতে আমি মাটি কামড়ে পড়েছিলাম। ফেণী জানেন তো ? আমার মনে হয় ফেণীর মতো জায়গা পৃথিবীতে কোথাও নেই। বড়ো ভালো জায়গা। মানুষগুলো আরও ভালো।—অথচ কী যে হয়ে গেলো !

একটু থেমে বলে, আমার দাদা আছেন হংকং। আমি হংকং যাচ্ছি।

তাই নাকি ? তবে ব্যাঙ্কক্ কেন ?

কী জানি কেন। ঐ যে তাজমুলকে দেখছেন না, ও এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। হংকং আর ঢাকা এই করছে। জিনিষ কেনে। ঢাকায় বেচে দেয়। প্যাকিংও খোলে না।

ওকে ধরে বার হলে বুঝি ?

না, ঠিক তা নয়। বার কি হওয়া যায় ? ব্যাপারটা স্মাগলিং। আমাকেও স্মাগল্ করে বার করেছে। আমি তো এতোদিন নরক বাস করেছি। মুক্তি চেয়েছি। প্রাণপণ মুক্তি চেয়েছি। মন থাকলে দেহ কিছু নয়। একজন বিদেশী রাজদূত আমার খিদমতের বদলী একটি বাজে পাসপোর্ট দিয়ে বর্ডার পার করে দিয়েছিলো। কলকাতায় আসতেই ঠিক পাসপোর্টও পেয়ে গেছি।··· ছেড়ে দিলো ! কিন্তু ওদের অন্য সন্দেহ।

তাজমুল ?

হ্যাঁ। হিন্দু মেয়ে ভাগাচ্ছে কি-না।

আমাদের দেশের কাস্টম্স্ পুলিস কিন্তু ভারী ধার্মিক কণিকা। এর পরে অস্বীকার করতে পারো না।—

তাজমুল আসল বাংলা-দেশী। ওর কাছে এই খুন খারাবীর কথা শুনবেন। ও আমায় হংকং অবধি পৌঁছে দেবে। সর্ত ওর একটি। ব্যাঙ্ককে নামবে। নামবেই, এবং এক রাত থাকবে।—ব্যাঙ্ককে যে ওর এক রাতের কী জানি না।

বুঝলাম। ব্যাঙ্কক এখন আমেরিকানদের দৌলতে এ তল্লাটের সেরা উর্বশী পাড়া। ও নামবে রাতের ব্যাঙ্ককে। নামুক। কিন্তু তোমায় নিয়ে করবে কী ?

তাই তো ও বললো, দাদাকে ধরো। ব্যাঙ্ককে যে হোটেলে দাদা থাকবেন সেইখানে তুমিও। আমার খোঁজ একটা রাত আর কোরো না।—শয়তান ছেলেটা। অথচ মিঠাই চাচা, ওর বাবা, এতো ভালো যে—

তাজমুল দৌড়ে আসে।

চান্দের আলোয় বইস্যা আছেন। বেবাক ভুইল্যা ফেলাইছেন। দিব্য আছেন। বোস না গুষ্টির ছালি।—চলেন। কে কী ফাটকী দিছে। ঝামেলা। ব্যাঙ্ককে যদি রাইতে পেঁছায় দিনে দিনেই যাইতে হইবো—কয়েন তো কী প্যাচ্? আমার ব্যাঙ্কক্ যাওন্-ই বিলকুল বরবাইদ্ হইবো না?

সেই চিন্তাতেই এই বাঙ্গালী যুবক ব্যস্ত।

* * *

ট্যাকসীওলা আমার বক্তব্য বুঝেছিলো। মার্চেন্টস স্ট্রীটের লাগাও পার্ক-এর ওপরেই এয়ার লাইন্স্ হোটেল। আমায় ও সোজা নিয়ে এলো লালবাতি পাড়ায়, রেঙ্গুনের ব্রডওয়ে। চৌরঙ্গী বলে মনে হয়; গন্ধটা আলাদা।—

কণিকা আমার সঙ্গে এলো কেবল তাজমুলের ওস্কানীতে। কারণ ছেলেটা একা হয়ে যেতে চায়।

এমন ছেলের সাথী হতে গেলে কেন?

ইংরীজীতে বললো,—বিপদের সময়ে বিছানার বাছ চলে না। কিন্তু তাজমুল ফেনীর ছেলে। মিটাই চাচার এক শালা ঢাকায় কারবার করতেন। দেশ ভাগ হবার পর দাঁও বুঝে কাপুড়ে দোকান সার—সার—তিনখানা কিনে এখন ক্রোড়পতি। তাই ভাগেকে এনে কাজ শেখাচ্ছেন। বাইরের কেনাকাটায় ও পোখ্তো। তাজমুল যখন ছোটো ছিলো তখন আমার খুব আদরের ছিলো। মিঠাই চাচার কাছ থেকে সব শুনে এবার নিজে থেকেই বললো চলো,—আমি ফেনী ছেড়েছি পাকিস্তানের লড়াইয়ের পর। ঢাকাতেই থাকতাম। —বললো,—চল্ ছোড়দি। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তোকে ব্যাঙ্কক পেঁছে দেবো। তবে আমার বৌ হতে হবে তোকে।—অবশ্য কলকাতায় পেঁছে ছোড়দি হয়ে যাবি। ও ছেলে ভালো। কিন্তু ঐ এক। পয়সা খরচ ক'রে মেয়ে খোঁজে।

না খরচ ক'রে খোঁজার চেয়ে ওটা ভালো। নর্দামা ঘরে না ঢুকিয়ে ঘর থেকে নর্দামা বার করাটা মঙ্গলের।

রেঙ্গুনের নদীর ধার। আসল নাম লাইং নদী; ইংরেজ বলে গেছে রাঙ্গুন নদী। ইরাবতীরই শাখা। এমনি শাখা তিনটি,—মায়ু, কালাদান, লেমরো। বদ্বীপ গুলো বড়ো বড়ো। শাখাগুলোর তাই আলাদা নাম। শহরের নামও রাঙ্গুন নয়। আসল নাম ইয়াং-কোন্। "সব ঝামেলার শেষ—" এই নাম

হোলো ইয়াঙ্গন্। ইংরেজ বললো রাঙ্গুন। ও ব্যাপার বোধহয় সবাই করে। কালীঘাট, কালিকাট, কালকাটা; কানপুর থেকে কান্পোর, মুম্বই থেকে বম্বে এও যেমন হচ্ছে,—ত্রিনিদাদে গায়ানায় দেখেছি ভারতীয় বাসিন্দারা সাগুয়ানাস্-কে চৌহান, সিপারিয়াকে, শিউ পিয়ারী; সাংওয়ান্ কে শাওন্ বলছে। গ্রীকদের দেখো ইন্দাস্, ট্যাকসিলা, পোরাস্, স্যাণ্ড্রাকোটাস—কী না করেছে?

সোনার প্যাগোডা গোয়ে-দাগন—৩৬৮ ফুট খাড়াই। মন্দির তো নয়, স্তূপ। ভক্তেরা যুগে যুগে সোনা ঢেলে পাতে মুড়ে দেয় মন্দির। সে সোনা কোথায় যায় অজ্ঞাত। অজ্ঞাত থেকে যায় মন্দির ও দেবতার নামে দেশে দেশে ধর্মে ধর্মে এই যে বোদা অন্ধ অর্থের স্তূপ,—এ কোন নালী পথে বয়ে যায়। বয়ে তো যায়ই। নইলে,—'উচ্ছিয়া উঠিত বিশ্ব—পুঞ্জ পুঞ্জ' দানের দৌলতে। মায়া-দের মন্দির, নতার্দেমের মন্দির, ভাতিকানের মন্দির, পুরীর মন্দির, নাথদ্বারা, দিলওয়ারা, বালাজী,—এ এক দারুণ গ্যাঁড়াকল। সেই উর, বাবিলন সভ্যতা, 'মাজী'-দের—মন্দির কৃষ্টি থেকে নিয়ে এই সব প্যাগোডা, ব্যাঙ্ককের—শত শত মন্দির, সেই সুদূর থাইল্যাণ্ডে ব্যাঙ্ককের বৈদুর্যময় বুদ্ধ মন্দিরে রাশি রাশি সোনা,—এ দৌলত কার? কেন? এর—অন্ত কোথায়? কেন মানুষ এতো দেয়? ভাববার কথা। কেবল অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব যে নয় তা এই মন্দিরের চত্বরে সমবেত শতশত নাগরিকদের চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। প্রায় দেড় হাজার ফুটের ব্যাস জুড়ে কেবল মানুষই বসে। বড় বড় গামলায় বালি। সেই বালিতে গেঁথে দিচ্ছে ধূপকাঠি। পর পর সারি সারি মোমবাতি জ্বলছে।—দূরে কোনো এক গদ্দীতে আরামে সিল্ক-মখমল-কার্পেটের স্তূপে বসে মহন্ত বাবাজী মন্ত্রপাঠ করছেন পালীভাষায়। জনতা আবৃত্তি করছে না। তবে গুঞ্জন করছে। মেজো মহন্তরা একটা চৌকো রেলিংয়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দোয়ার্কী করছে। ফুল ও মালার গন্ধে অন্ধকার পুলকিত।—

বাইরে সারি সারি দোকান। দোকানগুলোর বাজার দেখে মনে হয় যদিও বিদেশ তথাপি অবধারিত কয়েকটি মাল দেখা যাবেই—কোকাকোলা, ওভালটীন, লাক্স ও সানলাইট সাবান, এভারেডী—এ সব বিজ্ঞাপনের কৃপায় মন হারিয়ে যায় না। বেড়ায় বন্ধ জানোয়ারের মতো লক্ষ মাইল দূরে সরে গিয়েও মনে হয়,—যে পৃথিবী ছেড়ে এলাম এবং যে পৃথিবীতে ঢুকেছি,—আসলে একই পৃথিবী। এখানে মুক্তি নৈব নৈব চ।—হায় হায় হায় কী করি উপায় পিছে পিছে ধায় 'য়াঙ্কী'।

জুতোপাড়ার মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্ক পাড়া ঘুরিয়ে ট্যাকসী চললো নদীর ধার

রে। এখানেই মানুষ, জনতা, বৈচিত্র্য। লোহার জালের বেড়া দেওয়া াস্টমস্ এলাকা পার হয়ে সারি সারি ভাসমান বোট। বোটেই এদের ন্মমৃত্যু। বোটেই এদের পলিটিক্স্। ট্যাকসিওলাকে বুঝিয়ে বলি। ও নয়ে এলো বোটে ভাসমান এক কাফেতে।

অনেকটা খোলামেলা। বন্দরঘাটা মাত্রেই একটা গন্ধ আসে সেটা জলের ন্ধ নয়। জলপচা, মেছো এবং তৈলাক্ত গন্ধ। আর শব্দ ছলাৎ ছল। মাঝে াঝে জাহাজী ভেঁপু। মোটর বোট, ফেরীবোট চলা ফেরা করছে; জল াটছে তীব্রবেগে। এ নৌকোয় ও নৌকোয় লাগছে তাই জলের শব্দ কল্ কল্ নয়, ছলাৎ ছল।—

কফি আর মাছভাজা অজুহাত। কথাই বলতে চাই। বর্মায় সব ব্যাপারেই ময়ে প্রধান। এ বৃদ্ধাও ইংরাজীতে পোখ্তো।—জেনে শুনেই ট্যাকসীওলা এসেছিলো এখানে।—আমি জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজ ফিরে আসে চাও তুমি া? মানে তোমার জীবন তো বেজায় লম্বা। ইংরেজ আমলও দেখেছো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বৃদ্ধা তার চায়ের বাটীতে চীনামাটির চামচ নাড়তে নাড়তে বললো ইংরেজ এলো কবে? ও কী আসা নাকি? বেইমানী, মতলববাজী, ভাঁওতা দিয়ে কাজ হাসিল করার তালে ছিলো। আরাকান দিয়ে ঢুকে রেঙ্গুন থেকে বার য় গেলো।—ওরা অমন না হলে জাপান এমন হোতো না। ওরা চেয়েছে ক, টীন, সোনা, রবার, চাল—আর কিছু নয়। গেছে আপদ গেছে।— রা এ দেশকে ভালোবাসেনি।—ওরা এদেশকে পেয়েছিলো রানী; ছেড়ে লো বেশ্যা!

আর ভারতীয়রা? তবে তাদের তোমরা তাড়ালে কেন?—

বিছানা থেকে ছারপোকা তাড়াও কেন? ছারপোকা যদি শিল্পকর্ম জানতো তাড়াতো? যারা কেবল শুষতেই এসেছে তাদের কে চায়? ভারতীয় াড়াই নি। চেটিয়ার তাড়িয়েছি।

কিন্তু ভারতীয় এখনও তো বেশ কিছু আছে। আগে তো ব্যবসা- াণিজ্য সব ভারতীয়দেরই রবরবা ছিলো। শতকরা ৪০ ছিলো বৌদ্ধ; ৩০ িন্দু আর ১০ মুসলমান। এখন?

এখনও সবই আছে। কেবল রক্তচোষাগুলো গিয়েছে।—অবশ্য রক্তও াছে; চোষাও আছে। মুখের ছাঁচগুলো পালটেছে, এই যা। এও যাবে। নেক রক্ত ক্ষয় হবে। উত্তরের আরাকানী মগ, আর-দক্ষিণে কারেন সবই গড়েছে। বার্মা বলতে তো ওই দুই। রেঙ্গুনের এরা যারা, এ-তো বই পোষাকী—শহুরে বেনে, কলার আঁটা বাবু। এদের দিয়ে কী হবে?

ঐ বিদেশী অজাত কুজাতদের চুমড়ে যে কটা দিন! তাতে আর হবে কী? দেখলে তো ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া।—থাইল্যান্ড-ও দেখো কী হয়।—বিদেশীকে টু করতে দেবো না। আমরা বেপরোয়া। বার্মার সঙ্গে শত্রুতা করলেই,—আমরা বার করে দেবো।—

কাকে আগে বার করবে?

একটু চমকালো বুদ্ধা। চোরের আবার জাত কী? ছারপোকার আবার রং কী? তবে—জাপানীদের আমরা দূরে রাখি,—আর আমেরিকান দেখলেই ভয় পাই।

কেন?

ওরা জীবজগতের ছুঁচো। ইংরেজ যেমন ইঁদুর।—আমেরিকানরা নাক গলিয়েই আছে। আসার অনেক আগে দুর্গন্ধ ছড়ায়, আর আসার পর অসভ্যতা।—

আমি হাসি। বলি, এই জন্যে বুড়ো বুড়ী ভালো লাগে আমার। খুব ন্যাংটা কথা। বুঝতে কষ্ট হয় না।

যৌবন কালে ন্যাংটা হবার দায় অনেক। সেরা দোকানী সেরা মাল সবচেয়ে ঢেকে রাখে, আর সব চেয়ে শেষে খোলে।—যৌবনের কালে অঙ্গও যেমন, কথাও তেমন। সেই দোকানী যখন বছুরকী সেল্ করে, পুরোনো মাল বাতিল করে, নির্বিবাদে সবই ন্যাংটা করে দশের চোখের সামনে ফেলে মেলে রাখে'। আমার আর ভয় কীরে ভাই?

এখন ভয় করো কাকে? মরণকে?

মরণ কে? খুব হাসে বুদ্ধা।—উঁচু কপাল আর পিছনের বাঁধা চুলের সামান্য পুঁটলীটি কৌতুকের প্রাচুর্যে নড়ে ওঠে। শ্লথ বক্ষস্থলে যেন জলকাটা মোটরের গতির ধাক্কা লাগে। নীরবে ছলাৎ ছল করে। ছোটো চোখ বুঁজে যায়। সোনা বাঁধানো কালো দাঁত ঝক ঝক করে।

তবে হ্যাঁ ভয়, যাবৎ দেহ, যাবৎ সমাজ, যাবৎ ভবিষ্যৎ, তাবৎ ভয়। সমাজে থাকতে গেলে ভয় রাখা ভালো। সমাজে বাঁধন থাকে। ভয় আছে। রাখি তাই আছে।

মানুষের ভয়?

আর কার? সব পশু বশ হয়। মানুষ পশু ভীষণ পশু। এই যে আরাকানী, কারেনী, আহোমী, পাহাড়ী সব ভাগ ভাগ হয়ে মরছে, এই যে ধীরে ধীরে বর্মী দেশকে দেশ টুকরো হবার তাল খুঁজছে—এটাই সর্বনাশ।

এটা হচ্ছে কেন?

তা কী জানি বাপু।

ট্যাক্সীওলার দিকে চেয়ে বুড়ী উঠে পড়ে। এ সব কাদের নিয়ে এলে? বাংলার ছেলে মেয়ে মনে হয়।—ওদেরই আছে এই সব খুঁচিয়ে যারা।—নিয়ে যা; নিয়ে যা। বাঙ্গালীগুলো নচ্ছার! খেয়ে না খেয়ে পরের গাকে কাঠি লাগিয়েই আছে!

কণিকার শাড়িখানায় হাত বোলায়—সিল্ক।—ভালো লাগে। পারো তো সিল্ক পরবে। নাইলন পরবে না।—

কেন? নাইলনে ক্ষতি কী?—প্রশ্নকর্তা আমি।

বুড়ী হাসে। যৌবনে তুখোড় ছিলে তুমি। শয়তান। বিচ্ছু।—নাইলন মানেই গতি, দৌড়, পাল্লা দিয়ে ছোটা। ফ্যাক্টরী, ব্যাঙ্ক, লুঠের লাভে রাতারাতি লাল।—কিন্তু সিল্ক,—মানে পৃথিবী, মাটি, গাছ, পোকা, তাঁত, চরখা,—ধীরে ধীরে—গ্রামের ধারে বসে কাজ। মন শান্ত থাকে। লোভ তাতায় না।—

আমি বুড়ীকে জড়িয়ে নিয়ে বলি,—এ ছবিও জলছবি।—সত্যি নয়। সত্যি এই যে রস ঝরবে। অনেক রস ঝরবে। ঝরার পরেও বহু বহু যুগ কেটে যাবে।—এক রূপ নিয়ে যে দৈত্য চলে যাবে অন্য রূপ নিয়ে সেই দৈত্য আসবে।

আমাদের প্রত্যেককে বুড়ী একটি করে ফুল আর এক গোছা ধূপকাঠি দিলো।—

বললো সোজা গাড়িতে চেপে চলে যাও।—এখানে আশে পাশে ভীষণ পকেটমার! টেরও পাবে না। পাসপোর্ট হারাবে!—

পাসপোর্ট হোটেলে।

* * *

ট্যাক্সিওলাকে ধন্যবাদ দিলাম। কণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করলো তাকে,—এ বুড়ীর কাছে নিয়ে এলে কেন?

বাবু খোঁজ করলেন তাই। বার্মামুলুক দেখতে আসে যারা তারা এ সব খোঁজ করে না। আমি বুঝে নিলাম।—আমি বুড়ীর কাছে নিয়ে এলাম। আপনারা তো জানেন না। জানলে চিনতেন। আমিও কারেন, ঐ বুড়ীও কারেন।

ময়দানের ধারে সরকারী দপ্তরের বাড়িগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্টোরিয়া লেকের ধারে রাঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগান পেরিয়ে, রেস কোর্স পেরিয়ে হোটেলে ফিরতে রাত হোলো।

কণিকা বললো এখুনি ঘরে ঢুকবেন?

আমি বলি, পাগল! খিদে পেয়েছে। ডিনার হলে চলো দেখি ঝালবড়া আর পান্তাভাত পাওয়া যায় কি-না!

আমরা অনেক রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে ঘরে যাবো, খোঁজ নিয়ে জানলাম তাজমুল ফেরে নি।

কণিকা ঈষৎ হাসলো।

সকালে আর সময় ছিলো না। আটটায়ই এয়ার পোর্ট। প্লেন ছাড়তে ছাড়তে এগারোটা হোলো।—ব্যাঙ্কক্ এসে নামলুম তখন দেড়টা।—

এবং ঐ ব্যাঙ্কক এয়ার পোর্টের ইমিগ্রেশন ও কাষ্টম্স্ দেখে চক্ষুস্থির অমনি এতোক কালে কোথাও দেখি নি।—ইতি—

শুভার্থী—
জামাইবাবু।

২

কল্যাণীয়াষু,

পদ্ম—দিদি,—এয়ার হস্টেসের গলায় লাউড স্পীকার ঘোষণা করছে ব্যাঙ্কক এয়ার পোর্ট ; বেল্ট বন্ধন করুন।

ওপর থেকেই থাইল্যাণ্ডের দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল রূপ স্পষ্ট। কোনো ধারে কোনো অজুহাতে একটুও এমন সাড়া নেই যে ভাবতে পারি এই সোনা কাজল মাটি পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে। নিতান্তই আঁচল বিছিয়ে বসে এক পূর্ণাঙ্গী মা। চাওফ্রাইয়া নদীর শাখা প্রশাখা ধমনীর মতো ব্যাপ্ত করে আছে এক সবুজ দীঘল দেহ। কেবল দূরে পূবের দিকে, এবং উত্তর পশ্চিমে যেন একটু উঁচু। এমনিই সজল আমাদের বাংলা মা-টির রূপ কিন্তু বোঝা যায় বাংলায় জলের চেয়ে জলা বেশী। এমনিই দিগন্ত জোড়া ঘন কাজল মুড়ে রেখেছে এসেকুইবো-ডেমেরারার-বদ্বীপ এবং গায়ানা। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় মানুষ বাস করে না সে তল্লাটে। ধানের চেয়ে ঘ জঙ্গলই বেশী। নদী সেখানে মায়ের বুকের ধারার মতো প্রাণময়ী নয় অঘোর-তন্ত্রের-মন্ত্রের মতো গূঢ় ব্যঞ্জনায় কেবল চোরা হাতছানি দিচ্ছে। একটু ভ্রান্ত হলেই সর্বনাশ। এ তা নয়। রোদে ছাওয়া, স্নেহে আর্দ্রে ঢাকা এক নিরন্তর পৃথিবী, যেখানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত কেবল প্রাণ ; মানুষের প্রাণ, দেশের প্রাণ, ইতিহাসের প্রাণ,—ধান! ধান, নারকেল, সুপারি

গ্রাম, আঁকাবাঁকা নালা। নালার গায়ে গায়ে সীমন্তের মতো শান্ত

কিন্তু আরও নীচে আসতে না আসতে চোখে পড়ে সর্বনাশ।—
বেরের কাগজের ঠাণ্ডা অক্ষরে পড়া যায়,—"মুক্ত-পৃথিবীর আশা ভরসার
ও যে কটি বন্দর আছে থাইল্যাণ্ড তার অন্যতম। নাস্তিক কম্যুনিজমের
বেলা করার জন্য এশিয়ায় এখনও যে কটি ঘাঁটি আছে থাইল্যাণ্ড
....." ইত্যাদি। মুক্তি? কার মুক্তি? কোন্ সর্বনাশ থেকে মুক্তি?
ইছে মুক্তি? দায় কার?—এ সব প্রশ্ন অবান্তর। বুলি-ধন্য, স্লোগ্যান
নো খবর-কাগুজী ভাষার ফুলঝুরিতে এই ব্যাঙ্কক্ যেন কুরুক্ষেত্রের
নের মতো সর্বনাশা ধর্মক্ষেত্র হয়ে চিতিয়ে আছে।
আমি পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্স
ী, পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড দেখলাম। দেখলাম মুসোলিনীর ইতালী,
লের ফ্রান্স। কিন্তু একটি হাওয়াই-বন্দরে এক সঙ্গে এতোগুলো বোমারু
নের-জটলা,—এ আমি কখনও দেখিনি, দেখার আশা রাখি না। গ্রীসে,
ত্র গ্রীসেই আমি তবু কিছুটা লড়াকু প্রস্তুতির আভাস পেয়েছি।—
় সব কিছু দলে মথে পিষে ব্যাঙ্ককের নখ-দন্তের জান্তব হিংস্রতার
স, সে এক্কেবারে এক নব অভিজ্ঞতা।
ডোবায় যেমন মশা পড়ে থাকে, অগুন্তী বলে ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে
যাই, এই বোমারু বিমানের বহরকেও এমনি 'অগুনতী' বলেই পাশ
য়ে তুচ্ছ করতে হবে।—ওরা অহঙ্কার করে বলে এক ব্যাঙ্ককের বিমান
রই আছে তিন হাজার বোমারু বিমান! ব্যাঙ্ককই নাকি দক্ষিণ পূর্ব
য়ার ফ্রী ওয়ার্লডের শেষ ঘাঁটি! হোক্; কিন্তু ডীয়েগো গার্শিয়া তবে কী?
কার বিপক্ষে এ ঘাঁটি? দুশমনটা কে? কার দুশমন?
কেবল সেইটাই কেউ জানে না।
শত্রুপক্ষ কে, তাই জানে না থাইল্যাণ্ড। থাইল্যাণ্ড শান্তিপ্রিয় নিরীহ
। ওরা বুদ্ধের মূর্তি গড়ে নিয়মিত তিন ভঙ্গীতে; বসা: দাঁড়ানো;
য়া। কিন্তু মুখখানা গড়ে একটিই রসের মাধুরী দিয়ে। সে রস
ন্তর রস, সমাহিত মানসতার লোকোত্তর রসপ্রবাহ।—ওরা ধান চষে।
র চাল আবাদ করে। ওদের নদী নালায় অজস্র মাছ; পল্লীভরা নারকোল,
া। ওদের জঙ্গলে সেগুন, গালা, সিল্ক, হাতির দাঁত। ওরা দিনান্তে
ত পায়। নৌকা শালতী বেয়ে মাছ ধরে। ওদের স্নান আহার বাদ
য়ও বহু সময় হাতে থাকে যখন ওরা ওদের স্বপ্নধোয়া বিভোর চোখে
খ প্রকৃতিতে নিসর্গতে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের রূপকারী ঐশ্বর্য। সেই রংয়ে

রসে! লতায় পাতায়, প্রাণে গানে ওরা রচনা করে চলে চারু শি
কলাকৃতী। গানে, নাচে, সৌধে, শিল্পে, অলঙ্কারে, উপকারে ওদের পরম
অবাক্ বিস্ময় সৃষ্টি করা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননতার প্রকাশে ওদের প্র
উত্তেজনা, উৎসাহ। আর সেই প্রকাশের রূপ ও ভাষার মধ্য দিয়েই স্প
হয়ে উঠছে ওদের সমাজ-চরিত্রের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা, নির্জনতা-প্রী
সমাহিত একাকীত্ব এবং শান্তিপ্রিয়তা। ওদের ইতিহাস জুড়ে বড়ো ব
লড়াইয়ের বর্ণন আছে। ওদের বীর পুরুষদের কীর্তি সিকং থেকে ইরাব
পর্যন্ত প্রবাহিত। ওদের ইতিহাসের পাতায় ব্রহ্ম, চম্পা, চীন—এরা
বার এসে বার বার চোট খেয়েছে। সবই সত্য। ইতিহাস প্রখ্যাত দ্বা
শ্বেতহস্তীর লড়াই জিতে প্রাচীন রাজধানীতে ওরা স্মারক মন্দি
বুদ্ধকে অর্পিত করে লিখেছিলো, "হে অক্ষোভ, হে অমিতাভ
করুণানিলয়—যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ দাও; রক্তপাত থেকে মুক্ত করো
সরিয়ে ফেলো চিরদিনের জন্য বিদ্বেষ, লোভ, হিংসা, ক্রূরতা।" শ্রীবু
আমরা চাইনা চাইনা ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য বেণেলীর পথ; চাইনা চাইনা চো
ছাওয়া আকাশ; তেল ঢালা নদী-নালা; ধোঁয়ায় ঢাকা দিন;
ঢাকা রাত; ব্যাঙ্কে ঢাকা সওদা; দালালে ঢাকা সমাজ। আমা
নিরঞ্জন অবকাশ দাও; শান্ত জীবিকা দাও; নির্মল পরিশ্রম দাও
গানে ভরা দিন, ঘুমে ভরা রাত, প্রেমে ভরা বুক, রসে ভরা শিল্প-জী
দাও। গতি, প্রখরতা, শুধু ধাও, ধাও, ধাও,—না ও চাইনা। আমা
নদী কেটে যে অসংখ্য নালা, খাল, প্রবাহ তারই বুক বেয়ে নৌকো
শালতীতে এই যে যাওয়া আসা, এই ভালো, এই ভালো। ওগো তোম
আমাদের সভ্য করার জন্য এমততরো নিংড়ে নিংড়ে ভালো কোরো না।-
আমরা যা আমাদের তাই থাকতে দাও। পিছু ধাওয়া করে ধরে ফে
প্রেম করতে চাই না। অপেক্ষা করবো শান্তিঘট পেতে। পরাণখানি
পাতি চরণ রেখো তাহার 'পরে। ছুটকো প্রেম আর ছুট্ প্রেম দুইয়েতেই ঘেন্না।

মানুষ তো তাই চায়। কিন্তু ও চাওয়া চেয়ে তৃপ্ত হয় না বণিক
—ন্যু-ইয়র্কে যাও নি তুমি পদ্ম-দি। তোমার দিদিকে নিয়ে প্রায়ই আমা
'ওয়াল্-স্ট্রীট' নামক তীর্থ-টি পার হোতে হোতো।—তোমার দিদি একদি
রাগ করে তার ধর্ম-বেটা নারায়ণকে বললেন,—"আর কী তোদের পথ নে
এই লোহা সিমেন্টের জঙ্গলে? কেবল কেবল এখানে আনিস কেন?"
বাপ রে, হাঁফ ধরে। আকাশ যে আকাশ তাকেও গেঁথে ফেলে গলি ক
দিয়েছে। ওয়াল স্ট্রীট না ওয়াল স্ট্রীট! যা দেখো কেবল দ্যাল আর দ্যাল।

আমি তো এই সব সময়ে ওঁকে একটু উসকে না দিয়ে পারি না,

ামি বিলক্ষণ জানো।—আমি চুপিসাড়ে বললুম,—প্রেজুডিশ্-তত্ত্বে তুমি ্যাংলার।

ব্যস্! অমনি নয়ন বাণ! প্রসিদ্ধ পাঁচবাণ ছাড়া সে এক পেল্লায় রামবাণ। াওয়াজ এলো,—'ক্যেনো?'

মিউ মিউ করে আমি ভাষ্য করি,—দেখো আগার ওপর প্রেজুডিস্ তো চামার নানা কারণেই। ও আমি না হয় মালা করে গলায় পরেছি। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি যার কাশীর গলি,—ওয়াল স্ট্রীট দেখে সে তিহাত্তর তলা বক্তৃতা য় ?—তাই বলছি!—

রাখো রাখো তোমার শীতল করার মোন্তোর। কাশীর গলি আর ওয়াল ট্রীট? এটা হোলো লোভ আর দম্ভের বারফট্টাই। শান-ও-শৌকতের খেলা। লে তিহাত্তর তলা আবার তলা? ঝাঁটামারো এমন গুমরে। কাশীর গলি খলেই বোঝা যায় মায়ের কোলে গঙ্গার ধারে ধারে মিলে মিশে জড়াজড়ি রে থাকতে চাইতো লোকে। মায়ের আঁচলের পাশে বাচ্চাদের ভীড়, আর চামাদের ঐ ফাট্কা বাজারের আনাচে কানাচে চিল চিৎকার—এক নাকি? ব তাতে টিটকিরি!!

মানুষ, জানো পদ্ম, চিরদিন ঐ শান্তি, ঐ মনোরম চায়। যারা চায় না রা মানুষ নয়। উপকারের নাম নিয়ে এসে চড়াও হয়ে যারা তোমার ন্তি নষ্ট করতে চায় তাদের আগা পাশতলা UNO, SEATO, UNESCO, LT, WHO! যতই বিচিত্র নামের তক্মা সাঁটা থাকুক না কেন তারা ুষ নয়, মানুষের নয়।

নৈলে বলোতো পদ্মা, এই ব্যাঙ্কক বিমান বন্দরে মড়কের হারে এই হাজার রার বোমারু বিমান কেন? কে ব্যাঙ্ককের দুশমন? আর সে দুশমনী লেও ব্যাঙ্ককের সঙ্গেই আছে; তোর তাতে কী?—তবেই তো কথা স,—দুশমন যে, সে কার দুশমন? তোর যে কলেজা এতো টাটায়, কেন য়? মূল কথা কী জানো পদ্ম? ঐ বাণিজ্য। অমুক দেশের কটরীগুলোকে চলন্ত, অমুক দেশের ব্যাঙ্ককটিকে ভরন্ত রাখার দায় য়াতেই এই সব ঘা-খাওয়া দেশ,—যার ছড়াছড়ি এশিয়ায় আর আফ্রিকায়, থ আমেরিকায় আর ক্যারাবিয়ানে। এশিয়া জাগছে। আরব দেশগুলো াস্ত্র ছেড়ে আক্কেল গুড়ুম করেছে; আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা শাসাচ্ছে া-মালকেই মারণ অস্ত্র করে তোলার কথা। ভারতবর্ষ তার শিক্ষা দীক্ষার দিব্য গতরে আর শানে বাড়ছে; চীনের তো কথাই নেই; জাপান গুরুকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে তুঙ্গী চক্রে মশ্গুল; আর শেষ মেশ—ঐ চম্পার লমেয়েগুলো! চম্পা—বুঝলে না? আজ যার নাম ভিয়েৎনাম।

ভিয়েৎ—স্বাধীন, অন্নম্, (বা আন্নাম্,—ইংজিরী বানানের ফেরে যা-
বলো—অন্নের দেশ, মুক্তির দেশ) এই অন্নাম (অন্নমই) ছিলো চম্পা
রাজধানী ছিলো পাণ্ডুরঙ্গম্। চম্পার পাশে শ্যাম, কাম্বোজ, মলয়, শঙ্খদ্বী
—এ সবই তো একদিন একান্তভাবে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শে অত্যন
শান্তিপ্রিয় অতিথিবৎসল ধর্মভীরু দেশ ছিলো, এবং আজও আছে।
শান্তিতে বাগড়া দিতে এসে সেঁদিয়েছে এই বাণিজ্য করনেওলা শয়তান ধাপ্পাবা
খুনেগুলো। কিন্তু ভিয়েৎনাম ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে যুদ্ধ জয় করা আ
দেশ শাসন করা এক কথা নয়।

* * * *

তাই ব্যাঙ্ককে লড়াকু বিমানের বহর।

লড়াকু বন্দর; লড়াকু বিমানঘাঁটি; লড়াকু ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম্‌স্‌-এ
দরবার। হেলথ্ চেক্ হয়ে গেলো। হলদে বইগুলোয় দেখে নিলে কলের
বসন্ত, পীতজ্বরের ফোঁড়াফুঁড়ি ঠিক আছে কিনা। তার পরেই সার সা
এপার ওপার ঠাসা ডেস্ক ভর্তি উর্দী পরা অফিসার। মিলিটারি বন্দ
নামেই সিভিল। সিভিল সাজে সাজা মিলিটারি বিমান বন্দর। কাজ নে
কর্ম নেই যে-সে এসে প্রশ্ন করছে এটা সেটা ওটা। সাবধানে থাকতে হয়
কুবায় নয়, হেতীতে নয়, স্বয়ং মস্কো বিমানঘাঁটিতেও এমন দন্জালপনা পাইনি
গরমে, হট্টগোলে সে যেন এক হাট। আর যেখানেই দেখো, যাকেই দে
য়ুনীফর্মের ঢালাও বাহার। মিলিটারি শানের ধমক। ওর মধ্যে হারি
গেলো তাজমুল আর কণিকা।

প্রশ্ন এলো আমি থাকছি কোথায়?

হঠাৎ মনে হোলো তাজমুল বলেছিলো ও থাকবে হোটেল ভিক্টরে
কাগজে লিখে দিলুম হোটেল ভিক্টর। ছাড়ান পেয়ে মালপত্রের জ
দাঁড়িয়ে তো দাঁড়িয়েই।—সেখানেই পুনশ্চ দেখা কণিকাদের সঙ্গে।—

তাজমুলের টান ভিক্টর হোটেল। ওর দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদের মা
এসে পড়তেই ও মাল নিয়ে ছুট্, কাস্টম্‌স বাকী। আমার সুটকে
আসেনা। মাল আসা-যাওয়ার সরবরাহের অটোমাটিক কল বিগড়েছে। চল্লি
মিনিটে তাজমুল সাড়ে চল্লিশবার তাগাদা মারছে। আমি লাচার। সুটকে
এলো, কাস্টম্‌স্ পার হলাম,—এখন বসতে হবে মিনিবাসে। ভিক্টরের বা
কিন্তু অগ্রিম টাকা দিয়ে টিকিট কিনলে তবে বসতে দেবে। কিন্তু টাকা ভাঙ্গানো
বিপদ। মিনিবাসে জিনিষ উঠে গেছে। আমার গাড়োয়াল-পনায় ওদের দে
হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং—যাত্রীরা কটোমটো। আমায় উজান বেয়ে যে
হোলো টাকা বদলাতে। যক্ষের মতো বসে আছে টাকাবদলনেউলীরা।

এ যখনকার কথা বলছি,—১৯৭৫-এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর,—তখন তো বিলিতী পাউণ্ড দেয়ালা করছে, কখনও গিলছে, কখনও ওগরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ডলারও নাচছে। ডলারের নাচ তখনও থামেনি। আমাদের দেশের সিংহী মার্কা টাকা তখনও 'ফ্লোট' করছে, অর্থাৎ যখন যে মৌকায় যা দাম, তার হিসেব নেই।—আমি সামান্য কয়েকটা ডলার ভাঙ্গাতে গিয়ে বুঝলাম কোপ মারলো জবর। কিন্তু এ ব্যাঙ্কক্। মার্কিনী আওতায় এরা এক্কেবারে মডার্ন হচ্চে। এখানে গণ্ডারের চামড়া না হলে কুচ্ করে কাটা পড়তে হবে। সাবধান!

ব্যাঙ্ককের চৌক 'দ্য-সার্ক্ল্', ক্লক-টাওয়ার পার করে। আমেরিকা পরিত্যাগ করেছে ব্যাঙ্ককের প্রাচীন শহরকে। ছুট্-মারা সিধে রাস্তা নৈলে আমেরিকান গাড়ি বিক্রীর অসুবিধা। তাই যেখানে যেখানে ওরা গেছে গঁ্যাটের কড়ি খরচ করেও ঐ সব জাঁদরেল পথ আর তার দু-ধারে পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি করে মার্কিনী ঢাউস্-স্থাপত্যকে জগদ্দলের মতো চাপিয়েছে। এখন নতুন ব্যাঙ্কক হয়েছে নদীর এপারে।

সেই পুরাতন ও নতুন ব্যাঙ্ককের সীমায় প্রশস্ত পথের ওপর ক্লক-টাওয়ারের কাছে হোটেল ভিক্টর। গাড়ির দরজা খুলে উর্দী-পরা রামটহল দাঁড়ালো। তাজমুলকে দেখেই রামটহল বললো তাজমুল-সাব! আদাব। আপকো ব্যাঙ্কক সে মুহব্বৎ লগ গয়া।

রামটহলের বাড়ি আরা-জিলায়, বিহারে। সপরিবার রামটহল আছে ভিক্টর হোটেলে সতেরো বছর। ও ছাড়া পর পর কদিনেই বহু বিহারী ভাইদের সংগে দেখা হোলো। ব্যাঙ্ককে ভারতীয়দের সংখ্যা কম নয়। বহু সিন্ধী, গুজরাতী, কচ্ছী এবং আন্ধ্রীদের দোকান আছে। বাঙ্গালীদের দোকান দেখিনি।

রামটহল বললো, হোটেলের নাম ছিলো ভিক্টোরিয়া।—বড়ই ঝামেলা গেছে নাম নিয়ে।—ভিক্টোরিয়া নাম কেটে ভিক্তর নাম। ব্যাঙ্কক হোটেলে হোটেলে ভরতি। হবেই। ব্যাঙ্কক তো পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক নাভিকেন্দ্র। রাজনৈতিক, সামরিক, সওদাগরী মীটিং লেগেই আছে। কাজেই হোটেল। এর মধ্যে এ-রা-ভান্ হোটেলই সুয়োরানী। আরও রানী আছেন—হোটেল অরিএন্টাল হোটেল কসমস্, হোটেল টাওয়ার্, হোটেল আর্কেড্,—তা ছাড়া শেরাটন্, ভিক্টর এরাও কম যায় না।—

ঘর নেবার আগেই কণিকা বললো, আমি দাদার ঘরের পাশের ঘরে থাকতে চাই।

আমি ইচ্ছে করে বললাম,—এক ঘরে সাহস হয় না বুঝি? আমার

বড়ো মেয়ে তোমার চেয়ে বড়ো, আর ছোটো মেয়ে তোমার চেয়ে খুব ছোটো নয়।

তাজমুল ধরে পড়ে। দাদা এই কামটুক্ কইর‍্যা দেন।···মানে, জন্ম জন্ম তাজমুল আমার দাসানুদাস হয়ে থাকতে রাজী যদি ব্যাঙ্ককের একটা রাত আমি ওর ঘাড়ের থেকে কণিকাকে নামিয়ে রাখি।

ব্যাঙ্কক মর্ত্যের হুরী পরীদের সেরা গন্ধর্বলোক। শ্রীমান তাজমুল ইতোমধ্যে বার বার ব্যাঙ্ককিনী বারললনার অঙ্কশায়ী হয়েছে। তাই এ পথে যাতায়াত, এবং ব্যাঙ্কক্ এলেই থামা।

আশ্চর্য মানুষের সততা বোধ। আশ্চর্য তার নৈতিক জানালার হুড়কো-গুলো। ঐ তাজমুল, তরুণ তাজমুল, নারীসঙ্গের মাদক উত্তেজনা খরিদ করে, রাত্রির পাত্র ভরে ভরে পান করে, মাতাল হয়;—অথচ তার কতো সনির্বন্ধ আকুতি তার সঙ্গিনী এই তরুণীটিকে বেড়ার ওধারে রাখে। কেন না, কোন্ গ্রাম সুবাদে, কোন্ চাচা সুবাদে এ মেয়ে তার বোন্। কণিকা নামক জৈব ভোজ্যটি তার দেহকে অতিক্রম করে তার প্রাণের দোরে আত্মীয়া। অনেক সময়ে পদ্ম, এই তত্ত্ব ভেবেছি। তা-বড়ো তা-বড়ো বারোঘর বিলাসী বার-সেবী মানুষকে দেখেছি যে কোনো এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আর যখন যায় তখনই আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসে। সত্যি দেখতে পাই চটক পিষে মেরে ফেলতে চাইলেও,—ঈশ্বর নামক ঘুঘুটি ঠিক বেঁচে থাকবে। পেল্লায় পেল্লায় আয়েসবাজ ব্যক্তিও জিভ কেটে বলবে,—আমি নাগরী ব্যাঙ্ককিনীর অঙ্ক খুঁজিগে যাই। আপনি ছোড়দিকে পাহারা দিন।

আমি যেন সেই পাত্তোর। দিতে গেলাম তোমার কণিকা পাহারা! বয়ে গেছে।—কণিকাকে বললাম কী ভাবছো?

কণিকা মৃদু মৃদু হাসছে। চোখে চমক। বললো, আচ্ছা কী ডানপিটে ছেলে বলুন। হ্যারে, তোর লজ্জা নেই? ঘেন্না নেই? তুই কী?

—আচ্ছা কয়েন। এই সকল পোলাপানগো লইয়া কী করণ যায়। আইছি বাঙ্ককে। আমি তো আর খাশী না; আস্তা ছাগল। এগোর খ্যোত্ ভরতি শাগ,—খায়ুম না? এ পোলাপানে কয় কী?—দেখেন মাষ্টর ছাব, জনাব। আপনে এলেমদার, সমঝদার। মনে মনে গাইল দিয়েন না। এই যে আপনাগোর হিন্দু মত, এই মত দিয়া ঐ বেহেস্ত হয়তো জেতলে জেততে পারেন। কিন্তু এই দুনিয়ার তত্ত্ব আপনারা পাইলেন না, পাইলেন না। প্রাক্টিকল হইতে পারলেন না।—

তা পারি নি। বোনকে অপরিচিতের কাছে গচ্ছিত রেখে নিজে রূপবিলাসিনীর দরবারে যেতে পারি নি। তাজমুল এইবার লজ্জিত হোলো।

কণিকা গেলো তার ঘরে, মানে আমার পাশের ঘরে চতুর্থ তলায়। তাজমুল ও তালাতেই নয়।—এক্কেবারে পঞ্চম তালায়।

কণিকা হাসে আর বলে, চলো হংকং-য়ে। যদি না বিছুটিপেটা করি,—

ছেলেটা একগাল হেসে বলে, ঠিক জানো হংকং-এ বিছুটি পাওয়া যায়?

কণিকাও ছাড়ার পাত্র নয়। বলে,—চীনের পারেই,—হংকং; গা ঘেঁষা; —আর বলছো বিছুটি পাওয়া যায় না! না গেলে চীনে মেয়ের সংগে বেঁধে দেবো। দেখবে সে কেমন বিছুটি।

তাজমুল জোর-সে হেসে ওঠে। কণিকার মুখের দিকে আর চায় না। আমার দিকে চেয়েই বলে,—কী যে কয় বুইনডী আমার। বান্ধন কী আর বাকী রাখছি মাস্টার ছাব। হেঃ হেঃ! মাইয়া মানে মাইয়া। বিছুটী আর কলমীর শাক, ঐ যতক্ষণ মাঠে, বিছানায় সকল মাইয়াই মিউ মিউ বিলাই!

* * *

কী জানি কণিকা কী করছে। আমরা ডাইনিং হলে বসে আছি। তাজমুল খাবারের অর্ডার দিয়েছে। মাস্রুম সুপ; চাউ হারপিন; সুইট-বিটার শ্রিম্পস্, আর—

আরও—? আমি সেই তাগড়া যৌবনকে সীমিত করার চেষ্টায় বলি।

কত্তা ভাত না খাইলে—বোঝেন না। সারা রাত্তির তো!

সারা রাত—মানে?

হায় তওবা। মাস্টর ছাব, ভাবলেন নাকি ঐ রামজাদীগো বাড়িতে থাকুম! ঐ কম্মো নাই।…আপন হল্কায় ভিজা লায়ন্ও তাজা মালুম হয়।

তবে?…সত্যিই এ তত্ত্বে আমি না-লায়েক। যৌবনদীপ্ত তাজমুলের আগাগোড়া সমাজ-ভাঙা দাপুটে চেহারাটার জৌলুষ আমায় চমৎকারে ভরে দিচ্ছিলো। এই তাজমুলের বিয়ে হবে, ছেলে মেয়ে হবে। কিশোরী মেয়েকে আগলে রাখার বেড়া ও নিজের হাতে বাঁধবে, পাঁচ ওয়াক্ত্ নমাজের গুণগান গাইবে। বিদেশিনীর অধরে অধর রাখতে দ্বিধা যে করে নি সে জিজ্ঞাসা করবে 'এ মাংসটা হারাম না হালাল!' তখন ছেলেকে ব্যাঙ্ককে পাঠাবার সময়ে ওর মনে ছিয়াত্তর রকমের কারণ মাথাচাড়া দেবে।…কিন্তু আজ ও চমক্-লাগা মেঘের টুকরো; রেকাবের ঘা খাওয়া আরবী ঘোড়া। —ঋষি মার্কস্ এই বৃত্তিটিকেই বলেছেন 'বোর্জোয়া কন্ট্রাডিক্শন্'—মধ্য-বিত্তদের ওলট পালট আত্মহন্তা নীতিবোধ।

আরে গুরুজী, এ ব্যাঙ্কক! বাজারে যামু। ছো-কেস্ দেইখ্যা দেইখ্যা যে ছো-কেশে ভালো বিবি পাইমু রাইতের মতো দাম দিয়া হোটেলে লইয়া

আসমু। রাইত যাইবো, মাইয়াও যাইবো ; তার আগে ছাড়ে কোন্ হালায় ? কুর্শী সৎরঞ্জী ভাড়ায় আনেনা ? শামিয়ানা ?—এ-ও তাই।

মানে তুমি কী সেই মেয়ে নিয়ে এখানে হোটেলে—?

তাজমুল বললো,—তয় কী-য়ের—লাইগ্যা পঞ্চম তলায় গেলাম ? আর বুইন্ডীরে আপনার ঘাড়ে চাপাইলাম ?

আর আমায় যদি না পেতে ?

ঘাড় কী আরও পাইতাম না ? কিন্তু আউঅল্ বাৎ কী জানেন ? পাইয়া গেলাম জনাবের গর্দান।

* * * *

ইন্দ-চীনের আবহাওয়াই বাংলাদেশের আবহাওয়া। ব্যাঙ্ককে সমুদ্রের বাতাসটা বেশ। শরৎ ঋতুর সেই ধানের শীর্ষে দুধ-ঢালা আমেজ বাতাস বয়ে আকাশ বেয়ে নামছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই বন্ধ ঘরের ঝলমলে আলো, কৃত্রিম গন্ধ, প্লাস্টিকের ফুলে সাজানো ছবি যেন পাখির বুকে সোনার খাঁচার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছিলো। হঠাৎ কণিকার উদয়ে সেই হাঁফটা ছেড়ে গেলো।

ওরা থাইল্যান্ডকে 'টাই' বলে বটে। 'টাই' কথাটা 'ত্রা' অর্থাৎ ত্র ধাতু নিষ্পন্ন কিনা বলতে পারি না। কিন্তু 'টাই'ল্যান্ড মানে—'পরিত্রাতা দেশ', মুক্ত-ভূমি। থাই-ল্যান্ড মানে যে দেব-ভূমি এ কথাও লোকে বলে,—কারণ এ দেশের —অন্ততঃ ব্যাঙ্ককের এক পঞ্চমাংশ জায়গা মন্দিরের সম্পত্তি। এতো মন্দির কোনো দেশে নেই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে চলে যাও,—দেখবে লতায় পাতায় শেকড়ে শাখায় পিষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিরাট বিরাট মন্দির নগরী। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক আঙ্কোর-ওয়াৎ-এর সেই ভীষণে-সুন্দরে, শক্তিতে ভয়েতে মাখানো যক্ষ নগরী বসতিহীন অতিঘন জঙ্গলের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন। তবু সেখানে পেয়েছিলেন কয়েকঘর 'চাম্'-ব্রাহ্মণ পরিবার। তারা সব ফেলে পড়ে আছে বুদ্ধের 'হে-বজ্র' সাধন, শক্তি-সাধন এবং আনুষঙ্গিক শৈব ও বৈষ্ণব তন্দ্র-সাধন নিয়ে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন দ্যু'পো। 'এ কারা গড়লো ?'—'এমনিই গড়ে উঠেছে'। এর বেশী জবাব তিনি পান নি। 'কেন আছো এ জঙ্গলে ? কোন্ আশায় ?' উত্তরে পেয়েছিলেন মৃদু হাস্য। 'থেকে দেখতে হয়। বলা যায় না।' সে হাসির ভাষ্যকে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের র‍্যাশনালিজম্ এর মধ্যে পাই না তো ! কী পায় এরা ? যদি পায় ধ্বংস হতে দিয়েছে কেন ? কেন মেরামৎ করছে না ? জঙ্গলে আকীর্ণ কেন ? এর তত্ত্ব কী ?

এরা মন্দির সংস্কার করতে চায় না। ভেঙ্গে গড়া এদের নিষেধ। এদের ধারণা প্রতিটি ইট, প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি ধুলিকণার অন্তরে আছে মহাপ্রকৃতির

চিদাভাস। সকলেই সেই এক চিন্ময় প্রাণে সঞ্জীবিত। ভাঙ্গন, ধ্বংস, এও-তো সেই ইচ্ছাময়ীরই ইচ্ছা কাজেই তাদের ভাঙ্গাচোরা ওপড়ানো,—তার দায় আছে। শ্মশান যাঁর রঙ্গভূমি, দোলমঞ্চ ভাঙ্গলে তাঁর কী আসে যায়? কখন কোন প্রাণে ব্যথা লাগে। তাই বাপ মায়ের দেহের মতো, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো স্থাপত্যের জরাকেও এরা স্বীকার করে। নতুন স্থাপত্য সৃজন করতে করতে যায়। ফলে যেখানেই যাও দেবভূমি, মন্দির।—

বাইরে আসতেই ট্যাক্সী। বেলা এখনও অনেকটা। আমি ট্যাকিসওলাকে জিজ্ঞাসা করি, বলোতো এ সময়ে কোথায় যাওয়া যায়? একটু ঘুরে আসা যাক।

রামটহল একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছে।—আমি বুঝতে পেরে আবার হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকতেই দেখি কণিকা গাইডেড্ টুরের কাউন্টারে ছাপানো ভ্রমণ-সূচী দেখছে। মন্দ নয় টুর-টা।—নৌকোয় ঘোরাবে, ক্রকোডাইল গার্ডেনে নিয়ে যাবে, রাতের ব্যাঙ্কক দেখাবে, থাই নাচ দেখাবে, এবং আলাদা পয়সা দিলে থাই মুষ্টিযুদ্ধও দেখাবে।—

রামটহলকে বললুম, এটা রাত। গাইডেড্ টুরই ভালো। কিন্তু সকালে বাপু আমি ট্যাক্সিতে যাবো। একটা ভালো বিশ্বাসী ট্যাক্সী জুটিয়ে দাও।

রামটহল বললে—আপনি তো ফুমী থানারাৎ-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। নেশায় নেশায় ও অবশ্য ঝাঁঝরা; কিছু আর নেই ওর। কিন্তু ও বড় ভালো লোক। ওকেই বলে রাখবো।—

কণিকাকে প্রশ্ন করলাম,—এখন নাম থাইল্যান্ড,—নাম ছিলো শ্যাম,—সাইয়াম। এ নামের সংগে পরিচয় ছিলো তোমার?

হ্যাঁ, কেন থাকবে না? সায়ামীজ বেরাল, সায়ামীজ যমজ—আর একটা প্রসিদ্ধ ছবি, শ্যামের এক রাজাকে নিয়ে—

ও, 'কিং এন্ড আই'—ব্রাইনার আর ডেবোরা কার-এর সেই অপেরার ধরণে করা। ভালো লেগেছিলো সেই ছবি তোমার? টাকা পিটেছিলো অনেক। কিন্তু শ্যামদেশে ও ছবি দেখানো নিষিদ্ধ ছিলো। 'নাইন আওয়ারস টু রাম'—একখানা ঐ জাতীয় ছবি; ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং গান্ধী-হত্যা বাবদে ইয়াঙ্কী উদ্গার অথচ ভারতে ও বই দেখানো হয় নি। এ দিককার ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে এশিয়ার শান-ও-শৌকৎকে হাস্যাষ্পদ করায় বেগে কর্তাদের ভারী রুচি। হবে না কেন? অযোধ্যার বেগমদের সালওয়ার কামিজ নীলাম করার মতো রুচি যাদের হয়েছিলো, বন্দী বাহাদুর শার মতো নিরীহের নির্যাতন যারা করেছিলো, যারা শতদ্রুর কিনারে বিনা বিচারে তিনশো পংজাবীকে গুলি করেছিলো, তাদের বর্বরতা আর নতন কী? এই 'কিং

এন্ড আই'এর রাজা কে ছিলো জানো? রাজা মুকুট, থাই ভাষায় বলে মোহ্‌ঙ্‌-কুৎ—। 'চতুর্থ রাম' উপাধিতে তিনি রাজ্য করেন। সেই সেকালে তিনি পশ্চিম দেশ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা এনে শ্যামে শিক্ষা বিস্তার করান। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ইংরেজদের যে চিঠি দেন তার মধ্যে ভাষাগত কিছু ত্রুটি ছিলো। সেই ভাষার ত্রুটি নিয়েই অতো হাসাহাসি 'কিং এন্ড আই' বইতে। শ্যামের ইতিহাসে রাজা মুকুট একটি সম্মানিত শ্রদ্ধেয় নাম। ভারতের ইতিহাসেও প্রায় নিরক্ষর আকবর যেমন।

কী লিখেছিলেন?

> নির্ভরযোগ্য শিক্ষিকার গুণাবলীর ব্যাখ্যা ক'রে রাজা লিখেছিলেন·· ···
>
> She will be a English school mistress here, And it is not pleasant to us if the school mistress much morely endeavour to court the scholars to Christianity than teaching language, literature etc, etc, etc.···

হাসে কণিকা। হ্যাঁ ঐ 'এটে সেটেরা—এটে সেটেরা' নিয়ে 'কিং-এন্ড-আই'তে অনেক হাসাহাসি।

অথচ ওদের দেশের কোনো কেউ,—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, —কেউ এশিয়ার কোনো ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য বই লেখেনি। ওদের ব্যসনই হোলো অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা। অযথা অতিথি বাৎসল্যের সুযোগ নিয়ে, মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে উপকারীর সর্বনাশ যারা করে তাদের বাড়া বর্বর আর কে? আর আমাদের দেশ দেখো। ওদেরই অনুকরণ করে, সাজে, পোষাকে, খানাপিনায়, আদবে, এমন কি গালাগালে, উচ্চারণে ওদের ঢং আয়ত্ত করার জন্য আমরা ল্যা ল্যা করে কুত্তার মতো ল্যাজ নাড়ি। কেন বলোতো?

কেন? ওরা আমাদের শাসন করেছে,—তাই?

গৌণভাবে তাই। মুখ্যভাবে আরও সর্বনাশের কথা। যারা শাসন করেছে ইতিহাসের অমোঘ পদক্ষেপে তাদের শাসনের মঞ্চ একদিন ভেঙ্গে যাবে, যায়, গেছে। কিন্তু আমাদের শান্ত জীবনধারাকে আমরা দরিদ্রের অসঙ্গতি মনে করে, লজ্জিত, বিড়ম্বিত। এটাই আত্মঘাতী সত্য। এটাই সর্বনাশের কথা। ওদের পা ফাঁক করে চলা, পাইপ দাবিয়ে ধোঁয়া ছাড়া, ভাঁওতায় ভরা দম্ভ এবং বারফট্টাই-কে আমরা প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে এক করে দেখি। এবং অন্তরে অন্তরে ঐশ্বর্য ও বড় মানুষীরই পূজা করি। শান শৌকৎ সত্যিই জাহির করতে চাই; ওরা যেমনটা করে। ফলে ধনতন্ত্রের

নির্লজ্জ স্তবই করি আমরা। দেমক্রাসী যদি মানো, এরাই তো তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল! এদের শোধরাবার, দাবাবার যন্ত্রকেই তো আমরা শাসন যন্ত্র বলি। আর শোষককে পরোক্ষ বাহবা দিই। শোষকের রূপ সজ্জা অনুকরণ করে অন্তরের দারিদ্র্য এবং চিন্তার মূর্খতা প্রচার করি। শ্যামের বেরালই ধরো। স্রেফ্ বড়োমানুষীর মেকী বালক, শান দেখাবার ভড়ং। শ্যামবাসীদের জিজ্ঞাসা করো, বলবে, 'শ্যামের বেরাল সব বিলেতে চলে গেছে সাহেবদের ট্রেনিং দিতে, কী করে কুঁড়েমীর রাজা হয়েও মহারাজার চালে থাকা যায়।' আর শ্যামের যমজ! খোঁজ করে দেখগে যাও গায়ে গায়ে জোড় লাগা ঐ সব হতভাগ্য জাতকের সংখ্যা শ্যামের বাইরেই বেশী। চ্যাং এবং ইং নামক সেই যমজ চলে গেলো য়ুনাইটেড স্টেট্স্-এ। ওখানেই তারা রয়েও গেলো।

* * *

ঝলমল করছে আলো। খালের ওপরেই মন্দির। দুটো গেট। গেটের বাইরে নানা রকমের ফেরিওলা। খাবার থেকে খেলনা। তামাশা থেকে বাঁশবাজী, ম্যাজিক, হরবোলা।—বেঁটে বেঁটে নারকোল গাছের তলায় কেউ শুয়ে, কেউ গড়িয়ে, কেউ মাদুর পেতে। কোথাও যুগল বন্দী, কোথাও অনর্গল দল, কোথাও পারিবারিক ছন্দ।

রাজার নাম চুলালোংকরণ। মনে হয় চোল-অলঙ্করণ, চোলদের অলংকার! শ্যাম কেন, চম্পা থেকে মলয় দ্বীপ, যবদ্বীপ, বহ্নিদ্বীপ, সুমাত্রা, শঙ্খদ্বীপ সবই একদা পল্লব, চোল এবং পাণ্ডেয়াদের অখণ্ড প্রতাপে সমৃদ্ধ ছিলো। মহাবলিপুরমের বন্দর, সেই বন্দরে সাত-মহলা মন্দিরের শিখরে প্রদীপ, আলোক-স্তম্ভ, কালিকটের, মাউশলীপট্টমের, ভিজাগাপট্টমের সমৃদ্ধ বন্দরের সারি বঙ্গোপসাগরের গৌরব ছিলো। সিংহলে মার্কোপোলো এতো জাহাজ দেখেছিলো যে তার গুণগান না করে পারে নি। চীন দেশ থেকে আরব দেশ পর্যন্ত এই সব চোল, পল্লব, পাণ্ডেয় জাহাজ যাতায়াত করতো। সে সব জাহাজের প্রতিলিপি মিশরের, মেসোপটেমিয়ার, ইরাণের, কাম্বোজের, যবদ্বীপের সৌধ প্রাচীরে উৎকীর্ণ। এতে ভুল নেই কোনও মহা নিপুণ সংস্কৃতি নৌ-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাগর থেকে সাগরের কিনারে কিনারে উজ্জ্বল প্রাণসম্ভার পরিবেশন করেছিলো। তারা মন্দির রচনা করেছিলো শিবের, বুদ্ধের, বিষ্ণুর। শ্যামের জীবনযাত্রার পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদপটের সীমন্তে সীমন্তে এই মন্দির-প্রকল্প।—এ থেকে শ্যামের জীবন আলাদা করা যায় না।

কুমারী আনা লিয়ঁআওয়েন্স্ ছিলেন রাজা মুকুটের (রাম-পঞ্চম) দ্বারা নিযুক্তা—সেই ফরাসী শিক্ষিকা যিনি রাজা চোলালঙ্করণকে পড়িয়েছিলেন। রাজা হয়ে নাম নিলেন (ষষ্ঠ) রাম। তিনি দেখলেন মন্দির নির্মাণের উপকরণ

কাঠ, চূণ, বালী, মাটির টালি হবার দরুণই মন্দির বেশীদিন বাঁচে না। পুরোনো মন্দিরের সংস্কার অসম্ভব হয়ে পড়ায় নতুন মন্দির গড়তে হয়। ফলে দেশের মাটির বহু অংশই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ অধিকার করে রেখেছে। শিক্ষিকা আনার উপদেশে ষষ্ঠ রাম চোলালঙ্করণ ইতালী থেকে মার্বেল এনে এই মন্দির রচনা করেন। মন্দিরের ছাদে নাগমূর্তি। নাগেরাই নাকি বৃষ্টির দেবতা। বেদে বৃত্র-ইন্দ্রের দ্বন্দ্বে ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে বৃত্র নামক নাগকে সংহার করে ইন্দ্র বৃষ্টি আনলেন। পরে ইন্দ্র হলেন উপেন্দ্র, অর্থাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু-পদের পূজা শ্যামের মন্দিরে হয় বুদ্ধপদের নামে।—বিষ্ণুর বাহন গরুড়, তিনি নাগ সংহারক। নাগে, ইন্দ্রে, বিষ্ণুতে, বৃত্রে, জীনে, বুদ্ধে জড়িয়ে নানা পুরাণ, নানা গাথা। নানা সাহিত্য, নানা নাটক। নাগ ও গরুড়ের আকৃতি ও পোষাকের বৈচিত্র্য থাই নাটকে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য এনেছে। মনোহরনিয়া সেই থাই নাটক, থাই নাচ। পরে এ বিষয়ে বলা যাবে।

একটি কথাই বার বার প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঝলমল্। এই একটি শব্দের মধ্যে সমগ্র থাইল্যাণ্ডের শিল্প-সৌধ-চিত্র-বিচিত্র সমাহিত, সংন্যস্ত। থাইল্যান্ড, শ্যাম,—আলো আর রংয়ের দেশ, রোদ আর জলের দেশ, মেঘ আর নীল আকাশের দেশ, সবুজ আর সোনার দেশ। এ দেশে মেঘে থর, জলে কাঁপন, নারকোল পাতায় ঝিলমিল,—নৌকা, শালতি, ভেলা দুলে দুলে চলেছে; জলে, কুমীরের পিঠে আঁশের কাঁপন; ডাঙ্গায়, ময়ালের পিঠে আঁশের কাঁপন; ময়ূরের পেখমে কাঁপন; লক্ষ লক্ষ মস্কোভী হাঁসের পেখমে কাঁপন; বন-মরালী ফেজান্টের সোনা-গায়ে সোনা কাঁপন, ধানের শীষে গুলমোরের থোকায় কাঁপন। ঝিলমিল। গোধা, গিরগিটী, সবার গায়ে কাঁপন লাগা চিত্র, ক্ষেতের শীষে ঢেউ,—তাই ঢেউয়ের দোলা দিয়ে এদের আলিম্পন, চিত্রণ, মুদ্রণ, পট :—এদের পরণে যে সারং বাঁধা, তাতে ঝিলমিল; এদের চিত্র কাটা কাগজ আর পার্চমেন্টের ওপর নরুণ নক্সী,—তাতে ঝিলমিল। এদের মন্দিরের ছাদে টালির বর্ণ-দোলা,—তাতে ঝিলমিল। এদের প্রতিমার গায়ে এরা সোনার তবক টিপে টিপে লাগিয়ে দিচ্ছে,—তাতে ঝিলমিল। সারি সারি মোমবাতি জেলে দিচ্ছে। শিখা দুলছে,—ঝিলমিল। গাদা গাদা ধূপবাতি গেঁথে দিচ্ছে বড়ো বড়ো পিতলের বাটীতে রাখা বালির বুকে। সেই ধূপের ধোঁয়া এঁকে বেঁকে গম্ভীরার মৌন আকাশে ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে,—সেও এক ধূসর ঝিলমিল। এই ঝিলমিল ছন্দের পরিচয় বিধৃত থাই স্থাপত্যে, থাই চিত্রে, থাই বর্ণে। নাগের অলঙ্করণ, গরুড়ের অলঙ্করণ, মন্দিরগাত্রের রক্ষীদের অলঙ্করণ, সবার মধ্যে এই সরীসৃপ ছন্দ, এই হঠাৎ উড়ে যাবার পাখা সর্বদাই মেলা।—

এরই মধ্যে দ্রিম্ দ্রিম্, টুং টাং বাদ্যযন্ত্রের আমেজ। গম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠ করছে।—বাদ্যযন্ত্রও বাজছে।—বাদ্যযন্ত্র এমন কিছু না। লম্বা কাঠের 'জল তরঙ্গের' মতো। দু টুকরো কাঠের তক্তা এক করে গাঁথা ছোটো ছোটো দুটি তক্তার গায়ে মুখোমুখী, মাঝখানে একটু ফাঁকা। সেই ফাঁকায় গাঁথা কাঠের বা বাঁশের টুকরো। টুকরোগুলো মোটা সুতোয় গাঁথা। কাঠের ফাঁকা হাতুড়ী দু হাতে দুটি নিয়ে পিটলেই সরগম বাজছে। পাশে বৃদ্ধা বসে আছে, সারং আর কামিজের পোষাক। কাঠের খাঁজ কাটা টুলের ওপরে বসানো বড় ঢোলক। খোলের গা যেমন আগাগোড়া চামড়ায় ছাওয়া থাকে তেমনি বেত দিয়ে ছাওয়া। দুধারে চামড়ার অংশ দুটি বেশ বড়ো এবং গোল। গুরুগম্ভীর বাজনা। সঙ্গে করতাল বা ঘণ্টা আছে।—

গাম্ভীর্যই বেশী। মন্দিরের মধ্যে কার্পেট বেছানো। বহু ভক্ত বসে আছে। ধূপ সবাই দিচ্ছে। মোমবাতিও। মালা। মালা গাঁথায় ওদের অভিনিবেশ অপূর্ব। ফুলের পাঁপড়ি ভাঁজ করে করে গাঁথা রংয়ে রং মিলিয়ে; প্রয়োজনমতো পাঁপড়ি রংও করে নেয়। গোড়ে মালার মতো পুষ্ট গোল লম্বা লম্বা মালা। এমনি মন্দির, ফুল, মালা নিয়ে কারিগরি আমাদের দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রচুর। শ্যামেও ফুলের ছড়াছড়ি। তারই মধ্যে পদ্মফুল আর কুমুদই বেশী।—'লোয়-ক্রাৎহোন্' ওদের এক কুসুমোৎসব। মেয়েরা নৌকোয়, ভেলায়, ডিঙ্গিতে খালে নদীতে ভেসে পড়বে নানান্ সজ্জায় সেজে। পদ্মপাতায় নৌকো গড়ে তার ওপর সব পাঁপড়ি খুলে পদ্ম সাজিয়ে ভাসাবে। পদ্মের মধ্যে গেঁথে দেবে ধূপকাঠি, ছোটো ছোটো মোমবাতি। —ক্রাৎহোন্ উৎসবের রংয়ে আলোয় জলের বুক ভরে যায়।—এমনি উৎসব ওদের লেগেই আছে। উৎসব মানেই সাজসজ্জা। নাচ-গান। পথে, নদীতে, খালে, বাজারে শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড। কী যে খুসী ভরা জীবন ওদের। প্রতি মাসে কোনও না কোনও কারণে ওদের একটা না একটা উৎসব লেগেই আছে।—মালয় থেকে নিয়ে চীন উপসাগর পর্যন্ত এই সুবিশাল ভূমিভাগের আনন্দময়তা কারা মুছে দিলো পদ্ম? কী অপরাধে? আমাকে আমার মতো হয়ে থাকতে দিতে তাদের দেমক্রাসীর এতো আপত্তি কেন?

এই উৎসবের ভাগীদার রাজপরিবারও। শুনতে পাওয়া যায় প্রাসাদের মধ্যে রানীমা নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়ান, শেখান, নিয়ে খেলা করেন, গান গান। সব দায় আয়ার ওপরে ছাড়া নেই।

পড়েছো প্রিন্স শিহানুকের লেখা?—কাম্বোজের প্রিন্স শিহানুকের মা রানী শিশোওয়াৎ-এর অনুপস্থিতিতে দালাল লন্-লোনের ভাড়াটিয়া সরকারের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করলেন। নির্যাতন সইলেন,—কেন? প্রজারা তো তাঁকে

চাইতো। বলতে গেলে প্রজাদের মধ্যেই কাটতো তাঁর দিনচর্চা। তাঁর মর্যাদা ছিলো গেরিলাদের হৃদয়ের স্পন্দন। এ দেশে রাজা-প্রজার সম্পর্কটা ঠিক বাকিংহাম-প্যালেসের ধাঁচে তৈরী নয়। স্বাধীন দেমক্রাসীতে যে রেচে নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট খুন হয়, এ সব রাজতন্ত্র সে তুলনায় ঢের পোখ্‌তো। নৈলে রাজা নিয়মিতই বাজার মন্দির করে বেড়াচ্ছেন ?

■ ■ ■

এই যে সব বুদ্ধ মন্দির আজ ব্যাঙ্ককে এবং আশেপাশে আছে এ সব খুব বেশী দিনের পুরোনো নয়। পাথরের বুদ্ধ অনেক পুরোনো। কিন্তু ঢালাই বুদ্ধ একাদশ দশক বা দ্বাদশ শতকের। বুদ্ধের মূর্তি গড়ার নিয়ম আছে। বুদ্ধ দেবতা নন। বুদ্ধ মানুষ। কিন্তু খুব বিরাট মানুষ। মহাযোগী। এবং তাঁর যোগমুদ্রায় বিধৃত রূপটিই বড়ো। সুতরাং মূর্তি বুদ্ধের নয়; যোগের; যোগীর; যোগ আসনের আদর্শ।—এক নম্র বুদ্ধ কোলের ওপর দু হাত রেখে বসে আছেন। যেমন ব্যাঙ্ককের সুবর্ণ-অমিতাভ। আগাগোড়া সোনা। ব্রঞ্জের ওপর সোনা চড়ানো। সোনার ক্ষয় হয়। আবার ভক্তেরা সোনা এনে দেয়।—সুবর্ণ দ্বীপ নাম ছিলো এ দেশের। সেগুন—চন্দন—হাতির দাঁত, কিসের ব্যবহার যে এরা করেনি বুদ্ধকে সাজিয়ে তুলতে। যেদিকে চাও শিল্পসম্ভার। যে ক্লোং-য়ের তীরে (ক্লোং মানে খাল) বুদ্ধ সুবর্ণ অমিতাভের মন্দির, তারই অপর পারে ব্যাঙ্ককের শিল্পীদের আড্ডা। গেলেই পর পর উঠোনে দেখা যায় শিল্পীরা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কাজ করছে।

মার্বল মন্দিরের বুদ্ধ দাঁড়ানো। কষ্টিপাথরের বুদ্ধ। এ ছাড়া ডান হাতের ওপর মাথা রেখে শেষ-শয়ান বুদ্ধ আছেন। ওয়াৎ-পো মন্দিরে। লম্বায় সে মূর্তি একশো ফুটের ওপর। আমরা যখন গেছি তখন বুদ্ধের ওপরে ভারা বাঁধা। সোনা পালটানো হচ্ছে। ভক্তরা সোনার তবক, সোনার পাত, যে যা পারে সাগ্রহে নিবেদন করছে।—এই তিন ধরণের বুদ্ধ মূর্তি ছাড়া চতুর্থ বুদ্ধ মূর্তি আছে এক হাত কোলে, অন্য হাত, ডান হাত জানুর ওপর দিয়ে মাটিতে লটকানো। আঙ্গুল মাটি ছুঁয়ে আছে।

কিন্তু বুদ্ধের চেহারা তো যোগবিধৃত। কেউ তো আর প্রত্যক্ষ বুদ্ধের ছবি বা মূর্তি গড়ে রাখেনি। বুদ্ধ মূর্তিই তো এলো সেই গান্ধার শিল্পের আওতায় পড়ে। খৃষ্ট শতকের সেই সবে আরম্ভ। কনিষ্ক আনলেন গ্রীক ভাস্কর্য এ দেশে। তারপর মথুরা-কনৌজ সংস্কৃতির সময়ে গুপ্ত আমলে হোলো তার ছড়াছড়ি। পাণ্ডেয়া আর চোলেরা নিয়ে এলেন ভারতের বাইরে। রাম বা কৃষ্ণও 'দেবতা' ছিলেন না। ছিলেন মহামানব

ষ্ণুর মন্দির শিবের মন্দির পাওয়া যায়।—কিন্তু রাম বা কৃষ্ণের মন্দির নেই। রামায়ণ গান, রামায়ণ ব্যালে, রামায়ণ নাটক, রামায়ণ শিল্পের জনপ্রিয়তা তো, কৃষ্ণ নিয়ে ততোটা নয়। তবুও তন্ত্র প্রধান এই দেশে মন্দির গড়ে কৃষ্ণ বা রামের পূজা নেই বললেই হয়। বুদ্ধ ধর্মের পূজা করা সত্ত্বেও এরা বুদ্ধকে দেবতা করে নি। আমরা রাম বা কৃষ্ণকে ব্রহ্মের প্রতীক হিসাবে রেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করি। অথচ এদের মন্দিরের গায়ে যে সব মূল্যবান ছবি আঁকা সে সবই রামায়ণের ছবি।

থাই রাজার প্রাসাদ সংলগ্ন যে বিশাল মন্দির আছে, যে মন্দিরে বৈদূর্যের ১০ ইঞ্চি মাপের অতি মূলবান বুদ্ধ মূর্তি আছে। তার অলিন্দের চারধারের দেয়াল ভরে চেয়ে আছে অত্যন্ত মনোরম শিল্পকর্ম। নিখুঁত শিল্পকর্মের নিপুণ উদাহরণ। সেই বিরাট দ্যালে পর পর কেবল রামায়ণের কাহিনী চিত্র! সে চিত্রের বর্ণন, ব্যাপন, মনন, অঙ্কন নবন্যাসে অনন্য।—না দেখলে বোঝানো এই কারণে যাবে না যে রামায়ণ বলতে তার সুর, তার চরিত্র আমাদের মনে এক ধরনে গাঁথা। এ চিত্রে সে সব চরিত্র একেবারে পালটে গিয়ে অন্যরূপ ধারণ করেছে। শিল্পী যেন হিন্দু, মুঘল, পারস্য এবং চীন পদ্ধতির সমন্বয় করেছে। সবচেয়ে অভিনব এ সব ছবির (১) পার্সপেকটিভ ; আর (২) বর্ণ রচনা, বর্ণ নিবেশ বর্ণচয়ন। এ ছাড়া অলঙ্করণের প্রতি এদের নিখুঁত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হুঁশিয়ারী, কারিগরি। মনে রাখতে হবে এগুলো প্রাচীর চিত্র। মানে ভিজে সিমেন্ট বালি চূণের গায়ে রঙ্গীন চূণমাটি বসিয়ে কাজ। এমনি তুলির আঁকা কাজও আছে।—তিনটি রংয়ের প্রয়োগ বড় ভালো লাগে ; একটি সোনা, অন্যটি সাদা রং, আর তৃতীয়টি নীল। আশ্চর্য আশ্চর্য রংয়ের বিন্যাস আছে। তুঁতে, গাঢ় সবুজ আর উজ্জ্বল হলুদ। শাদাকে এমন প্রয়োগ করা পারস্য শিল্পে পেয়েছি।

থাই-চিত্রকলা মানুষের শিল্প ইতিহাসের এক সম্পদ। হবেই,—উত্তরে চীন, পূর্বে ভারত—থাইল্যাণ্ড দুটোকেই ধরে রেখেছে। অর্জুনের সঙ্গে নাগকন্যার বিবাহ হয়েছিলো, সে কন্যার নাম চিত্রাঙ্গদা। তার ছেলের নাম বভ্রুবাহন। ঐ নামগুলোর মধ্যেই শ্যাম কাম্বোজের তিনটি পরিচয় পাই: এক স্ত্রী-প্রধান সংস্কৃতি, মাতৃগোষ্ঠিক সমাজ ; দুই চিত্রে কলায় অনুরাগ এবং তৃতীয় মেঘের বাহনে রাজা হয়ে আসা অশনি, বজ্র, করকা, বিদ্যুতে সজ্জিত দিক্‌হস্তীর নায়ক ইন্দ্র বা বিষ্ণুর সঙ্গে প্রীতি।—নাগেরা জলের তলায় থাকে। নাগেদের বিষচিকিৎসা অভিনব। সমুদ্র পেরিয়ে এই সব ওষধি বিকীর্ণ সংস্কৃতির পরিচয়—গান, নাচে মশগুল স্ত্রী প্রধান সমাজের পরিচয়

রামায়ণে মহাভারতে পাতার পর পাতা ভরিয়ে রেখেছে। অথচ তুমি-আমি কোলকাতায় বা বান্দীকুঈতে বসে বসে ভাবছি 'নাগ' না জানি কেত্তা বড়া সাপরে বাবা! অথচ 'নাগ-পঞ্চমী'-টি যে দারুণ বর্ষায়, শ্রবণাভদ্রায়, মেঘের এবং জলের উৎসব তা ভুলে যাই। 'থাই' দেশের কার্ণিশে ছাদে, অলিন্দে নাগ; জলের দেবতা।

সোনার বুদ্ধের মন্দিরে নাচ হচ্ছিলো সে রাতে।—যাত্রীরা বললো নাচ দেখবো।—বাসওলা নিষেধ করতেই সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলো। সে এক বিচিত্র স্ট্রাইক।—রফা হোলো আমরা ক্রকোডাইল গার্ডেনে যাবো না।—তার বদলি এই নাচ দেখবো।

নাচের আঙ্গিক দাক্ষিণী, দ্রাবিড়ী। কিন্তু মণিপুরের সেই ধীর ছন্দও যেমন, ওড়িষীর পাকের বর্তুল বিন্যাস এবং পদচারণও তেমনি। কথাকলিতে যেমন নাচিয়ের গায়ের চামড়ার ওপরই এঁকে সাজ, সেই রূপটি এরাও আনে মুখোশের ব্যবহার করে। ছোটো-বড়ো নানা মুখোশ নানাভাবে পরলেও ভাবভঙ্গী একেবারে অবলুপ্ত থাকে না।—

কিন্তু সাজে সজ্জায় এরা ভারত নাট্যমের মতোই নিখুঁত পরিকল্পনা করে। এদের সজ্জা, আভূষণ এরা সাজায়,—যেন জহুরী জহরৎ সাজাচ্ছে। মন্দিরগুলোর গায়ে চোখ ধাঁধানো ঝলমল। এরা ভাঙ্গা কাঁচ, ভাঙ্গা চীনামাটির বাসনের টুকরো,—কাঁচা সিমেণ্টের গায়ে রংয়ের ছন্দ রেখে এমন গেঁথে দেয় যে তার 'এফেক্ট্' হয় মণি মাণিক্যের মতো। মন্দিরগুলো থরে থরে ধাপে ধাপে উঠে যায়। ঠিক ওই নিপুণতা নর্তক নর্তকীদের সাজে। মাথার মুকুটে তেমনি ধাপ, তেমনি থর, তেমনি মুক্তায়, পুঁথীতে, ফুকো সোনার দানায়, জরির কাজে, ভেলভেটে, সিল্কে—এক অপরূপ শিল্প রাজ্য। মেয়ে নাচছে মন্দিরের চত্বরে, যেন মন্দিরই নাচছে। ছাদগুলোর খাড়াই, খাড়াইয়ে পরে খাড়াই বর্ষা রোদ থেকে পরিত্রাণ তো দেয়ই, টালির ছাদের ঢল এতো তীব্র যে বৃষ্টির জল দাঁড়াতেই পারে না।

থাই মেয়েদের গায়ের রং শান্ত, দীঘল, মসৃণ। ওদের চোখের চাওয়ায় হরিণের নির্ভরতা, পাখির সতর্কতা, বেরালের গভীরতা। সে চোখের তারা নানা রূপে নানা কথা কয়। নাচিয়ে মেয়েরা ভ্রূ আঁকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে, চোখের কোণে সুর্মা কাজল আঁকে গভীর করে। কিন্তু এমনি স্বাভাবিক ভ্রূই ওদের বাঁকানো এবং গভীর। থাই মেয়েদের সৌন্দর্য ওদের বাদামের মতো সুডোল মুখে। ওদের চিবুকের প্রশংসা ওদের কাব্যে গানে অনেক পাতা জুড়ে আছে। ওদের চামড়ার সোনালী শ্যামলতার চেকনাই —যাক পদ্ম, আর বলবো না। তুমি আবার তোমার দিদিকে বলে দেবে।

আর পদ্মা,—আমি বলবো ওদের একটি বিশেষ দেহ গৌরবের কথা। টি না বললে পাপ হবে। হিংসেয় কালো হোয়োনা। গাল দাও মানিয়ে বো। সেই গৌরব যুগলকে আজ আর ওরা সহজে প্রকাশিত হতে দিতে য় না। ওদের মধ্যে ব্রা পরাটা যেমন অসভ্যতা, শিথিল স্তনের নিন্দাও তো তীব্র। আঁট সাঁট সিল্কের জামা পরবে, সারা হাত ঢাকা থাকবে। রা জানে, ও মানে, এ গৌরবের গরিমা আভাসে; প্রকাশে নয়, নয়। সে কাশ ওদের নিতম্ব ও জঙ্ঘার সুডৌল বিন্যাসে। ঐ অংশটিকে ওরা ওদের বাস্থ্যের ও নির্ভরতার মজবুত পাট্টা হিসেবে গরিমার দরবারে দাখিল করে। কন্তু ওপর দিকটা ওরা জড়িয়ে বাঁধে। জাপানে এ বাঁধন আরও নিবিড়।

আমাদের যাত্রাদলের মতো এদের নাচিয়ে দল আছে। গ্রামে গ্রামান্তরে ত্র তত্র মন্দিরে, হাটে নৌকায়, বিবাহ বাসরে এরা নাচে।

তাই থাই নাচে যৌন খোঁচাখুঁচি, রিরংসার জ্বালা নেই। কেবল ছন্দ মার ছন্দ। কেবল আনন্দ আর আরতি। ঐ যে রাশিয়ান ব্যালে, ফরাসী ্যালে, ইতালীয়ন অপেরা, মরক্কোর কাবারে, মিশর তুরষ্কের নাভি-নৃত্য ও বের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ততার একটা উলঙ্গ প্রখর ছাপ আছে। কিন্তু এ গান যেন নিবেদন।

* * * *

ওখান থেকে সোজা আনলো কোথায় বলোতো? থাই মুষ্টিযুদ্ধ দেখাবার আসরে!

ওরেব্বাস। এমনি ঘরে বন্ধ হয়ে মারপিট দেখা সেই মাঁতিনীকে দেখেছিলাম সাপ-বেজীর লড়াই। তখনও সঙ্গে ছিলো আশ্চর্য এক মেয়ে, মলি লোত্রেক্, —বারবণিতা। আজ সঙ্গে কণিকা।

কণিকা খানিক পরে বললো, এ যেন দেখা যায় না দাদা। মারপিট আর দেখতে পারি না। প্রাণ হু হু করে ওঠে। চলুন বাইরে যাই।

কিন্তু কণিকা, এতো এ যুগের মস্তবড়ো ব্যসন। মূল্যবান ব্যসন। ছবিতে, গানে, উপন্যাসে, কবিতায়, সিনেমায় এই মারামারি ঘুষোঘুষি যে এ যুগের কিশোর তরুণ মনকে জগরঝম্প বানাবার কৌশল। কোটি কোটি টাকার উপার্জন এই নপুংসক আনন্দের হাটে। একে তুমি এড়াবে কী করে!

শ্যামে ওরা বাড়িতে বাড়িতে রঙীন মাছ পোষে। কিন্তু সাপ বেজীর লড়াই না দেখিয়ে ওরা মাছের লড়াই দেখায়।—উঠোনে চৌবাচ্চা। তাতে মাছ ছাড়ে। মাছেদের লড়াই শেখায়। লড়ায়ের সময়ে ওদের মুখ, পাখনা, গা রং তেল দিয়ে এঁকে দেয় যাতে বীভৎসতা প্রখর হয়।—তারপর মৎস্যপুঙ্গব আখড়ায় নেমে খুব কসরৎ দেখায়; পাখ্না ঝাপটায় যাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বী এসে

না তাল ঠোকে! তখন লড়াই ;—মৃত্যু বা পলায়ন ছাড়া নিবৃত্তি নেই। এমনি লড়াই ফড়িং-এর। এমনি লড়াই মানুষের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘুড়ির। ঘুড়ি আবার মেয়ে ঘুড়ি ছেলে ঘুড়ি আছে! ঘুড়ির সুতোর গায়ে অন্য ঘুড়িকে কাটার জন্য নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র আছে। দশরথের অযোধ্যার প্রাচীরে শতঘ্নী ছিলো। থাই ঘুড়ির সুতোয় ততোধিক মারণ সজ্জা।—পুরুষ ঘুড়ি —'চুলা'; মেয়ে ঘুড়ি—'পাক্-পাও'। মেয়েদের অস্ত্র পাকে জড়িয়ে মারা, তাই বোধ হয় মেয়ে ঘুড়ির অস্ত্র লম্বা লেজ। ওই লেজে সুতোয় পাক লাগিয়ে ঘুড়িকে ভূপতিত করা মেয়ে ঘুড়ির কাজ। লড়াই লাগলে জুয়ার বাজী ধরাও আছে।

বোধহয় প্রকৃতিতে ওদের লড়াই নেই তাই এই সব খেলুড়ে লড়াইয়ের আয়োজন করে ওরা তৃপ্ত। আর এই সব জীব, জন্তু, পতঙ্গ, মাছ, পাখি ধরে, পোষ মানিয়ে লড়াই করানোর মধ্যে যে শান্ত, সমাহিত, নীরব ধৈর্যের সাধনা আছে,—ওদের প্রকৃতির মধ্যে সেই সাধনা একটা জেদ এনে দিয়েছে। মাত্র ধৈর্য ধরেই ওরা শত্রু নিপাত করে। এ যে কতোবড়ো সত্য এ কথা তারাই অনুভব করবে যারা জানে পৃথিবীর নৃশংসতম যুদ্ধ সজ্জার বিপক্ষে হিন্দুচীনের কৃষক-মজদুর কীভাবে লড়েছে। বিশ্বাস করবে কী তুমি পদ্ম এই নিতান্ত অ-সম লড়াইয়ে, মনেকরো সেই বাইবেলের ডাভিড্ আর গোলিয়াথের লড়াইয়ে, ভিয়েৎনামের রোগা পটকা ফ্যান-মাছ খেগো মানুষগুলো কেবল ব্যাং, ফড়িং, পিঁপড়ে, সাপ, বিছেরই পল্টন করেছিলো? বিশ্বাস হচ্ছে না! কিন্তু আমি বলছি। বিশ্বাস করো। আমি বাজে কথা দিয়ে তোমায় ভোলাবো না। তা ছাড়া ভিয়েৎনাম আমার কেউ নয়। অন্ততঃ শালীর মতো মজেদার কেউ নয়।

থাইল্যাণ্ডের মুষ্টিযুদ্ধে কোনো দায় দিলাশা নিয়ম কানুন নেই। মুষ্টি মানে হাত, পা, হাঁটু, কনুই,—যা দিয়ে হোক, যেমন করে হোক,—প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলে রাখাই এ যুদ্ধের শেষ কথা। যারা লড়ায়ে নামে তারা শেষ প্রার্থনা করেই নামে। পাছে গোঙানী আর্তনাদ শুনে কোনো দুর্বলচিত্ত জ্ঞান হারায় তাই বাজনা বাজানো হয় যুদ্ধের নিনাদে। —সর্বনাশও আকচারই হয়। এবং এই হওয়াটাই আমোদ। আমেরিকান জি-আই-রা খুব আমোদ পায় ;—প্রায় প্রত্যেকের কোলে, ঘাড়ে, পিঠে থাই বাজারে কেনা ভাড়াটে রমণী ঝুলে আছে। আমেরিকান যৌবনকে সজাগ করে রাখার ব্রতে তাঁরা ব্যস্ত। থাইল্যাণ্ডে ষাঁড়ে ষাঁড়ে যে লড়াই হয় তাতে একটা ষাঁড় ল্যাজে গোবরে হলেই রক্ষে হয় না,—তার মৃত্যুও দেখা চাই।—

বুঝতেই পারছো কর্ণিকার ও সব 'শো' ভালো লাগে নি। আমরা বাস

ছেড়ে দিয়ে ট্যাকসী করে রাতের ব্যাঙ্কক দেখতে লাগলাম। তখন বেশ রাত। আমরাও খুব পরিশ্রান্ত।—কণিকা ঐ বক্‌সিং আর থাই মেয়েদের কাণ্ড দেখার পর থেকেই অন্যমনস্ক।—আমি লক্ষ্য করে হোটেলে ফিরে এলাম। ও সংগে সংগে ওর ঘরে চলে গেলো।

আমি রামটহলের সঙ্গে কথা বলি দুটো একটা। কিছু কিছু খবর পাই। ডিনার হলে ঢুকে কফি আর একটা পুডিং খাচ্ছি। কাঁধের ওপর দিয়ে 'বয়' এসে বল্লে,—আপনি একা। কোনো সঙ্গিনী চাই? হাসলাম। বললাম,—না আমার সঙ্গিনী আছে। আমার মেয়ে। দেখো নি?

ওরা সব দেখে। দেখে দেখে ত্রিনয়ন।—যে কদিন হোটেলে ছিলাম,—ও আমায় প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করেছে, সঙ্গিনী চাই? রামটহল বলেছিলো টিমোর, হংকং, মাকাও—এর এককালে বিশ্বের মেয়েবাজার বলে যে কুখ্যাতি ছিলো সাইগন 'মুক্ত' জগতে যোগ দেবার পর থেকে ব্যাঙ্ককও এখন সেই খ্যাতি অর্জন করেছে। এর পরিচয় পরে পেয়েছিলাম বলবো।

শুভার্থী
জামাইবাবু।

৩

কল্যাণীয়াষু,

ভাই পদ্মদি,—এবারের চিঠিটা তোমার ধৈর্য ধরে পড়তে হবে। ওরা ঘুমুক! এই ফাঁকে তোমাকে একটু ব্যাঙ্ককের কেন, এই থাইল্যান্ডেরই ইতিহাস শুনিয়ে দিই। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে থাইল্যাণ্ডের ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। ডাঃ প্রবোধ বাগচী হিন্দু-চীনের ওপর ছোট্ট একখানা বই লিখেছেন (বিশ্বভারতী গ্রন্থমালা)। পড়ে দেখো। আমার কাছে এখানে বইখানা এখন নেই। দেখবে শ্যামের শেষ রাজা ভারতের কাছে সাহায্য চেয়ে বিফল হয়েছেন। নৌকোয় করে মহাসমুদ্রে সেই যে ভেসে গেলেন, কোথায় গেলেন পাত্তা কেউ রাখে না।

ভারত থেকে পল্লব, পাণ্ড্যা এবং চোলেরা যথারীতি বাণিজ্য প্রকল্পে

ব্রহ্ম, মালায় থেকে যখন আজ-কালকার ভিয়েৎনামে এবং সে কালের শ্যাম দেশে আসে তখন 'কণকচূড় মুকুট' পরে আসে-নি। এসেছিলো বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি, সংস্কৃতির বিস্তৃতির শুভ কামনা নিয়ে। তাদের শুভকামনা, ধর্মবোধ এবং ব্যবস্থা করার কৃতিত্বেই প্রথম শ্যামে সেই শান্ত সভ্যতা এলো যার পরিচয় আজও পাওয়া যায়। একটু আধটু লড়াই ঝগড়া হয়ই। হয়েও ছিলো। গোটা শ্যাম-কাম্বোজ উপদ্বীপে মহা অরাজকতা এবং অভিশাপ ছিলো চীনের নৃশংস অত্যাচার এবং ব্রহ্মের শান, আরাকান এবং কারেনদের লুঠতরাজ হত্যা। গোড়া থেকেই এ দেশ শান্তি-প্রিয়। পল্লব রাজাদের হাতে পড়েই এরা প্রথম খাড়া দাঁড়াতে শিখলো। আকবর ও মুঘলেরা ভারতে এসে যে নীতির প্রবর্তন করে ভারতেরই রাজা হয়ে গিয়েছিলো, পল্লবরাও এ দেশে বিবাহ করে এই দেশকেই স্বদেশ করে নিয়ে-ছিলো। আশে পাশে যতো সব ভূমিপাল সর্দার ছিলো তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে গোটা উপদ্বীপকেই একটি সংস্কৃতির বন্ধনে বেঁধেছিলো। বুদ্ধ হলেন সে সংস্কৃতির মধ্যমণি। শিব ও বিষ্ণু লেই সংস্কৃতিতে পরম দেবতা। শ্যামের দরবারে, শ্যামের ক্যাবিনেটে বরাবর ব্রাহ্মণ সভাসদ্ থাকতেন। আজও শ্যামদেশে ব্রাহ্মণ পরিবার বহু আছে।

ভাষাই দেখোনা। এ ভাষা একটু তলিয়ে দেখলেই সংস্কৃত ধ্বনি পাবে। ধরো দিনের নামগুলো।

ভান-আতিৎ, ভান-চান্, ভান্ ওয়ান-কান্, ভান পুৎ, ভান্ পার্রুৎ, ভান শুক্, ভান্ শা-হু,—রবি থেকে শনি বারের নাম। ভান্ 'ভানু'-দিন,—কোন্ দিন? আতিৎ যে আদিত্য, তার ভান অর্থাৎ দিন; আদিত্যবার, অর্থাৎ রবির দিন বোঝা যায়। ভান্-চান, চাঁদ-বার অর্থাৎ সোমবার, ওয়াঙ্কান্ (মাঙ্কান্) অবশ্যই মঙ্গল; এমনি পুৎ = বুধ, পার্রুৎ = বিষ্যুৎ, বা পুরুৎ অর্থাৎ গুরুবার; শুক্ = শুক্র এবং শাহু = শনি।

দিন-কে যদি ওরা ভ্বান্ বলে তা হলে আমরা অহন্ বা বিহান বুঝে তাকে আপন করে নেবোনা কেন? ভ্বান্-হি, এবং প্রূন্-হি যখন 'গতকল্য' এবং 'আগামী কল্য,' তখন 'হি'কে অহি, অহন্ বলতেই হয়। কুন্ হোলো রাত। কিন্তু 'সপ্-পা-দা' যে সপ্তাহ, হপ্-তা, তা বোঝা যায়। নমস্কার করি, বলি hallo; তবে বলি—থাই ভাষায়,—স্ব-ওয়াদ্-দি; কিন্তু আসলে বলছি স্বস্তি। রাহ-কা-তা-ওরে? মানে কতো রৌপ্য (টাকা) দাম? রাহ্, রৌপ্য, রুপেয়া, অর্থাৎ দাম। বাট্ মানে বাট্টা,—টাকা। 'রাম' তো ওদের খুবই সাধারণ নাম। সুখো-থাই শ্যামের সুখের যুগ। আযোধ্যা ওদের প্রাচীন রাজধানী, এখন বলে আয়ুথিয়া। ১৫৪৮ এ ওদের মহা বীরবিক্রম রাজা ছিলেন, নাম মহা-চক্রতাৎ। আধা-চীন

আধা ব্রাহ্মী সেনাপতি ব্রহ্ম শত্রুপক্ষকে তাড়ালেন—নাম তাঁর তক্ষীন্। এমনি আছে সেনাপতি চক্রী। চক্রী যুগ ওদের ইতিহাসে অমর। ফ্রা-অপ্পই, পরা-অপ্পই, —ওদের দেশের মহাকাব্য। কিন্তু অপ্পয় দীক্ষিত তো দক্ষিণের বিরাট পন্ডিত ছিলেন। এমনি নামের সাদৃশ্য—সেংগ্রাম (সংগ্রাম), প্রীদি প্রাণোমিয়ো (প্রীতি-প্রাণ), সরিৎ থানারাৎ (সরিৎ-স্থান-অরাতি) কিত্তীকাচোরন্—(কীর্তিকাচরণ) শহরের নামের সঙ্গে 'বুরী' লাগা থাকলে 'পুরী' না ভেবে পারিনা। নাখোঙ্গ-পাতোম্ যে নাসিকপট্টনম্ এটা খুব খুঁজে বার করতে হয় না। নদীর নাম প্রিয়া না হয়ে ফ্রাইয়া, ক্রুং-থেপ্ দেব-নারী। ব্যাঙ্কক্ নিজে 'পঙ্কজ' থেকে জাত শব্দ। উদং (উদয়ন); ফান-রাঙ্গ (পান্ডুরঙ্গ), বাতাঙ্গান্ (পতঙ্গ), সুভান্নাপুনী (সুবর্ণপুরী), সোভন্ন (সুবর্ণ) একটি বহু ব্যবহৃত নাম। সে-ক্রুংগ নদী কালিন্দীর কথা মনে করায়। তেমনি রাভন্ রাবণের কথা,—'সিঙ্গোরা' সিংহপুরের কথা, নান্ সাচ্—শচী, নদীর নাম। জানকীশ, পত্তনী, রঙ্গ—এ সব দক্ষিণে মালায়ার শহর। এ ছাড়া অসংখ্য কথায়, চিত্রে, সাইন বোর্ডে, অজস্র সংস্কৃত কথা পেয়েছি। দ্রাবিড় বা তৈলঙ্গী ভাষা জানা থাকলে এ-বিষয়ে আরও অনেক বেশী আবিষ্কার করতে পারতাম মনে হোলো।

যতো দেশ যতো মানুষই দেখিনা কেন কখনও নিজেকে একা, অপরিচিত, নির্বাসিত মনে হয়নি। কোথাও আমি হারিয়ে যাইনি। তার একটিই কারণ পদ্ম দিদি। আমি সংস্কৃতকে ভালোবেসেছি। সেই শিক্ষার ভূরিতৃপ্তিতেই আমি ইংরিজীকেও ভালোবাসতে পেরেছি। ফলে, সমস্ত ধর্মের মূলের ঐক্য, সমস্ত মানুষের বুকের তৃপ্তির সন্ধানও পেয়েছি। বুনো ব্রাজিলিয়ান থেকে চোখা প্যারিসিয়ান অবধি, হুড়ো-ভজা স্পেন থেকে নিয়ে তালাচাবী আঁটা মস্কো অবধি, এ্যলবেলে ভারতবর্ষ থেকে ধাক্কার পর ধাক্কায় নীল হয়ে যাওয়া শ্যাম-ভূমি অবধি, উন্মাদ নিউ ইয়র্ক থেকে শান্ত ক্যারাবিয়ান অবধি কেবল দেখেছি চেয়েছি মানুষ, মানুষ, মানুষ। কতো তার রঙ্গ, কতো তার বয়েৎ, কতো তার রুচি, কতো তার স্বপ্ন, কতো তার ফাঁড়া, কতো তার রোগ,—দেখলাম আর শুনলাম। এবং অকাতরে ভালোবাসলাম সকলকে। মানুষহীন সমাজ দেখি নি; যদিও সমাজহীন মানুষের উৎপাত অনেক বারই দেখেছি। বনে জঙ্গলেও বুকের ডাকে সাড়া দেওয়ায় মনের মানুষ পেয়েছি, দেখেছি, থেকেছি তাদের কাছে।

কী শক্তিতে? কী বিদ্যায়? কী ম্যাজিকে? ঐ একটি মন্ত্রের বোল। ইতিকথা মনকে অতীতে নিয়ে যায় বর্তমানকে আরও বুঝিয়ে দেবার জন্য। ইতিহাস না থাকলে মার্কস্ থাকতেন না। মার্কস্ না থাকলে আজকের মানুষ, সাহিত্য, সংগ্রামের চেহারাই বদলাতো না। মানুষের পরিচয় তার দেশের পরিচয়ে; দেশের পরিচয়ও মাটিরই পরিচয়ে। দেখলাম মাটি যারা

কোপায়, জঙ্গল যারা কাটে, পাহাড় যারা ফাটায়, হাপর যারা টানে, জাহাজে যারা মাল্লা, জলে যারা জেলে,—পৃথিবীর সর্বত্রই তারা এক। যেমন দালাল, সুদখোর, পুরুৎ, বেশ্যা, আর অপরিশ্রমের অপচয়ের ঘাস চেটে যারা ফুটানী করে তাদের ঘেউ ঘেউ-ও সর্বত্র এক।

কাজেই ইতিহাসে আসতে হয়। বিদ্যে জাহিরের কথা নয়। দেশ কেবলই চোখ দিয়ে যারা দেখলো তারা কতটুকু দেখলো? একটা দেশকে জানতে গেলে আমেরিকান টুরিস্ট সাজলেও চলবে না, তীর্থযাত্রী জৈন মাড়োয়াড়ী, ধার্মিক ইহুদী সাজলেও চলবে না। মানুষকে জানতে হবে; ধারাকে জানতে হবে। শ্যাম দেখবো, থাইল্যান্ড দেখবো, বলবো—ওমা, এরাও শিব-বিষ্টুর পুজো করে? এরাও রাসনৃত্য, রামলীলা জানে? এরাও সংস্কৃত বলে?—আর সেই অহংকারে, দেমাকে—আর্যকৃষ্টির নামে জয়ধ্বজা তুলে ধরবো। বগল বাজাবো। ডগোমগো হবো। এমন পাগলামীকার ফাঁকা হাম্বড়াইয়ের গাঁজা মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হবার মতো।

একবার বাসে মধ্য য়োরোপ পার হতে গিয়ে হঠাৎ বাস ফেল করি। যার আশ্রয়ে রইলাম সে জিপ্‌সী। এবং তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যদি খানিকটা ভাব হয়েই থাকে তার কারণ আমার সংস্কৃত জ্ঞান এবং পুজো, পার্বণ, শ্রাদ্ধ, তাবিজ, মাদুলীর জ্ঞান। জ্ঞান একটু থাকলে সেটাও আমেরিকান ডলারের মতোই বিদেশে কাজে দেয়। সর্বত্র পূজ্যতে বিদ্বান্‌, আর ডলার। কাজেই একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো এই বিদ্যা-কে।

ঐ ছাড়পত্র ছিলো বলেই তো এমন অবাধে আর সহজে পরিচয় হয়ে গেলো শ্যাম-কাম্বোজ-চম্পা-মালয় সংস্কৃতির সঙ্গে।—পরে, জাপান পর্যায়ে বলার সুযোগ আসবে;—বলবো যে এই সংস্কৃতিই জাপানের প্রপিতামহী সংস্কৃতি, কোরিয়ার পিতামহী। শভিনিজ্‌ম্‌ বা আত্মতোষণ নয়; ইতিকথা, সত্য।

এদের ভাষার মধ্যেও যেই পেলাম সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়, পালির ছোঁয়া, জাতকের কাহিনী, রামায়ণী ঈডীয়ম্‌,—মনে হোলো, এরা আমাদেরই। হয়তো সংস্কৃত ছাড়াও আজকের দ্রাবিড়, থেলেগু, মালায়ালম্‌ জানা থাকলে আরও কাছাকাছি যেতে পারতাম।—গঙ্গার মূলধারা কেটেই কেউ কোনোদিন রাজমহল থেকে ভাগীরথীকে সুতোনুটীর ধারে এনে ফেলোছিলো সত্য;—হোক সে প্রবাহ বিচিত্র। কিন্তু পুণ্যলোভীমন তাতেই স্নান করে বলে, গঙ্গা, গঙ্গা। শ্যামে-এসেও সেই পল্লবরা গঙ্গা ভোলেন নি। শ্যামের বৃহত্তম নদীর নামই হোলো মা-গঙ্গা, যা থেকে এখন নাম মীকং। সিংহলে বোধিদ্রুমের শাখা নিয়ে গেলেন অশোক-কন্যা সঙ্ঘমিত্রা; কিন্তু বোধগয়ার বোধিদ্রুম তো বারে বারে পুড়িয়ে দেওয়া হোলো; তবু ঐ সিংহলের শাখাকেই পুনশ্চ বোধগয়ায় পল্লবিত

দেখে মনের মধ্যে অমিতাভ সেই বুদ্ধের ঐতিহাসিক যোগসিদ্ধির মহিমা দীপ্ত হয়ে ওঠে।—

এইটাই দেশ দেখার মধ্যে রোমাঞ্চ। অদেখার মধ্যে দেখার অঙ্গীকরণ; 'চরৈ বেতি'র মধ্যে আমার ইতিবৃত্তের অনুচরণ। স্মৃতিকে ফিরে পাওয়া বিস্মৃতির অরণ্যের মধ্য থেকে। যে রসে অধীর হয়ে কবিকে বলতে হয়েছিলো,—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?'

তাই একটু ইতিহাস বলি। বিদ্যে জাহিরের অপরাধ তুমি মাপ করে দিও। চিৎকার করে উঠো না।

* * *

প্রতিমায় একমেটে করা যা, চিত্রাঙ্কনে পটের ওপর শাদা পোঁচে লাগানো যা, কোনো দেশকে দেখে তার গভীরে প্রবেশ করতে গেলে ইতিহাসও সেই ধরণের পটভূমির বিন্যাস সাধনে কাজে দেয়।

চীনা বলে আমরা যাদের 'জানি' বলে জানি, তাদের সম্পর্কে আমরা এক 'ওমনিবাস্' জ্ঞানের ব্রাকেটে ফেলে দিই খ্যাঁদা-নাক, ট্যারা চোখ, অনুস্বারান্ত মনোসিলেবিক হেৎকার, চ এবং ত বর্গের গণ্ডীর মধ্যে শব্দ-সম্ভারের ব্যঞ্জনান্ত-ধ্বনি;—এ ছাড়া জানি ওদের লম্বা টিকী, ছোটো পা, চিবুকে বক্ষে কেশের অভাব, তুলোর বালাপোষী পোষাক, ব্যাঙ্গ-আরশুলোর ভোজন, নৌকোয় বাস, আফিমের ধোঁয়ায় মশ্‌তী, গুলতানী। এ ছাড়া শাদাদের বই, এবং তার অনুবাদের অনুভাষণে জানি কালিম কাহিনী,—চীনেরা বোম্বেটে, নৃশংস, খুনে, নির্মম ইত্যাদি। শাদাদের লেখা সেই সব 'অভ্রান্ত অথরিটীতে' আমরা পাই নিগ্রোগুলো গরিলা ওরাং ওটাং ছাড়া কিছু নয়; আমেরিকার 'আপাচে'রা (রেডইণ্ডিয়ান) একেবারেই কাঁচাখেকো বর্বর; মায়া-আজটেকের-বাসিন্দারা বর্বর, কুঁড়ে, অকৃতজ্ঞ; আরবরা চোর, কামুক, কুঁড়ে, মিথ্যেবাদী;—ভারতীয়েরা··· থাক্, ও কথা বলবো না। মানে শাদারা যেখানে যেখানে গিয়েছে কেবল জ্ঞান, ধর্ম, অন্ন, শিক্ষা বিলিয়েছে দু-হাতে! তারা না হলে,—হায়, হায়, হায়,—এ বিশ্বকে কেই বা তরাতো?

চীন, জাপান গোড়া থেকেই এই ভুঁইফোড় সবজান্তাদের আর তাদের বিশ্ব-ধোলাইকার খৃষ্ট ধর্মকে দূর থেকে সরিয়ে রেখেছিলো।—

একেই বলা হয় প্রজ্ঞাশীল শ্বেত-সাহিত্য! এগুলো পরের কথা, যখন থেকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জন্ম, এবং এখন যার আরও ঢের ভয়াবহ সংস্করণ বণিকসামন্তশাহী, নব-বাণিজ্যতন্ত্র। কিন্তু সে কালে যারা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তাঁদের কড়চার সুর আলাদা। মেগাস্থিনিস, য়ুয়েন চোয়াং, ফা হিয়েন্, ইব্‌নে বাতুতা, অল্ গজালী, অল-বরুনী, বাবুরবাদশা, মার্কোপোলো

—এদের বয়ান সম্পূর্ণ আলাদা।—অতীশ, ধর্মপাল, নাগাজর্ন, কশ্যপ-মাতঙ্গ, কুমারজীব, বোধিধর্ম, জীনগুপ্ত এ'দের কড়চায় ঐ চীন-জাপানের রূপই অন্য আলোয় স্বর্ণপ্রভ।—'গুণী গুণং বেত্তি'; 'মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি, মধু মিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ'। চীনের ভেষজ, চীনের পদার্থ বিজ্ঞান, বিষ বিজ্ঞান, ধাতু বিজ্ঞান ফলিত গণন, শিল্প, রুচি, সাহিত্য, সাধন, বাণিজ্য, শিক্ষা—কোনো কিছুই শ্বেত-কড়চার সাক্ষ্যের নজীর হয়ে দাঁড়ায় না। অথচ খোলো বিদেশী গল্প, বিদেশী খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, নৃশংসতার কাব্য,—দেখবে, চীনারা বোম্বেটে, নৃশংসতার রাজা। অথচ, কৈ, ইতিহাস পড়ে তো বলতে পারি না 'অসভ্য জাপান; অসভ্য চীন!'

অথচ ভরসাও করি না।

কেন?

সেই কথাটাই বলবো। বলবো চীন বলতে একটা চীন নয়।—অনেকগুলো চীন; অনেকগুলো চাঙ্গড়া। কিছুবা উত্তর ভারত এবং গান্ধার কৃষ্টিতে ওতপ্রোত; কিছু বা দক্ষিণ ভারত এবং দ্রাবিড়-পল্লব কৃষ্টির পোষোকে সুসজ্জিত। কিছু বহন করছে জাপান কৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই ভাগগুলো তিব্বত, আকশাই, শ্যাম, কাম্বোজ, মলয় (যেগুলো এক করে বলা হয় হিন্দু-চীন, বা হিন্দু-এশিয়া), ইয়াংসীর দক্ষিণে ক্যাণ্টনীজ চীন, ইয়াং-সীর উত্তরে পিকিনীজ চীন, মঙ্গোল চীন, সিকিয়াং-শান চীন। মোটামুটি এ সব চারভাগে বিভক্ত।—বনেদী চীন ঐ কাণ্টনীজ। ওদের সঙ্গে বহির্জগতের ব্যবহার বেশী।—

তিব্বতে-চীনে সংঘর্ষ আবহমানকালের। চীনই ছিলো তিব্বতের; আর তিব্বত চীনের। এর মধ্যে ঐ সাংঘাই-চীনের সাংঘাতিক মোঙ্গলরাই ইতিহাসের এক সেরা জাত। মোঙ্গোল খানেরা,—কুবলাঈ, (১২০৬) চেঙ্গিস্—(১২১৬-৯৪), দুর্ধর্ষ হালাকু। মিংরা এদের দমন করতে করতে আরও দেড়শো বছর কেটে যায়। এর মধ্যে এরা এশিয়ায় প্রত্যেক সিংহাসনে এদের বংশের সন্তানকে বসিয়েছে। মস্কোর জার বংশ এদেরই বংশ। হাঙ্গারীর মধ্য দিয়ে গিয়ে রোমকে উপড়ে ফেলেছে এরা। 'খাঁ' উপাধিকে গৌরবমণ্ডিত উপাধি করে তুলেছে। সীজার, কাইজার, জার—সবই য়োরোপের টেক্কা পদবী; এশিয়ায় খান্ এমনি টেক্কা।—এরই অপভ্রংশ 'চ্যান্'।

সিকিয়াং, য়ুনান ক্যাণ্টন ইত্যাদি প্রদেশ থেকে মাঝে মাঝে হুড়মুড় কোরে হানাদারেরা সাংকোঈ নদী পার কোরে শ্যামে ঢুকে পড়তো। সে চাপ সইতে না পেরে শ্যামবাসীদের কিছু গেলো আরও দক্ষিণে যবদ্বীপে, বালি—সুমাত্রায়—বহির্দ্বীপে;—কিছু গেলো সোজা উত্তরে জাপানে। চীনের

চাপে দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনস্রোত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এমনটা ছিলো না পূর্বে। ব্রহ্মের চিরকালের লোভ শ্যামের অন্ন, শ্যামের দৌলত,—হাতি, চন্দন, রুবী, পান্না, সিল্ক।—ইতিহাসে শ্যামের শত্রু চীন নয়; ব্রহ্মদেশ। শ্যামের কীর্তিমান সব বিজয়গুলোই ব্রহ্মের বিপক্ষে।

মোটের ওপরে না ছিলো রাজা, রাজত্ব, শৃঙ্খলা, উৎকর্ষ। টাল-মাটাল বাহানা-বিপদ এই সব নিয়েই 'থাই',—শান্তির দেশ এই দেবভূমি ছিলো অতিথিপরায়ণ মুক্তচিত্ত দেশ।—চীনের বাসিন্দারা যখন থৈ-থৈ করে উপচে পড়তো, সবাই আগেভাগে এই শ্যাম দেশেই আসতো।—কেননা, শান্ত দেশ; খাবার ভাবনা নেই। আজও শ্যামে চীনা-বাসিন্দার সংখ্যা প্রবল। সিঙ্গাপুরে, মালায়ায়-ও তাই। শ্যামের পলিটিক্সে আজও চীন ও ব্রাহ্মণ এ দুয়ের কদর উঁচু দরের।

এই অরাজকতার মধ্যেই ছোটো ছোটো ছাতার তলায় ছোটো ছোটো সর্দারদের দল ছিলো।—সারা দেশের একচ্ছত্রতার কথা কেউ ভাবতোই না। ঐ যখন ওড়িষ্যার পল্লবেরা আর দক্ষিণ ভারতের চোলেরা এলো তখনই ঐ একচ্ছত্রতার কথা উঠলো। সময়টা কুবলাইয়ের অন্ততঃ হাজার বছর আগে। হাজার বছর কতোখানি বোঝা শক্ত। ইংরেজ ভারতে যতদিন ছিলো তার পাঁচগুণ সময় হাজার বছর। বুঝে দেখো। মানে কম করেও ৩০-পুরুষের রাজত্ব !!

শান্তির মন্ত্র প্রচার করতে বৌদ্ধ শ্রমণরা তো অশোকের সময় থেকেই আসা সুরু করেন। যাতায়াত ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। খৃষ্টের জন্মের ৪৬৭ বছর আগে থেকেই চীনে ভারতীয় পণ্ডিতদের যাতায়াত সুরু। এই সব মহামান্য পণ্ডিতদের নাম আজও ইতিহাস ধরে রেখেছে; কশ্যপ—মাতঙ্গ, কুমারজীব, জীনগুপ্ত, বোধি-ধর্ম, বীতপাল, অতীশ। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনে ভারতীয় শ্রমণ ছিলো ৩০০০-এর বেশী। ভারতীয় পরিবার ছিলো ১০,০০০-এর বেশী! আজও গ্রেট ব্রিটেনে এর বেশী ভারতীয় হয়তো নেই। তবু দেখো ওদের চাঁই এনক্ পাওয়েলের ক্যা চিৎকার, ব্রিটেন গেলো! হজমশক্তি যার মন্দা, পাতে খাবার দেখলেই তার চোঁয়া ঢেকুর ভাঙে।

সিংহলে যখন চোলদের প্রতাপ তখন সিংহল থেকেও চোলেরা আসতো।—খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে শ্যাম-ভারত সম্পর্ক চলে আসছে অব্যাহত। সুতরাং কুবলাঈ আসতে আসতে ভারত-শ্যাম সম্পর্ক যাকে বলে সাত পাকে বাঁধা। এই সৌখ্যের কাহিনী শ্যাম কাম্বোজের গল্প-কথায়, রূপকথায়, ভারতের পুরাণে লোককথায় সাদরে বিধৃত। শিল্পে, ভাস্কর্যে, লোকসঙ্গীতে এই

শ্যাম-চম্পা বন্ধনের কাহিনী কতো চাঁদসদাগর, উষা অনিরুদ্ধ, শঙ্খদ্বীপ, সুবর্ণ-দ্বীপের ধনপতি, বজ্রসেন শ্রেষ্ঠীর কথা ছড়িয়ে আছে।

শুধু রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা পরের কালের। সে এলো পল্লবদের সময়ে। এরা আয়োজন সহকারে বসতি করতে লেগে গেলো। শৈলেন্দ্র রাজবংশের রবরবা এই সময় থেকে। শৈলেন্দ্র বংশ উড়িষ্যা থেকে এসেছিলো। বৌদ্ধপ্রধান দেশ হলেও শ্যামের সেই রাজবংশটি বর্ণে ছিলো ব্রাহ্মণ। তাই আজও শ্যামের রাজদরবারে বৌদ্ধ শ্রমণাচার্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও বিশেষ মান্য করা হয়।—খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্ট অব্দের পঞ্চদশ শতক,—সময়টি বড়ো কম হোলো না! একদিকে বিশাল মহাচীন, অন্যদিকে সুবিশাল মহা-ভারত : এই দুই যুগন্ধর দিক্‌পাল সংস্কৃতির সঙ্গমস্থান এই পূর্ব-দক্ষিণ ভূখণ্ড—যেখানে ছড়িয়ে আছে শ্যাম-কাম্বোজের গায়ে লেগে সুবর্ণদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, বহির্দ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়—সুমাত্রা। এই ভূখণ্ডের পূর্বে ও উত্তরে চীন প্রাধান্য যেমন স্বাভাবিক, দক্ষিণে পশ্চিমে ভারতীয় প্রাধান্যও স্বাভাবিক কারণেই অটল। এ প্রাধান্যের বিজয় তোরণ 'আঙ্কোর-ওয়াৎ', আংগর-ভাৎ, রাজা বিজয় বর্মণের বিরাট কীর্তি। সে স্বপ্নের রূপকে বাস্তবিক করতে লেগেছে লাগাতার চারটি শতাব্দী! আঙ্কোর এশিয়ার সর্বাশ্চর্য নগরী হবে,—এটা আর আশ্চর্য কী? এই আশ্চর্যের পাশে,—তাজের পাশে ইৎমিৎদৌলার মতো, হালাবিদের পাশে বেলুরের মতো, ইলোরার পাশে অজন্তার মতো, শাহজনাবাদের পাশে নয়াদিল্লীর মতো ছিলো বায়োনের মন্দির। সম্পূর্ণ উদ্ধার এখনও শেষ হয় নি এই 'বায়ুযান' মন্দির সংলগ্ন ভূমিভাগের। মন্দির সংলগ্ন ভূমিকে মেরামত না করে সরে থাকা থাইদের ধর্মবিশ্বাসের গোড়ার কথা। দেব মন্দিরকে বিচলিত করবেনা। কালের গ্রাস থেকে কালের খাদ্যকে কেড়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মহাকালকে ক্ষুধায় হিংস্র করে তুলবে না। নতুন গড়ো।—এ সব মন্দিরের আশ্চর্য ও বিরাট মহিমার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একের পর এক পাশ্চাত্য শিল্পরসিক, প্রত্নপণ্ডিত বলে গেছেন,—ত্রিভুবনে মানুষের এমন কীর্তি নেই। এ মহিমা পিরামিডকেও স্তূপ করে দেয়; আজটেক, ইন্‌কা মন্দিরকে জ্যামিতির পিণ্ড করে দেয়, সিরিয়া—বাবিলনের জিগারেৎগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক প্রচেষ্টায় অবসিত করে দেয়; ভার্সাই, ভাতিকানকে মাত্র ফ্যাসনেব্‌ল করে ছাড়ে, তাজকে করে দেয় সৌখীন লীলাচাপল্যের রঙীন স্বপ্ন। এ কীর্তির তুলনা পাহাড়ে, আকাশে, মেঘের জটায়, তারার মণ্ডলে। এ নৈসর্গিক; দেবকল্প; স্রষ্টার সমগোত্রীর মানবশিল্প।

কিন্তু যে কোনো নগরীর ঐশ্বর্য-খ্যাতি তস্করের লোভকে উত্তেজিত করে। বিদেশী ডাকাত, মিকং-এর বন্যা, চোলেদের আক্রমণ,—একের পর এক এই

বিপদের মুখে শৈলেন্দ্র বংশের আসন টললো। অবক্ষয়ের স্রোতে পড়েও এ বংশ চারশো বছর সংগ্রাম করে যেদিন পাণ্ডুরঙ্গের বন্দর থেকে জাহাজে পাড়ি দিলো অজ্ঞাত সমুদ্রের আশ্রয়ে সেদিন চম্পার সমুদ্রতীরে উঠেছিলো কান্নার রোল। চম্পার মানুষের সেদিন হয়েছিলো প্রিয়জন বিয়োগের বিপুল শোক।—

এই ভাঙ্গন ধরেছিলো ত্রয়োদশ শতকে; এবং পরে কুবলাঈ-খাঁর আক্রমণে শ্যামের হোলো চরম পতন। ইসলাম, আলবুকার্ক, বোম্বেটে, য়োরোপীয় লোভ ঘিরে ধরলো শ্যামকে। চেয়ে চেয়ে অসহায় শ্যাম দেখলো পড়ে যাওয়া হাতিকে যেমন হায়না, শেয়াল, নেকড়েতে ছিঁড়ে খায় তেমনি ছিঁড়ছে শ্যামকে য়োরোপের ডাকাতরা। বৌদ্ধ শিক্ষায় বর্দ্ধিত শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু এই জাতের অস্তিত্বই ওলোন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, স্পানিশরা বিপন্ন করলো। ভাগাভাগি করে নিলো এদের আকাশ, মাটি, নদী, কান্তার। মুখে ভাঁওতা বজায় রাখলো,—জয়তু যীশু!

এই সমূহ বিপদে তবু, মাত্র কূটনীতির বলে, যারা নিজেদের পতাকা ও পদবীর নামমাত্র গরিমা বজায় রাখতে পেরেছিলো শ্যাম, কাম্বোজ এবং লাওস্ তাদের অন্যতম। আজও লাওস্, থাই স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বাধীনতার মুখোশ হয়তো আমেরিকার রং পালিশই বজায় রাখবে। ইয়াঙ্কীবেয়নেটের ঠেক্নোই জীইয়ে রাখবে দেমক্রাসী। তবে "মেড্-ইন-U. S. A." হবে কী হবে না সে জবাব দিয়েছে ভিয়েৎনাম, কাম্বোজ। লাওস্-ও গেলো বোলে। কাম্বোজ, লাওস, থাইল্যাণ্ড প্রথম মহাযুদ্ধে "স্বাধীন" জাত হিসেবেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান সে মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। সেই সুযোগে আমেরিকা চেয়েছিলেন সুমুখে শিখণ্ডী রেখে নতুন উপনিবেশ শিকারে হাত লাগান। তার প্রমাণ থাইল্যাণ্ডের বিমান বন্দরে তিন হাজার বোমারু। ঠেক্নোয় ধরা গৌরব, ধপাস্ হোলো বোলে!

আজ আছে, কাল নেই। কাম্বোজের রাজা, থাইল্যাণ্ডের রাজা, লাওসের রাজা। এর মধ্যে মাত্র একজন আমেরিকাকে প্রতিপক্ষ করেও নিজের তাগদে নিজে দাঁড়িয়ে। শীহানুক! আর দুটো গেলো বোলে! দেমক্রাটিক রিপাব্লিকের হাড়িকাঠে ওদের ব্যা করতে হবেই।—কেন?

ওরা শীহানুক হতে পারলোনা বোলে!

শ্যাম থেকে বালি পর্যন্ত আজও মনুর আইনই বড়ো আইন, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মই বড়ো ধর্ম; হিন্দু শিল্পকৃতী, বাদ্যকৃতী, সঙ্গীতকৃতী এবং নৃত্য-কৃতীই বড়ো কৃতী; এবং ভারতীয় বর্ণমালাই তার বর্ণমালা। আমরা আমাদের দাদা-ফলানো ব্যবহারে এবং রাজনৈতিক মোড়লগিরির ফলে এ সব

দেশে ধীরে ধীরে ভারতীয় বিদ্বেষ চালু করে দিতে অবশ্যই পারি ; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ সব দেশে অমাদের বন্ধুত্ব, সৌখ্য, পারিবারিক সম্পর্ক-ই নানাদিকে নানাভাবে পোখ্‌তো করে গেছেন।

* * *

কিন্তু এমনি ইতিহাস আর বেশী চালানো যাবে না পদ্ম-দি।

সকাল হবে। তখন আবার চোখ মন বর্তমানকে আঁকড়ে ধরবে। এখন দরকার দিনান্তের শান্তির ঘুম। ডাকাতহীন রাতের পূর্ণ বিশ্রাম।

সারাদিনের পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, ঘুমুচ্ছিলুম ঠিকই। কিন্তু ঘুমের আমেজ ভোরবেলাই চট্‌কে গেলো।

তখন আমি তোয়াজ করে বাথ্‌-টাবে বসে শাওয়ার নিচ্ছি।

টেলিফোন।

এই বিদেশে হেন সময়ে কে আমায় টেলিফোন করবে ?

কিন্তু করেছে। বিশ্বাস করো ভারী মিষ্টি গলা। খুব মিষ্টি করে মধু ঢেলে কথা বলছে। তোমাদের মতো ক্যের ক্যেরে নয়,······তখুনি ডাক দিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু জো ছিলো না। আঁতুড় ঘরে সদ্য প্রসূতের পোষাক। হাতে টেলিফোন। বললাম,—হ্যাঁ বুঝলাম তো সব, কিন্তু কোথাও ভুল করেছো ঠাকরুণ। আমি তোমায় সময় দিয়েছিলাম, এ সময়ে ডেকেছিলাম, এ সব যদি সত্য হোতো, আমি বর্তে যেতাম। আমারে পেতো কেডা ? কিন্তু ডাকিনি, চাইনি, চাইবো না। আমার-গাধা-বেকুব মাস্টার নাম অক্ষয় হয়ে রইলো দেবী। অঙ্কে আমার লোভ যথেষ্ট, কিন্তু অঙ্কে আমার ভয়ও ঢের। এখানে বসেও যে নতুত অঙ্কে মন দেবো তা চলবে না ; আমার দিকে ড্যাবড্যাব চোখে চেয়ে থাকবে আমার সেই শুভঙ্করী। ও চোখের পাল্লা ছাড়িলে না ছাড়ে হায়। কিছু হলেই আমার ননদিনী পদ্ম 'বলে দেবে'।

কিন্তু দেবী বললেন, আপনি নেমে আসুন। বোঝাপড়া হবে।

লে হালুয়া !! একটাব জলে বসে, শাওয়ারের তলায়,—আমি ঘামছি।

বিবি সাব !

বোঝাপড়া ভালোই লাগে। বোঝাটা বিদেশে এসে পড়লো এই একটা ফাঁড়া। তা অমন ফাঁড়াকে নাকি বীর পুরুষদের ভাগ্যে প্রায়ই আসতে হয়। আসতে চায়।

আমি পুরুষ হিসেবে যতো বীর, বীর হিসেবে ততো পুরুষ নই !

কাজেই ! পোষাক-আশাক পরে নামার আগে কণিকাকে ফোন করতেই আর এক পাক কেউটে সাপ !

কণিকা কাঁদছে !

ছোবল খাওয়া লখীন্দরের মতো টেলিফোন নামিয়ে রাখার আগে কেবল বলতে পেরেছিলাম,—কণিকা, লাউঞ্জে নামছি। তুমি এসো। কথা হবে। কিন্তু এইসব অবস্থাতেই বোধহয় ধনপতি-সদাগর সত্যনারাণ মেনেছিলো!

কণিকা বললো,—যে কথাই হোক। আমি যাবো না। আমি পরে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। ওই হতভাগাকে আপনাকে নামাতেই হবে।

হতভাগা মানে, (আমি নয় যে কেন জানি না!) ওই তাজমুল।

লগ্নে তো আমার চন্দ্র নয়। তবু যে কেন সকাল বেলায় দুই ধার থেকে দুটি চন্দ্রমুখী দু-ভাবে আক্রমণাত্মক' জড়িয়ে ধরার ফাঁদ পাতলো তা আমি জানি না। নেমেই যাঁকে দেখলাম তাঁকে কখনও দেখি নি। ইংরিজী অতি সামান্যই জানেন। তারই বদৌলত বুঝলাম যে আমি ও'র ট্যাক্‌সি আজ সারাদিনের জন্য ভাড়া করেছি। উনি আমায় ব্যাঙ্কক শহর দেখিয়ে ছাড়বেন। সন্দেহ করি না যে ত্রিভুবন দেখিয়ে দেবারই যোগ্যতা রাখেন। অন্ততঃ সাজ পোষাকের বলয়িত আতিশয্যে সে বিজ্ঞাপিত বিঘোষিত।

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বোঝা গেলো। গতকল্য বিমানঘাঁটিতে সেই হোটেল-ভ্যানে চড়ার সময়ে হাতে কেউ একটা ছাপা কাগজ গছিয়ে দিয়েছিলো। একবার চোখ বোলাতেই মালুম হয়েছিলো দেশ দেখানোর পাণ্ডা, এবং তস্য গাড়ি।······কিন্তু সেই টাকা ভাঙ্গানো ব্যাপারে আমাকে নেমে যেতে হয়েছিলো, এবং দৌড়ে ফিরে বাসের টিকিটের জমা অগ্রিম দিয়ে টিকিট নিয়ে বাসে সীট সংগ্রহ করতে না করতে সেই পাণ্ডা পুনশ্চ কী বললেন। মোদ্দা "অগ্রিম প্রণামী জমা করিয়া সীট সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন।···অন্যত্র ঠগিতে যাইবেন না।" মানে, ওরাই ও কর্মে যথেষ্ট পটু।

অমন অবস্থায় সুবুদ্ধি আমার কখনও হয় না। অগ্রিম প্রণাম আমি শনিকেও দিই না। হোটেলে ঢুকে স্নান আচমন সেরে এক কাপ কালা-কাফি পান করে তবে ও সব ব্যাপারের সাধনা। ঝটিতি কোন্ পথ, কতো দেখানো, কতো মুদ্রা এ সব পরখ না করে এক কোপে কাটা পড়বো, ব্যা-ও করতে পারবো না, এমন বলিতে পাঁঠা হতেও আমি রাজী নই। প্রাতঃকালের এ ভুজবন্ধন এখন আমি এড়াই কী করে? মেয়েটি আবার চলতা-পুর্জা সুন্দরী। নিজেই ট্যাক্‌সী।

কিন্তু আমি না-রাজী তো না-রাজী। তাতে কাজীর কী? কাজী বিচার করে দিয়েছে। সীট আমার। আমি যাত্রী। যেতে আমায় হবে।

মেয়েটি ছিমছাম, আমেরিকান প্যাণ্ট-সুট পরা চুল ছাঁটা পরী। হাসিতে ইত্যাদিতে আমায় তেলাপোকা বানিয়ে ফেলেছিলো আর কী! কিন্তু সবে

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে র' সিল্কের স্যুট হাঁকড়ে আমিও এমন কম কী তখন? তোমরা দেখলেও হেনস্থা করা ছেড়ে দিতে।

বুঝিয়ে বলে দিলাম,—ধনী, দেশে আমায় শালিবাহন হয়ে থাকতে হয়, মুকুলে, পদ্মে, রেণুতে আমার মন-ভ্রমর প্রায়ই পাখা দুমড়ে পড়ে থাকে বটে, কিন্তু মুক্তি শেষ পর্যন্ত পেয়েই যাই। সেটা অবশ্য তাঁদের দাক্ষিণ্যে নয়। নিজেরই কারামাতে। অর্থাৎ, স্বকীয়া লীলায়।—সেই লীলাতেই এ দফাও সারলাম। যখন শ্রীমতী গেলেন তখন শ্যাম ভাষায় যা বলে গেলেন সেগুলো খুব সংস্কৃত সংস্কৃত শোনাচ্ছিলো না।—ও সব বালা-ভাষিতং চেপে যাওয়াই ভালো। আমার মিষ্টি লাগলেও তোমাদের লাগবে না। বলবে 'মুখপুড়ী'। কিন্তু সত্যি বলছি পদ্ম মেয়েটি মুখপুড়ী নয়, এবং······আচ্ছা যাক্। তুমি বলবে, জামাইবাবু এই নিয়ে কিন্তু তিন বার হয়ে যাবে।

এর একটু পরেই খুট্ খুট্ করে নেমে গেলেন একটি চকিত প্রেক্ষণা, ত্বরিত চরণা। বেশ ফিটফাট পোষাক। বুকে চাপা একটি মানানসই 'ফুটানী কী ডিব্বা'। কে এ অভাগিনী বরাকী জানতেই পারো যেতো না যদি সে তাজমুলের ঘরের নম্বর দিয়ে কাউন্টারে কফির কথা না বলে যেতো। তা ছাড়াও কী একটা ফিস্ ফিসিয়ে হোলো। 'ফুটানী-ডিব্বা' খুললো, বন্ধ হোলো। ও দিকেও বিনা রসিদে কী দেয়া-নেয়া হোলো। বুঝলাম হোটেলে রাতের অতিথিরা অঙ্কে শুতে আসেন বটে; কিন্তু অঙ্ক কষে কিছু-দালালীও দিয়ে যান্।

হবেনা কেন? শকুন মরলে তার মাংস কী হয়? সে মাংস খাবার জীবও আছে। জীবনলীলার এটাই মজা। বেশ্যারও পুরুৎ আছে; দালালেরও ভাগীদার আছে; শ্মশানেরও নীলাম ডাক হয়।

বুঝলাম তাজমুলের স্নান সেরে ফিট হয়ে আসার—দেরী আছে। কিন্তু কণিকা ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে নিয়ে লাউঞ্জের রেস্তরাঁয় বসে প্রাতরাশের অর্ডার দিলাম। জানি জিজ্ঞাসা করতে হবে না। এমনিই বলবে। বলার জন্য চোখ কান নাক ফেটে পড়ার জো।

মানে ও এখনই হংকং যেতে চায় না। যেতে চায় ব্যাঙ্কক দেখে কদিন পরে। অথচ তাজমুলের পক্ষে একদিনও বেশী থাকা অসম্ভব।—এবং তাজমুল ওকে ছেড়ে যাবে কেন? কিন্তু আমি যখন হংকং যাচ্ছি তখন উপায় কী আর হতে পারে না? তা সত্য। আমি এখন ব্যাঙ্ককে থাকছি। কিন্তু শুধু তো ব্যাঙ্কক নয়। এই ব্যাঙ্কক আশ্রয় করে আমি শ্যাম, কাম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর ঘুরবো। সে যে নেহাৎ-ই ঝামেলা। সঙ্গে কণিকা বেধে থাকবে। অস্বস্তি।—

বুঝে কণিকা বলে, আমি আমার ভার নিতে পারি। টাকাও আছে। শুধু আপনার হ্যাঁ বলায় তাজমুলকে মানিয়ে নিতে পারবো।—নৈলে ভোর থেকে আমায় যা ঝাড়ান দিচ্ছে না, কী বলবো। হতচ্ছাড়া ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙ্গাতে হয়।

তাজমুল এসেই ওর টেবিলে কতকগুলো খাম আর একটা ছোটো ব্যাগ পট্‌কে দিয়ে বললো, চাচারে কেব্‌ল্‌ কইয়্যা দিবা। আমারে না দুষেন তিনি। তোমার কথা তুমিই বুঝবা ভালো। তোমার দাদারে যা কওনের কবো।······আর আপনারেও কই ম্যাস্টর ছাব। জাইতে ম্যাস্টর, মানি; কিন্তু ম্যাস্টর হইলেই কী··· ···যাউক কইয়া কাম নাই। গরুরে দুধে ডুবাইলেই কী পিঠা হয়?

না—না বলো তাজমুল বলো। আমি এখন বিলকুল বোঝার চেষ্টাই করছি না। আমি বিহ্বল, বিদিশা।—পিঠাকে দুধে ঢেলে গরুকে খাইয়ে দাও। যা খুশী করো। কেবল শুনবো আর শুনবো। বোঝা আমার রলো। পরে দেখা যাবে।

—আচ্ছা ব্যাঙ্ককে আইলেন। এ দ্যেশের খপ্‌ছুরতীই ভোগ করলেন না। না করলেন। দাদুর বয়স। বিষ দাত ভাঙ্গছে। বুঝি। তাই কি ফণাও তোলবেন না। ছুবলও ডাসবেন না? না ডাসেন না-ই; আমার হালার কী!···কিন্তু এই পোলাপান বগলে দাবাইয়া আপনে দেখবেনই বা কী আর ইয়ারা যারা এই দ্যেশের, তারা দেখাইবোই বা কী!

—কিন্তু তাজমুল পৃথিবী ঘুরলাম তো সঙ্গে সহচরী নিয়েই। আনন্দ তাতে তো কিছু কম হয়নি।

—ঐ যে। আগেই কইয়া থুইছি। আপনারা হিন্দু, ঠিকই। কিন্তু প্র্যাক্‌টিকাল না। আমাগো নবীর মজহব এক্‌কারে টাইট্‌ প্র্যাক্‌টিকল। ঘুরেন ওই মাইয়া লইয়া। কিন্তু কী যে হারাইলেন জানলেন না। দ্যেখেন ব্যবসা কইরা খাই। মগজের ঘেলু ত্যেল হওনের আগে কইয়া দি। বিদেশে যদি ঘুরি-ফিরি-র খ্যেল খ্যেলতেই চায়েন তো গুপ্তি পকেটে এউককা দেশী জেনানা নিয়া চলবেন না। জেনানা সর্বত্রই এক। কেবল বাড়ির জেনানাটি ছাড়া। সব জেনানাই জোউক। কিন্তু টাকার লবণে ছাড়ান দেয়। বাড়ির জেনানা আজব জউক রে দাদা। যেত্তা টাকা তেত্তা জোর কামড়। চোষবেই চোষবেই।—যাবৎ লোহু আছে।

—আমাদের ঋষিরাও বলে গেছেন, পথি নারী বিবর্জিতা। কিন্তু বিয়ে না কোরেই জেনানা-তন্ত্রে তুমি আগমবাগীশ। ঋষি বাক্যই ফুটছে মুখে, যেন খৈ।

—আরে তেনারা কী ছিলেন বলদ? তেনারা ছিলেন ষাড়। শিবেরে
পিঠে চড়াইতেন, আবার গোঠে গোঠে যা করার তাও করতেন। সংগে গা
লইয়া এক-গোয়ালেই পৈরা থাকে বলদে, বলদে।

একটি কথা জিজ্ঞাসার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। "ওই মেয়েটির ভা
তুমি বলতে পারো কি?" তাজমুল অবাক চেয়ে বলে, "জাইতে আমি মাষ্টা
না ছাব যে ঘাড় ঘাড় দ্যেশ বিদেশে ভাষার বর্ণ পরিচয় করমু।…মাই
মাইয়া; রস রস; তাই আবার ভাষা কী দাদা?"

"কিন্তু ভাষা বোঝোনা, রাত কাটালে। কী রস? অবাক!"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে তাজমুল বলে, "রসগোল্লা খায়েন যে, ত
লগে কোন ভাষায় কথা বলেন?"

নিজের সুটকেশটি নিয়ে কাউণ্টারে নাম চেক্ করিয়ে তাজমুল হুসে
সোজা ট্যাক্সী চেপে চলে গেলেন নটায় প্লেন ধরতে।…আমার ঘাড়ে চে
বসলো কণিকা।

আমি যে এতক্ষণ কিছু বলিনি কণিকা তা লক্ষ্য করেছে। বললে
থেকে গেলাম ঠিকই; কিন্তু আপনার বোঝা হবো না। আমার খরচ ছাড়া
আমার আছে। মুখ গোমরা করলে আপনাকে বিচ্ছিরি দেখায়।

ভালোই হোলো। থাইল্যান্ডটা চষে দেখা যাবে। কারণ আমার কা
অনেক টাকা নেই। দুটো 'আছে'-তে মিল হয় না; দুটো ছেড়ে দশটা 'নে
তেও যোগফল 'নেই' হতেই হবে। এ 'আছে' আর 'নেই'য়ের মেল। জম
ভালো। চলো কণিকা দিদি, চলো।

* * *

এমনিই হয়। পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি……তাই অকার
গান গাই। মনে কারুর থাকুক না থাকুক এই যে হঠাৎ ঝরে পড়া ফু
গন্ধ, এর মদিরাই কি কম?

রামটহল বলেছিলো ফুমী থানারাৎ ভালো লোক। সেই আমার ট্যাক
বাহক। তার সঙ্গে খুব মিষ্টি লাজুক লাজুক একটি শ্যাম তরুণ। এ
বর্ণকেই বোধ হয় শ্যামবর্ণ বলেছে ভক্তি-সাহিত্যে।

[এই যে শ্যাম নাম ও শ্যাম বর্ণের খ্যাতি এটা কোন যুগ থেকে আরম্ভ
আমাদের সঙ্গে শ্যাম দেশের পরিচয়ের পর থেকে যদি হয়, তা হলে শ
বর্ণের আসল মানে দাঁড়ায়,—এই জলপাই রংয়ের সজল চেহারা। শ্যা
পুজো তো নিশ্চয় আসাম-তিব্বত প্রান্তের ব্যাপার, যেখানে শাদা সরস্বত
নীল।]

ছেলেটি কলেজের ছাত্র। মাঝে মাঝে বাপকে সাহায্য করে। তা ছা

ামরা দূর পাল্লার সওয়ারী। ও বাপকে বলেছে এ সংগ ও ছাড়বেনা। াজনৈতিক কারণে বহু বিপর্যয়ের সংগে সংঘাতে ফুমী থানারাতের স্বাস্থ্য ভংগে পড়েছে। তার হাঁপানী। তাই ছেলেকে সংগে এনেছে! ছেলের াম সুবুবা বেহেন্নো থানারাৎ। বুঝিয়ে বলাতে বুঝলাম সর্বভুক বহ্নির াদর্শে ছেলের নাম যে রেখেছে সে আসল 'থাই' নয়; নকল থাই। নামও কল। এমনি নকল নামের অজস্র লোক থাইল্যান্ডে আজ থই থই করছে।

করবে না কেন? আন্দামন সাগর থেকে শ্যাম উপসাগর, সেই ূর্বের চীন সাগর পর্যন্ত বনরাজিনীলা ধনধান্যে পুষ্পেভরা এই সুবর্ণদ্বীপের ধিবাসীদের পোষাকে, ধর্মে, ভোজনে ভাষায় ততোটা অমিল নেই যতোটা ংজাবী এবং ওড়িয়ায়, তামিল, কাশ্মীরী, এবং রাজস্থানীতে। তবু তো ারত ভারত। তেমনি ছিলো এই ভূখন্ড। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আরবীরা মিলে একটা সার্বভৌম সমাজকে কেটে কুটিয়ে তছনছ করেছে। তবু, ইতিহাস ও রাজনীতি যা বলুক, যা করুক,—আসলে এরা এক। কোনো রাজনৈতিক বলেছেন হিন্দু আর মুসলমান দুই জাতি। ব্যস্,— াই হয়ে গেলো! কিন্তু ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় চাষী, মজদুর তো আলাদা নয়, হোলোনা। এ-ও তাই। কাজেই চম্পায় (ভিয়েৎনাম) যা লছে সেই দিয়েং-বিয়েং-ফু থেকে অদ্যাবধি, তার ফলে বহু পরিবার তছনছ। ফুমীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে দক্ষিণ চম্পার লড়াকু বিদেশীরা। 'মুক্ত-পৃথিবী''র এক নিগ্রো ধনুর্ধর ওর পেছনে একটা চোঙ্গ গুজে দিয়ে ানা রকমের অত্যাচার করেছে। ওকে একটা ঘরে বন্ধ করে (অনেকের সঙ্গে) সেই ঘরে জোর পাখা চালিয়ে ধুলোয় আবর্জনায় ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে। সে আবর্জনার মধ্যে সোডা, মরিচ ছিলো। অত্যাচারের লিষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। ফলে ও গোটা দুই খুন করে পালায়। নাম ভাঁড়িয়ে থাই মেয়ের স্বামী সেজে এদিকে এসে সে মেয়ে ছেড়ে দিয়ে অন্য বিয়ে করে। যাকে বিয়ে করে সেও তো জমির তলার পাতাল—বাসিনী। জঙ্গলে গেরিলাদের সঙ্গে চলে যায়। ওর হাঁফানীর জন্য ওকে ফেলে যায়। এক বুড়ী ওকে আশ্রয় দেয়। বুড়ী বলছি এই কারণে যে আফিমের নেশায় তার আর কিছু ছিলোনা। যা ছিলো তার ফলে ঐ জরোজরো হাড়েও এই ছেলে। বাপে ছেলেতে বয়সের খুব তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। ছেলেটা এ যুগের! বাপের রক্তের আগুনে ওর রক্ত লাল। আমি বাঙ্গালী শুনেই ও কলেজ কামাই করেও এসেছে! বুড়ীর পেটে ফুমীর পর পর তিন বাচ্চা। তার মধ্যে সর্বহি-রই (সুব্বা-বেন্নো) দায়িত্বজ্ঞান বেশী। সে প্রথম ছেলে।

তুমি বড়ো হয়ে কী হবে? প্রশ্ন করেছিলাম মাষ্টারী গলায় মাষ্টারী

মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেয়েছিলাম—কিছুই করবো না কেবল দেখে নেবো।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কী দেখে দেবে ?

আমার দিকে এবার একটু তাকালো। সকালের অফিসের ভীড়। বড়ে ইয়াঙ্কী-রাস্তা ছেড়ে পুরোনো ব্যাঙ্ককের পথে গাড়ি চলছিলো। একটা বাজা আসছে সামনে। ব্যাঙ্ককে থাকে প্রায় বিশ লক্ষ লোক। (সমগ্র ত্রিনিদা দ্বীপে—ত্রিনিদাদ একটি স্বাধীন দেশ—বারো থেকে চোদ্দ লক্ষ লোকের বাস কাজেই ভীড় যেন জগু বাজারের গায়ে গা দিয়ে বড়োবাজার। ওর চো পথে; হাত স্টিয়ারিং-এ। তবু চাইলো, বললো, তবে নাকি আপনি বাঙ্গালী ?—হতে চাই প্রেসিডেন্ট। শীহানুক্, হোশীমীন্। হতে চা —এই বাজারের এদের চোখের তারা।

একটু খ্যাপাবার জন্য বললাম,—তবে তোমাদের দেশে এতো ধুম-ধাড়াক্কা রাজা কেন ?

জবাব দিলোনা। বললো বাজারে নামবেন বলছিলেন।

আমি নামলাম না। তবু ও গাড়ি থামালো। তাই এ জনসমাজ গাি থেকেই দেখতে লাগলাম। এক ভারতবর্ষেই দেখেছি পুরুষরা বাজার করে বেচে কিন্তু মেয়েরা। কাশীতে বড় বড় বাজারে ঝুড়ি বয় তারাও মেয়ে খটকীন্। তার কারণ চাষও তো প্রসব। প্রসবের ঝামেলা প্রসূতি বোঝে কিন্তু সুদ গুণছে বানিয়া,—তারা পুরুষ। আমি গুজ্রাত, সিন্ধ, মাড়ওয়ার সমস্ত রাজস্থানে দেখেছি,—বেনে, ব্যাঙ্ক, সুদ, মিল—এ সব পুংলিঙ্গ কিন্তু বাজার, যেখানে সব্জী, আনাজ, মানে পয়দা-র—ফল বিক্রী,—সেখানে সব মেয়ে। কিনছেন কিন্তু ঝোলা হাতে বাবু। মেয়ে ঝোলা হাতে বাজারে যাবে,—অপমান; অথচ ফুটানী-ঝোলা ঝুলিয়ে কলেজ স্ট্রীট, বেঙ্গল স্টোসে ফুটানী-শঙ্করী মাল কিনবে,—সেটা শান।

এ দিকটায় মেয়েদের রাজত্ব। মেয়েদের পোয়াবারো। সেই দক্ষি আমেরিকার সুরিনামে যারা ভারতীয় বাসিন্দা তারা চীনাদের দেখে, ইন্দোনেশিয়া বাসিন্দাদের দেখে এই তত্ত্ব আয়ত্ত করেছে। চাষের মাঠে আখের শ্রমিক,— তার নেই জাত, নেই পতাকা, নেই লিঙ্গ,—এক পরিচয়। শ্রমিক; খেটে খায়। যারাই খেটে খাবেনা তারাই কাজের মধ্যে মেয়েদের কাজ, পুরুষে কাজ ভাগ করবে। মেয়েদের পক্ষে বাজার বয়ে আনা মাছের দর করে মা কাটানো, কসাইয়ের দোকানে মাংস বেছে কাটিয়ে আনা,—এগুলো যে মধ্যবিত্ত ঠাটের মাথায় হাতুড়ী মারে। উঁচুবিত্ত আর নেইবিত্ত-দের মধ্যে মেয়ে স্বাধীনতা বেশী। নেইবিত্তদের মধ্যে মেয়েরা চলে পুরুষদের সুখ সুবিধ

ভবে ; উচুবিত্তদের ঘরে পুরুষেরা চলে মেয়েদের সুখ সুবিধার ভাবনায় শুটকী
ছ হয়ে।—

এটাই ভালো লাগে। মেয়েরা পুরোদমে খাটছে। বেছে বেছে কী
ন্না করবে ভেবে বাজার করছে। মাঝে মাঝে অন্য মেয়েদের সঙ্গে একটু
থাবার্তাও সেরে নিচ্ছে।—কিন্তু আমাদের তো অপেক্ষা করার সময় নেই
য় বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার ছলে কিছু কথাবার্তা বলবো। যাচ্ছি
্যাঙ্কক থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে। প্রথম দিকে পুরোনো ব্যাঙ্ককের
ীড় পার হতে হয় ; তার পরেই ছুট রাস্তা।

প্রথমেই চোখে পড়ে পথের ধারে ধারে খাল। খালে পদ্ম। (ফুলের
মে যে এতো বিরহ তা এক তুমিই বুঝবে!) কণিকার কিন্তু সবই ভালো
াগছিলো। ওতো আর জানেনা পদ্ম নামে আমি কী দেখি! এদিকে ওতে
ার সর্বহিতে ভাবটা বেশ জমেছে। কিন্তু আমার হয়েছে এক ঘোর
সুবিধা।

বাসে, ট্যাক্সিতে, মোটরে আমার বাঁধা সীট ড্রাইভারের পাশে। পিছনে
সলে সহযাত্রীর সঙ্গে বেশী আলাপচারী করতে হয়। দেখা হয় না আকাশ
রা। আর সবই যেন ঝটিতি শেষ হ'য়ে যায়। দূর পাল্লার যাত্রায় মাথা
রে ; উচ্চৈশ্রবার জামাই যদি চালাক হয় তখন দৌড়ের মাথায় মোড় নিলেই
-ওর ঘাড়ে পড়া অনিবার্য। অনেক সময়ে পড়ে গিয়ে দেখেছি দিব্যাঙ্গনাদের
ীরের যে সকল চৌহদ্দী 'প্রবেশ-নিষেধ' বলে বিজ্ঞাপিত সেই সকল
ৌহদ্দীরই ইতস্ততঃ হুমড়ী খেতে হয়। আদর করে পাতে দিলে যে
াগ্য মধুর ঠেকে হেলাফেলায় বরাতের বদৌলত সেই দ্রব্যই যেন গলাধঃকরণ
রতেও মাথা কাটা যায়।

কিন্তু এ যাত্রায় আমি ড্রাইভারের পাশে বসলে কণিকাকে এক নয় পিছনে
কা বসতে হয়, নৈলে বুড়ো থোমের পাশে বসতে হয়।

কোনোটাই কণিকার রুচিপ্রদ হবে না বুঝে আমি পিছনের সীটে
ণিকার পাশেই বসেছি। সর্বহির সঙ্গে কথা বলতে ঝুঁকে পড়ে বলতে হচ্ছে।
ণিকা বলছে চেঁচিয়ে।

কিন্তু শহর পার হতেই ফাঁকা পথ। আমি বার বার খালের বাহার
খে প্রশংসা করি। বহ্নি একবার বললো দেশের প্রশংসা করছেন, ভালো
াগছে। বেশী প্রশংসা করলে বেশী ভালো লাগবেনা।

কোথায় কে ভগবান আছেন জানি না। কিন্তু আমার তীর্থ যাত্রার
থে পথে তিনি সাবাস্-পান্ডা জুটিয়ে দেন। এ আমি বার বার দেখেছি।
হ্নি আমার মাখন-ভায়ার মতো কমুনিষ্ট। একটুও ভন্ডামী সহ্য করে না।

এই পথ যে ইয়াঙ্কীর, বুঝতেই পারছেন। এখান থেকে লাওস্, কাম্বোডিয়া, সাইগন যে কোনো সাঁজোয়া গাড়ির দল ঝমঝম করে যাবে। এ দেশ তো দেখছেন পোড়া কপালের মতো একেবারে সমতল। এক পশলা বৃষ্টি হতে না হতে জলে 'জলম্ময়'। তাতে তো গরু ভেড়ার বেশী কিছু চলবেনা। কাজেই এক পাশে মাটি খুঁড়ে সেই মাটির বাঁধ; তার ওপরে পথ। আমেরিকানরা এলো-পাতাড়ি করছিলো যা-তা। থাই সরকার ধমকে দেয়। সে সব দিনে ধমকানো ওরা শুনতো। থাই সরকারই বুঝিয়ে দেয় যে সড়ক হলে পরে পাশের খালি জায়গা যাতে নালা-খাল হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা হোক। খালের ধারে ধারে কৃষক পরিবারেরা চালাঘরে আছে। চালাঘর জলের ওপরে পোঁতা খোঁটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। অনেকের আবার নৌকোতেই বাস। নৌকো আছে সবার বাড়ি। সবাই চালায়। ভাগ্যি বৈঠা দিয়ে চালায়; নৈলে মোটর লাগাতে সুরু করলে শব্দে কান পাতা যাবেনা।—

মেয়েরা শালুক তুলছে। কেউ কেউ মাছ ধরছে। পারিবারিক সব চিহ্নই স্পষ্ট দেখা যায় কারণ জলই উঠোন।—ভালো লাগছিলো। পর পর সাঁকো। জলই পথ। তবুও গাঁয়ের পর গাঁ। পথও থাকবে। তাই সারি সারি সাঁকো। একটা কুঁড়েতে স্বামী দোলা চেয়ারে বসে। একঝুড়ি ছেলে মেয়ে ঘিরে বসে। ভাত মেখে গরাস গরাস ওদের মুখে তুলে দিচ্ছে। কথা বলতে ইচ্ছে হোলো।—কিন্তু বহ্নি বারণ করলো। যেখানে যাচ্ছি সেটা প্রত্নতত্ত্বের আজায়েব ঘর। বিরাট ভূখণ্ডে থাইল্যাণ্ডের সমস্ত দ্রষ্টব্য সমাবিষ্ট। জায়গার নাম বাং-পা-ইন (প্রাচীন শহর)। দুশো একর জমীর ওপরে প্রায় এক শো মাইল পথ তৈরি করে তামাম থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন কীর্তি সাজানো। —দেখতে সময় লাগবে।

ব্যাপারটা ঘোরালো। আমার বুঝতে সময় লেগেছিলো। মনে হয় তোমাকেও বুঝিয়ে বলা দরকার পদ্ম।

দেখো, শ্যাম দেশটা বেশ বড়ো দেশ। পশ্চিমবঙ্গ আর আসাম মিলিয়ে যতোটা জায়গা। থিক থিক করছে মানুষ। অথচ যাতায়াতের পথ দুর্গমই বলতে পারো। ট্রেন চলে। দক্ষিণে যত ভালো, উত্তরে ততো নয়। 'বাস' নির্ভরযোগ্য নয়। সিভিল এয়ারোড্রোম খুব জবর চালু নয়। অথচ দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে শুধু প্রাচীন কীর্তিই নয়, বিস্ময়কর সব কীর্তি। ব্যাঙ্ককে বহু ভ্রমণ বিলাসী আসেন। বিদেশীও, স্বদেশীও। সবার না থাকে সংগতি, না সময় যে সব ঘুরে দেখেন। তা ছাড়া চারশো মাইল গিয়ে যে অরণ্যে ঢুকলে সেখানে ভাঙ্গাচোরা এক নালন্দা পেলে, বা পান্দেথানের কয়েকটা থাম পেলে,

ড়া জোর গৌড়ের সোনা মসজিদ। এতে না পোষায় খরচ, না পরিশ্রম,—
ং শেষ পর্যন্ত মনে হয়, ওমা, এই ভাঙ্গা-চোরা ইঁট-পাথরের কুচি দেখতে
সা। কে আর আজকে কোনারক দেখে পল্লবদের গৌরব চাক্ষুষ করতে
রে?

তাই এই কোম্পানী এক কাজ করলো। মস্ত জমি কিনে ঠিক শ্যাম দেশের
তো করে সীমানা কেটে ছোটো একটা শ্যামদেশ সৃষ্টি করে শ্যামের বড় বড়
দীর ধরণে নালা, পথ, পাহাড়, ঝর্ণা সবই নকল তৈরী করলো; এবং দেশের
য যে প্রান্তে যে যে মহৎ কীর্তি আছে তার অনুকরণে ঠিক তেমনি সব
মারত তৈরী করালো। জীবন্ত ইমারত। একেবারে কার্পেট, ধূপ, মালা,
ন্ধ সব দিয়ে তকতকে ঝর ঝরে করে সাজানো। সারাদিনে ঘুরে দেখলে
ুরো শ্যামের সব কিছু দ্রষ্টব্য দেখা যাবে। ভাবো মুর্শিদাবাদ, গৌড় থেকে
নয়ে জয়পুর, আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, বিজাপুর, কাশী, মৈশুর, অজন্তা, মাদুরা
—সব জায়গার কীর্তি সৌধগুলি এনে বসানো হয়েছে কলকাতার বাইরে।
এবং সেই অজন্তাই যেন পুরো অখণ্ড সাজানো। ফতেপুর সিক্রী একেবারে
বাদশাহী ব্যাপারে তাজা, আগ্রার তাজ সমেত। দিল্লীর দেওয়ান-ঈ-আম-এ কার্পেট
পাতা; ঝরণায় গোলাপজল বইছে। সেখানেই আবার দেখছো কাশ্মীরের শাল-
কারিগরের গাঁ; জয়পুরের পাথর কারিগরের পরিবার; মাদুরার ঢালাই-কারিগর;
সেকেন্দ্রাবাদের বিদারী নক্সীর শিল্পীদের; কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পী, ফরাসডাঙ্গা-
শান্তিপুরের তাঁত শিল্পীর গাঁ-টি; সবাই জীবন্ত। বস্তুতঃ কাজ করছে। কাঁথায়
নক্সী তুলছে নাগা বুড়ী,—দেখছো অথচ কলকাতায় একই ঘাটে একই হাটে।
এ এক নয়া ধরণের চিন্তা! ভ্রমণ বিলাসীর স্বর্গ। পণ্ডিতের পকেট বুক।
ব্যবসায়ীর সোনার খনি। এ ভাবনা যার মাথায় এসেছিলো তাকে থাই-
ল্যান্ডের কেন, ইউ-এন্-ওর কেউ কেটা সর্বেসর্বা করে দেওয়া উচিত। এটার
নাম "প্রাচীন নগরী", Ancient City.

কাজেই বহ্নি বারণ করলো। যেখানে যাচ্ছি এমনি দূর নয়। কিন্তু
বাংপাইনে বহুৎ কিছু দেখার আছে। ঐটি এন্সান্ট্ সিটি কোম্পানী
লিমিটেডের "সম্পত্তি"।

১৯৬৩ সালে এই গড়ে তোলা "প্রাচীন-শহর"-এর পত্তন করা হয়।
তিন লক্ষ গাছ দিয়ে সাজানো এ শহর যেন বাগান।—সওয়া লক্ষ টন
সিমেন্ট খরচা হয়েছে; ত্রিশ হাজার টন পাথর এনে কৃত্রিম পাহাড়ের সৃষ্টি
করা হয়েছে। পঞ্চান্ন কোটি ঘণ্টা খেটে এই কৃত্রিম শহর গুছিয়ে রাখা
হয়েছে যাত্রীরা যাতে এক জায়গায় এসেই সারা থাইল্যান্ডের সেরা জিনিস
দেখতে পান্। সেই তুলনায় তাজমহল গড়তে ক'ঘণ্টা লেগেছে জানো?

১৮১৫৬০ ঘণ্টা মাত্র। তাও যদি প্রতিদিনের প্রতিঘণ্টা খাটো। তার মানে তাজ গড়তে যে সময় লেগেছে তার তুলনায় এটা ঢের বড়ো কীর্তি! হলেই বা ব্যবসায়িক। এর ভেতরে অদ্যাবধি ছে-ষট্টি-টি দর্শনীয় কীর্তি জমিয়ে, গুছিয়ে, সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আরও দ্রষ্টব্য প্রাচীন শিল্পের কৃতিত্বের খোঁজ করা হচ্ছে। এখানে আনা হবে। এ যেন পৃথিবীর বৃহত্তম আজায়েব ঘর যেখানে ঢুকলে সমস্ত থাইল্যাণ্ডের ইতিহাস জীবজন্তু মানুষ সবই দেখতে পাওয়া যায়।—

খুঁজে খুঁজে দাম দিয়ে কিনে কীর্তি সৌধ, সৌধের পর সৌধ এককাঠ্ঠা করেছে। সাজিয়েছে প্রত্নশালা-কে প্রত্নশালা, আবার যেন বোটানিক্যাল গার্ডেন; যেন পশুপাখির আনন্দ কানন। হাতি থেকে নিয়ে বাঁদর পর্যন্ত সকলেই প্রায় মুক্ত বিচরণ করছে। পাখির তো অন্ত নেই। সারারাজ্যের পাখি। নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে।—

এ সবই কিন্তু কোম্পানীর। বারবার সেই কথাটাই বোঝাচ্ছে সর্বহি। কাজেই বাইরে দেখেই হৈ হৈ করবেন না। এ থাইল্যাণ্ড ছিলো শ্যাম। এখন ঘোলাটে। খালধারের ওরাই শ্যামের সর্বহারা। এইখানে ওদের জমি-জমা জেরাত ছিলো। সব গেছে। দেখেছেন তো বড় পথের ধারে ধারে সব কলকারখানা। পৃথিবীর সব মোটর কারখানা পাবেন। আমেরিকান সবকটা ঢাউস কোম্পানী। ঐ যে সব পেল্লায় পেল্লায় চৌহদ্দীর চারপাশে দ্যাল,—এ সবইতো ছিলো এদের।

হঠাৎ একটা গ্রামে ভীড়। কী একটা নাটকীয় পালা শোভাযাত্রা করে চলেছে। তার মধ্যে বিচিত্র বর্ণময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে দুটো ঢাউস লম্বা ড্রাগনই বাজী মাৎ করেছে। গতকাল এ গাঁয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বরযাত্রীকে মাতিয়ে রাখার জন্য এরা উৎসবের আয়োজন করেছে। থাইল্যাণ্ড দেবভূমি; শ্যাম দেশ,—সবুজের দেশ।—ধনধান্যে পুষ্পেভরা এ দেশে ছড়ালেই ধান। নারকোল অজস্র। যেখানে সেখানে জল। কুমীরের মাংস, কচ্ছপের মাসং থেকে চুনোপুঁটি সবই চলছে। জলে নিত্য ধরা, সদ্য ধরা,—এবং ভোজন। হাজার লড়াই ঝগড়া যুদ্ধ বিগ্রহ হোক থাইল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ নেই।

কণিকা নেমে পড়েছিলো নাটকটা একটু দেখতে। ওরা তখন তাড়কা হত্যার পালা করছিলো। মুখোষগুলো মাথার ওপর, যেখানে মুকুট থাকে। চোয়ালে কব্জা লাগানো। তাতে দড়ি। সেই দড়িতে টান দিয়ে সুন্দ, আর তাড়কার চোয়াল নড়ছিলো। হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে চোখ থেকে আগুন ঝর্ছিলো। এদিকে কণিকাকে ঘিরে মেয়ের দল। বাঃ কী সুন্দর মেয়ে!

এসে কণিকা বললো, ফেরার পথে নেমে যাবো। ওরা খেতে বলেছে। না খেয়ে যাবো না। আমড়ার চাটনী আছে। বেশ হবে।

আমি মেয়েদের প্রাকটিকালিটির বাবদে প্রশংসায় গদ গদ।—কণিকাকে বলেই ফেললাম যে তাজমুলকে মনে পড়ছে। তোমরা এতো প্রাকটিক্যাল যে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হচ্ছে সব মেয়েরাই গোপনে গোপনে আল্লা-ভজা কি-না। কিন্তু খাওয়াটা ফেরার পথে বিকেলে করতে হবে যে কণিকা। সকালটা "প্রাচীন শহরে"ই কাটবে। লাঞ্চও ওখানেই হতে হবে। ও-দেখা তো আর মন্দির দর্শন নয়।

ওখানে খাবার জায়গা আছে?

থাকবে না কেন? মস্ত জায়গা যে! দুশো একর তো কম জায়গা নয়। এই জায়গাটার সীমা আঁকা হয়েছে শ্যাম-দেশের ঠিক অনুকরণে। গোটা শ্যাম দেশটা যেন একটা শুঁড় দোলা কান তোলা হাতির মুখ। "প্রাচীন শহর" বাং-পা-ইন্‌ও ঠিক সেইভাবে সীমিত। কেবল এর মধ্যে গাছ ও বাগানের শোভা, বাগান সাজাবার অপূর্ব এবং একেবারেই স্বকীয় ভঙ্গী, এবং তার অলঙ্করণের শিল্প-কল্পও নিজস্বতায় ভরা। বাগান তো অনেক দেখলাম। পারী-ইর ক্যারুজাল, লুকসেমবুর্গ, বৃন্দাবন গার্ডনস্‌-মৈশূর, মোগল গার্ডেন্‌স-দিল্লী, নিশাত, শালামার,—কিন্তু এমনটি সাজানো আর এতো সব মহার্ঘ জিনিস দিয়ে সাজানো বাগিচা আর দেখি নি। (পরে দেখেছি) একটা গোটা দেশের ফুল এনে যেন একটি 'ভাস্‌' সাজিয়েছে।

রামায়ণ-উদ্যানে তিন মাথাওলা এক গজাসুর অমিত বিক্রমে ধ্বংস করছে আততায়ীদের। জলের উদ্‌গত সফেন প্রস্রবণের ঝর্ঝর শব্দ। জলকণার মধ্যে বিবস্ত্র নায়িকাকে হাতের ওপরে তুলে ধরেছে। নায়ক-নায়িকা জলে ঝাঁপাই খেতে ব্যগ্র হাত মেলে দিয়েছে। কোথায় লাগে রোমের ভ্যাতিকান শিল্পশালায় লাওকুন। সে হোলো আতঙ্কের বিভীষিকা; এ হোলো আনন্দের জ্যোতির্লোক।

যেমন হাতি, তেমনি ঘোড়া। দেব-লোক গার্ডেন্‌স্‌-এ জলের ছিঁটেয় বিব্রত ধাবমান ছয় ঘোড়া লাফিয়ে জল পার হবে; কিন্তু পায়ের ভর রেখে রেখে পার হবার মতো শক্ত কোনো নির্ভর জলের মাঝে শুধু এক চাবড়া পাথরই পেয়েছে; তাই প্রত্যেকটি ঘোড়ার পা সেই পাথরখানারই ওপরে কিন্তু জায়গা হবে কেন? স্থান অ-কুলান। তাই ওরা বিব্রত; এদিকে জলেও বিরক্ত; গতির তাড়নায় অসহিষ্ণু। এর প্রকাশ ওদের গ্রীবাভঙ্গীতে, পায়ের ভাঁজে, ঘাড়ের লোমের বিশ্রস্ত অধীরতায়, দেহের পেশীর রেখায় স্পষ্ট। এদিকে গাছ, ফুল, অঁকড, পাম,—এবং পাখি, পাখির বাহার। যুগ যুগ ধরে

এখানে কেউ হিংসা করে না। পশু পাখিও ভয় জানে না।—নির্ভয়ের সাহস ; বরাভয়ের সৌন্দর্য।—

সারাবুরিতে "বুদ্ধ-বাৎ" (বুদ্ধ-পাদ) অর্থাৎ বুদ্ধ-পাদ-মন্দিরে বুদ্ধের পদচিহ্ন। দেখলেই দক্ষিণের শ্রীরঙ্গনাথ প্রাঙ্গনের বা থিরুপতি বালাজীর বিষ্ণু পদের কথা মনে হয়। ঐতিহাসিকরা তো বলেনই জৈনদের পদচিহ্ন-পূজা অর্শেছে বৌদ্ধদের মধ্যে ; এবং শেষ পর্যন্ত তা হিন্দু মন্দিরে ঢুকেছে বিষ্ণুপদের মাধ্যমে। বোধগয়ার বৌদ্ধতীর্থ আজ বিষ্ণুপাদ তীর্থ।—

এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে পশ্চিম দিকে ঢাকা লম্বা বারান্দা সারি সারি পাথরের থামের গ্রুপ। কাঠের টুকরো রাখা আছে। টুকরোটা দিয়ে বাজালেই সরগম বাজছে। মাদুরায়, ত্রিচিনাপল্লীতে, শুচীন্দ্রামে, চিদাম্বরমের নটরাজের মন্দিরে এই ধরণের আরতি-মণ্ডপের থাম দেখেছি। সুন্দর সরগম-তুলে বাজে।

তা বাজুক। কিন্তু বলোতো পদ্মা মন কতোখানি অবকাশ পেলে, চিত্ত কতোটা সৌন্দর্যের সাড়া পেলে, দেশে কতোটা শান্তি, স্বাস্থ্য, শক্তির পূর্ণতা এলে মানুষের মনে এই ধরণের সৃষ্টি করার বেদনা মুকুলিত হয়। কোনো ক্ষুধাকাতর, দারিদ্র্যে দিশাহারা, অপমানে দীন জাতি শিল্প সৃষ্টি করতে পারে কখনও ? এ কখনও জোর করে করানোর জিনিস নয়। পাঁজর ভাঙ্গা জবরদস্তিতে পিরামিড হয়। এ সৃষ্টির মধ্যে পাথরের সঙ্গে সুষমার, শিল্পের সঙ্গে মাধুরীর, সৃষ্টির সঙ্গে চৈতন্যের, স্থাপত্যের সঙ্গে ভাবুকতার, ধৈর্যের সঙ্গে তন্ময়তার যোগসাধন ঘটেছে।

ঐ তো ক্লাং-এর (খালের) ধারে ধারে সেই মুখ জোবড়া গাঁ গুলোর কথা বলছিলাম। দরজাহীন বিশাল বারান্দা। তার কোণে দ্যাল ধরে দু-চারটে ঘর। সারাদিন ঐ টিনের ঢাকা খোলা বারান্দার তলায় বসা, থাকা, রান্না, খাওয়া। সামনে দড়িতে কাপড় শুকুচ্ছে। বারান্দার ধারে বসে কেউ কেউ মাছ ধরছে।—ধরা পড়ার সঙ্গে কড়ায় চাপালে হবে। ওদের তল্লাটে যাও, মেহগনীর, শিরীষের, সেগুনের, অর্জুনের নানা কাঠের নানা কাজ। কী রকমফের বার্ণিশের। কতো রকমের জরীর কাজ! সিল্ক বুনছে ; হাতির দাঁতের নক্সী চলছে। চুনী, পান্নায় শান চড়ানো হচ্চে। সোনার, লোহার, মেকানিক-ঘোড়ার সাজসজ্জা।—কেবল হাতের কাজ আর হাতের কাজ।

পিটে পিটে পেতলের বাসনে নক্সী তুলছেন কোনো মহিলা। স্বামী দোলায় বসে ঝিমুচ্ছে। হয়তো সবে ফিরেছে পাইকিরী বাজারে শেষ রাতের সওদা তরিতরকারী, ডিম, মুর্গী বেচে।—প্রত্যেকের বাড়ি পাখির ঘরের মতো "প্রেত মন্দির"। ছোটো হোক বড় হোক, কোণে রাখা হোক বা উঠোনো স্তম্ভের ওপর বসানো হোক প্রত্যেকটি সাজানো, পালিশ করা শিল্প-কৃতী।—

থাই কেন, সারা হিন্দুচীন ও চীন বিশ্বাস করে প্রেত লোকে। প্রতি কণায়, প্রতি ঘাসে পাতায়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অসংখ্য বিদেহী আত্মা সর্বদা সঞ্চরমান। মানুষের জীবনের প্রতি তাদের অসীম করুণা। তাদের বাস তুলে দিয়ে নিজের বাসস্থান গড়া,—অনাবশ্যক পাপ। যেমন নিজের গড়ছো, তেমনি তাদের গড়ে দাও। তারা তোমায় দেখবে। তারা তোমার দ্বারপাল, রক্ষক হবে। থাইল্যাণ্ডের প্রতি মন্দিরের মঠের, প্রাসাদের দোরে যক্ষমূর্তি, বিভীষক এই সব চৈনিক দ্বারপালের আকৃতি বিস্ময়কর। ভীষণতর নৈলে ভীষণকে ভয় দেখাবে কী কোরে?

সেকালে নুন এবং নানা সামগ্রী নিয়ে ফু-চাও, হ্যাং-য়াঙ্গ, সাং-হাই-তে যেতো থাই জাহাজ। ফিরতো খালি। তখন জাহাজের ভারসাম্য রাখার জন্য পাথর বোঝাই হয়ে আসতো। হঠাৎ সুবুদ্ধি হোলো পাথর না এনে পাথরের মূর্তি আনলে কেমন হয়। ব্যস্ সেই সব অদ্ভুত চীনা মূর্তি মন্দিরে, মঠে, প্রাসাদে দ্বারপাল। চীনা মূর্তি-শিল্পের প্রভাব এসে জুটলো ভারতীয় মূর্তি শিল্পের কায়দার পাশাপাশি।

এ প্রেত মন্দিরের জবর চাহিদা থাইল্যাণ্ডে। ওরা বাড়ি ভেঙ্গে বাড়ি, মন্দির ভেঙ্গে মন্দির না করে আর একটা বাড়ি আর একটা মন্দির করে। আমেরিকান 'আর্থ-মুভিং বুলডোজিং' কোম্পানীকে থাইল্যাণ্ডে বাঁচতে গেলে ওদের 'প্রেত' ধারণাকেই প্রথম 'বুলডোজ' করতে হবে। তাই সূর্য-মন্দির, অরুণ মন্দির, রাম মন্দির, রাজবাড়ি বাড়ছে ওসারে; ওপরের দিকে নয়। ওরা পরপর পাশাপাশি গড়ে। উঁচুত্ব পূবের আদর্শ নয়। পূবের আদর্শ বিনয়। চীন-জাপানের প্রণাম বিনিময় প্রায় উবু হয়ে।

কাজেই প্রেত-মন্দির গড়া, তার শিল্পে সৌন্দর্য আনা, থাই শিল্পীর এক সাধনা। থাইয়ের লাক্ষা-পালিসের কাজ, থাইয়ের পেতলের ওপরে 'নীয়েল্লো'র কাজ আজ সারা পৃথিবীর শিল্পসংগ্রহে পরিব্যাপ্ত। ওরা কাজ করে এই 'ক্লোং'-এর ধারে ধারে। নির্জন মন্থর গাঁয়ে। দেখে মনে হয় দরিদ্র। কিন্তু কী যে খুশীর ধন, খুশীর ধান। খুশীবাদ দিয়ে ধনাঢ্য ঠাটে থাই মনে আজও চীড় কাটে না।—যেহেতু এই সম্পদের শেকড় চীনে,—তাই এ কাজগুলো থাই-বাসী চীনেরাই করে। শিল্পে এই অপরিসীম আস্থা জয়পুরের মূর্তি মহল্লায় দেখেছিলাম।—

থাইল্যাণ্ডের পথে পথে সাংঘাতিক মোড় যেখানে, সেখানে প্রায়শঃই এক্সিডেণ্ট্ হয়। কাজেই সেখানে এই প্রেত মন্দিরের লিলিপুট সংস্করণ পাবো। ফুল আছে; দীপ আছে; অনিবার্য ধূপকাঠি জ্বলছে। আশ্চর্য,—পাখী আসে না এ সব মন্দিরে। উঠোনে, পথে, হঠাৎ দেখলে পাখি-বসার

ঘর মনে হলেও পাখি কখনও বসে না। পাখিমন বোধহয় প্রেত চেনে। উভয়েই 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ'-যে।—

কথাটা সেরেই নিই। থাই নাচ দেখোনি, কিন্তু মণিপুর বা ভারত-নাট্যম্ দেখেছো। দেখেছো কী নীরব সাধনায় ঐ সব নাচের পোষাক হয়। ঐ সব সাজকে একশো দিয়ে গুণ করে আরও একশো গুণ ভালোবাসা ঢালো,—তবেই থাই নাচের পোষাকের বিভ্রম পাবে।—চম্‌কালো তার দীপ্তি, ললনাময় তার লালিত্য। যে সুন্দর ভীষণে, বীভৎসেও আশ্চর্য, সেই রুদ্র ভয়ানক মুখোষগুলোও তাদের কারিগরীতে মন মাতিয়ে রাখে। মুকুট কখনও কখনও চার ফুটও উঁচু হয়। আগাগোড়া মুকুটে আধা ইঞ্চি জায়গাও সমান নয়। সব নক্‌সী আর নক্‌সী। একটু পাক খেলে, একটু নড়লে, একটু আলোতেই ঝলমল করে। জীবন্ত হয়ে ওঠে।—

শুনেছি থাই পুতুল নাচও চমৎকার জিনিস। থাই পুতুল তো পৃথিবী বিখ্যাত। আশ্চর্য লাগে পদ্ম, ভাবতে যে মাদ্রাজী পুতুলগুলো, যা কথাকলির চরিত্র মানিয়ে গড়া, সেগুলোও কী সুন্দর। পল্লবেরা কী পল্লবিতই করেছিলো। শৈলেন্দ্র রাজাদের আমলটাই ছিলো যেন কোমল, মসৃণ, সূক্ষ্ম লক্ষ্ণৌ-চিকনের আমল। লক্ষ্ণৌয়ে সেটা সীমিত ছিলো ছুঁচ-সুতোয়; এখানে সেটা উপচে পড়েছে সোনায়, চুনীতে, প্রবালে, মুক্তোয়।

শুনেছি উত্তরে শহর ছিলো শ্যাম-মাতৃকার নামে উৎসর্গীকৃত। নাম ছিলো চিয়াং-মাঈ।—সে ছিলো প্রাচীন যুগের রাজধানী। আজও চিয়াং মাঈ শ্যামের একটা বড় শহর। এটা উত্তরের পাহাড়ে উপত্যকায় ঢাকা আদিবাসীদের আড্ডা। কিন্তু হাতের কাজের জায়গা যেমন কাশ্মীরে অনন্তনাগ, জয়পুরে মুতি মহল্লা, কাশীতে ঠঠেরী বাজার, খোজোয়া,—এখানে তেমনি সিল্কের কাজ, নিখুঁত বালা-পোষ, খেশ্, কম্বল, মৃৎপাত্র, চীনামাটি, এনামেল, পিতলের নক্সীগিরি।—এখান থেকে সারা থাই, সারা পৃথিবী। যেতাম এখানে। সময় নেই, টাকা নেই তবু যেতাম। কিন্তু যখন শ্যামে এসেছি তখন সেখানে তুমুল বৃষ্টি। পথ ঘাট বন্ধ।—

কিন্তু এই শিল্পাশ্চর্যের প্রধান প্রতীক,—কী বলোতো?—শরৎ আকাশে তারার ছায়াপথ; এক ঝাঁক সাদা পায়রা, ভরা দুপুরে নীলের বুকে; অভ্রের ধুলোয় ঢাকা ছোটনাগপুর বা হাজারিবাগের বনপথ।—বিন্দু বিন্দু চমকের বিন্দু বিন্দু সূর্যের ফোঁটা, চৈত্রের পলাশবনে আগুনের বন্যা।—দীপাবলিতে সেজেছে যেন নয়া দিল্লীর লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, জয়পুরের মদনমোহন মন্দির, এম্বের অম্বামায়ের মন্দির, মৈশুরের রাজভবন।—

থাই শিল্পের প্রধান কথা এই চমক, সোনা, রুপো, আয়নার টুকরো তো

বটেই, রঙ্গীন ঝিনুক, ভাঙ্গা চীনামাটির বাসনের টুকরো, রঙ্গীন পাথর—কী নেই এতে। সব কিছু ব্যবহৃত হয়েছে ঝিনুক পোড়ানো পঙ্কের পালাস্তারার ওপর। এমনি মুক্তো ধরা শুক্তি ঝিনুকের কাজের চরম বাহাদুরী দেখলাম পঞ্চদশ শতাব্দীর সান্-পেন-প্রাসাৎ-থ্রোন হল্-এ। অর্থাৎ সফেন-প্রাসাদের রাজসভায়।
—এই প্রাসাদটি দেখতে দেখতেই এই প্রথম কণিকা আমার কাঁধে হাত চেপে বাঙ্গালী মেয়ের মতো বলে উঠলো,—"উফ্! কী ভীষণ ভালো!! না দাদা!"

আমি শুধু বলি,—ভালো লাগছে তোমার?

ও শুধু চেয়ে থাকে।

বাং-পা-ইনের বাগান জুড়ে রোদ পড়েছে। সফেন-প্রাসাদের গা ফেনার চেয়েও সাদা। ঝলমল করছে রোদে। এ প্রাসাদের স্থাপত্য দেখলে মনেহয় নেপালী মন্দিরের টালির মাঝে কে প্যাগোডা বসিয়ে দিয়েছে, প্যাগোডাটা শুধু ভুবনেশ্বরের পরশুরাম মন্দিরের মতো ভাঁজে ভাঁজে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। কোনার্ক যারা রচনা করেছিলো তারাই যেন, ইট, কাঠ আর টালি দিয়ে এই নব কোনার্কের মাথাটা সাদা ধবধবে পঙ্খের দ্যালের ওপর বসিয়ে দিয়েছে।

জানালাগুলো বড় বড়। সপাট খোলা। রোদ এসে ঝলকে দিচ্ছে পুরু লাল কার্পেট। সোনালী দড়ি দিয়ে ঘিরে পথ রচনা করা থাকলেও যত্র তত্র বিচরণও সম্ভব। থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে এই অপরূপ দৃশ্য ভোগ করছি। কণিকা হারিয়ে গেছে। সৌন্দর্যের সাগরে দু-জনে খানিকটা সাঁতরানো গেলেও তলিয়ে যাবার সময় সকলেই একা। তলাবার যন্ত্রণা একার যন্ত্রণা; তলাবার সমাধি একার সমাধি।

কণিকা কখন এসে নিঃশব্দে পাশে বসেছে। হঠাৎ বললো, "এ অনুভূতির ভাষা নিশ্চয় আছে দাদা। নিশ্চয় আছে। মহাকবিরা চুপ থাকেন না। থাকলে বেদের গান জন্ম নিতো না। এই অলখ নিরঞ্জন আনন্দের গানে মেতে গিয়ে কেউ কি বলে নি, শৃণ্বন্তু বিশ্বে" ?—

আমি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করি

> বন্ধ দুয়ার বিশ্ব বিরাজে নিভেছে ঘরের দীপ্তি;
> চির উপবাসী আপনার মাঝে আপনি না পাই তৃপ্তি।
> পদে পদে রয় সংশয় ভয় পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ;
> বৃথা আহবান, বৃথা অনুনয়; সখার আসন শূন্য;—
> মন কহে মোরে ডুবে যা গভীরে: মিথ্যে এ সব মিথ্যে—
> নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভিরে আপনার একাকীত্বে।

ইতি—

তোমার জামাইবাবু।

৪

পরমরমণীয়াষু,

পদ্মদিদি, ভাই,—এবার এক সঙ্গে অনেক কথার তোড়। ধীরে ধীরে পাদ-চারণ করতে হবে 'প্রাচীন শহর' বাং-পা-ইন্-এ। অনেক ঘুরতে হবে।—

একদল টুরিস্ট। গাইড সঙ্গে। সেই বক্তৃতা বৈতরণী,—পার হলেই জ্ঞানের স্বর্গ! আমি উঠে পড়লাম। মন্দিরের গায়ে ফ্রেস্কো। সবই রামায়ণী কথা কিছু কিছু বৌদ্ধ কথাও আছে। রামায়ণের আশ্চর্য প্রভাব এদের শিল্প কর্মে, নাটকীয়-মননে। বিরাট একটা সেগুনের প্যানেল। সত্যিই বিরাট তার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্ম। যেন নরুন দিয়ে কাটা। যেন বাজুবন্ধ আর বালার ওপরের কাজ। বিষয় বুদ্ধ-জীবন। প্রাচীর চিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব। তা হোক। ও আমাদের তারকেশ্বরেও আছে, শ্রীরঙ্গমে-মাদুরায়ও আছে। কিন্তু এদের শিল্পী যখন যা কল্পনা করেছে তার ভেতরে সঞ্চারিত করেছে প্রাণ, জীবন নাটকের আশ্চর্য কথকতা। এটাই ভাবছি। কই দেশের ছবিতে তো এই 'নাটক' নেই। হয়তো ধ্যান আছে, তাই গম্ভীর! তবু ভালো লাগে সারনাথ মুজিয়ামে রাখা পাথরে তোলা বুদ্ধ-জীবনের চেয়ে, সারনাথ মন্দিরের দ্যালে জাপানী শিল্পীর আঁকা বুদ্ধ জীবন।

এরা তা ব'লে চপল নয়; শুধু প্রাণিল। কয়েকটা ছবির কথা না বলে পারি না পদ্ম। মা বধ করছেন শুম্ভ-নিশুম্ভ। মা বড়ো; সত্যিই বড়ো। বড়ো কে আরও বড় করার উপায় বড়র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরীহ বেচারা না করে বড়ো করে তোলা। বড়র দমনেই আরও বড়ত্বের পরিচয়। সেই শুম্ভ নিশুম্ভ দেখার মতো। কী বিক্রম! কী শক্তি! কী ভঙ্গী কুবলয়াপীড় হাতি কৃষ্ণ মেরেছিলেন মথুরার পথে। এ কৃষ্ণ হাতির দাঁত উপড়ে দু হাতে সেই দাঁত বাগিয়ে সেই রাশিকৃত মেঘের মত হাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। আতঙ্কে দিশাহীন করিরাজ আর্তনাদ করে ছুটেছে। অম[...] হাতির মৃত্যু অনিবার্য বুঝে সেই মাহুতটার পথে গড়াগড়ি দিয়ে সে ক[...] কান্না। হরগৌরীই বলো, রাধাকৃষ্ণই বলো যেন সংসার ভাব বিলাসে প্রণয়াকুলি[...] দুটি আবদ্ধ বিশ্বাসের যৌথ মিলন। তাতে যেমন প্রেমের পয়োধি, তেমনি রতিক্লেদ অতিক্রান্ত পরম শিল্পরচনার সমাহিত শান্তি।

বোঝানো দুষ্কর। রিয়ালিষ্টিক আইডিয়ালিজম্ যখন রোম্যান্সের সুর বুলিয়ে দেয় চোখে মনে তখন তুলির কারিগর কবির বড়ো হয়ে আকাশ ভুবনজোড়া মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত হন। নারায়ণ শেষ শয়নে শুয়ে। যেন ভুবন জোড়া শান্তি। খেলা করছেন লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে। ঐ সব কাণ্ড দেখে লজ্জায় আড়ষ্ট যেন নাগের ফণাগুলো ; বেচারী গরুড় ভাবছে এমন রূপ কখনও দেখবো বলে ভাবি নি। সাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ এই নারায়ণ, সাত্ত্বিক প্রণয়ের শতদলে বিকশিত। নৃসিংহ অবতারে আর যা থাকার সব আছে। অধিকন্তু আছে হিরণ্যকশিপুর দুই স্ত্রী! তাদের সেই ভয় চকিত সর্বনাশের চাহনি, তাদের বিগলিত চিকুর, লুণ্ঠিত ত্রুটিত মাল্যবন্ধ, ত্রাসস্খলিত নীবি ;—পদ্ম, এরা শিল্পী ছিলো না। এরাই মহাভারতের নাগ, দানব। তিলোত্তমাকে সৃজন করে সুন্দ উপসন্দকে ঘায়েল করলেন—কে যেন? ইন্দ্র না বিশ্বকর্মা? সুন্দ উপসুন্দের বীর বিক্রমে সে লড়াই, চকিত প্রেক্ষণা মধ্যক্ষীণা সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-রমণী মহাকুতূহলে দেখছেন।······

আর একটা। আচ্ছা বলোতো। সবাই তো গেলো হেরে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উঠে এলো লক্ষ্য বিঁধতে এক দীর্ঘ—কান্তি ব্রাহ্মণ যুবা। মাথার ওপরে ঝুঁটি বাঁধা। শাঁওলা শাঁওলা রং। দেখেই তো দ্রৌপদী মজে গেছেন। যুবাও ধনুক টেনে তৈরী।······আচ্ছা পদ্ম, তুমি তো মেয়ে। ঐ সময়ে তুমি হলে কী করতে বলোতো! রবিবর্মার খপ্পরে পড়লে বড় জোর মালা হাতে করে স্মিত বদনে ঐ মৎসচক্ষু চক্রবেধ-এর দিকে সতী-সীমন্তিনী মুদ্রায় চেয়ে থাকতে। থাই শিল্পী তা করেন নি। শঙ্কিতা দ্রৌপদী তাঁর সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে এমনই একাত্ম হয়ে পড়েছেন যে এ যুবার পরাজয় আশঙ্কায় থর কম্পিত বুক এক হাতে চেপে অন্য হাতে চোখ ঢেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। কী বিচিত্র স্বাদ এ সব চিত্রের। কিন্তু কতো বলবো।

আরও ভিতরে রত্ন খচিত সুবর্ণ সিংহাসন। দেয়াল থেকে ছাদ—সব সোনা আর সোনা। দারুণ রোদ পড়ে ঘরে যে আগুন জ্বলছে তার দাহ ঐ বহ্নি-রাঙ্গা কার্পেটে প্রতিফলিত। তার ওপর দুই ধারে দুটি কান্তিময়ী থাই পতঙ্গ সিল্কের সারং আর কামিজ পরে নিঃশব্দে সেই মণি-মাণিক্য খচিত রাজ দরবার পাহারা দিচ্ছে। যতো-না পুড়ছে, তার বেশী পোড়াচ্ছে।

বাইরে বহ্নি দাঁড়িয়ে। হেসে ইশারা করলো। ওর বাবার হাঁফ বেড়েছে। তিনি রেস্তরাঁয় চা খাচ্ছেন। ও বললো, আপনারা আর রেস্তরাঁয় নয়। খাবার বাইরে এনেছি। এখনও অনেক দেখার বাকী।

এনেছিলো বুদ্ধি করে পেঁপে, ওদের দেশের একটা ফল,—গায়ে

জামরুলের মতো কাঁটা। ভেতরটায় জেলী! আতা, আর আনারসের ফালি। গরম খাস্তা চীজ দেওয়া রুটি। খাওয়া সেরে চললাম ঊষা-উদোর্নখানী। বুঝতেই পারছো এদেশে অরুণের মন্দির আছে; আর এ শহরটার নামই "উদয়ন"। এখানে থাকবেই একটি ঊষার মন্দির। কিন্তু এ তো ঊষার মন্দির নয়; একটি একক গিরি চূড়ার ওপরে দোদুল্যমান পাথরের চাঁই। বিশাল চাঁই। এককালে মন্দিরেই নিরেট চবুতরা ছিলো নিশ্চয়। ওপরে মন্দিরের চাতালটিই রয়ে গেছে। তলায় গায়ে নানা শিল্পকৃতী।—মনে করিয়ে দেয় মামাল্লাপুরমের গিরিগাত্র। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ সেই অপরূপ ভাস্কর্য।

ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এলাম সেখানে একটি বিরাট ঝরণা। জলটা যেন রহস্যময় বনানীর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারপর ক্ষীণ একটি ধারায় স্তিমিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে কুমুদের দল বুকে দুলিয়ে। ঘাসের গা বেয়ে বেয়ে পাথর এড়িয়ে সে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার সেই উথাল-পাথাল কান্না এখানে কুমুদ কাননে এসে ভুলে গেছে।

শ্রীবিজয় চৈত্য একটি মন্দির। ছোটো কিন্তু মনোহর। একটি সাদা ধবধবে বিহার। ভিতরে আলো ছায়ার ঝিলমিল কারণ জানলাগুলো জালিদার। ঘোড়াটানা গাড়িতে সৌখীন পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বেড়াচ্ছে হাতির পিঠে।

এদিকে এরা থাই গ্রামের মতো গ্রাম বসিয়েছে। সেই বন্য উত্তরের গ্রাম থেকে শিল্প কারিগর এনেছে। ঠিক তাদের গাঁয়ের ব্যবস্থায় গাঁ বসিয়েছে। তারা কাজ করছে। দেখো, কথা কও, কেনো। আবার তার পাশে মিকং নদীর অববাহিকা থেকে এনেছে মেয়ে শিল্পীর দল। এরা আঁকছে, কাপড়ে নক্সী তুলছে, বাটিকের কাজ করছে, ছাপছে সিল্ক, ছাতা তৈরী করে ছাতা সাজাচ্ছে রংয়ে তুলিতে। লম্বা সুন্দর কালো কালো চুলের গোছা ঢল দিয়ে নেমেছে পিঠে। সারং-এ, কামিজে, পুঁথী-পাথর-সোনার নেকলেসে রোদের সঙ্গে হাসি মিলিয়ে ওরা কাজ করে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের যে একেবারে দেখছে না এটাও সত্য নয়। ওরা যে জানে ওদের দেখাবার জন্যই এখানে বসত করানো হয়েছে। ওরাও বিনোদিনী-ই।—

কণিকা তৎপরতা দেখালো। ঝপাং করে বহ্নির হাত ধরে ও সাঁকো পার হয়ে মিকং-এর মেয়েদের 'গাঁয়ে' ঢুকে পড়লো। ওরা তো মহাখুশী হয়ে কলকলিয়ে এগিয়ে এলো। হাত ধরে ওকে বসালো। হঠাৎ ওর হাল্কা বাঁধা চুল দিলো খসিয়ে। ওর চুলে কাঠের কাকই বসিয়ে আদর করে আঁচড়াতে লাগলো। এক ধরণের ব্রাশ ব্যবহার করছিলো, কিন্তু তুলির মতো তার হাতল।—তাই দিয়ে বালি থেকে মুড়ি ভেজে তোলার মতো ওর চুল ঝেড়ে

লকের মতো মসৃণ করে তো দিলোই, চুল তুলে মাথার ওপরে তালুর ধারে অপূর্ব কবরী বেঁধে দিলো। মিনিসুতোর মালার মতো বিনা ফিতায় বাঁধন যেন অক্ষয়। যেন থাই মন্দিরের চূড়া ; থাই নাচিয়ের মাথার মুকুট। র ওপরে জড়িয়ে দিলো মালা।—দিয়ে ওর চিবুক আমার দিকে ফিরিয়ে খের ভাষায় যা বললো তার অর্থ—"দেখো তো চেয়ে 'ইহারে' তুমি চিনিতে রো কি-না" ?

দূর থেকে সুন্দর বাজনার সুর ভেসে আসছে। আমরা এগিয়ে গেলাম। টা একটা থাই আদিবাসী গাঁয়ের অনুকৃতি পশ্চিম দিকের ব্রহ্ম ঘেঁষা গভীর নের বনচর দল। প্রায় আট-দশজন মনের আনন্দে বাজাচ্ছে। একতারার উটা ঢাউস। ছাত থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া অসংখ্য ফাঁকা ডম্বরুর লা। বাঁশের এবং কাঠের। বড় থেকে ছোটো। মালার অন্যধার নীচে বাঁধা। ঝুলে ছে চাঁদের মতো বেঁকে ডম্বরুর একদিকের কাঠে ফাঁকা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে কজন পিটছে। অন্যদিকে অন্যজন। ফলে ডবলরীডে বাজানোর মতো রুগম্ভীর শব্দ উঠছে। অপূর্ব লাগছিলো দোল লাগা সেই ধ্বনি। একঘেয়ে নে হতে না হতে ঝিম লেগে যায়। বেশ বোঝা যায় বনের পশুপাখিকে হপনোটাইজ করার আজব কায়দা।

মস্ত একটা জলাশয়। চারিধার থেকে নালা এসে জল পড়ছে তাতে। আবার একধার থেকে দুটো ভাগে দুটো ক্লোং দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে! মাঝে বিরাট এবং গভীর জলাশয়।—সেই জলাশয়ের ঠিক মাঝে না হলেও তীর থেকে বেশ খানিক দূরে নয়নাভিরাম এবং বিশাল এক থাই প্রাসাদ। সাদা ধবধব করছে। এটি একজন থাই রানীর স্মৃতি মন্দির। এখন স্কুল, শিশুদের স্কুল।

এই রানীর মৃত্যু হয়েছিলো জলে ডুবে! ঘটনাটা ঘটেছিলো উত্তরে সুখোথাঈ নগরে। কিন্তু এখানে সেই ঘটনাটিকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। সেদিন নৌকার খেলা চলছিলো। রাজার নৌকা রানীর নৌকাকে হারিয়ে চলে গেলো। রানী দাঁড়িয়ে মাঝিদের প্রোৎসাহিত করছেন। এখনও দু পাক জলে ঘুরলে তবে বাজী শেষ।—রাজার নৌকা চলেই গেলো। রানী তখনও হাত ঘুরিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। উত্তেজনার মুখে রাজাকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে যাবার তালে তাল রাখতে না পেরে পা ফসকে বহুসজ্জিতা রানী জলে পড়ে যান। কিন্তু রাজদেহের স্পর্শ সাধারণ মানুষ করতেই পারে না। অতোবড়ো অনাচার আর নেই। সাধারণ মানুষ কিনা দেবদেহ স্পর্শ করবে? কেউই করলো না। সুসজ্জিতা রানী সবার চোখের উপরেই সলিল সমাধি লাভ করলেন। তাঁর স্মৃতিতেই এই সৌধ। অদ্ভুত-সুন্দর করুণ স্মৃতিতে

আপ্লুত কাঠের তাজমহল। বিশাল সরোবরের মধ্যে যেন ফুটন্ত এক
শ্বেত পদ্ম।

এবার নিয়ে এলো সোজা 'দেবলোক'-এ। হলেও 'দেবলোক'; এটাও এক
গাঁ-ই। দেবলোকে হিন্দু দেব-দেবী প্রায় সকলে উপস্থিত থাকলেও রবরবা বে
দুজনার ঃ—শিবের আর বিষ্ণুর। গাঁয়ে বাজার, হাট, নাচ, গান, খেল, তামাশা
সুখোথাঙ্গ নগরীর দাপট বেশী। রঙ্গশালা আছে, নামও তার রঙ্গশালাই, কে
একটু উলটে পালটে—শালা-রঙ্গ-তুক্। আয়োজন সব প্রস্তুত, কেবল নর্ত
দ্বিপ্রহরে অনুপস্থিত।—মহাধাতু-র ওয়াৎ; ওয়াৎ মানে বাট, মন্দির বা বাসস্থান
মহাধাতু বুদ্ধ শ্রমণ, মহাধাতুর স্তূপও আছে। কামদেবের মন্দির আছে,-
কামাখ্যা তাঁর শক্তি। আর চামুণ্ডা মায়ের মন্দির চেড়ী, চাম-দেবী। এই চামু
নিয়ে ডঃ প্রবোধ বাগচী মশায় অনেক কথা লিখেছেন। ওরা আজও নিষ্ঠাবা
ব্রাহ্মণ। বাইওয়ান এবং আঙ্কোর ওয়াৎ-এ এখনও চাম-ব্রাহ্মণরা বেদ পড়ান
পড়েন। শ্যামের রাজার দরবারে চাম রাজপুরোহিত আজও বহাল আছেন।-

আগেই বলেছি বাং-পা-ইন্-এর প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক গড়া হয়েছে আকা
থাইল্যাণ্ডেরই মতো কোরে। এবং এর মধ্যে যেখানে যা প্রাচীন কী
সাজিয়ে রাখা আছে (পুনর্নির্মিত এবং পুনরুজ্জীবিত রূপে) তা ঠিক ভৌগোলি
অবস্থিতি অনুসারেই রাখা। দেবলোক, সুখোদাঙ্গ অথবা সুখোদয় নামক জায়গ
গুলো মে-পিং এবং সালউইন নদীর অববাহিকার মধ্যে ব্রহ্মের সীমানায়, কারে
অধ্যুষিত কারেন্নী শহরের উত্তর পূর্বে। চিয়াং মাঙ্গ, চিয়াং হাই, শহরগুলে
এই দিকে বলেই চিয়াং-দের দেবদেবীর আখাড়াও এদিকে। এটাই 'চামু'-দের আড্ডা
চামু-দেবী, চামু-মাঙ্গ, চামু-দেব,—সব এইখানে। চামমোঙ্গ (চামুণ্ডা)-র স
শিখরী বিশাল মন্দিরের শোভাও বিশাল। "ফ্রা-ধাতু-চোম কৃতি"র স্মৃতি সৌধে
বিন্যাস প্রায় মডার্ন।

অযোধ্যা ছিলো প্রাচীন রাজধানী। আজ তা ভগ্নস্তূপ। কি
বাং-পা-ইনে অযোধ্যার প্রখ্যাত মন্দির প্রাসাদগুলো নতুন করে তৈরী ক
রেখেছে। প্রিয়শ্রী সঙ্কেত (Phra Sri San Phet)-এর বিহার, চো
থোং হল, সাম্পেচ্ প্রাসাদ এবং রামা-বাটীকা এই চারটিই দেখলাম বটে; ত
আসল অযোধ্যায় যেতে হবে একদিন, তাই এগুলোর ঝলমলে চেহারা মোটামুটি
দেখলাম। বহ্নি বললো আসল অযোধ্যার রাম বাটীকা সত্যই সুন্দর। উত্ত
কাম্বোডিয়া এবং শ্যামের বর্ডারে মাইনুনী এবং নোয়াং কাঙ্গ নদীর অববাহিকা
আছে সুন্দর মন্দির। নান্ শহরে আছে ওয়াৎ ফুমিন বিহার, অর্থাৎ প
মন্দির। সে মন্দিরের ছন্দটি অত্যন্ত মনোহর। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষি
পাখার পর পাখার ছন্দে তিন থাক করে ছাদ, ভাঁজ করা পাখার মতো আ

লা অবস্থায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে। বারোটি পাখি যেন এই উড়বে ল অপেক্ষা করে আছে। পবনের এমন মন্দির কখনও দেখবো বলে ভাবি নি। তা মাথায় স্বর্ণাভ রেশমী ও সুতো কাপড়ে ঢাকা শ্রমণের দল মন্দিরের দিকে লছে। জলের ওপর সাঁকো। যুবা শ্রমণ বৃদ্ধ শ্রমণের কাছে পাঠ নিচ্ছে। -সর্ব সমেত ছেষট্টিটি দেবস্থান এখানে জড়ো। এখনও নির্মাণের কাজ লছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

তবে আর নৌকোয় ভাসা হাট এখানে কেন থাকবে না। তরমুজ কিনে খলাম। ডাব খেলাম। এদের ডাব কাটার কায়দা ভালো। ডাবটির সবুজ খালাটি কেটে কেটে ছোট্ট একটি ঘটির মতো করে বসিয়ে রাখে। চাইলে মুখটা টির মতোই অতোটা গোল করে কেটে দেয়। এখানে কয়েকটি ভারতীয় ছলেকে পেয়ে গেলাম। ইচ্ছে হোলো কথা বলি। দেখেছি বিদেশে, হঠাৎ ারতীয়দের সঙ্গে দেখা যদি বা হয়ে গেলো, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বড়ো কটা বলতে চায় না। অমন উপরি পড়া কথা বলা নাকি গোঁয়ো রেওয়াজ! এ্যাংলো-স্যেকসনী হোৎকামীর এই এক অবদান। ভারতে তৃতীয় শ্রেণী রেল ামরায় বন্ধু যতো তাড়াতাড়ি জুটে যায় প্রথম শ্রেণীতে তেমন জোটাই দুর্ঘট। বমানে অমন বন্ধুলাভ এ পর্যন্ত আমার হয়েছে তিনটি। একজন ফারসী, একজন কোরিয়া প্রবাসী আমেরিকান; তৃতীয়টি পোলিশ ইহুদী। কেউ-ই তার ধ্যে এ্যাংলো স্যাকসন্ নয়।

হঠাৎ দেখি কণিকাও নেই বহ্নিও নেই। ভাবলাম অপরিহার্য কোনো ডাকে সাড়া দিতে গেছে। আমি সাঁকোয় বসে বসে হাঁসের খেলা দেখছিলাম। সরে গিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি বাঙ্গালী?

অন্য দুজন হেসে উঠলেন। একজন বললেন,—বলতে পারেন। আপনারা াঙ্গালীরা কী বাঙ্গালীর গন্ধে টের পান?

উত্তরে বললাম,—আসল ব্যাপারটা আরও গূঢ়। আপনি তো দেখছি যুক্ত াদেশের ক্ষত্রী?

চমকে ওঠেন ডঃ খান্না। আপনি তো দেখছি উইজার্ড। বলুন তো, আমি কোথাকার?

আমি হাসি। বলি, বেশ তা হোলে বলুন এ পর্যন্ত যা বললাম, ঠিক লেছি। তারপরে সাহস কোরে এগুই।

করুন সাহস! সব ঠিক এ পর্যন্ত।

এখানে আপনারা এসেছেন, বেড়াতে যে নয় বুঝতেই পারছি। তা হোলে নিশ্চয় কোনো কনফারেন্সে। ব্যবসায়িক কনফারেন্সে হলে টুরিস্ট বাসে আসতেন

না। এ আসাটা গাঁটের পয়সায়। মানে সরকারী চাকুরে। তবে কি আপ
ইকনমিস্ট? তাই না? দিল্লীর।

মশায়, পেটের খবর বার করবেন দেখছি! খুব জোরে হাসতে হাস
নতুন কেনা সিগারেট কেস বার করে সিগারেট অফার করেন।

সবিনয়ে সিগারেট প্রত্যাখ্যান করে বলি, ধন্যবাদ, এই সব ছোটোখাটো পা
কর্ম করি না।

আমাদের আলাদা ট্যাক্সী আছে শুনে ওদের আক্ষেপ। ওরা এম
টুরিস্ট বাসের যাত্রী।—কিন্তু কথা রইলো ওদের সঙ্গে হোটেল এরা-ভবান
দেখা করবো।—

আমাদের তখনও দেখা বাকী। প্রাচীন-বুরী (পুরী)-র প্রাসাৎ-সাদো
কোক্-থোম একটি প্রাসাদ। কোক-থোম নামক কোনো মহৎ সাধকের বাসস্থান
সাদায়, ছাইয়ে মেশানো বিশাল প্রাসাদ। কাছেই পার্ক। এ পার্কও পশু
ফুলে সাজানো। অভয়-মনি পার্ক। একটু উত্তরে বিশাল হ্রদ। হ্রদে
কিনারে সুরীন শহরের বহুখ্যাত মন্দির প্রাসাদ শিখর-ফুস্। সাং-থোং পা
ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ অনুভব করলাম সর্বহিরর সঙ্গে কণিকার খুব জ
গেছে। এবং ওরা উভয়েই আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

* * *

সোজা এলাম সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বাঁচালো কণিকা। আমা
স্নানের ব্যবস্থা করে দিলো। আমি খালে নাইবো শুনে বিয়ে বাড়ির সব
নিষেধ করলো। অভ্যাস না থাকলে এ জল বিষ। নাইবার জন্য ট্য
ওয়েল থেকে জল তুলে দিলো। স্নান শেষ করেই কফি। খাদ্য যা দিয়েছিল
বেশির ভাগই মাছ ও মাংস। কিন্তু মাছ চটকে পেঁয়াজ রসুন আদা আ
পদ্মবীজ দিয়ে এক পকৌড়া। একটা নতুন গন্ধ। স্বাদটি ভালো। তাছা
গরমভাজা নোন্‌তা খাবার।

কিন্তু গল্প করে করে খাচ্ছি। গল্প তো ইণ্টারপ্রেটারের মাধ্যমে, ত
মন্থর গতিতেই হচ্ছিলো। হঠাৎ শ্রীমতী কণিকাকে দেখে আমি থ'।

এ কী! একেবারে থাই-মাঈ যে!

কণিকা-ও গা ধুয়ে এসেছে। কিন্তু কেশ-বিন্যাস থেকে নিয়ে সা
পোষাকে গহনায়,—একেবারেই অন্য। বাঙ্গালী মেয়ে কণিকা; কিন্তু থ
মেয়ে হয়ে গেলো মাত্র সুর্মা, কাজল, রং, চুলের দৌলতে। কী সাজাতেই পা
থাই মেয়েরা। ওদের গাঁয়ের পোষাক, দেশের পোষাক,—সারং, লুঙ্গী,
যা বলো। তার ওপর ওদের কোমরের তলা অবধি ঢাকা। ব্লাউজের হা
কনুয়ের ওপরে অবধি। হাফ শার্ট—বলো, ফতুয়া বলো; যা খুশি। তার তল

শ্য একটা কিছু আঁটো-সাঁটো থাকে। পা খালি ; মাথায় ছাতা অনবধারিত ;
থাকবেই ; নৈলে যে রোদ পায়ে সইবে, সে রোদ মাথায় সইবে না।
লের তলায় বেতের ঝুড়ি, বা কাঁধে বাঁক, বাঁকের—দু ধারে—ঝুড়ি।
ঠ যারা কাজ করছে ধান ক্ষেতে তারা সারংটাকেই হাঁটু অবধি তুলে
টা কাছা মতো করে নেয়। মাথায় টোকা না থাকলে রঙীন কাপড়ের
রো বাঁধা থাকবেই।

শহরে তা নয়। শহরে সারং যে এক্‌কেবারে নেই এ কথা ভুল ;
র বেশির ভাগ সারংই হয়ে গেছে স্কার্ট, অবশ্য হাঁটুর নীচে
ধি, আর ফুলছাপ শার্ট। এ হোলো সাধারণের। ঠাটদার পোষাক সিল্ক।
ল্কের শীথ্‌ কাটের গোড়ালী অবধি গাউন্‌। আঁট-ফিটিং। হাতা কনুয়ের
 অবধি। হাতায় আর গাউনে পাড় আছে ঝলমলে। গলায় হার আর
ায় ফুল।—এ ছাড়া আরও নাক-উঁচু পোষাক হোলো ঐ লম্বা-শীথের
ুকরণে "সেলাই-নেই-নেই" স্টাইলে পোষাক। সিল্কেরই পোষাক ; কিন্তু
ৎ দেখলে মনে হবে সিল্কের থান ফেড়ে বুক থেকে পা অবধি প্যাঁচ
র বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ফেলে দেওয়া। এক প্যাঁচেই যা ঢাকার
টুকু ঢেকে বুকের চত্বর হাত ঘাড় গলা খোলা এক পোষাক। যেন
ল ফেলে দিতে একটি স্পর্শের বেশী দুটি লাগবে না।

তবে গহনার চলন খুবই কম। যা আছে তার মধ্যে দামী পাথর আর
ক্তাই বেশী। নৈলে জরী, পুঁথী, ফুঁকো কাঁচের ব্যবহার বেশ। প্রবালের
ন দেখছি খুব। ওদের বিশেষ অনুরাগ নীলে, সোনায় এবং লালে।
র ফ্যাশন যা কিছু সারং, জুতো এবং সবার ওপরে ছাতা। ছাতাই ফ্যাশন।
তার ঢাকা ছাড়া আর ওরা যা কিছুই ঢাকুক না কেন, উদ্দেশ্যটা ঢাকা
; উদ্দেশ্য, 'এখুনি খুলো-না'।

বাড়ির কর্তা বৃদ্ধ। কণিকাকে প্রায় জড়িয়ে নিয়ে এসে গালভরা হাসি
খভরা খুশীতে খানাঘর ছাপিয়ে দিয়ে বলে দেখো যদি চিনতে না পারো,
রা থাইয়ের বৌ করে নিতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু মনে হচ্ছে চিনে
ফেলেছো!

সুযোগ ছাড়লাম না। বললাম, নতুন কথা কী? হাজার বছর আগে
নই হঠাৎ রসে রঙে মেতে আমাদের ঘরের শ্রীকে তোমাদের ঘরে এনে ঘট
তে দিয়েছিলাম। তাকেই যখন আজও চিনতে ভুল হয় না, এ কয় মিনিটে
মেয়েকে চিনে নিতে ভুল কী হয়?

খুব খুশী ; খুব হাসি ওদের। যেন জিতে নিলাম। কলরবে ভরে গেলো
ই উৎসব মুখরিত ঘর।

*　　　　*　　　　*

খাওয়া সেরে ফেরার পথে রাজবাড়ী হয়ে এলাম। প্রাসাদের ঐশ্ব একশো পঁচাত্তর বছরে একটুও টসকায় নি। অব্যাহত ভাবে যু যুগে এ প্রাসাদের শ্রী-বৃদ্ধি হয়েছে। এক বর্গ মাইল-এর জমি আগাগো পাঁচিল ঘেরা। সেই পাঁচিলের মধ্যে প্রাসাদের পর প্রাসাদ যেন প্রদর্শনী।

চাও-ফ্রায়া নদীর ওপারে পুরোনো ব্যাঙ্কক।—এপারে আজ নতুন ব্যাঙ্কক এই নতুন ব্যাঙ্ককেই এক রাজপ্রাসাদ ছিলো ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের আগে। থোন্-বু প্রাসাদ। থোন্-বুরী প্রাসাদের রাজসভার প্রতিকৃতি আমরা "প্রাচীন নগরী তে সবে দেখে ফিরেছি। রাজা পাগল হয়ে গেলেন। না তাঁকে থামা যায়। না অমান্য করা যায়। কাজেই তাঁকে শেষ করতে হোলো। বি হোলো তাঁর। সেটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার নয়। শোকাপ্লুত সে ঘটনার পর সে প্রাসাদে কেউ আর থাকতে রাজী নয়। তলে তলে সে 'প্রেত' সংস্কারও যে কাজ করে নি তা নয়। অন্য একটি প্রাসাদ গড় হোলো।

একেবারে নদীর এপারে নতুন রাজার নতুন প্রাসাদ।

প্রাসাদের নাম চক্রীপ্রাসাদ, কারণ সেনপতি চক্রী-ই প্রথম রাম উপাধি ভূষিত হয়ে রাজত্ব আরম্ভ করে। শ্যাম রাজ্যে এই চক্রীবংশের অব অবিস্মরণীয়। প্রথম-রাম-ই এই প্রাসাদের পত্তন করেন, এবং তখন থেকে প্রাসাদ রচনায় এমন একটি ঐশ্বর্যময় পরিকল্পনাকে মূর্ত করেন যে যু যুগে সব থাই রাজাই ঐ উদাহরণকে সামনে রেখে প্রাসাদকে মণ্ডিত অলঙ্ক করেছেন। উইণ্ডসর প্রাসাদ, বাকিংহাম প্রাসাদ, লুক্সেমবুর্গ, ভার্সাই, লুভ ভাতিকান এ সব প্রাসাদের মর্যাদা একটা একক সমগ্রতার আঁট সাঁট ধর

ঐ যে প্রেত-সংস্কারের কথা আগে বলেছি, তার ফলে সারা শ্যামেই মেরা করার চেয়ে নতুন গড়া, ভাঙ্গার চেয়ে আর একটা গড়া-ই মনঃপূত। স সদ্য যে 'চক্রী-হল্' তৈরী হয়েছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে মনে ছুঁ ফেললাম তার অত্যন্ত অলঙ্কৃত লাল টালির ছাতটা। লালের পাড়ে সবু টালিগুলো দামী এনামেলে ঝকঝক করছে। কার্ণিশে তার সোনা। ত দুটি টালি ছাওয়া ছাতের মাঝের গভীর কোণের বুকে খাড়া একটি শি আকাশ ছুঁতে চলেছে, সোনার আঙ্গুলে সূর্য বরণ করবে বলে। স থাকে তার সাত মহল। প্যাগোডা পিরামিডের মতো ঢেউ কেটে কে উঠে গিয়ে মাথায় ধরে রেখেছে যেন সোনাময় এক বাঁমিজ প্যাগোডা।

ভিতরে মেরামত চলছিলো সাজসজ্জার, তাই যেতে পারিনি। কিন্তু পা গেট দিয়ে যেখানে প্রবেশ করলুম সে এক অদ্ভুত স্থান, অদ্ভুত অনুভূতি

এই অপূর্বতার চমক সেই অপরাহ্নের আলো যেন সোনায় ভরে দিলো।

কণিকা বললো, না বুঝিয়ে দিলে কিছুতেই এ সব বুঝতাম না। দেশ
খো, বাড়ি দেখা, শহর দেখা, মানুষ দেখা—সেও এক কারিগরি। এখন
ন সব বুঝতে পারছি।

আমার খুব ইচ্ছা ছিলো এই পান্নার বুদ্ধটি আমি দেখি। শ্যাম দেশের
বুজ পাথর,—এই পান্না। এই সবুজের অঢেল প্রেমে পাথরও এখানে সবুজ,
ূর্ব তোরণের অরুণ দীপ্তিতে হীরেও এখানে চুনী। চুনী আর পান্না,
াতির দাঁত আর সিঙ্কের আড়ৎ এই শ্যাম দেশ। আর আছে সোনা।—
ই পান্নার বুদ্ধ আড়াই ফুটের ওপর, প্রায় ৩১" ইঞ্চি উঁচু। উঁচু মানে,
—বুঝে নাও। বুদ্ধ পদ্মাসনে বসে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানে নিমীলিত। সেই
পবিষ্ট বুদ্ধের উচ্চতা ৩১" ইঞ্চি। তুমি আমি বসলে এই মাপেরই হবো।
র্থাৎ বলতে চাই পান্নার এই বুদ্ধটি প্রায় পুরো একটি মানুষের মাপের।
র গড়নটা একেবারেই ভারতীয়। শ্বেতকায় পণ্ডিতরা মানছেন যে ভারত
থকেই একে গড়িয়ে আনা হয়েছে। শ্যামের শ্রুতিকথন তাই বলে আসছে।
য়ারোপীয়েরা অবশ্য কবুল দেন,—হ্যাঁ, ভারতের বটে; কিন্তু মনে হচ্ছে
ারতে বসে কোনো গ্রীকই এটিকে তৈরী করেছে।

থাক্ ও কথা। অন্যকথায় আসি।

এদের পুজোর ধরনটা বলি শোন। মন্দির বলতে যা এক বিস্তীর্ণ হলঘর,
াগাগোড়া এ পুজো অন্য ধরণের। রাজদরবারের মতো সাজানো। কার্পেটে
মাড়া। মন্দির প্রবেশের দ্বার দুটি দিকে দুটি। আট ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।
াঝখানটা খোলা হলেও ওঠার সিঁড়ি থেকেও নেই। সারি সারি ধাপে
ারি সারি ফুলের টব সাজানো। একমাত্র রাজশ্রীচরণ ছাড়া অন্য কোনো
শ্রীচরণের চরণ তাতে লাগার জো নেই। পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্তীরও
য়। স্বয়ং সিদ্ধার্থ বুদ্ধও যদি আসেন, প্রবেশ করতে হবে পাশের
দার দিয়ে, অবশ্য যদি তিনি তোমার মতো প্রাকৃত বেশে আসেন। উনি তো
ুনতে পাই কুকুর বেরালের বেশেও এসেছেন। সামনে বিশাল পিতলের গামলা।
ামলা ভর্তি বালি; সেই বালির বুকে হাজার হাজার ধূপকাঠি জ্বলছে;
ক্তের নিবেদন। মালা যা চড়ছে তাও সামনের ঐ সিঁড়িতে রাখা; অবশ্য
য-ই রাখছে, সাজিয়েই রাখছে। কিছুই তড়িঘড়ি এলোপাতাড়ি নয়।

মন্দিরে যাও,—গিয়ে কার্পেটে বোসো। কার্পেটে বহু প্রার্থনার বই
ড়ে আছে। পা মুড়ে পায়ের ওপরে চেপে বোসো। ডানদিকের দেয়াল
ঘেঁষে রেলিং। তার মধ্যে রঙীন কাপড় পরে মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণরা স্তোত্র
াঠ করছেন পালিতে, থাই ভাষায়। স্তবের বইয়ে লেখাও সব থাই

লিপিতে। গম্ভীর স্তব। সমস্ত পরিবেশ গম্ভীর। বেশির ভাগই সবাই স্ত্রী গ
পরিবার নিয়ে এসেছেন। অন্ততঃ হাজার দেড়েক মাথা সেই হলের মধে
আসা-যাওয়া ইচ্ছামতো হলেও কেউ কারুকে বিরক্ত করছে না।—

পান্নার বুদ্ধ প্রায় ১৫ ফুট উঁচু টোঙ্গে সোনার সিংহাসনে কড়া পাহারায়
ন যযৌ ন তস্থৌ। সিংহাসনের ভেতর উজ্জ্বল আলো। ১৫ ফুট উচ্চত
ধাপ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ঢাকা। সে সিঁড়ি ঢাকা লাল কার্পেটে। কার্পেট
ঢাকা রাজোচিত নানা অলঙ্করণে। সোনা রুপো অঢেল। ও নিয়ে মন
খারাপ করবেনা। এই বুদ্ধ অশান্ত মানবদের কতো রক্ষা করেন বা করবেন
জানিনা, এই বুদ্ধকে রক্ষা করার জন্য দোরে অঙ্গনে গিস্ গিস্ করছে
উর্দীপরা বন্দুকধারী পল্টনের দল।

তবু সোনা চায় এ দেবতা। ফুল-মালা-ধুপের দোকানে তবকের দোকান।
ডাক টিকিট, ডবল ডাক টিকিট-এর মাপে শাদা কাগজের টুকরোর মধ্যে রাখা
সোনার তবক। ভক্তরা সযতনে শাদা কাগজ খুলে চেপে ধরছে বাইরের বুদ্ধ
ও বোধিসত্ত্বদের গায়ে। তাদের চোখ মাথা মুখ সব ঢেকে গেছে সোনায়
সোনায়। দম থাকলে আটকে মারা যেতেন বুদ্ধ। শুনেছি জেম্স্ বণ্ডের
হাতে পড়ে এক সুন্দরীর ঐ দশা হয়েছিলো। সোনা মোড়া সুন্দরী পঞ্চত্ব
লাভ করেছিলেন। অবশ্য মরেও মরে না বুদ্ধ। মৃত্যুর কোনও ভয়, কোনো
পরোয়া নেই বলেই হয়তো এই স্বর্ণ দলাই সহ্য করেন।

একদা স্নানের অবসর হবে এই সব অস্নাতক বুদ্ধ মূর্তিগুলোর। তখন
এ সব সোনা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পুনশ্চ ভক্তেরা সুবর্ণ লেপন করবেন
বোধিসত্ত্বের গায়ে। এই নিয়ম! (নৈলে সোনা সংগ্রহ করা যায় না যে!)

রেলিংয়ের বাইরে ছোটোখাটো বুদ্ধের কাপড় বদলানো ইত্যাদির হ্যাপা
মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণরাই পোয়ান। বুদ্ধও মেনে নেন। কিন্তু ঐ সিঁড়ি কটা
উঠে পান্নার বুদ্ধের গায়ে হাত—সে ঐ চক্রী বংশধরের কেউ ছাড়া হবে না
বুদ্ধ পূর্ণিমা আসবে। বসন্ত উৎসব আসবে। কপিলাবস্তুর আম বাগানের
সেই চন্দ্র জ্যোৎস্নায় ধোয়া রাত্রির স্মরণে সুদূর এই শ্যাম দেশে উৎসব আরম্ভ
হবে! রাজা আসবেন। বুদ্ধের গায়ের বহুমূল্য অলঙ্করণ ঝেড়ে মুছে নতুন
বসন ভূষণে সাজাবেন,—কাকে? যিনি সব বসন ভূষণের মায়া ত্যাগ করে
যতি-শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন, যাঁর যতি-ধর্ম থেকেই পৃথিবীব্যাপী যতি-ধর্মের মহিমা
হোলো প্রচারিত। আমাদের শঙ্করাচার্য, দশনামী সন্ন্যাসীরা গেরুয়া ধরলেন
কার আদর্শে? ঐ যতিরাজ সম্মা সম্বুদ্ধ!

* *

তখনও দিন একটু বাকী। গেলাম এক অদ্ভুত পশুশালায়। এখানে

াঘ কুমীর থেকে বাঁদর কাঠবিড়ালী সবই মোটামুটি শুধু ছাড়াই নয়, তাদের দখ-ভাল্ করনেওলাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছে। হাতির সদ্য প্রসূত াচ্চা থেকে নিয়ে বুড়ো বুড়ীও এখানে, কুমীরের ডিম থেকে নিয়ে একেবারে াারো-চোদ্দ ফুটের নাদা পেট রাক্ষুসে কুমীর দলকে দল বেঁধে আছে। হাজার হাজার। অতি রঞ্জিত নয়। এক দম সত্য। সুন্দরী থাই ললনা সর্বাঙ্গে অজগর ল্যেপটে ঘোরা ফেরা করছেন যেন লেটেষ্ট ফ্যাশনের সেব্ল, মিঙ্ক, চিলচিলা কী এরমিন চড়িয়েছেন। সাইক্লে চেপে শিম্পাঞ্জী চলেছে নষ্টামি করতে ; শুঁড় তুলে হাতির বাচ্চা মেরেছে তাকে এক 'চাঁটি'। সে বেচারী চিৎ-পাৎ। উঠে সে কষে চপেটাঘাত করেছে হাতির গালে। এবার সে শুঁড় উঁচিয়ে হেসে অস্থির। সাইকেলে চেপে শিম্পাঞ্জী চলে যাচ্ছে রাগ দেখিয়ে তীব্র বেগে। হাতি শুঁড় দিয়ে সাইকেলটি টিপে ধরলো। শিম্পাঞ্জী এবং তার রাগ ধপাস্। মেজাজটি ফেটে চৌচীর। শিম্পাঞ্জী ডিগবাজী খেতে লাগলো। বোধকরি সৃষ্টি সংসারকে ডিগবাজী খাওয়াতে না পেরে। তখন বেচারী হাতিই বন্ধুকে আদর কোরে ঘাড়ে চাপিয়ে মেজাজ শান্ত করে। কুমীরের পিঠে চেপে বসে আছে বাপ, লেজ ধরে আছে কিশোর ছেলেটা। কুমীরের হাঁ-এর ভেতরে বসে আছে তারই বালক ভাই। মুখটি বন্ধ করতে যাবে ; অমনি কী চেঁচিয়ে বললো মানুষটা। কুমীর গড়িয়ে পড়লো এক পাশে ! জলের চৌবাচ্চায় কিলবিল করছে বাণমাছের মত কি সব ? কিছু নয় সদ্য ডিম ফাটা কুমীর। ঐ অবস্থা থেকে ওরা কালক্রমে বুড়িয়ে মরে যায় ! সভ্যতাকে জুগিয়ে যায় বহুমূল্য চামড়া। সেই চামড়ার ব্যাগ, বাক্স, বেল্ট, জুতো বিক্রী হচ্চে। ব্যাঙ্ককে কুমীরের চামড়া জগন্নাথ প্রসাদ কেনার মতো কর্তব্য। বাঘের খেলা অনেক দেখেছো ; কিন্তু বাঘে কুমীরে বাঘে বাঁদরে খেলা করছে এটা সহজে দেখা যায় না। বনের জন্তুকে পোষ মানাতে এরা ওস্তাদ। আমেরিকান সৈনিকদেরও পোষ মানিয়ে ফেলে বলেই এ দেশে মার্কিন 'ডেজার্টার'-এর সংখ্যা এমন ভীষণ। শ্যামের মেয়েদের ঝেঁটিয়ে ওয়াশিংটনে নিতে যেতে পারলেই কেনেডী-নিক্সনের বিশ্ব-উদ্ধার করার 'পুলিসি' ব্রত উদ্যাপিত হতে পারতো। স্ট্রাটেজীটা ভুল করেছিলো "বিশ্ব মণিটার-সঙ্ঘ"। য়ু-এন্-ও !

ঐ কথা হচ্ছিলো জিম থম্সনের সঙ্গে। জিম্ একজন যাদুকর। ভোজবাজীর উইজার্ড। তবু জিম সাধারণ এক আমেরিকানই। তার বেশী নয়। বছর কুড়ি আগে এই তল্লাটে এমনিই এসেছিলো। টুকিটাকি সিল্ক কনতো, বেচতো। ধীরে ধীরে ওর চারধারে 'ডেজার্টার' জড়ো হয়। তারা এ দেশের মেয়ে বিয়ে করে চলে যায় উত্তরে জঙ্গলে, পূবে কাম্বোডিয়ায়

দক্ষিণে মালয়ায়। জিম্ তাদের ছত্রধর। প্রত্যেককে দিয়ে দেয় ভাঁওতা নাম ; ভাঁওতা সাজসজ্জা ; ভাঁওতা বিয়ে, সংসার, ছা-পোনা। এবং ঐ ভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে লাগিয়ে দেয় কাজে। ধীরে ধীরে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে জিমের লোক সিল্কের সন্ধানে লেগে গেলো। সিল্ক ব্যবসাকে সে কেন্দ্রস্থ করে ফেললো। "থাই সিল্ক কোম্পানী" এখন এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ককে জিমের বাড়িটাই একটা দেখবার জায়গা, টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। বাড়িটি আগা গোড়াই থাইল্যান্ডের কাঠের। কিন্তু কোনো অংশই জিমের আমলের তৈরী নয়। সারা দেশ খুঁজে খুঁজে ও প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়ির অংশ কেনে ; সেই অংশ জুড়ে জুড়ে ও একখানা বাড়ি গড়েছে। সে বাড়িতে থাই দারুশিল্পের চরম ও প্রাচীন নিদর্শন প্রতি ঘরে, জানলায়, দেয়ালে, দরজায়, রেলিংয়ে। তার ভিতরে কতোরকম কাঠের মূর্তি, সবই পুরোনো, এবং অবিকৃত ভাবে পুরোনো বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা কেনা। এখন লোকে দেখতে যায়। জিম এখন অর্বুদ-পতি। কিন্তু মানুষটাকে দেখে তা বোধহয় না। যখন জিগ্যেস করলাম, তুমি এতো অনামেরিকান্ কেন? জবাব দিলো, থাই বোলে।

—এতো টাকা নিয়ে করো কী?

—নিজের হাম্বড়াই পুষি।

হেসে বলি, পুষতে পারো ভালো। ওটা পুষতে পারলে তবেই শান্তি আসে। কিন্তু হাম্বড়াই-কে পোষ মানানো বাঘ-কুমীরকে পোষ মানানোর মতো অতো সহজ নয়।

কণিকা বলে, ওঃ! কী কথাই বলতে পারো!

হঠাৎ মনে হোলো এবার পেটে কিছু পড়া দরকার। ভিক্টর হোটেলে যাওয়া দরকার। কিন্তু কণিকার তা মত নয়। কণিকা তখন ঐ সর্ব-বহির সঙ্গে যাবে।

বলি, সে কী? কোথায়? এই বিদেশ বিভুঁয়ে? বলেই মনে মনে হাসি। কণিকা আমার কে? ও তো স্বাধীন।

ভাববেন না দাদা!

আরও কী বলতে যাচ্ছিলো। দিলাম ধমকে। বয়ে গেছে ভাবতে। তবে কোথায় যাচ্ছো কী করছো তার চেয়েও বড়ো কথা সীটটি বুক করতে হবে এবং আমি তোমার অপেক্ষা করবো না। কাল সকালে আমি গ্রামের দিকে যাবো। এবং আজ আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো। হুড়ো মেয়ে করোগে হুড়োহুড়ি।

আমি সন্ধ্যায় তখন একা। ধীরে ধীরে রাজপথ ধরে এগুচ্ছি। সোজা

পথ। দু ধারে ঝকঝকে পণ্যের সমুজ্জ্বল দীপ্তি। বেশির ভাগ দোকানেই বিদেশীর মনোহরনিয়া দেশী শিল্প সামগ্রী! মণি, মণিহার, কুমীরেরও গোসাপের চামড়া, পুতুল, সিল্ক, রুপো-পিতল-ব্রোঞ্জের মূর্তি, বাটীক, ছাপা-সিল্ক,— জিনিস আর জিনিস। চলেছি। দেখছি। একটু আধটু আলাপ পরিচয়ও হচ্চে দোকানীদের সঙ্গে।

হঠাৎ ডানধারে ঝলমলে পথ। লাল আলোর নিওনের চমক। পর পর কেবল দোর বন্ধ ক্লাব, দোর বন্ধ খানাঘর, 'মাসাজ্' এবং 'বাথ্'। তাদের নামগুলোয় রোম্যান্স, যেমন দাল হ্রদের শিকারার নামে রোম্যান্স। 'আফ্রোদিতে', 'লিলি অব দি ভ্যালী", "ল্যাঙ্গুইশ্", "কল গার্ল", "লেসবস্"; "সুদাস"; "ওভিড", "এরস্"—কিন্তু আশ্চর্য লাগে সবই ইংরেজী নাম! কেন? থাঈ ভাষার এতো ধমকানো শাসানো প্রকটতা এখানে এসে এ্যাংলো-স্যাক্সন্ হয়ে গেলো কেন? কারণ স্পষ্ট। খাঁচায় ওরা যে পাখি পুরতে চায় তাদের ভাষা ইংরেজী। এ পাড়া জমিয়ে রেখেছে আমেরিকান। লড়াকু আমেরিকা বিশ্বের শান্তির ঠেকাদারী নিয়েছে। দোর গোড়ায় বুলডগ যা করে।

হঠাৎ এই পথে ডাঃ খান্না ও সান্যালের সঙ্গে দেখা। খান্না আমায় বল্লেন,—'দেশে এ পাড়ার এতো খোলতাই এতো স্পষ্টতা নেই। যখন নেই তখন দেখেই যাবো।'

আমরা চোখ বুজেই ভালো দেখতে পাই। এদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হয়। গলায় আঙ্গুল দিয়ে গেলাতে হয়।

আমি না বলে পারলাম না তাজমুলের কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম,—মেয়েটিকে ভোর বেলায় হোটেল থেকে আমি বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

ডঃ সান্যাল বললেন, আমি তো মশায় যাবো। এ সুযোগ ছাড়বো না। আমি ইকনমিস্ট। সোশ্যাল স্টাডি করার ফীল্ড। এবং এখানকার এ ফীল্ড্ মানে সাউথ ঈস্ট এশিয়ায় আমেরিকান অর্গানাইজ্ড্ স্কিল কেমন করে মেয়ে বাজারকে সিসটেমেটাইজ্ড্ করেছে এটা দেখা যাবে। এটা বাজার; এবং এরা সদাগরের মাল। ঝকমক যা দেখছি সবই বিজ্ঞাপন। কম্পিটিটিভ্ বাজারে কম্পিটিটিভ দামও আছে।

আমি বললাম, চলুন। বিজ্ঞাপনের ব-দৌলত কিঞ্চিত জ্ঞান হোক।

পদ্ম এই আমার চক্রব্যূহে প্রবেশ।—

* * *

একটা ট্যাক্সীওলাকে ওরা কী বললো আমি জানি না। ট্যাকসিওলা আমাদের একটা গলি দিয়ে যেখানে আনলো, সে জায়গাটা লম্বা একটা সেনা-নিবাসের মতো ক্যান্টনমেন্ট ধাঁচের হল। সেখানে খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং স্টেজ-

শো চলছে। যারা শো দেখাচ্ছে এবং যা শো দেখাচ্ছে তাতে দেখবার কিছু নেই। বা এ-ও বলতে পারো যে যা আছে তা কেবল দেখবারই। ওরা কেবল দেখাচ্ছে আর দেখাচ্ছে। নির্লজ্জ আধা-বয়সী হোঁৎকাগুলো কোলের কাছেই মেয়ে নিয়েও দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলো। কিন্তু দূরবীন না লাগিয়েও যাতে দেখার কোনো অসুবিধা না হয় এই চেষ্টাতে শিল্পিনীদেরও ত্রুটি ছিলো না।—

আমি চট্ করে বাইরে আসতেই ডঃ খান্নাও বেরুলেন! বল্লেন, বেরিয়ে এলেন যে!

এই মাত্র তো ডিনার খেয়ে এলাম। খেতে যখন পারবো না তখন বসে লাভ? শো? আমি পারী-ই-তে ফলি-বার্জার, মল্যাঁ রুজ্-এ শো দেখেছি। রোমের অপেরা দেখেছি। এ আর কী দেখবো?

দেখলাম ডঃ সান্যালও তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বললেন, না, এ দেখতে আসি নি। শো-কেস্ দেখতে এসেছি।

মনে পড়ে গেলো তাজমুল বলেছিলো,—ছো-কেছ দেইখ্যা বিবি আনুম্।

পাশেই অন্য ঘর। আগাগোড়া পর্দা দিয়ে ঢাকা।

দুটো কাঠের বাড়ির মাঝে অনেকটা জমি। লাল আলোয় আধোছায়া অন্ধকার। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে তাগড়া তাগড়া গুণ্ডা চেহারার খবরদারী দৃষ্টি নিয়ে মানুষ। তারা দেখে নিচ্ছে গাড়ির মালকে নয়, গাড়ির মালিক-কে। চেনা ট্যাক্সিওলা মানে—নিশ্চিন্ত; তবে দালালী দিতে হবে।

ব্যাঙ্ককে সব চলে ও চলছে। কিন্তু আইনগতভাবে উলঙ্গতাকে মানা যায় না। সেটা বন্ধ ঘর নৈলে চলবে না।

তা ঘর বন্ধই। বন্ধ ঘরের ডেফিনিশনে অন্ধকার নেই।

কাজেই দরজা দিয়ে ঢুকে যে হলটায় এলাম, সুমুখেই ঘুপ্‌চী কাউণ্টার। কাউণ্টারে সুসজ্জিতা রূপসী ক্যাশ বাক্সের তীরে বসে আছে।

একপাশে চেয়ারে আধাবয়সী ছিমছাম একটি মহিলা মিশমিশে কালো সার্টিনের টাইট গাউনের ওপর মোতির তিনফেরী লম্বা হার আর হীরের ব্রূচ্ পরে আছেন। অবশ্যই নকল হীরে, নকল মোতি। মেয়েটিও যে নকল। মাদাম্,—অর্থাৎ গিন্নী শকুন।

উনি উঠে আমাদের নিয়ে ভেতরের দরজা পেরুতেই, উঃ কী জোরালো আলো! প্রায় বিশ ফুট লম্বা বারান্দায় আট ফুট উঁচু কাচের দেয়াল। তিনধারে কাচ। একধারে তিন থাক চওড়া সিঁড়ির পারে সাদা ধবধবে ঢেউ-তোলা দামী পুরু ভেলভেটের পর্দায় সোনালী পাড়ের কাজ। সিঁড়ি এবং

মেঝে লাল কার্পেট মোড়া। সেই সিঁড়িতে ধাপে ধাপে নানা ভাবে ভঙ্গীতে রূপসীরা বসে। টি-ভি চলছে কাচের ঘরের ভিতরে। ও'রা পরস্পর দেখতাই আড্ডায় মশ্‌গুল। চুল ব্রাশ করে দিচ্ছে এ ওর, নখ নিয়ে খেলা করছে; ভূষণের মধ্যে হার আর কাঁকন এক হাতে। আর বসন মানে যা, তা আমায় জিগ্যেস কোরো না পদ্ম। আমি বলতে পারবো না। তবে তাদের উলঙ্গ আমি বা আইন কেউই বলতে পারবে না। কালো সিল্কের ফিতেয় প্রত্যেকের নম্বর ঝোলানো। এরা এখানে রম্ভা, তিষ্যা, বিনোদিনী, সাবিত্রী নয়। এদের নাম বারো নং, বাইশ নং, বত্রিশ নং! ভিতরের কোনো শব্দ বাইরে আসছে না। সব দো-হারা পুরু কাঁচে ঢাকা; সব মেঝেই পুরু কার্পেটে মোড়া। অত শত 'নেতি'র বেড়া থাকলে কী হয়; বিধাতার দেওয়া এক এক জোড়া চোখ যেন এক একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। তত্ত্বে, সংবাদে, চিত্রে ভরা।

আমরা চারজন এক সঙ্গে ঢুকেছি! মধুচক্রলোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল—পতঙ্গই বটে, প্রজাপতি,—সৌখীন, বিলাসী, নয়নাভিরামা প্রজাপতির গুচ্ছ।—

ওরা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী, নানা ধরনের হাসি, আরও নানা আকৃতির চাহনির মাধ্যমে কিলবিল করে উঠলো, সকালে কুমীরের সদ্যফাটা বাচ্চাগুলো কাদাজলে যেমন কিলবিল করছিলো। কিন্তু অন্ধকারের বুক বেয়ে আসছে ধূপের গন্ধ এবং নরম সুরের একটি ছড়ি-চালানো যন্ত্রের সংবেদন।

একটি বছর বিশ বাইশের সাদা ছেলে। সঙ্গে এক নিগ্রো, বছর ত্রিশ হবে। চটপট এলো; চটপট দেখলো ঘুরে ঘুরে। নম্বর বলে দিলো। মাদাম স্পীকার তুলে হাঁকলেন আঠাশ, বত্রিশ। মেয়ে দুটির দিকে অন্য মেয়েরা চোখ মটকে জানালো, কনগ্রাট্‌স্‌! বাজী মার দিয়া। ওরা বাইরে এলো। রসিদ নিয়ে টাকা জমা হোলো। দু জনেই দূরের গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লো। সেখানে কিছু দেখা যায় না।

মাদাম বলছে,—ইচ্ছে হলে হোটেলে নিয়ে যেতে পারেন।

দেখলাম দর কষাকষি আছে। কারণ খান্নাকে বলছেন,—কতো দিতে পারেন।

আমি বাইরে চলে এসেছি। সহ্য হচ্ছিলো না।

কেন আমি মানুষকে স্রষ্টার এতো বড়ো একটা সৃষ্টি বলে মূল্য দিই! কেন সম্মান করি এই চেহারার পশুগুলোকেই বিশেষ করে? মানুষ! মানুষ!!

আকাশ ভর্তি তারা। চাঁদ আজও উঠেছে। বাইরের আকাশে যেন পূর্ণতা নেই। কোনো একটা জানলা দিয়ে হাসির রোল ঝাঁপিয়ে পড়লো

নীচে। একটা পানশালায় ভেঙে যাচ্ছে গেলাস প্লেট, চেয়ার। পুলিসের বাঁশী ফুঁড়ে দিচ্ছে রজনীর বুক।

ওরাও বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ঢুকলো। সবাই নীরব। বুঝছি ওরা আরও পাড়ি দেবে। কিন্তু ওদের মনের কিনারে পাড় ভাঙছে।

ট্যাক্সি অন্য একটা বাজারে অন্য শো-কেসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। যেন ধনীগৃহের বৈঠকে আলোকিত জলে রঙিন মাছের খেলা দেখছি।

এখানে ম্যাদামকে বাদ দিয়ে আমি কথা বলি কাউণ্টারের মেয়েটির সঙ্গে। লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম 'দোকানে'—এবং এবার এ 'দোকানে'-ও যে কাউণ্টারের দেয়ালে ছোটো আলমারী ভর্তি নানা ঠাকুর দেবতা, আলো মালা ; ধূপ জ্বলছে। আমরা ব্যাঙ্ককের 'প্রেত-সিংহাসনের' সঙ্গে পরিচিত এও সেই ধরণ। জিজ্ঞাসা করলাম—ও সব কী?

অবাক হয়ে মেয়েটি বললো, তুমি ভারতীয়। ও কী জানো না? বুদ্ধের মূর্তি। বোধিসত্ত্বের মূর্তি।

এখানে কেন?

হোঁৎকা লোকটা বললো, টয়লেট পেপার তো পায়খানায়ই থাকে ; সাবান তো গোশলখানাতেই থাকে। বুদ্ধ কী আর স্বর্গে থাকবেন? থেকে করবেন-টা কী? নরকেই তো ওঁর আসল কাজ। তাই আমরা বুদ্ধ মানি। স্বর্গের শিব বা বিষ্ণু নয়।

আমি অনেক কিছু শিখলাম।

কিন্তু ওরা চললো তৃতীয় বাজারে।

আমি এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছি। আমার সেই প্রথম ধাক্কা আমি সামলেছি। আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি একটি মেয়ে ভাড়া নেবো। এখন কথা হোলো বাছার। কী বাছি ; কাকে বাছি ; কেন বাছবো?

এটা অনেক বড়ো দোকান। শো কেসও দুটো। মাছগুলোও বেশ রঙিন্, চটপটে এবং নানা জলের। চীনা দেখলাম, বার্মিজ দেখলাম, দেখলাম ইন্দোনেশিয়ান। এদের চিনতে কষ্ট হচ্ছিলো। খান্নাকে বোঝাচ্ছিলো কেউ। মনে হচ্ছিলো খান্নার পরম ইচ্ছা ছিলো একটু ফষ্টি-নষ্টি করে। আমি শুনছিলাম। যৌবন তো! অল্প জলে মাছ নড়ে বেশী।

মেয়েরা নানা দেহভঙ্গী করলেও অশালীনতা করছিলো না।—বরং তারা যে রূপবিলাসিনীই শুধু নয়, তারা যে রঙ্গবিলাসিনীও সেটাই প্রমাণ করছিলো।

দেখছি, আর এক পা দু পা করে পিছিয়ে পিছিয়ে একটা ঢাউস ক্যাকটাসের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি। ও ধারে অন্ধকার হল। দুটো একটা লাল আলো টবে রাখা ঝাড়ের মধ্য থেকে দানোর মত চেয়ে আছে।—মাঝে

একসারি কাঠের থাম। থামের ওধারে আরও অন্ধকারে একটা দীভানে আধশোয়া পা ছড়ানো এক দীর্ঘ নারী মূর্তি। গাঢ় সবুজ বা কালো বা নীল,—এক বঙ্গা শীথ গাউনটার দুটো পাশই কাটা; একটা পাশ প্রায় কুঁচকী অবধি কাটা। ফরমোসা, জাপান, হাইনানে এ পোষাকটার কদর ওপর মহলে বেড়েছে। তবে বলবার সময়ে বলে চীন-ফ্যাশন। বাজে বলে। চীনের পোষাকে বেলেল্লাপনা নেই।—ওরা কামিজ আর পাজামা পরে। কামিজের গলায় উঁচু কাঁণিশ। হাতাটা কনুই-কব্জীর মাঝামাঝি কাটা। পাজামাও গোড়ালীর ছ' ইঞ্চি ওপরে কাটা। কাঠের চটী, বা সিনথেটিক চামড়ার স্যাণ্ড্যাল। কালো পোষাকের ওপর সাদা জড়োয়ার কী ছিলো জানি না অন্ধকারে খুব চকচক করছিলো।

আর চকচক করছিলো দুটি চোখ।—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, আমার সামনে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচু মস্ত পিতলের ভাস্। তার ওপর আনারসের পাতার কাটে ঢাউস্ ঢাউস্ পাতার ক্যাকটাসের ঝাড়। তার মধ্য থেকে আমি চেয়ে দেখছি একটা থাম ধরে। ক্যারাবিয়ানের দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে মার্তিনীকে আমি এক মলি-কে পেয়েছিলাম। ভাবলাম যদিও মলির চেয়ে বয়সে বড়ো এ জন, কিন্তু মহিলাটির মন আছে। আমার যা নেবার আমি পাবো। ওর কাছে তা আছে। সব মেয়ের থাকে না। এ দেশে আমি বলি,—All women are females; but all females are not women.

আমাকেও সে নিরীক্ষণ করে দেখছিলো। চোখে চোখ রেখেই দেখছিলো। একটু পরে ধীরে ধীরে উঠে এলো। এবং সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো একটা ড্রিঙ্ক কিনে দাও।

বলেই হাতখানা আমার কনুয়ের নীচে রাখতেই আমি হাতের ওপর হাত রাখতে দিয়ে বললাম, এখানে তো বার দেখছি না। কোথায় যাবে চলো।—তুমি খাও আমি খুশী হবো। আমায় খেতে বোলো না।

বললো না কিছু। শুধু আমায় বাইরে নিয়ে গেলো।

লক্ষ্য করলাম টাকা কড়ির কথা না বললো সেই মাদাম, না কেশিয়ার। না কোনো হোৎকা-মার্কা ষণ্ড বা অমর্ক।—

পাশেই ফৈলাও নাইট ক্লাবে দারুণ মুষ্টিযুদ্ধ চলছে। থাই মুষ্টিযুদ্ধ। কেবল মুঠো নয়। কনুই, হাঁটু, সোজা লাথিও,—যা খুশী, যেমন খুশী। একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করা।—স্তব্ধ হয়ে দেখছে দর্শক মণ্ডলী।—

বারে গিয়ে বসলেন সেই আশ্চর্য 'প্রাপ্তি'। নাম বললো,—মোণিসেরি।

আমি জিগ্যেস করি আচ্ছা মানে কী তোমার নামের? নামটি মিষ্টি। মোণিসেরি।

অবাক যেন! বললে, আমার বাবা চাম্। স্রেফ সংস্কৃত নাম রেখেছেন। তুমি তো ভারতের। মানে জানো না, মোণি সেরি?

হাসি। মণি-শ্রী! মানে সুন্দর যেন মণি, প্রীটি এ্যজ্ এ ওয়েল কাট্ ডায়মণ্ড।

তোমার নাম কী?

লীলাময়।

মানে কী?

খেলা নিয়েই থাকি; খেলুড়ে।

তুমি যোগী?

একদম না; ভোগী।

কেন? না কেন? যোগী কি ভোগী হয় না? তিব্বতের সবচেয়ে যোগী লামা ছিলেন পরম ভোগী। সব ঠাকুরই পরম ভোগী। তাঁর ভোগ জোগানোই আমাদের পুজো। তুমি যোগী। আমি জানি।

তাই নাকি? জানলে কী করে?

আমি চাম্। চাম্-এর মেয়ে। আমার বাড়ি আসলে কাম্বোডিয়ায়। আঙ্কোর-বাৎ জানো? তার উত্তরে। সেখানে চাম্-মায়ীর মন্দির আছে। মোষ বলি হয়; মানুষও। আমায় এখানে অনেকে জানে আমি সিদ্ধাই জানি আমি যে-পুরুষকে চাই নিজে ডেকে আনি। যেমন তোমায় এনেছি।

বার-রক্ষক এসে দাঁড়ালো।

আমি বললাম,—কী খাবে? মার্টিনী না গরম ওয়াইন্।

তুমি?

আমি বার-রক্ষককে বললাম, মার্টিনী দিও একটা, আর আমায় বিটার লেমন্‌স্ একটা।

জানতাম। তোমার চোখে তাই চাউনীতে ভাষা আছে। তোমার চোখের কৌতুকও জ্বলে। আমার দিকে চাইছিলে,—আমি জ্বলছিলাম। অ্যালকোহলের জ্বলা কেমন জানো? যক্ষ্মা রোগীর গাল ঠোঁট যেমন লাল; যেমন তার চোখ করে চকচক্। ওটা মরণের চমক।

এখানে তুমি কেন?

ওমা, তা জানো না? এখানেরই তো আমি। দেশে অবশ্য আমি সতী সীমন্তিনী, মন্দিরের সেবিকা। সেখানে আমায় লোকে দেখে তুমি যেমন পান্নার বুদ্ধ দেখে এলে।

হঠাৎ একটা চিৎকার।

একজন যোদ্ধা পড়ে গেছে। অন্যজন তার ওপরে চড়ে দারুণভাবে

—সুবর্ণ মন্দির—
সুখো থাই

ব্যাঙ্ককে সুবর্ণ বুদ্ধ
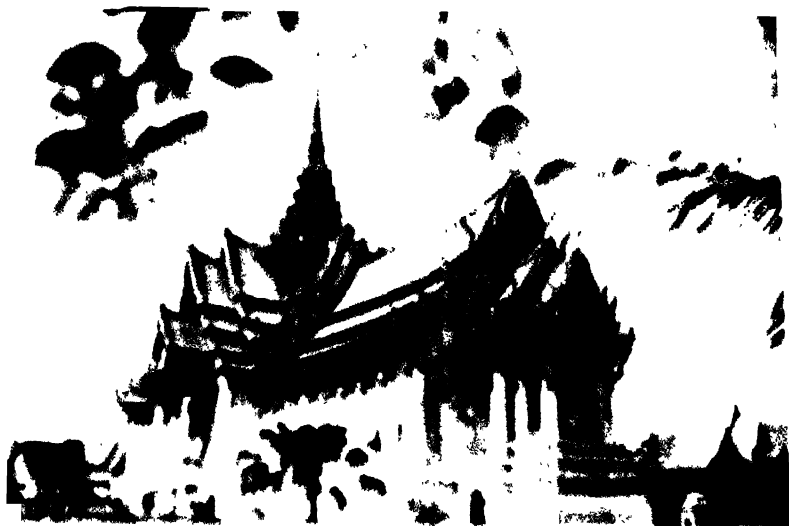
হংকং-এর একটি রাস্তা।

লাফাচ্ছে। পেটের ওপর, বুকের ওপর শূন্য থেকে পা তুলে সজোরে পা নামিয়ে আনছে, আর মানুষটা কোঁক্ কোঁক্ করে শব্দ করে উঠছে। থামিয়ে দেবার কথা যাদের তারা চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না।

আলো নিভে গেলো। আবার জ্বলে উঠলো। সুসজ্জিতা থাই কন্যা নাচতে এলো। মাথায় মুকুট। সারা অঙ্গে নানা আভরণ। কিন্তু আবরণ সামান্য। ক্যাবারে নাচের সঙ্গে থাই নাচ মিলিয়ে মেয়েটি নাচতে আরম্ভ করতেই 'মণিশ্রী'—তার গেলাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বুঝলাম খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মণিশ্রী একটু দূরে যেতেই আমাকে বারম্যান বললো—মাঈ-লাং নাচছে আজ। দেখবেন নাচ কাকে বলে। ··ওর নাচ হলেই মোণিসেরি আগুন হয়ে যায়।

তার মানে কী?

কী জানি! মোণি-সেরি যা তা মেয়ে নয়। শো-কেসের মেয়ে নয়। এখানে মোণি-সেরিকে সকলে চামু--মন্দিরের দেবীর মতো মানে। তাইতো মোণি সেরি মাঈ লাং-য়ের নাচ দেখলে ক্ষেপে যায়।

ওকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া যায়না বুঝি?—সাহস করে জিগ্যেস করি।

তা যাবে না কেন? ওর ইচ্ছে হলেই যায়।···তারপরেই একটু হেসে বলে,—গিয়েই বা কী? মানুষ হোটেলে নিয়ে যায় একটা মেয়ে। আগুনের মালসা আর-কে···

সরে পড়লো বার-ম্যান।

মণি-শ্রী ফিরে এসে গ্লাস্‌টা আবার ভরে নিলো। একটু একটু সিপ করছে আর নাচ দেখছে।

বাজনা আরম্ভ হয়েছিলো স্তিমিত তালে। ছিলো বাঁশী এবং মন্দিরা প্রধান। এখন ক্রমে ক্রমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। হয়ে পড়ছে মাদল প্রধান।—চামড়ার ওপর হাতের তাল নানা ভঙ্গীতে নানা ছন্দে লয় বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে।

দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠছে। নর্তকী যেন সেটা বুঝতে পেরে আরও উত্তেজিত; আরও তৎপর; আরও বিকশিত, হিন্দোলিত, উচ্ছল।—মালায়, কঙ্কণে, বাজুবন্দে, মেখলায়, নূপুরে, মুকুটে শত-সহস্র স্ফুলিঙ্গে আলো পড়ছে, ফুটছে, ঝরছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র দেহের পেশীগুলো বন-ময়ালের বিসর্পিত গায়ের পিচ্ছিল চিক্কণ ভরাট ছন্দে পাক খাচ্ছে। মন চলে যাচ্ছে বার বার দেহের গভীরে। মন চাইছে ওই শত-নয়নিত, সহস্র শিখায় উদ্দীপ্ত লেলিহা-কে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জাপটে ধরে, গ্রাস করে, মুছে ফেলে। যে মহা মূল্যবানকে দেখে লোকোত্তর চমৎকারের আস্বাদ অনুভূতির কোষে কোষে

চারিয়ে যায়, সেই মূল্যবান চরমের বোধকে সঙ্গে সঙ্গে তচনচ করে ফেলার একটা রাক্ষসী প্রচণ্ডতা সংযমকে ক্ষুধাতুর করে তোলে। মনে হয় চুর চুর করে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিই এই উত্তেজনা।

হঠাৎ দেখি বিটার লেমন্‌সের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে মণি-শ্রী বললো,—অমন করে দেখোনা। ও মাকড়সা, তুমি মাছি, ঐ নাচই ওর জাত এ নাচ ওর নয় এ নাচ আমার। চাম-মন্দিরের নাগ কন্যার নাচ। কি করে যে ভুলিয়ে দিই ওকে এ নাচ। যদি জানতাম; যদি জানতাম। চলো, চলো;— ও থামার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করবো, সীন করবো। দেখছো না, বুড়ো ম্যানেজার চাং-থোম্‌ কাতর নয়নে আমায় গিলতে চাইছে। অনুরোধ করছে, মরো মরো। চলো চলি! মরতে যে আমি পারি না! চাই না। জানো বাঁচার বড় সাধ আমার; বাঁচতে চাই। চলো কোথায় যাবে বলো।

কেন? হোটেলে? দেখলে তো এখানে তোমার কোনো পয়সা লাগলোনা। মাদামও রসিদ দিলোনা, নাচ ঘরেও টিকিট চাইলো না! আমার আসা যাওয়া আমার খুশী। আমার নাগর বাছাও আমার খুশী। আমায় কোন নাগর বাছে না। সে আমি চাইও না। আমার জাত আছে! আমি কী ওই ওরা নাকি? পয়সা নেবো না। শুধু একটু বাঁচতে দিয়ো। চলো চলো। আমি তোমায় যা আনন্দ দেবো তাতে অ্যালকোহল থাকবেনা-গো! শুধু বিটার লেমন্‌স্‌।— হোটেলে ভেগে চলো।

কিন্তু আমি হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য কারুর খোঁজে এখানে আসিনি; হোটেলে আমি কারুকে নিয়ে যাবো না।

বেশ তো, নিয়ে আমিই যাবো। চলো চলো।—আমি এখুনি পাগলের মতো চিৎকার করবো। আমার বুক ফেটে যাবে। তা দেখতে পারবে?

আমায় খপ্‌ কোরে ধরে মণিশ্রী প্রায় টেনে নিয়ে বাইরে এসেই নীল এক-খানা টয়োটায় বসে পড়লো। চেয়ে দেখলাম ডাঃ খান্নাদের গাড়িখানা নেই। আমি সোফারকে বলে দিলাম, ভিক্‌টর।

ভিক্‌টরে আমার ঘরে ফোন তুলে মণিশ্রী বারে অর্ডার দিলো মার্টিনী আর কিছু ব্ল্যাক পুডিং।—এবং ধীরে ধীরে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। পা থেকে জুতো খুলে ফেললো ছুঁড়ে। বোতাম খুলে পোষাক ঢিলে করে নিলো।

একটু হেসে বললো,—ভয় পেও না। এর পরের পাতাগুলো স্টেপ্‌ল্ করা। না কিনলে খুলবে না।

* * *

আমি সে রাতে একটা সজল কাহিনী শুনেছিলাম। গভীর উত্তরের বনের

ধ্য এক মন্দিরের গল্প, যে মন্দিরে উৎসর্গীকৃতা প্রকৃতির পক্ষে মিথুনতা নিষিদ্ধ
া। কারণ লয়-কর্মে সবই নাকি একে একে লয় করে দিতে হয়। কিন্তু
জ-সংক্রমণ, গর্ভাধান, প্রসব একেবারেই নিষিদ্ধ। এ মণিশ্রী সেই সাধনায়
ষ্টতন্ত্রা। অভিচারে সে ব্যভিচার এনেছে। এ মণিশ্রীকে তার পালক পিতা,
ান্ত্রিক পিতা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেছিলো কারণ ব্যভিচারিণী মণিশ্রী
ক ঘোর তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর লয় কর্মে বিঘ্ন এনেছিলো। প্রাণের ভয়ে যুবতী
ণিশ্রী দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলো। কিন্তু ফিরে আর সে আসতে
ারেনি অরণ্যের সেই মন্দিরে। অবশেষে যেখানে এসে থামতে পারলো
ণিশ্রী সেখানে অনেক পুরুষ, অনেক উৎসব, অনেক ঐশ্বর্য। সেই স্রোতে
ভেসে, ঢেউয়ের পরে ঢেউ পার করে অবশেষে সে ঠাঁই পেলো এক
ামেরিকান সেনানীর খাস কামরার পাটেশ্বরী হয়ে। এবং সেখানেই জন্ম নিলো
ই মেয়ে।

মা হয়েছে এখন মোণি-সেরি। সংসারের ঘাটে কলসী ভরেছে, ডুবেছে,
ভেসেছে, খালি হয়েছে। কিন্তু এ ঘাটের পৈঠায় হঠাৎ তার শিকড় গেছে জমে!
ার রতি পেয়েছে বিরতি; তার পুষ্প-সমাগম হয়েছে ফলবান।

কিন্তু মণি-সেরি জানে যে-প্রেম বাজার দরে দাম ধরে নেয় সে-প্রেম চায় না
শকড়ের বন্ধন, ফলের সম্পূর্ণতা। আমেরিকান প্রেম মূলহারা ফুল। সেই
র্থ সম্পদের আশায়ই সম্মোহিত মণি-শ্রী একদা আকাশ-কুসুম চয়নে হাত
াড়িয়েছিলো। কিন্তু সেই সেনানীর পরিচয় ছাড়া এ থাই কন্যার আর কীই বা
রিচয় থাকতে পারে? সেই পরিচয়েই এই নীল-নয়না, কৃষ্ণ-চিকুরা বাঁধা পড়লো।
বং ঐ নামের আবডালেই মণি-শ্রী, মা মণি-সেরি, মেয়েকে গান্ধর্বী বিদ্যায় পারদর্শিনী
রে তুলতে চাইলো। কেন হবে না? জাপানে কী গীশা মেয়েদের সম্মানিত
িবাহ হয় না? ক্যাথলিক কনভেণ্টে শিক্ষা, বালে-নাচের তালিম সব যেন তারই
কমেটে। দোমেটে সে নিজের হাতে করেছিলো,—থাই নৃত্য, বালি নৃত্য,
ূপ সজ্জার খুঁটিনাটি এ সব মণিশ্রী শিখিয়ে নিলো মেয়েকে।

তবুও মেয়েকে মণি-শ্রী মায়ের স্নেহবন্ধে বেঁধে রাখতে পারেনি।—সে মেয়ে
িশ্বাসই করতো না সে মায়ের স্নেহ নামক কোনো বন্ধনে বাঁধা।

এর মধ্যে এলো সেই কাম্বোডিয়ান কর্নেল। শীহানুকের স্বপক্ষে থাকার জন্য
ন-নোলের কুত্তারা তাকে খোঁজে। তখন সে গোপনে আশ্রয় পায় মণিশ্রীর কাছে।
বং সেই আশ্রয়ই পরে মণিশ্রীকে প্রথম ও শেষ পুরুষ কামনায় জর্জর করেছিলো।
লোল মণিশ্রীর সেই ব্যভিচার ও অনাচার আমেরিকানের অজ্ঞাত থাকে নি।
কন্তু সে তখন আমেরিকানের প্রতিপক্ষ। দুই কারণে প্রতিপক্ষ। কিশোরী
ন্যাও মণিশ্রীর সেই দু-কুলভাঙা সর্বনাশের সাক্ষী ছিলো। সেই কন্যার কাছে সব

খবর পাবার পর আমেরিকানের পক্ষে সেই কাম্বোডিয়ানকে সরিয়ে ফেলা দুঃ
হোলো না। আর তার দেখা পেলো না মণিশ্রী।

সেই থেকে সম্পর্ক স্তব্ধ। মণি-শ্রী মেয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। মে
বাপের সঙ্গ ছাড়তে সম্পূর্ণ অরাজী। আমেরিকান তক্‌মার বলে মণিশ্রীর মে
মাঈ-লাংকে আমেরিকান অধিকার করতে চাইলো। মণিশ্রী নিরুপায়।

মেয়ে নিয়ে সে চলে গিয়েছিলো সেই গভীর বনের মন্দিরে যেখানে ছিে
তার চাম্‌ পিতা। তিনি তখন এদের রাখতে অরাজী! কিন্তু চাম্‌ ব্রাহ্মণে
মন টললো মাঈ লাং-কে দেখে। মণি-শ্রীর মেয়ে!

এ ঘটনার পরিণতি যে কী হোতো অজানা।

ঘটনা পাক খেয়ে গেলো কাম্বোডিয়ানের অকস্মাৎ আবির্ভাবে।

হঠাৎ কর্নেল উপস্থিত হোলো। মাঈ লাং-ও মনে মনে তেতে উঠলো
কিন্তু কিছু বললো না। কারণ তখনও মাঈ লাং-য়ের কাছে সব স্পষ্ট নয়।—

আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম, আমি ভালোবাসি কর্নেলকে। মার্কিনীটাে
আমি ঘৃণা করি।···মেয়ে আমার জবাব দিলো,—আমি কিন্তু আমার বাবাকে
জানি। আর কেউ আমার কিছু নয়। তোমার ভালোবাসাও আমার কিছু নয়।

ওকে সেই ইয়াঙ্কী কী যে দিয়েছিলো, আমি জানি না। আমার ওপর
সর্বদা চোখ রাখতো। এক সুযোগে ও কর্নেলের রাইফেল দিয়েই কর্নেলে
গুলী করে। তার প্রাণের আর কোনো আশা ছিলো না।

আমারও কোনো আশা রইলো না। আমার বাবাও আমার বিপক্ষ। কোথা
যে মাঈ লাং-কে পাচার করে দিলেন আমি জানি না—কেবল শান্তভাবে বললেন
মন্দিরে যেন কখনও আর আমি না আসি। মন্দির, বাবা,—উত্তরের সেই জঙ্গল
—ঘুচে গেলো।

বাবা আর মন্দির এখনও আমার মনকে ডাকে। আমি এখনও ঐ জঙ্গলের
এখানে আমি প্রবাসী।—একান্ত প্রবাসী। কাম্বোজের বনের নিঃশ্বাস আমি
শহরে তো আমার নির্বাসন।

কিন্তু থাকতে আমায় এখানেই হয়। কারণ মেয়ে এই নাচ মহলের সের
নাচিয়ে। আমি শো কেসের বাইরে পড়ে থেকে তোমার মতো বিটার-লেমন চাখ
নাগর নিয়ে রাত্রি বাস করি। কখনও কখনও যে ভুল করি না তা নয়। এম
জনকেও পাকড়াও করি যে থেমে থাকাই জানে না।···অবশ্য টাকাও দিতে চায়
কিন্তু টাকাই তো আমার অনেক। অভাব তো টাকার নয়। কর্নেলের অনে
কিছু, আর মাঈ লাংয়ের বাবার সব কিছু—সে সব জড়িয়ে অনেক। টাকা আমা
চাই না। চাই—

চেয়েছিলো মেয়েকে, মেয়ের সান্নিধ্যকে।

পায় নি। কাজেই আধা পাগল। সকলের উপহাস।

*　　*　　*

তুমি নিজেই তো এ ধরণের ব্যাপার অনেক জানো ; অনেক দেখেছো।
যে ঘটনা জেনে শুনে তবু মুখ বুঁজে আছো। কতো-তে আবার নিজেও
়য় পড়েছো।···কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন থেকে যায়। মনে হয় সত্যিই কী
সব ধরণের মা যারা, তাদের মধ্যেও মেয়ের, মানে সন্তানের জন্য কি এই
ার আকুতি আপশায় ? এটা কী সত্যিই এক স্বাভাবিক প্রকৃতি, না একে
যেতে পারে বিকৃতির ভদ্র রূপ ? জানি এ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারো
না শরৎবাবু। হক্ কথা এই যে জীবন বিচিত্র। এর স্বাদও বিচিত্র।
সব কিছু ঝুঠ হ্যয় এক পাগল মেহের আলীই বলতে পারে। তুমি আমি
তা পারলাম কৈ ?

পারি না বলেই রাতে ও ঘুমিয়ে পড়লো। আমি এসে লাউঞ্জে বসে রইলুম।
অবশ্য অন্য বিছানাও ছিলো। এখানে সব হোটেলে ডবল বেড। কিন্তু
বিছানায় আমার ঘুম আসতো না, বিশ্রাম তো হোতোই না। পরের দিন
া 'অউধিয়া'—অনেক দূর। ধকল আছে।—লাউঞ্জই ভালো।

রাত প্রায় দুটোর কাছাকাছি খুব খুশীময়ী কণিকা এসে অবাক। দাদাকে
ঞ্জে দেখে সে ভাবলো আমি বুঝি বোনের ফেরার সময় চেয়ে বসে আছি।
সই অস্থির। ওর চোখে ও যে একেবারে সাতঘাটের জল খাওয়া মেয়ে।
লাদেশে ফেনীর সেই অত্যাচারের ঘাট থেকে একটা ডুবন্ত মেয়েকে
ার অন্য ঘাটে তুলে তাজমুলের চাচা পাচার করেছে হংকং-এ ! তার
ত্ব এবং খবরদারীর ভয়ে দাদার ঘুম নেই। কণিকা সত্যিই হাসতে থাকলো।
কনজার্ভেটিভ্-রে বাবা !

কিন্তু সর্বহির মুখ দেখে বুঝছি ওর কাজ হয়েছে। হংকং-এ ওদের
ক-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে।—এ্যমেচার রেডিও সেট্ এর মারফৎ সব
। তেমন হলে কণিকা হংকং থেকে আরও আরও পীতাক্ত অকথনের মধ্যে
য় হারিয়ে যাবে। কণিকা জানে সমাজ জীবনে ফিরে আসা তার পক্ষে আর
জ নয়। তবে,—মনের মধ্যেই মনসিজ ; কখন জন্মান, সে লগ্ন কী তাঁরই
া আছে ?

যখন শুনলো আমার বিপদের কথা তখন ওর আবার এক চোট হাসি।—
জা ঘরে এলাম। তখন তো সেই কামকন্যার নিপাট ঘুমের আসর। বুদ্ধিমতী
ণকা বললো, তুমি যাও ; আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে ; আমিই এখানে
চ্ছি। একটু রোসো ; আমি শুধু এগুলো টপ্ করে বদলে আসি। তুমিও
বেলা বদলে নাও।

যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, বলে গেলাম,—কণিকা উঠে যদি উনি দেখেন

একটা ধ্যেধ্‌ধেড়ে বুড়ো রাতের পরশ পেয়ে কেমন পূর্ণাঙ্গী যুবতী হয়ে উঠে হল্লা না বাধিয়ে দেয়। এ কায়াপলট দণ্ডীপর্বের ঘুড়ীটারও হয় নি।

বলে এলুম, কাল কিন্তু সূর্য উঠবে বেলা ন'টায় কণিকা! ইতি—

তোমার জামাইবাবু

৫

কল্যাণীয়াষু,

ভাই পদ্মদি, মণিশ্রীর কথাটা চেপে গেলেই বোধহয় ভালো করতুম। ম দিয়ে বাকী চিঠিগুলো পড়তে। আবার ভাবছি তুমি তো তুমিই। চাপাচা কী। সব বলবো।

আমি আর সকালে উঠে আমার মণিশ্রীকে পাই নি। পেলাম ধোয়া মো চকচকে কণিকা।—ও আর থাই পোষাক ছাড়ছে না। জমেও গেছে পোষাক ওর তনুশ্রীতে। আমরা অযোধ্যায় যাবার পথে গেলাম সেই বিখ্যাত দাঁড়া বুদ্ধ দেখতে।—

সে যে কতো ফুট উঁচু জানি না। দু ধার দিয়ে সিঁড়ি আছে। মাথা ওপর ছাতা আছে। তবে মৈশুরে হালাবিদ-এর পথে গোমতেশ্বরের জৈ তীর্থঙ্করের নগ্ন মূর্তির চেয়ে অনেক বেশী বড়ো এবং উঁচু।—চারধারে চত্বর চত্বরের পরে বসত বাড়ির সার। ক্যামেরায় পুরো ছবি তোলা যায় না পাশেই যথারীতি সেই মন্দির; মন্দিরে ঐ ধূপদানী, মালা, চামর—ইত্যাদি ভক্তি আসে না, কারণ তার সম্পর্কও নেই। তাবিজ, তন্ত্র, মাদুলী, কবচ পরশমণি, বশীকরণ, অশ্ব-জিতন,—এ সব আছে। পুরোহিতরা বেচেন।

পথে যেতে যেতে ভীড়। সত্যিই ভীড়। ব্যাঙ্কক নদী। মানে আমাদে পূর্ব পরিচিতা 'প্রিয়া' (ফ্রাইয়া) নদী। ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত নদীর বুকে বাজার নদীর বুকে বাজার দাল হ্রদে যা আছে তা সত্যিকার বাজার নয়। দা হ্রদের বাজারের নামে সৌখীন শিকারাগুলো ঘোরে তুলতুলে রোম্যান্টি পর্যটকদের ঘাড় চুপিয়ে টু-পাইস করার আশায়। এ বাজার আদিম অকৃত্রি বাজার এবং একমাত্র বনেদী বাজার পুরোনো ব্যাঙ্ককে। নতুন ব্যাঙ্ককে নতু ছাঁদে কয়েকটা বাজার আছে; কিন্তু তা এ বাজারের তুলনায় কিছু নয়

লে ফ্লোটিং মার্কেট। পর্যটকদের দ্রষ্টব্য লিস্টের মধ্যে একটি। এর সঙ্গে
তুলনা করার মতো বাজার আমি জানি কুরাসাও (ভেনেজুয়েলার উত্তরে ওরিনোকো
নদীর পাশে মাকারাইবো উপসাগরের তেলের খনির মুখে) দ্বীপের নৌকো
বাজার। কুরাসাওয়ে নদী নেই। সমুদ্রেরই একটা খাঁড়ি কেটে গেঁথে 'কী'—
করা। তার সঙ্গে গলুই বেঁধে বেঁধে সারি সারি রং করা নৌকোর মধ্যে নানান
সজী। মনে হয় তাও রং করা। কুরাসাওয়ে স্থানাভাব। কাজেই গায়ে গা
লাগিয়ে গলুয়ের মাথা 'কী'-তে ঠেকিয়ে অত্যন্ত সাজানো গোছানো বাজার।
তীরে দাঁড়িয়ে কেনার সময় নৌকো বলে মনেই হয় না।…এ কিন্তু তা নয়।
বড়ো, ছোটো, মাঝারী, হাতটানা, গুণটানা, মোটরটানা নৌকো, শালতী, ভেলা,
—কী নেই। আর কী নেই ভূমণ্ডলের বাজারের সওদা! মানে ফল, সজী,
তরিতরকারী, ডিম, মাংস, মাছ ইত্যাদি, মায় চাল, ডাল, মসলা,—কী এমন বলতে
পারো যা সেই ভাসা বাজারে নেই। হাঁক পেড়ে কেউ ডাকছে, কেউ হাঁক পেড়ে
জিনিসের দাম এবং প্রশংসা বাৎলাচ্ছে। কেউ পাইকের, কেউ খুচরো।
সাঁকো অনেকগুলো। তার ওপরেও ঝুড়ি নিয়ে বসে। কার সাধ্য এ
ভীড়কে সালাম না জানিয়ে পথ পার হয়।—ভীড়, বাজার, ব্যবসা—এবং এর
অগ্র-পশ্চাতে, অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ আদ্যাশক্তির ভীড়, বুড়ী থেকে কুঁড়ি অবধি।

দেখলাম বাজার। কী বেচনেওলা, কী খরিদনেওলা,—সবাই দর করছে, এবং
তার বেশির ভাগই স্ত্রীলিঙ্গ। এমন কি তেইশখানা নৌকোগুণে তিনজন পুরুষ
পেলাম। নৌকো বাইছেও মেয়েরাই।—কিছু ফল কিনে বেরিয়ে গেলাম।—
গাড়ি ছুটেছে অযোধ্যা।

* * *

আমরা কিন্তু চলেছি ফ্রায়া-নদীর কিনারে কিনারে। ঢালাও ফৈলাও পথ।
আমেরিকান মার্কা পথ। জবরদস্তি জমি দখল করে পথ মাথা উঁচু করে আছে।
দু পাশের জমি গভীর করে কাটা। সেই মাটি জড়ো কোরে এই পথ। ফলে
তরতরে খাল কোথাও। কোথাও জল নিকাশীর সুবিধা না হওয়ায় জলা। জলায়
সারস, বক, ফিঙে, মাছরাঙ্গা। মাঝে মাঝে ময়ূর আসছে বটে। মনে হয়
পোষা। জলায় ময়ূর বড় একটা থাকতে চায় না।

অদ্ভুত নীলে আকাশ যেন ভেসে যাচ্ছে। তারই কিনারে কিনারে দূরে দূরে
সাদা মেঘের রাগ। নারকোল সুপারী ছাড়া প্রায় কোনো গাছ নেই। আজ
আর বুড়ো ফুমী থানারাৎ আসেই নি। এবং আজ আমি পিছনে কণিকার কাছেই
বসেছি। শরীর ভালো ছিলো না। কখনও হয় না; কিন্তু সকালে গা
ঘুলিয়েছে। বমি করেছি। কণিকা ঘাবড়েছিলো। আমি কিন্তু মনে মনে
বুঝেছি কী হয়েছে। বলি কাকে পদ্ম!

ঐ যে মেয়েগুলোকে খাঁচায় ভরা মুর্গীর পালের মতো বাজারে হাটে ন্যাংটা মার্কা বসে থাকতে দেখলাম আমার মনে পড়ে গেলো মীরা, মুকুল, তপতী, আতু —আরও কতো হৃদয়ের ধন নয়নের মণি।

আমার মনে পড়ে যায় অনেক কথা। কাশীতে বাঙ্গালীটোলার পণ্ডিত বংশের বিবাহিতা সুন্দরীকে আমি বেশ্যা হয়ে যেতে দেখেছি; দেখেছি পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের মেয়েকে মুসলমান ধোপার সঙ্গে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিতে; দেখেছি বেশ্যাকে বৌ বলে ঘরে এনে ঘরের বৌকে বেশ্যা করে দিতে; দেখেছি মারের চোটে নীল হয়ে স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যে বেঁচেছে বেশ্যালয়ের 'মাসীমা' হয়ে, তারই বাড়িতে সেই বীর পুরুষ স্বামী উবু হয়ে বসে চাল বাছছে বিকেলের রান্না চাপাতে হবে বলে। কতো বলবো তোমায়। এরা সব আমাদেরই পালটি—উলটি ঘর। আমারই দিদি, মাসী, বোন, পিসী, বৌদি—হতে পারতো আমার মেয়ে, শালী, পুত্রবধূ, স্ত্রী। এরা রামায়ণ মহাভারত পড়েছে। সাবিত্রী ব্রত, পুণ্যিপুকুর জানে। শাঁখে ফুঁ দিয়েছে; ধোকার কাঠি পুড়িয়ে বর-বরণ করেছে সাতপাক ঘুরে আরও ছ'জন এয়োস্ত্রীর সংগে। এমন কি কোন্ এয়োতীর মন কোথায় মজেছে, কোন্ কুমারী বিধবা কেন হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো তা নিয়ে গুলতুনীও করেছে।

একবার দুর্গাষ্টমীর বিকেলে মা বসে আছেন মণ্ডপের সুমুখে পা মেলে, মেয়ে-বৌ-নাতনীদের কলরব মুখরিত সভার মধ্যে রাজেন্দ্রানীর মতো সজ্জায়, সিংহিনীর মতো প্রতিষ্ঠায়। হঠাৎ একটা ভীত কোলাহল শিশুদের, অট্টহাসি নবীনাদের, ভীরু লজ্জা শিহরিত চীৎকার নববধূদের মধ্যে। যেন কেউ একটানে ওদের আব্রু টেনে উলঙ্গ করে দিয়েছে।

কিছু নয় কল্যাণী-দিদি এসেছেন।

কী যে রূপ ছিলো কল্যাণীদির কী বলবো। লম্বায় সাধারণ বাঙ্গালীকে ছাপিয়ে যেতেন; চোখে সুর্মা-কাজল দিতেন কি দিতেন না তা নিয়ে লোকে বাজী ধরতো; শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন একগাল পানে একমাথা সিঁদুরে লাল হয়ে জগদ্ধাত্রী মণ্ডপের মাঝে বসে। শান্তিপুরী শাড়ির ঢালা পাড়ে জমজম করতেন তিনি। হঠাৎ তিনি মজে গেলেন। মজে গেলেন পদ্ম। কোনো লজ্জা, কোনো বাঁধন, কোনো শাসন কিছু হোলো না। বিশ্বাস বাড়ির গিলেদা তাঁকে গিলেই ফেললো। মনে রেখো পদ্ম,—কল্যাণীদির স্বামীকে কখনও আমরা দেখিনি; কেউ কখনও দেখেনি। এবং কল্যাণীদি কোনোদিন গিলেদার বাড়ি যাননি। গিলেদা কল্যাণীদিদের বাড়ি যায়নি। সে বাড়ি ব এ বাড়ি, কোনো বাড়িরই দেউড়ী পার হওয়া খুব সহজ ছিলো না। কিন্তু তবু,—আমরা সবাই এই সরস কথাটা ব্রহ্মভাষ্যের মতো আপ্ত-সত্য বলে

মানতাম, জানতাম। কেন? তা জনি না। মনের অতৃপ্ত বাসনা ঠ্যাং বাড়িয়ে দেয় এমনি সব দৌড় মারতে। এবং নিজেদের বাসনা দিয়ে স্বপ্ন দেখি অন্যের জীবনে। আমাদের নীতি বোধের শাসন এবং অনুশাসনগুলোর বেশির ভাগটাই রং করা আমাদেরই স্বপ্নজালে। আমরা মহা শয়তান, মহা পাজী, নরক।—কিন্তু গিলে-দাকে কে গুলি করলো। গিলেদা মারা গেলো। ধীরে ধীরে কল্যাণীদি পাগলই হয়ে গেলো। তারপরে আর সে ঘরে রইলোনা। পথে পথেই ঘুরতো। যেখানে সেখানে যে সে যখন তখন তার দেহ ভোগ করতো। সে যেন সরকারী পায়খানার মতো নীরবে সেই নোংরা গ্রহণ করতো। মা গঙ্গা যেমন গ্রহণ করেন সারা কাশীর নোংরা বরুণার পুলের কাছে। যেদিন মদ দিতো কেউ, খেয়ে গান গাইতো। "যাহা দিতে পারিনি তোমায়, জনে জনে সব নিয়ে যায়, তবু তুমি নেই তুমি নেই, এই ব্যথা আমারে কাঁদায়।"

এই কল্যাণীদি, রূপে ঝলমল করতে করতে এসে ঢুকেছেন সে দিন পুজো বাড়িতে। এসেই এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসেছেন একেবারে আমার মায়ের কাছ ঘেঁষে। পরণের কাপড়ে লজ্জা ঢাকার কোনো তাকৎ ছিলো না। মাকে বললো, খুড়ীমা ক্ষিদে পেয়েছে। খিচুড়ীপ্রসাদ দাও। আর দেবে দাও একখানা কাপড় দাও। চান করে সিঁদুর পরে শাড়ি পরবো; নোয়া পরবো; তারপরে খাবো। খিদে!

আর মা-আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঐ কল্যাণীদির সেবায় লেগে গেলেন পদ্ম। সব ভুলে গেলেন। আত্মীয় স্বজন, উপবাস, আচার, সন্ধিপুজো,—সব সব। চান ঘরে সাবান তেলে ঐ কল্যাণীদিকে ধুয়ে মুছে সাফ করে, নতুন সায়ায় ব্লাউজে কাপড়ে পরিপূর্ণ সাজ করিয়ে যখন সিঁদুর পরাতে যাবেন,—নাপতিনী পসী মাকে বলে উঠলো,—ও আবার কী হচ্ছে বৌ?

মা যেন এতক্ষণে ফেটে পড়লেন। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা তোরা। পাপী শয়তান! তোদের মধ্যে কে কী আমার জানতে বাকী নেই। কল্যাণীর পাপ আমাদের পাপ, কল্যাণীর নোংরা আমাদের নোংরা। আজ ভরা অষ্টমীর সাঁঝে দেবীর অংশ এসেছে। নিজের মুখে মা ডেকে বলছেন আমায় সাজিয়ে দাও। এ-বুলা ও-বুলা হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল ফাঁসিয়ে যোনি মুদ্রায় ভগবতীর পুজো করবো; আর সদ্য যোনি, সদ্য ভগবতীকেই দোর থেকে দূর করে দেবো। তোদের আবার দুগ্‌গো পুজো। মর্‌ তোরা, মর্‌। তোদের ধম্ম মরুক। দেব্‌তা মরুক। তোদের ভণ্ডামীই তোদের অমর করেছে।

কিন্তু মা এ ধাক্কা সইতে পারবেন কেন? কল্যাণীদিকে বুকে করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন! প্রভু গাড়িচাপা পড়ে মারা যাবার পর তার পাশে বসে গলা উঁচু করে কুকুর যেমন করে নির্ভাষ কাঁদে।

আশ্চর্য কথা শোনো পদ্ম। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীদি ঘুমিয়ে পড়লো মায়ের কোলে। খাবার সময়ও পাননি। মা বসেই রইলেন। সন্ধিপুজো হবার পরে নিজে যখন খিচুড়ী দিলেন মুখে, সঙ্গে কল্যাণীদিকে নিয়ে বসলেন মুখে তুলে তুলে দিলেন, খাও মা মাতঙ্গিনী, খাও মা বগলা। খাও তুমি খাও।—তোমার ক্ষুধা ছিন্নমস্তার ক্ষুধা ; খাও মা!

সারারাত এই সব মনে পড়েছে। বুকটা হায় হায় করছে। করবেনা কেন?

পুরো যৌবনের তীরে বসে, শেজের ওপর নারী রত্নের পেলব দেহ চেয়ে চেয়ে নপুংসকের কী যে ক্ষোভ, জানি না তো পদ্মদি ; কিন্তু ঐ শো-কেস ভরা আমারই মেয়ে বোনের মতো দলকে দল দেখে আমি বোধ করেছিলাম,—আমিও এক ধরণের নিদারুণ অক্ষমতায় ক্লীব। আমিও অপদার্থ, অমানুষ, পৌরুষের অভাবে লজ্জায় দীন।

যে দারুণ ক্ষোভে আমাদের দেশের তরুণগুলো কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা শিরোপা পেয়েও বনে বাদাড়ে ঢুকে পড়ে খুনে, বোম্বেটে, ডাকাত, চোর আখ্যা ঘাড় পেতে নিচ্ছে, যে দারুণ সামাজিক অসংযম, অশাসন, অধর্ম দেখে তারা ফুঁসে উঠে নিজেদেরই নিজেরা ডাঁশছে, যে দারুণ অপচয়, অরাজকতা এবং অন্যায় শুধু ক্লীব অহিংসা, পুলিসী শৃঙ্খলা, আর ফাঁকা জাতীয়তা বোধের নামে হজম করতে তারা পারছে না,—আমার বিবমিষাও সেই অকারণ ক্ষোভ ও ভৎর্সনার উদ্‌গার। সাধে কী গা বমি বমি? কণিকা কী করে বুঝবে?

ঘুমুতে পারি নি। পাশে ঘরে যে দুটো মেয়ে ঘুমিয়ে ছিলো তাদের মধ্যে কেউই তো অক্ষত যোনি কুমারী নয় ; কিন্তু কার মর্মের বেদনার জন্য থেমে থাকবে কালকের মন্দিরের পুজো, গীতার ব্যাখ্যা, নগর সংকীর্তন? ওদের দুজনার মাঝখানে কালের মহাশ্মশানে পড়ে আছে একটা মড়া যুগের শব। তুমি কী সেটা দেখতে পাও পদ্ম? সেই পচা মড়ার গা ভর্তি কিলবিল করছে কৃমি ;—কিন্তু তাও ঢের বড় সত্য, এই মেকী সভ্যতার পালিশের চাকচিক্য থেকে।

সকালে খেতে পারিনি। কেবল বমি করেছি। কণিকা ঘাবড়েছিলো কিন্তু আমি সামলেছিলাম। কিন্তু তাজমুলের ভাষায়,—ও পোলাপান। বোঝে নি কোন্ অশ্রুদাহে আমার দেহ মন উথলে উঠেছে।

এই নীল সকালের শান্তরোদ, পাখি ছাওয়া জলার ধার, ভরা ধান ক্ষেতে সবুজ-ধরা দিগন্ত। এই তরতরে খালের জলের পাড়ে পাড়ে হাঁস মুর্গীতে চঞ্চল গ্রাম। এই সাঁকোর পর সাঁকো ধীরে ধীরে আমায় যেন জীবন স্রোতের অনিবার্য বেগের মধ্যে ফেলে ঠেলে দিলো। আমি বিহ্বলের মতো সাঁতার দিতে থাকি যদিও কূল পাই না, তবু পাশে বসে কণিকা। বলছে, দাদা কমলালেবু খাও হাতে করে একটি একটি কোয়া দিচ্ছে।

আমি বলি কণিকা,—গান গাইতে পারো একটি। এই সকাল আর কাল রাত। এই তুমি আর কাল রাতের মেয়েগুলোকে এক সুরে বেঁধে দিতে পারো গানে ?

একটুও আপত্তি না করে কণিকা গান গেয়ে উঠলো—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে' ; গান গাইলো—'আমায় দেখতে দাও, রেখোনা আঁধারে'। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবৃত্তি করি ;—

কালি মধুরজনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছ্বল যৌবনসুরা তুলেছো আমার মুখে।

* * *

হঠাৎ বিপর্যয়ের মতো দেখা যায় চিম্‌নী, দেয়াল, ফ্যাকটরী,—ফ্যাকটরীর সঙ্গে লাগাও কোম্পানীর রচা শিল্প নগরীর দোকান, বাজার, হাট। এবং তারই বদৌলত মন্দির। গ্রামের নাম বানবায়িৎ। কোম্পানীর নাম রেণল্‌ডস্‌ এ্যলুমুনিয়াম্‌। গায়ানায়, জ্যামায়কায়, সুরিনামে—কোথায় নেই। 'মাল্‌টি-ন্যাশন্যাল' এই সব ধূর্ত রাজত্বই তো দেমক্রাসীর ঘোড়ায় চেপে আইনের আবডালে যা মারার তা মারছে ; যারা মরার তারা মরছে। রেনলডস্‌ ; তারপরেই পর পর জাপানী টয়োটা, ডানলপ্‌, গুড্‌ইয়ার, বাটা, নেস্‌লে, ফোর্ড, এবং ফার্স্ট ন্যাশন্যাল। যতো মার্কিনী ব্যাঙ্ক। পর পর, পর পর, সারি সারি। তবু এ দেশ স্বাধীন ! ভারত স্বাধীন ! ব্রহ্ম স্বাধীন ! সিংহল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ স্বাধীন ! এ কী স্বাধীনতা !!

আমি চুপ করে আছি দেখে সর্বহি বলে উঠলো চুপ করে কেন আপনি ?

আমি শুধু বললাম, বহি, একটা গ্রাম দাউ দাউ করে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় যে, সে চিৎকার করে, বা চুপ মেরে যায়।

বহি হাসে। বললে কে নিরুপায় ? না ! না !! নিরুপায় নই আমরা। আপনাকে আমি ভিয়েতিয়েনেয় নিয়ে যাবো। দেখবেন সারা কাম্বোডিয়ায় আজ কী বিপুল উৎসাহ। সিহানুক ফিরেছেন। যদিও সিহানুককে এখনও সবাই বিশ্বাস করছে না। কিন্তু তবুও,—ওঁকেই এখন মুখিয়া করে এগিয়ে যেতে হবে। নৈলে লাওস্‌কে বাগে আনা যাবে না। ভাববেন না দাদা। থাইল্যাণ্ডে অনেকবার অনেক ধরণের ওলট পালট হয়েছে। ১৯৩২ থেকে ১৯৬৯ এর মধ্যে থাইল্যাণ্ডে পঁচিশবার ওলোট পালোট হয়েছে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ ওলোট পালোট না হয়েও ঘোর ব্যাপার হচ্চে, হয়েছে, হবে। থাইল্যাণ্ডে আমরা রক্তপাত সহজে করতে চাই না। করবোও না সহজে। তবে অসহজে—বাধ্য হতে হয়, —কী করা যাবে ! রাজার সম্মান আছে ; থাকবে। কিন্তু সিহানুক এবং সিহানুকের মা যে দৃষ্টান্ত রচনা করছেন থাই রাজ তা থেকে শিখছেন বলেই

আমরা বিশ্বাস করি, এবং থেমে আছি ; মনে হয় ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ও থমকে থেমেই আছে। থেমে নেই সি-আই-এ ! থেমে নেই রুশ। থেমে নেই আমাদের যোগাযোগ।—কিন্তু আর আমরা ভয় করি না। এ দেশের মুক্তি এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না। নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে অযোধ্যায়। অযোধ্যা ছিলো আমাদের প্রাচীন রাজধানী। এবং সে রাজধানীর সেরা কীর্তিস্তূপ কী জানেন ? ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের মরণ বাঁচন লড়াইয়ের পর যে জয় হয়েছিলো তার স্মৃতি-সৌধ। যুদ্ধ জয়ের স্মৃতিসৌধ আরও রচিত হবে এ মাটিতে। এ দেশের শান্তির ঘটে রক্ত দিয়ে পুজো হয়। আজ আবার থাইরাজ সেই ধ্বংসস্তূপকে নতুন করে দেশের সামনে মেলে ধরেছেন। এ থেকে যদি কিছু বুঝবার পেয়ে থাকেন বুঝুন। থাই এখন লড়াইয়ের কথা ভাববে কী করে ? থাইয়ের আষ্টে-পিষ্টে এখন মারণ অস্ত্র ঠাসা। আমরা শুধু থেমে থেকে ওতে মরচে পড়াবো। জাম্‌ক্‌ করে দেবো বিদেশী বণিকশাহী নীতির রথটা। ফৌজে না ঢুকে ওদের বেকার করবো। ফৌজে ঢুকে ওদের বে-ইজ্জৎ করবো। এই ভাবে খুব বেশীদিন লাগবে না। থাইয়ের জলে বাতাসে মরচে পড়ার বিষ। সবই জরে আসে। মরচে পড়ে নষ্ট হয়।—

তোমাদের উৎসাহ ? তাতে মরচে পড়বে না ?

এই যে মাঝে মধ্যে বিদেশী এই সব দিদিরা আসেন,—এঁরা মরচে পড়তে দেন না ! আমরা মরচের অতীত নিখুঁত স্টীল। চিন্তা করবেন না। আমরা হয়তো শুধু লোহা ;—কিন্তু দিদি একাই সিলিকন্‌, ক্রোমিয়ম্‌, তুংগস্টেন্‌। আর এমন দিদি একজন নয়।

পথে আতা দেখলাম। ঢাউস ঢাউস থ্যাবড়া থ্যাবড়া ফাটা ফাটা আতা ! কতকগুলো কিনলাম। অতিশয় মিষ্টি। একটা পেঁপে পেয়ে গেলাম। উৎসাহ ভরে বললাম,—কে আর পরোয়া করে তোমাদের লাঞ্চ। কে আর পরোয়া করে শরীরের বিবমিষা। দাও তো ওটাকে আধখানা করে। আর দাও একখানা চামচ।

কণিকা বলে, বীচিগুলো ফেলে দিই।

আমি বলি, তা নৈলে আর ভেতো বাঙ্গালী ? বীচিগুলোই তো প্যাপিন্‌ ভর্তি। বীচি ফেলে পেঁপে ভক্ষণ ক্রীম ফেলে দুধ ভক্ষণের মতো। ও পাপে আমি নেই। আশ্চর্য হবে, কণিকাও সেইভাবেই খেলো, বেঁচে রইলো এবং বললো বীচিতেও স্বাদ আছে সুগন্ধ আছে !

আমি আমার কথায় ফিরে আসি। এদেশে বিপ্লবের হিড়িক লাগলো কী হো-শী-মীনের তাড়ায় ?

এক হিসেবে তাই ; অন্য হিসেবে, এবং সেইটাই ঐতিহাসিক। যে তাড়ায় হো-শী-মীন্‌ সেই তাড়ায় থাইল্যান্ড-ও। আমাদের রাজা ৬ষ্ঠ রাম যখন

বিলেতে পড়ছিলেন, তখনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। স্বাধীন থাইল্যাণ্ড থাইল্যাণ্ডেরই পতাকা নিয়ে রাজার সৈনাপত্যেই সেই যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেন। সেই যুদ্ধের পর থেকেই থাইল্যাণ্ডের চেতনা হোলো পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার। হো-শী-মীনও ছিলেন সেই সময়কার নব উদ্বুদ্ধ দলে। ১৯৩২ থেকেই এই নব্যভাবাপন্ন শিক্ষিতেরা থাইল্যাণ্ডে এসে সুরু করেন কাগজে পত্রে আন্দোলন। রাজাকে সরাতে তারা চান নি। শুধু দুটি জিনিস চেয়েছিলেন: এক, রাজা কোনোদিনই আর সামন্ততন্ত্রে ফিরে যেতে চাইবেন না; দেশের প্রগতিতে যত্নবান্ হবেন; দুই,—রাজ্যে গণতন্ত্র কায়েম করে পরিষদ স্থাপনা করে পরিষদের নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর মত অনুযায়ী প্রজাপালক হয়ে থাকবেন। এখন তো সেইভাবেই চলছে। বাগড়া পড়েছে অন্যভাবে। সর্ষেয় ভূত ঢোকার চেষ্টা চলছে। ওয়াশিংগটন চাইছে বণিক-সাম্রাজ্যবাদীর অনুশাসনে রাজা এ দেশের ক্ষেত, বাজার, খনি, ব্যাবসা সবই ওয়াশিংগটনের মারফৎ করুন। রাষ্ট্রসংঘে জোট বাঁধুন যে দিকে বণিক-রাজদের বেনামীতে নতুন সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী স্বার্থ নিয়ে থলের মুখ চেপে বসে আছে সেই দিকে।

কী হবে মনে হচ্ছে? আমি প্রশ্ন করি।

যা অনিবার্য। তাই হবে। তাই হবে।—ঘোষণা বহির।

কণিকা গান গাইছে: নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়।

গানটা শুনেই মুজিবর রহমানকে মনে পড়লো।—জিগ্যেস করলাম কণিকা, বাংলা দেশের খবরটা কী বলোতো? ঠিক কি খবর? তাজমুল তো বলতে চাইলো না।

যা বলার সবই বলেছে। আর বলবে কী? আর কী বলা যায় দাদা? যখন সময় হবে তখন সে খবর দুনিয়া শুনবে। যা হয়েছিলো এবং যা হচ্ছে এর কোনোটাই যা হবে তার ইশারাও নয়। যা হবে তা হয়ে চলেছে। চলবে যতদিন না হবে।—তবে যারা খুনে তারা খুন হবে। বাংলা দেশে তাদের ভিটে পুড়ে ছাই হবে। মনে রেখো দাদা বাংলা দেশে গোনা গুনতীর মধ্যেই ত্রিশ হাজার বন্দুক গেরিলাদের হাতে।—

দেরী তবে কিসের?

ভূমিষ্ঠ হবার আগের পর্বটাকে দেরী বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

গুটি ছয় সাত মেয়ে। নানা বয়সের। খালি পায়ে মাটির পথ বেয়ে খাল পাড় ধরে ধরে চলেছে। সবার মাথায় ছাতা। কাছাকাছি কোনো হাট। সেই দিকে চলেছে। পরনে সারং আর কামিজ। মাথা খোলা। মিশমিশে কালো চুল। বেশির ভাগই ঘাড় অবধি ছাঁটা। কাঁধে বাঁখ, বা কোলে ঝুড়ি! এ ছন্দ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র। আমেরিকান দেখে বলবে গরীব, আনডেভেলপ্‌ড্‌, —লেগে যাবে ডেভেলপ্‌ড্‌ করতে। স্টাটিস্‌টিকস্‌ কষে দেখাবে আমেরিকান কত খায়, সে তুলনায় এরা কী খায়; আমেরিকানের বয়সের হার কতো, এদের কতো; আমেরিকায় ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত নেই। এরা মরছে। বলবে হায় যীশুখৃষ্ট, বলে দাও এই অবোধদের উব্‌গার কী করে ঠেসে ঠেসে করি!

ওরা চার্চে গিয়ে কী চায় জানো পদ্মদি? ওরা বাতি জেবলে দেয় ওদের মোমদানীতে আর বলে দয়াময় ঐসব সোনা-দৌলতের দেশে ওদের সুমতি দাও যাতে আমাদের উব্‌গার করার বিজাতীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে কোনো হাঙ্গামা না পোয়াতে হয়।

ওরা ওদের স্টাটিস্‌টিক্‌সে বলবে না আমেরিকানগুলো খেয়ে খেয়ে কী রাম খাশী। ওরা টিনের রান্না খেয়ে খেয়ে 'কুক্‌ড মীল্‌' খাওয়াটাকে কেত্তা খাতির করে। ওরা কোকা-কোলা এবং মার্জারিনের দাস। ওরা টি-ভি, ফ্রিজ্‌ থেকে নিয়ে, ডিশ-ওয়াশ, ক্লথ-ওয়াশ্‌, ঝাড়ু, পলিশ—রাজ্যের জাঙ্ক্‌ জড়ো করে জাঙ্কের পাহাড়ে চাপা পড়ার ব্যবস্থা করেছে। ওদের শিক্ষার মাধ্যম লেখা-পড়া নয়; কেবল 'দর্শন' ও 'শ্রুতি'; অর্থাৎ টি. ভি; সিনেমা, রেডিও, গল্প। এতো বিষ জমেছে যে সমাজে যক্ষ্মা, ক্যানসার, উন্মত্ততা, স্নায়ুবিকার, আত্মহত্যা, খুনোখুনী, বলাৎকারের অন্ত নেই। আকাশের আলো দমবন্ধ হয়ে চোখ বুজে আছে; জলে মাছ দমবন্ধ হয়ে মরছে। মোটরকার হয়েছে প্রত্যক্ষ দেবতা, ব্যাঙ্ক হয়েছে স্বর্গ; ডলার হয়েছে শক্তি। মোটর চাপা মরণ হয়েছে সেরা প্রগতির মাপকাঠি। আজই এ দেশের গার্জিয়ান কাগজে একটা স্টাটিসটিকস্‌ বেরিয়েছে। তাতে দেখতে পাচ্ছি (১৯-১১-৭৫) আমেরিকায় যে সব আমেরিকান চিঠি যদি বা লেখে তার ১৩ শতাংশ (অর্থাৎ ১৩,০০০,০০০) ঠিকানা লিখতে জানে না, বুদ্ধি নেই; ২৫% টি. ভি. দেখে; বোঝে না কিছু, নেশাগ্রস্তের মতো শুধু দেখে যায়; ২৫% রেডিওর বিজ্ঞাপনের মর্ম বোঝে না; ১৪% চেক লিখতে জানে না; প্রতি চারের মধ্যে একজন যা করে—করে যায়; কী করে জানে না। মানে পুরোপুরি যন্ত্র বা যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছে।

আমি আমেরিকায় ঘুরে দেখেছি ওদের মধ্যে 'শিক্ষিত'-দের মধ্যে ম্যাপ দেখতে জানে একশোয় দশ জনও নয়; পৃথিবীর খবর দু পার্সেন্টের বেশী শিক্ষিতেরা জানে না; আর প্রত্যেক আমেরিকানের ধারণা ওরা পৃথিবীর উবগার করতেই জন্মেছে। শুধু তাই নয়, ওরা না দিলে থুলে বাকী দেশগুলো অনাহারে মরতো। ওরা কী করছে ওরা জানে না; জানতে চায় না। যা কিছু করণীয় ওদের ধারণা ওদের 'লীডার'রাই করছে। এছাড়া ওরা জানে ট্যাকস্‌, ব্যাঙ্ক, সুপারমার্কেট, টি-ভি, ব্যস্‌!

ওদের ব্লাড প্রেসার আর হৃদ্‌রোগের তুলনায় এ সব দেশে ও রোগ নেই বললেই চলে। নেই বোলেই ওরা আবার বলে, পিছিয়ে পড়া দেশের লক্ষণ হৃদ্‌ রোগের অভাব ; প্রগতির লক্ষণ প্রেসার, হৃদ্‌ রোগ ! ওদের বাঁচার বয়সের লম্বাই বেশী, আবার ওদের পেন্সনের তালিকা, বৃদ্ধ বয়েসের হারেম হাসপাতাল, এবং ওল্‌ড্‌ এজ্‌ অ্যালাওয়েন্সের চাপে ওদের সসেমিরা অবস্থা ! জোয়ানদের সংখ্যা কম, বুড়োদের সংখ্যা বেশী। ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় দ্বীপ-কে-দ্বীপ, শহর-কে-শহর, সব বুড়ো। তুমিও তো একজন ছোটো-ডাক্তার ! ঐ সব দেশে চলে যাও। সেবা করে ক্রোড়-পত্নি হয়ে যেতে পারো। (আরে, চটছো কেন ? 'পতি' স্ত্রীলিঙ্গে 'পত্নি' ছাড়া কী ! আমি ভালো মানুষ। তোমাকেও জানি ! 'ক্রোড়' শব্দের অন্য অর্থ আমার আসে না বোলেই ধরে নিতে পারো। যদি কোনোদিন আমাদের দেশেই স্ত্রীলিঙ্গে রাষ্ট্রপতি হয়ে পড়ে, সেই ফার্স্ট লেডীকে আমরা রাষ্ট্রপত্নি না বোলে কী বলবো বলো ? ম্যালেরিয়া-বসন্ত ওদের নেই। কিন্তু ক্যানসার, সিফিলিস, গণোরিয়া, মস্তিষ্ক বিকার, অ্যালকহলিজম্‌ ছাড়াও ওদের ভীতির সংখ্যা অজস্র ! ওদের যৌন বিকৃতি, যৌন ব্যভিচার, পারিবারিক অবিশ্বস্ততা, সন্দেহ, কলহ, ঈর্ষ্যা—ওঃ, নরক, নরক। তুমি গোণ্ড্‌, সাঁওতাল, কুকী, মাওলী, পাহাড়ীদের মধ্যে যাও, গ্রামে গ্রামে যাও,—দেখো গিয়ে কতো প্রেসার, হার্ট, ক্যান্সার, সিফিলিস। ওগুলো 'অ্যাডভান্সড্‌' দেশের অ্যাড্‌ভ্যান্সী-য়ানা রোগ। ট্রাইব্‌স্‌, আদিবাসীরা কিস্‌সু জানে না। রোগে ভোগা তো জানেই না, রোগের নামও জানে না।

এ সব থাই মেয়ে খাটছে। গাইছে। নাচছে। খুশী আছে। এটাই বড়ো কথা। এই ছন্দটা যারা বিঘ্নিত করছে তারা কী পদ্ম ? মাঝে মাঝে আখের ক্ষেত। পুরুষে মেয়েয় মিলে আখ কাটছে। ছোট ছেলেটা একগাছা আখ কাঁধে নিয়ে গট গট করে হেঁটে চলেছে। যেন কতো ইম্পরটেণ্ট একজন। ভাই আর বাপ মোষের গাড়িতে আখ তুলছে। ঐ আখ-গাছাও গিয়ে চড়বে সেই গাড়িতে। আমি হাত নেড়ে হাসি। এক গাল হাসিতে ও গড়িয়ে পড়ে। 'হাজার লোকের হর্ষধ্বনি, সবার উপরে' !

দূরে সারি সারি গাছ,—সাইপ্রাস্‌। ছুঁচলো মুখে দাঁড়িয়ে যেন সবুজ প্যাগোডার সারি। তার পরেই বিশাল বিল। বিলের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খাল। এপার ওপার দেখা যাচ্ছে না। বাঁশের খোঁটার সঙ্গে বাঁধা, বিশাল বিশাল জাল। চৌকো জালের চারটে কোণা চারটি বাঁশের ডগায় বাঁধা। চার বাঁশের অন্য দিক মাঝে একটা খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। খোঁটা পোঁতা জলে।

ঢেঁকীর মতো সেই জাল উঠছে আর নামছে জলে। নিয়ে উঠছে মাছ। এমা
দশ বিশটা জাল যতদূর দৃষ্টি যায়।

পথের ধারে খালের পাড়ে গা ঘেঁসে মা-মেয়ে বসেছে সওদা নিয়ে। টম্যাটো
নানারকমের শাক, কলমী, পাৎলা পাৎলা শাকশুদ্ধ গাজর। পেঁয়াজ, কড়াই
শুটী, শিম, লঙ্কা। কচু, ওল, মিষ্টি আলু, শসা। সেদ্ধ ভাত। চাকা চাক
ছানা। জলে দুধে চিনিতে সেদ্ধ করা চাপ চাপ ম্যাকারুনী। জল আছে
বালতিতে, খেতে পারো। গাছের তলায় আরাম না হয় ছাতার তলা
বোসো। প্যাকিং বাক্সো আছে, কষ্ট হবেনা বসতে। ওজনের যন্ত্রগুলে
আলাদা। 'হুক্'-টা তুলে ধরো। জিনিষটা ঝুলবে। পড়ে নাও কত
ওজন,—স্প্রীং ব্যাল্যান্স।···এক সার-স্বর্ণাভ পীতবসনে মোড়া শ্রমণ হাতে ঢাক
কলস নিয়ে চলেছে। ওতে ওরা ভিক্ষা সংগ্রহ করে। নীরব বিষণ্ণ মুখ
কেন যে এতো বিষণ্ণ কে জানে! শুনতে পাই এখানে প্রতি পরিবার থেকে
প্রতি বিবাহের ফল একটি না একটি সন্তানকে শ্রমণ হতে দেওয়াই রীতি। শ্রমণরা
তা বোলে পরিবারের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করে না। প্রয়োজন হলে চাষের সময়ে
গিয়ে সাহায্যও করে দিয়ে আসে।

প্রতি পুরুষকেই জীবনে কিছুদিন সংঘে থেকে 'ট্রেনিং' নিতে হবেই
স্বয়ং রাজাকেও তা করতে হয়েছে। একটি কলস, একটি ছাতা, একটি ক্ষুর
(মাথাটি কামিয়ে রাখার জন্য ঃ শিখ হলে হতো চিরুনী, মাথাটিতে চুল গুছিয়ে
রাখার জন্য। ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ)—এই এদের যথা সর্বস্ব। কলসের মুখে
এক টুকরো কাপড়। যখন যা পান করবে ছেঁকে খেতে হবে। পেটে না
জীবন্ত কিছু ঢোকে। মরন্ত ঢুকতে পারে, ও ঢোকে। এদেশে শ্রমণরা মাছ
মাংস খায়। হত্যা নিষিদ্ধ; কিন্তু মাংস ভক্ষণ নয়। নারী সংগ? না! ওটি
বিলকুল না। (দেখছো? তোমরাই আমায় শ্রমণ হতে দিলে না। হলে, পুরো
ক্ষুরও লাগতোনা। আধখানাতেই হতো। কারণ এখন তো আর পুরো মাথায়
চুলই নেই!) তেমনি নিতে নেই পয়সা! কাজেই শ্রমণ বলতে যে সব তরুণদের
থাইল্যান্ডে দেখা যাচ্ছে ওরা বিষণ্ণ কেন বোঝা কঠিন নয়। না মুদ্রা, না নারী,
অথচ মৎস্য মাংস চলছে। ভেবেই তো আমি বিষণ্ণ! তবে ভরসা। ব্রহ্মচর্য
ব্রত অন্তে এরা সবাই অর্জুনের মতো উলূপীও পাবে! চিত্রাঙ্গদাও পাবে!
থাইলান্ডে স্থায়ী শ্রমণের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। এখনও বাড়ছেই; কমছে
না। এদের মর্মে ধর্ম বলতে যা, তার সংগে পলিটিক্সের কোনো বিরোধ নেই।

এইখানে আমার ইচ্ছে করছে তোমায় বলি যে এই সংঘবাসের (৮ থেকে ১০
বছর) সঙ্গে ওদের শিক্ষা ব্যবস্থার কী গভীর যোগাযোগ। সংঘে কী কী, এবং কী
ভাবে পড়ানো হয়; এইভাবে আশ্রমে বাস করে শিক্ষাকে দীক্ষা এবং কর্তব্যকে

ভেবে পালন করার মর্যাদা, গুরুত্ব এবং উপযোগিতা যে কতোখানি বলতে
হও হচ্ছে। সংযম করি। নৈলে পুঁথি যায় বেড়ে। তবে চুপি চুপি বলে
খ রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে এবং শান্তিনিকেতনে যা করেছিলেন তার ওপর
ধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের যথেষ্ট অবদান ছিলো। তিনি শ্রমণদের এই ধারার
ঙ্গ পরিচিত ছিলেন। আরও একটি কথা বলবো; এদিকে বিপ্লব যা ঘটছে
র মধ্যে শ্রমণদের দান যথেষ্ট। তবেই বুঝে নাও শিক্ষাটি কেমন শিক্ষা!
শ্রমণরা দেশের সুখ দুঃখের লড়াই থেকে দূরে সরে থাকবে কেন?

দেখো পদ্ম, যদি কখনও এদিকে আসো ব্রহ্মে, মালায়ায়, থাইল্যান্ড, লাওস্,
ম্বোডিয়ায়—ফুলের দোকানগুলো মন দিয়ে দেখবে। মাদুরা ত্রিচিনপল্লীর
ন্দির অঙ্গনে ফুলের দোকান দেখে ভেবেছিলাম এ রকম ফুলের সজ্জা হয় না।
কন্তু এদিকে এসে সে ধারণা ধপাস্। অবর্ণনীয় এদের ফুল দিয়ে সাজসজ্জার
কৌশল। পুতুলগুলো ফুলের; এবং পুতুলে পুতুলে মিলিয়ে একটি একটি
ল্প তৈরী করেছে। কুবা থেকে নিয়ে সারা স্পানিশ আমেরিকায় ফুল-সাজের
কটা প্রথা আছে। চার্চের কাছাকাছি সে সব চমৎকার দেখা যায়। কিন্তু এ
াইল্যান্ড। ফুলের দিগন্তে এরা স্বর্গের সুষমা ঢেলে দেয়, মর্তের মমতার
মালপোনা আঁকে।—

জায়গাটার নাম বাং-পা-ইন্। এখানে ছিলো পঞ্চম রাম রাজার 'সামার-
প্যালেস', অবকাশ কাটাবার বাড়ি। এরই কাছে সেই নৌ-উৎসব। সে গল্প
আমি 'প্রাচীন নগরী'র বর্ণনায় করেছি। বাড়িটা চমৎকার। ঠায় দাঁড়িয়ে দেখার
মতো। দীর্ঘ ছায়া ঢাকা পথের ধারে লম্বা সাঁকো। বিরাট পুকুর; যেন হ্রদ।
এক ধার দিয়ে আমার 'প্রিয়া' (ফ্রায়া) নদীর খাল বয়ে যাচ্ছে। হ্রদের চারিধারে
বাছা বাছা ফলের আর ফুলের গাছ। নিস্তব্ধ; শান্ত; সত্যি সত্যি পাখির
কূজনে, মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত। আর অবাক যেন চেয়ে আছে প্রাসাদ।
সাঁকোটি যেন প্যারী-ঈতে সাইন্-এর বুকের সাঁকো। তেমনি সব ফরাসী মর্মর
মূর্তি। এই প্রচ্ছদপটের সঙ্গে বেমানান। শুনলাম ফরাসী স্থপতির গড়া এই
প্রাসাদ। কিন্তু রানী যখন ডুবে মারা গেলেন তখন দুদ্দাড় করে সেই প্রাসাদের
চপলতা ভেঙ্গে ফেলে রাজা সত্যিকার একটি বিষাদ-সমুজ্জ্বল, গাম্ভীর্যে-ঐশ্বর্যে,
গভীরে-মহিমায় মণ্ডিত স্মৃতিসৌধ রচনা করলেন। সে যেন নরুণ দিয়ে
কেটে-কেটে প্রজাপতির পাখায় মুক্তোঝরা জালির কাজ। দেখলে মনে হয়
এখুনি নিজের নবনীত প্রতিভায় নিজেই গলে পড়ে যাবে। কী সুন্দর পালিশ,
কী সুন্দর সোনা-ল্যাকারের কাজ।

ভিতরে গেলাম। বাচ্চা ছেলেদের স্কুল হচ্ছে। সেই দুর্ঘটনার দিনে

সকালে রানী অনেক বাচ্চা-ছেলেদের নিয়ে খেলা করছিলেন। রাজা তাই আ
কোনো সজ্জা ইত্যাদি না রেখে রানীর স্মৃতিতে এই প্রাসাদে বাচ্চা বিদ্যালয় ক
দিলেন। বেশীদিনের কথা নয়। ১৯৩৭-এ প্যারী-ঈতে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন
হয় সেখানে এই প্রাসাদের অনুকরণে প্যাভিলিয়ন তৈরী করা হয় থাইল্যাণ্ডে
প্রদর্শনী-সামগ্রীসম্ভার দেখানোর জন্য।—

এখন থেকে 'আউধিয়া' (অযোধ্যা) কাছেই। এটিই থাইল্যাণ্ডের প্রাচী
রাজধানী। এরও আগে রাজধানী ছিলো আরও উত্তরে। চিয়াং-মাঈ। কেব
কেবল হানাঃ এই ব্রহ্মের, এই চীনের। মোঙ্গোলরা চীনাদের খেদালো
তারা এসে জুটলো; থাইল্যাণ্ডে চাপ পড়লো। ব্রহ্মদের লোভ ফ্রীয়া নদী
উত্তরের পাহাড়তলীর সম্পদ। সেখানে শ্যামের শাদাহাতি আর সেগুনের বন
ফলে ওরা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলো দক্ষিণে 'আউধিয়া'য়। ভারত থেকে যার
এসে রাজ্য স্থাপনা করেছিলো তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়। তা
সমুদ্রের কাছেই থাকতে চায়। তারপরে সেই ভীষণ যুদ্ধ চারশো বছর আগে
সেই যুগান্তকারী যুদ্ধে শ্যামের রানী মারা যান অত্যন্ত মর্মন্তুদ ঘটনায়। রাজ
রাজধানী আবার সরিয়ে আনেন বর্তমান ব্যাঙ্ককে।—

এই সেই অযোধ্যা। আজ একটি গ্রাম। কিন্তু একটু ঘুরলেই বোব
যায় একদার সেই সমৃদ্ধি।—

অযোধ্যা পেঁছবার ঢের আগে থেকেই দেখা যায় ধান ক্ষেতের দূর প্রান্
জেগে আছে সারি সারি মন্দিরের চূড়া। মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে কখন ঐ আভা
ইঙ্গিতময়, চূড়া, গাছ, সৌধের-প্রাণময়তায়-পূর্ণ, অদেখাকে দেখতে পাবো।

পাওয়া গেলো। পথ বাঁদিকে বেঁকে খাল পার করে সোজা হয়ে গেলো
ঘুম-ঘুম পথের দু-ধারের ব্যাপ্তির পারে ঘুম ঘুম সারি সারি চালাঘর
কিন্তু ছাড়া-ছাড়া পৃথক সত্ত্বা নেই তার। গায়ে গায়ে লাগা লম্বা চালার মতো

এমনটা পুরীর নুলিয়া পাড়ায় দেখেছি; শ্রীরঙ্গম্ যাবার পথে গ্রা
যারা সস্তা অলঙ্করণের জন্য হীরে কাঁচ কাটে সেই সব শ্রমিকদের পাড়ায় দেখেছি
কিষ্কিন্ধ্যায় (অর্থাৎ বিজয়নগরের) ধ্বংসের মধ্যে বরদস্বামী মন্দিরের দুধা
দেখেছি; বস্তুতঃ গঞ্জাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বস্তর, মেদিনীপুরের অধিবাসীদে
গ্রাম গড়ার পদ্ধতিতে দেখেছি এই সারি সারি গায়ে গা ঠেকিয়ে ঘরের পর ঘর
ঘরের সারি; মাঝে চওড়া সুপরিষ্কৃত পথ। সেটাই গ্রামের রূপ। পুরী
পথে কোনারকে বাঁক নেবার আগে পিপ্‌লী গ্রামে, সেকালের সাক্ষী গোপালে
গ্রামে এমন দেখেছি।

এতো করে বলতাম না। কিন্তু এই পথে, এই গ্রামে, এই পরিস্থাপনার lay out) বিশেষত্ব লক্ষ্য করে দেখার পর যেন আর একটা কিছু দেখার অভাব বোধ করছিলাম।—হঠাৎ সেটা চোখে পড়তেই শুধু যে অভাবটাই মিটলো তা নয়; পর পর অনেকগুলো ছবিও মনে ভেসে উঠলো। বুঝিয়ে বলছি।

গ্রামের পশ্চিম মুখে (আমরা পূব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছি তখন) বিজয় মহিমায় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্যাগোডার আকারে এক স্তূপ। বহু প্রাচীন হলেও, মার্জিত, অলঙ্কৃত; মনে হয় গ্রামবাসী এটির দেখা শুনা করেন। ছবি নিলাম। কিন্তু যেন এটিকেই চাইছিলাম। এই রাজপথের পারে প্রাচীন শহরের উপান্তে ঘুম পাড়ানী গাঁয়ের প্রকৃতিটি আমায় টেনে নিয়ে গেলো পুরীতে, কোনারকে, পল্লব চোল অধ্যুষিত বর্ণেতর গ্রামবাসীদের জীবন শিল্পের ছন্দে। পুরী মন্দিরের চারধারের পাড়ার নামের সঙ্গে 'শাহী' যুক্ত থাকে। এবং এই 'শাহী'-ধাঁচের পাড়া পুরী, চিল্কা থেকে নিয়ে সমগ্র আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পেয়েছি। শুনেছি আসামের আদিবাসীদের মধ্যেও এমন প্রথায় গ্রাম রচনা চালু আছে।

এ সব গ্রামের মুখে সর্বদাই থাকে একটি মণ্ড বা দেবস্থান; একেবারে কিছু না থাকলে অন্ততঃ একটি গাছ, যার তলায় সিঁদুর মাখা একটি পাথর। এবং এমনি একটা কিছুর অভাবই লক্ষ্য করছিলুম অবচেতনে। যেই ঐ সুসজ্জিত চৈত্যটি দেখলাম অবচেতনের সেই বিরহ অকস্মাৎ যেন ভরে গেলো। ভালো লাগলো চৈত্যটিকে।—

এমনি, চৈত্য না হ'লেও, চৈত্যের প্রকৃতিটা বৌদ্ধ, চৈত্যধর্মী দেবনির্দিষ্ট সংযুতি বা গঠনবিন্যাস ঐ সব 'শাহী'-মার্কা ভারতীয় গ্রামগুলিতেও দেখেছি। এটাই একটি বড়ো কথা। বহুর মধ্যে মিলনের কথা।

আজও মনে পড়ে দেশেও গ্রামের প্রশস্ত পথের মাঝখানে তুলসীমণ্ড, হনুমান ঝাণ্ডী, ঘণ্টা-লাগানো মণ্ডপ, বিশেষ সাজানো মণ্ডগুলি।—গঞ্জাম জেলায় আবার এটাই একটু বিস্তৃত ভাবে দেখা যায়—সাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি 'ভাগবত-ঘরে'। ঐ নামটাই চিল্কা, গঞ্জাম, পুরীতে প্রচলিত,—আসলে কম্যুনিটি হল। এবং এই 'কম্যুনিটি'র অর্থাৎ 'গোষ্ঠী'র স্বার্থ-সুবিধা রক্ষা করাটা প্রধানতঃ বনেচর আরণ্যক আদিম সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ ছিলো। (অনেকেই বলেন আটাসী ফলাবার 'গোত্র' ব্যাপারটাও এই 'গোষ্ঠী' ব্যবস্থারই রাজ সংস্করণ।)

এতো করে এ কথা বলবার দরকার ভ্রমণ-কথায় নেই। জানি। তবু কেন বলি। পাণ্ডিত্য জাহির? না। তা নয়। খুব প্রয়োজন আছে। পরে সিঙ্গাপুর বিশেষ করে কাম্বোজ খণ্ডে অনুধাবন করতে পারবে।

আচার্য সুনীতিকুমার 'কিরাত জন সংস্কৃতি' বলে একটা সংস্কৃতির সঙ্গে

আমাদের দেশের আদিবাসী সংস্কৃতির যোগাযোগ স্পষ্টতঃ দেখিয়েছেন। এই 'কিরাত' জন নিয়ে টানাটানি করতে গেলেই অসম-ভূমি, অসম ছাড়িয়ে আরও পূর্বে, দক্ষিণ পূর্বে যেতে হবে। কিরাতের মধ্যে মোঙ্গোল জড়িয়ে আছে; এবং ঐ মোঙ্গোলই জড়িয়ে আছে আবার তামাম শঙ্খদ্বীপে,—এখন যার টুকরো টুকরো বিভাজন সঙ্কুল নাম লাওস্, থাই, কাম্বোজ, শ্যাম, মলয় ইত্যাদি।

ঐ যে পাশাপাশি সারিবন্দী ঘর গেঁথে গ্রামের গড়ন, গ্রামের প্রবেশ পথে সুদর্শন সজ্জিত মন্দিরকল্প এক মণ্ড (নাম থাই দেও), এবং সাধারণের মিলন সভা মণ্ডপ গৃহ (নানা নামে) এটা যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতীয় প্রাগার্য সমাজে পাচ্ছি তাই নয়, পাচ্ছি এই কিরাত সংস্কৃতির মধ্যেও। কাজেই কী করে না ভেবে থাকি যে ঐ কিরাত সংস্কৃতি এবং এই ওঁরাও, হো, মুণ্ডা, বিড়হোড়, নুলিয়া, জুয়াং, ভুঁইয়াঁ সংস্কৃতির মধ্যে—'এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোনো মিল'। এরা নাম দিচ্ছে ধুমকুড়িয়া, ওরা নাম দিচ্ছে মোরং ; এরা নাম দিচ্ছে গীতিওড়, ওরা নাম দিচ্ছে নোক্‌পান্তে। এই নোকপান্তে, গীতিওড়ই হোলো ভাগবতঘর, চণ্ডীমণ্ডপ। না ভেবে পারিনে। দেশে দেশে দেশ দেখি, সমাজ দেখি, মানুষ দেখি। না দেখে পারিনে যে মানুষে মানুষে মিল নদীর জলের সাগরে এসে মেলার মতো অবধারিত সত্য। পৃথক আমরা হয়েছি আরও হবো। কিন্তু ছিলাম না।—বা, হয়তো পৃথক ছিলাম ; কিন্তু মিশে যাবার জন্য আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। তাকে মারতে গেলে আমরাই মরবো। তবু দেখছি এই স্বাভাবিক প্রেরণায় বাধা সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক স্বার্থের কায়েমী গুঠবন্দী। রক্তের, বংশের দোহাই পেড়ে কতকগুলো মানুষকে বঞ্চিত করে রাখার কারসাজি।

কিন্তু কিরাতের সঙ্গে আর্যামীর তথা অস্ট্রিক আদিবাসীদের মিলটা এলো কী করে ?

অর্জুনকে উপদেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব কিরাতদের সঙ্গে মিশ খেয়ে ওদের "বিদ্যে" আয়ত্ত করতে। ফলশ্রুতি কয়েকটি সুন্দরীর শয্যা বিহার ঃ উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদা তার প্রধান। এবং আরও বড়ো হয়ে দুটো তথ্য চেয়ে আছে মহাভারতে (অবশ্য সে দুটোকে আর্যরা খুব—'ইতি গজ' সুরে low key-তে গেয়ে থাকেন)।

এক,—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া-রক্ষা যুদ্ধে অর্জুন পারেন নি কিরাত নাগদের রাজা (অর্জুনের ছেলে হলেও) বভ্রুবাহনকে পরাজিত করতে। বভ্রুবাহন তবু জ্যেঠামশায়ের রাজ্যাভিষেকে যোগদান করলেন —'করদ' রাজা হিসেবে নয়। স্বাধীন রাজার প্রতাপে। স্মরণ করবে পদ্ম যে যে-উপঢৌকন দিয়ে কৃষ্ণের উপদেশে যুধিষ্ঠির বভ্রুবাহনকে মণিপুরে ফেরৎ পাঠিয়ে

দিলেন তেমন সশ্রদ্ধ সমাদর পাণ্ডবরা অন্য কারুকে দেখান নি। মনে রাখবে, তেজস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ভুলেও কোনোদিন আর্য-সংস্কৃতি নিয়মিত পুরুষপ্রধান সমাজের চৌহদ্দীর মধ্যে পা-ও রাখেন নি। সেই পংক্তিগুলি মনে করো—

······নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায় সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি।

মোটেই 'ছায়েবানুগতা'র ছাঁদে ছাঁদিনী মনুর পাতা মোড়া আর্য ললনার চিত্র পাচ্ছি না।—এবং যে চিত্রাঙ্গদা কিম্বদন্তী হয়ে অর্জুনের ভাস্বর যৌবনের মানসলোকে 'কিমাশ্চর্য' হয়ে সম্মোহিনী জাল ছড়িয়েছিলো,—সে চিত্রাঙ্গদার বৈশিষ্ট্যই ছিলো—'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ!' আর্য শ্রেষ্ঠ অর্জুনের সামাজিক প্রত্যয়ের শিখরে স্বর্ণচূড়ার মতো এই প্রোজ্বল নবতা—স্নেহে নারী, —বীর্যে সে পুরুষ। এমন পৌরুষে পেলবতায় সমৃদ্ধ প্রলোভন দ্রৌপদীর মধ্যেও অর্জুন পান নি। এ কিরাত সম্মোহন (অসম মেয়েরা নাগিনীর মায়ায় ভেড়া বানায়।) 'অর্জুনেরে করিয়াছে অনর্জুন'। কিরাত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহত। অর্ধনারীশ্বরের মহনীয় আভোগ।

দ্বিতীয় কথাটা, কোনোদিনও বভ্রুবাহন বা চিত্রাঙ্গদা হস্তিনাপুরের রাজ্য চান নি। চাইলেন না।—অর্জুনের নিজের ছেলে, মূর্ধাভিষিক্ত রাজাধিরাজ ছেলে থাকতেও অর্জুনের নাতি রাজা হলেন (পরীক্ষিৎ); কিন্তু তিলার্ধ আপত্তিও এ বিষয়ে মণিপুর রাজ্য থেকে এলো না। ইংরিজীতে যাকে বলে, with the contempt at deserved, সেই সম্পূর্ণ উদাসীন অবজ্ঞা দিয়ে এই বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনবিজয়ী রাজকুমার আর্য ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেছেন।

কাজেই এই কিরাতজনসংস্কৃতিও একটা অসাধারণ বীর্যবান রজোসমৃদ্ধ সংস্কৃতি।—মানতেই হবে।

কেবল মহাভারত হলে এতোটা বলতাম না।

এ বিষয়ে শঙ্খদ্বীপের কিম্বদন্তীও সোচ্চার। কিরাতজনসংস্কৃতির ওপরে দ্রাবিড়-আর্য সংস্কৃতির প্রভাব কী করে এসে পড়লো সে কাহিনীও তাৎপর্যপূর্ণ।

যদিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে শঙ্খদ্বীপের কোথাও ভারতীয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোনো হদিস পাওয়া যায় না, তবু এ কথা সত্য যে ব্রহ্ম মলয় শঙ্খদ্বীপ যবদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ ইত্যাদি ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় যোগাযোগ আরও প্রাচীন। পালিগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের চীন কাহিনীতে পাচ্ছি এক কৌণ্ডীন্যের কথা। তখন 'ফু-নান' অর্থাৎ কাম্বোজের সিংহাসনে ছিলেন সম্রাজ্ঞী বেতস-

পর্ণা (ল্যু-য়ে)। নাগবংশের মেয়ে তিনি। অসীম শক্তিশালিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপের তলায় কাম্বোজ, চম্পা শ্যাম সমগ্র মী-কং অববাহিকাই বশীভূত। দূরের দ্বীপ শ্রীবিজয়, শৈলেন্দ্রও (তখন নিশ্চয় অন্য নাম ছিলো ; এখন নাম সুমাত্রা, মালায়া) এ রাজ্ঞীর প্রতাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলো।

কিন্তু সব মেয়েরই (তা তিনি হোন না ক্লিওপাত্রা কি আফ্রোদিতে)—পালটি ছেলে আছে ; সব পুরুষের পাল্‌টি প্রকৃতি আছে। যাবৎ দেখা না হয় আমরা স্বাধীন। মোলাকাৎ যদি হয়ে যায়,—শিরি-ফরহাদ, পারীস্‌-হেলেন, বিদ্যা-সুন্দর।—কাৎ হতেই হবে। পেত্যয় না যাও জিগাও গিয়ে ভৃগু, বিশ্বামিত্র পরাশর, ব্যাসকে।

সোমবংশীয় ব্রাহ্মণ (পরে দেখবো এঁকে সূর্যবংশী-ও বলা হয়েছে !) কৌণ্ডীন্য কাম্বোজের উপান্তে শ্যাম অববাহিকা বয়ে আসছেন বিজয়ীর ডঙ্কা বাজিয়ে। রানী বেতসপর্ণা বিরাট সৈন্য নিয়ে আততায়ীর সঙ্গে মোকাবিলায় এসেছেন। কেউ কেউ এই কৌণ্ডীন্যকেই আবার কম্বু বলে চিহ্নিত করেছেন, যার থেকে কাম্বোজ নামের প্রসিদ্ধি।

যে পোশাকে বেতসপর্ণা যুদ্ধে এসেছিলেন সে পোশাকে নয়ন-পাতও শরশলাকা হয়ে বিঁধতো। কৌন্ডীন্যের ইন্দ্রাস্ত্র রানী সইতে পারলেন না। এক শরে 'বিদ্ধ' হলেন।—

রাজা হয়ে কৌণ্ডীন্যের প্রথম কাজ হোলো রানীকে কাপড় পরা শেখানো একটি চৌকো কাপড়ের মাঝে ছেঁদা করে রানীর গলায় লটকে দিয়ে তিনি বাঁচলেন। সেই 'ফ্যাশন'-ই এখন হয়েছে কবিতার মতো কোমল, স্বচ্ছন্দ 'সারং'। সৈন্য সেনাধ্যক্ষদের যে খুব বাঁচাতে পারলেন মনে হয় না। ঝটপট রক্ত সংমিশ্রণ হতে থাকলো বিপুল হারে। হবে না কেন ? এখনই বা এদের মধ্যে আবরণের রেয়াজ কতোটা ?

কৌণ্ডীন্য-কাহিনী এখানেই শেষ হলে বাঁচা যেতো। কিন্তু এ কাহিনীর বহু রকমফের আছে। পরে খ্‌-মের সৃষ্টি আঙ্কর-ভাৎ ও বায়ন অধ্যায়ে তা বলা যাবে। প্রসঙ্গ আঙ্কর শিল্প ঐতিহ্য। এখন এই থাক।

এই ঝটপট মিশ্রণের আতঙ্কেই আর্যরা একদা তৈরী করেছিলেন সামাজিক 'বর্ণ' ব্যবস্থা, যাতে বিজয়ীদের 'বাহাদুর' রক্ত বিজিতদের সঙ্গে না লাট খেয়ে যায়। কৌণ্ডীন্যই বা বাদ যাবেন কেন ? তাঁর বাসনাই খাঁটী রাখার জন্য নাগেদের (কিরাতদের) দেশে এক বর্ণ-ব্যবস্থা চালু হোলো। এ সবই নাকি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কথা। চীন কড়চা (৩য় শতাব্দী) থেকে, কিছু কিছু পালি থেকে জানতে পারা যাচ্ছে।

'নাম্‌' (ভিয়েৎ-নাম), নোম্‌ (নোম্‌পেন) মানে শিখর, গিরি। গিরি

খর, স্তূপের সঙ্গে শিশ্ন প্রতীকের যোগাযোগ বহু প্রাচীন, এবং তারই সাথে গ, বৃক্ষ, এমন কি নদী, কৃষি সবই প্রজননকামী সমাজের চোখে যৌন অঙ্গ থা যৌন মিলনের প্রতীক হয়ে আছে। কাজেই স্তূপে, মন্দিরে, চৈত্যে র বার যে উদ্ধত, আস্ফালিত, উদগ্র শিখর, কলস, ধ্বজা ইত্যাদি কালে কালে চত হোলো সারা মানব সমাজ ব্যেপে তার পরিচয় এদেশেও পাই। কাম্বোজ রিক্রমায় পদে পদে পাবো নাগ, শিখর, গাছ, স্তূপ, চৈত্যের প্রতীকী মাবেশ। এটা নিশ্চয় কৌণ্ডীন্য, অস্ট্রিক, আদিবাসী এবং নাগ-কিরাতের াগাযোগ সিদ্ধ করে।

খ্মের-রা তাদের ভাষায় তাদের দেশকে বলতো 'কোক্-থ্লোক্ (Kok-thlok) র্থাৎ বনময় (বৃক্ষময়) দেশ। এই দেশের রানী ছিলেন বেতসপর্ণা। রীপ্রধান সংস্কৃতির দিগম্বরী প্রতিভা। সেই বেতসপর্ণা বিদ্ধ হলেন কৌণ্ডীন্যের একটি শরের বিক্রমে। এ কাহিনীর তাৎপর্যও স্পষ্ট। মাতৃতান্ত্রিক ংস্কৃতিকে চুটিয়ে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিতে টেনে আনার ফলে কোটি কোটি সঙ্কর বর্ণ, াস গোষ্ঠি এবং অ-সম বিধান। ফলে বৌদ্ধ একরূপতা, সাম্য-সংস্কৃতি। ফলে বস্থানও চৈত্য।

হলেও গ্রাম ;—ওই গ্রামের বিন্যাসে পাচ্ছি উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মেদিনীপুর, র্ধমান, ধলভূমি, বাঁকুড়া।

চৈত্যটি বড় সুন্দর, বড় স্পষ্ট। এরা বলে 'প্রেত' অর্থাৎ দেবতাত্মার বশ্রাম নেবার ঠাঁই। বাড়িতে, দোকানে, যেখানে সেখানে প্রবেশের মুখে এই প্রেত' চৈত্য, 'প্রেত' মন্দির থাকবেই।

গ্রামের শেষের দিকে একটা বাড়ির সামনে সারি সারি শত শত নানা াইজের ছোটো ছোটো 'প্রেত'। বিক্রী হবে। সাজানো আছে।

এই সেই অযোধ্যা। আজ একটি গ্রাম। কিন্তু একটু ঘুরলেই বোঝা যায় কদার সমৃদ্ধি।

অযোধ্যা আসার ঢের আগে ধান ক্ষেতের প্রান্তে দেখা যায় জেগে আছে সারি ারি মন্দির চূড়া। পথ থেকে বাঁ হাত মুড়ে ধান ক্ষেত পার করে 'শহর' এখন গ্রাম) যেখানে আরম্ভ, সেখানেই বিশাল প্যাগোডা, জরা জীর্ণ। থগুলো ঘুম-ঘুম। মাঝে মাঝে দীর্ঘ পাঁচিল। পুরোনো ; ভেঙ্গে পড়ছে। তবু াঁচিল। বোঝা যায় প্রাসাদের অবশেষ। তার মধ্যে চাষ এবং বাস ও চলছে।—

'সুখো থাই'—নাম ছিলো দেশের ছ'শ বছর আগে। 'সুখস্থান', শান্তি মারাম, ভাই-চারার দেশ। শিলালেখে পাচ্ছি "এ দেশ সুখের, আরামের। এ ুখো-থাই। এখানে মাঠে ধান ; জলে মাছ। এখানে মানুষ স্বচ্ছন্দ। রাজা মাদায় করে না শুল্ক..."

এ-তো শিলালেখ। মরে যাওয়া দিনের কঙ্কালের মধ্য থেকে বেরিয়ে আ
চিৎকার। কিছু বোঝা যায়; কিছু যায় না; বর্তমানের দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষি
অবিস্মরণীয়। তবু সত্য: বামুর্দায় আজও ইনকম্ ট্যাক্স্ নেই। পার
উপসাগরের অনেক শেখ-দুনিয়ায় শুল্ক দিতে হয় না জনসাধারণকে। সরকার
অ-ব্যবস্থার মূল্য জোগাতে, রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ গজাবার আশ্চর্যকে
পুষতে,—"ভদ্র" এবং "উন্নত" দেশগুলো ট্যাক্স্ দিতে দিতে হিমশিম। আ
পৃথিবীতে যত ট্যাক্স সংগৃহীত হচ্চে তার শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশী ব্যবহৃত
হচ্চে যুদ্ধোপকরণের সংগ্রহে যুদ্ধ যাতে হয়, এবং যদি হয় সেই ব্যবস্থা ও
পরিস্থিতি পাকা করার জন্যে প্রতিটি দেশ হিমসিম।—থাইল্যাণ্ড আজও শান্ত,
কারণ এ সব দেশগুলোর ধারা-টাই শান্ত ধারা। নৈলে বেপরোয়া ক্ষেতে-
খামারে, ঘরে সংসারে ঢুকছি কী কোরে? য়োরোপে আমেরিকায় কী সম্ভব
নাকি?

লোপ্-বুরীর প্রাসাদ ঝরে ঝরে পড়লেও বোঝা যায় এ প্রাসাদের মহিমা।
মাঝে মন্দির ছিলো। মন্দিরে ছিলেন ধ্যান স্তিমিত পদ্মাসনে বুদ্ধ। তাঁর অঙ্গ
থেকে সোনা সবটা এখনও ধুয়ে যায় নি। আসনের ফাটল থেকে সাপ বেরিয়ে
চলে গেলো ফাটলে ফাটলে যে সব লতাপাতা গাছ গজিয়েছে তারই গভীরে। এ
মন্দিরের চৌকো পাথরের থামগুলোয় পল্লব-চোল ছাপ স্পষ্ট। দোরের মাথার
খিলানও ওড়িষ্যার খিলান, মার্তণ্ড মন্দিরের খিলান, কোনারকের খিলান মনে
করায়। ডান ধারের প্রাঙ্গনে সারি সারি বুদ্ধ। মনে হয় একদা মন্দির প্রাঙ্গণ
কেবল বুদ্ধে বুদ্ধে ভরা ছিলো।

লোপ্‌বুরি আজ সেনা-নিবাস। একদা কাম্বোজের রাজধানী ছিলো
পরে হোলো শ্যামের রাজার গ্রীষ্মাবাস। তারও পরে অযোধ্যা। অযোধ্যার
মন্দিরে বুদ্ধ বসে অনেক উঁচুতে। চারিধার ভগ্নস্তূপ। তার মধ্যেই শত শত
বুদ্ধ।

শিলালিপি পড়ছি—২১৩৫ বুদ্ধাব্দ (১৫৯২ খৃষ্টাব্দ; তখন ভারতে হুমায়ু
আকবর; ইংলণ্ডে হেনরী—৮ম এবং এলিজাবেথ) রাজা নরসিংহ যুদ্ধ করছেন
ব্রহ্মের রাজার সঙ্গে। সেই যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি এই মহা উপরাজ চৈত্য।

যুদ্ধের নাম ছিলো 'সংশ্বেতহস্তীর যুদ্ধ'। এ যুদ্ধের বর্ণনায় বহু শিল্পী
বহুবার বহু হাতির মাথায় তাদের প্রিয় রানীকে গড়ে তুলেছে। রাজা যুদ্ধে
যাবেন। কে বলেছে রানীকে যে এ যুদ্ধে রাজরক্ত ক্ষরণ অনিবার্য। প্রাণ
হারাতেই হবে। অথচ দোরে শত্রু। এ সময়ে কে বসে থাকবে শুভ লগ্নের
আশায়? রাজা চললেন। উদ্বেগ জর্জরিতা রানীও যাবেনই সঙ্গে। কিন্তু
এ কী আবদার রানীর? কী করে স্ত্রীলোক যাবে যুদ্ধে? কিন্তু রানীর মন

ঘটল। কাজেই রানী রাজার অজ্ঞাতে পুরুষের ছদ্মবেশে চললেন রাজার সঙ্গে হাওদায়। তিনি যেন বক্রী বাড়তি একজন মাহুৎ!

যুদ্ধ তো হাতির যুদ্ধ। শ্যামে তখন সত্তর হাজার হাতির বল।—রাজা নিজে পরিচালনা করছেন সাতটি শ্বেতহস্তীর বল। এই শ্বেত হস্তী নিয়েই দ্বন্দ্ব। হঠাৎ মোক্ষম এক বর্শার ফলা রাজার দিকে ছুটে এলো। আর রক্ষার কোনও উপায়ই নেই। রাজাকে বাঁচাতে রাজার মাহুৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো বর্শার মুখে। বর্শাটা বিঁধে গেলো তাঁর দেহে। তখন রাজা জানলেন সে মাহুত কে! কিন্তু তখন শোকের সময় নেই। পূর্ণ বিক্রমে রাজহস্তী তেড়ে গেলো ব্রহ্মরাজের দিকে। পরাজিত ব্রহ্মরাজও জানলেন নিজের প্রাণ দিয়ে রানীই বাঁচালেন রাজার প্রাণ। জ্যোতিষ সার্থক। রাজরক্ত বইলো।

মহা-চক্রপতি নরসিংহ দেব (১৫৪৮) হারালেন সূর্যদেবীকে (সুরিও থাই) সারা দেশ চোখের জলে ভাসলো। সূর্যদেবী হয়ে গেলেন শ্যাম রাজ্যের সীতা। তাঁর স্মৃতিতে অযোধ্যার অবিস্মরণীয় চৈত্য।

একটি টিনের বারান্দায় করাতের কল চলছে। শ্রমণদের বাসস্থান। শ্রমণরা কাঠের কাজ করছে। কাঠ কাটছে। মন্দিরের সংস্কার করছে। দীর্ঘদেহ বুদ্ধ শেষ শয়নে হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মন্দির সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।

স্কুলটা দেখতে গেলাম। এরাও পড়ায় চাণক্য শ্লোকের মতো যুগান্তের আপ্তবাক্য।

১

'পিঁপড়েরা বলে জল তুমি কেন বাড়ো ?
মাছগুলো আমাদের খেয়ে শেষ করে ;
জল বলে তোমরা কী মাছেদের ছাড়ো
ভাঁটায় জলের বাড় নেমে গেলে পরে ?

২

এক মুঠো দানা থেকে এক মাঠ ধান
এক মুঠো কথা থেকে হয়ে যায় গান
কেউ নয় ছোটেখাটো, বাজে কেউ নয়
বাথা ঢাকা ভালোবাসা ক্ষয়ালে না ক্ষয়।

৩

ভালো হাতি পেতে চাও বাছো লেজটাকে ;
ঘরণী বাছতে চাও, বাছো তার মাকে।

৪

বই পড়া বিদ্যে, স্বপ্ন ভরা নিদ্‌দে ;
ডিম ভরা মাচ্ছি, মজা বলে 'যাচ্ছি' ।

শ্রমণের যত কিছু রং আর ঢং ।
ব্রত ব্যতিরেকে শুধু ছিব্‌ড়ে ও সং ॥'

এমনি সব ছড়া । ছড়ায় ছড়ায় পড়া । ছড়ায় ছড়ায় জ্ঞান । ছড়ায় ছড়ায় অঙ্ক, ব্যাকরণ, শিল্পকর্ম, সওদাগরী, প্রজাপালন, পঞ্চায়েৎ । এই ছন্দের দোলায় জ্ঞান । তাই থাইদের দুর্দিনেও থাই হাসতে ভোলে না ।

শ্রীরাম পার্ক সত্যিই মনোহর । আর মনোহর তার কিনারে আধুনিক একটি বুদ্ধ মন্দির । এর পাশে বাজারটি কেবল পর্যটকদের জন্য । এইখানে একটি থাই পরিবারের চালায় বসে সর্ব-বহির আনা ভাত-মাছ এবং নারকোলের বড়া খেলাম । সেই সঙ্গে চাকা চাকা করে ভাজা ব্রেড ফ্রুট । জল নিলাম ডাব । সেই ঘটির মতো সুশ্রী করে কাটা ডাব । খাওয়া সেরে কফি চাইলাম ।···দেখলাম অতিথির সঙ্গে স্ত্রী জাতীয়া যদি কেউ থাকে, বড় হোক, ছোটো হোক,—যুবতী হলে তো কথাই নেই, সুন্দরী হলে এক্‌কেবারে—ভি. আই. পী'র খাতির । কণিকা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিতে দিতে এক ফাঁকে বললো,—পৃথিবীর সব মেয়ে গিয়ে শো-কেসে ঢোকেনি । এটাই বড়ো কথা দাদা ।

হ্যাঁ কীবা ব্রহ্ম, কীবা সর্বনাশ,—সর্বব্যাপী হবার পরেও কিছু বাকী থাকে ; তাই তো বলে, অত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ । সবারে বাদ দিয়া দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর ! শো-কেস্‌ও আছে ; আবার তার বাইরেও জগৎ আছে । আমরা যে বাইরে বাইরে পালিয়ে আছি এই আমাদের গৌরব ।

আয়োধিয়া শেষ । তবে কি ফেরা ? তাই তো টুরিস্ট করে ।

না বাড়ি নয় এখন !

ভ্রমণে পেয়েছে । দক্ষিণে চলেছি ! আরও মাইল চল্লিশ যেতে পারলে নাথোন্‌-পাথন্‌, ফেট্‌-বুরী ।

যাওয়া যাবে । ফেরা যাবে না ।

গাড়ি কী বলে ?

গাড়ি টয়োটা । গ্যাস ভরলেই চলবে ।

এতো গ্যাস ! পাবে কোথায়, পেলেই বা দাম ?

হঠাৎ সর্ববহ্নি বলে,—কণিকা, দাদাকে নিয়ে বোসো। আমি আধ ঘণ্টার ধ্যে আসছি।

আমি হ্যামক পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। কণিকা বসে সে ওদের মাছ ছাড়ানো শিখতে লাগলো।

মাছ ওরা মুক্ত প্রাঙ্গনে গাছের তলায় বসে কাটছে। গুলতুনীর সুবিধা। —আমি ওদেরই 'দয়ায়' এবং কিছু বিচক্ষণতার বদৌলত হ্যামক-জাত হয়েছি। হ্যামক ওরা ইদানিং পেয়েছে নতুন আমেরিকান 'আর্মি'র কাছ থেকে। ামেরিকানরা পেয়েছে মেকসিকানদের কাছ থেকে। ওয়েস্টইন্ডীজে এটার লাও ফৈলাত ব্যবহার। আমার তাই ভালোই লাগছে)।

বড় গাছটা যজ্ঞডুমুর। দূরে সুপারীর মস্ত বাগান। তুঁতের মতো ীল আকাশের পরিচ্ছন্ন গায়ে লেগে আছে হঠাৎ লাগানো আফ্‌টানের মতো ক টুকরো মেঘ। যেন ঠিকানা হারিয়ে গোলমালে পড়েছে।

আর আমি ভাবছি 'রাম', 'অযোধ্যা'—নামগুলো ভারতীয় মননতার শিখরে যন কেমন জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেয়। সত্য হোক না-হোক। ইতিহাস-সিদ্ধ হোক, া হোক।

এই মীনাম্‌ নদীর তীরে আজকের ব্যাঙ্কক। এরই অদূরে ছিলো াচীন দ্বারাবতী। জাহাজ লাগতো দ্বারাবতীতে। এবং এই নদীর তীরে ীরেই বার বার এই 'থাই' জাতিই বলো, 'শ্যাম' দেশই বলো, রাজধানী গড়েছে। উত্তর এবং পূর্ব থেকে বার বার এরা আক্রান্ত হলেও কাম্বোজই ছিলো এদের প্রধান প্রতিপক্ষ ; কারণ কাম্বোজ বলতে পশ্চিমে শ্যাম, পূর্বে চম্পা, উত্তরে ান্নাম্‌ সব মিলিয়ে ছিলো বিশাল কেন সুবিশাল সাম্রাজ্য।

সেই যখন জাপান আক্রমণে ফ্রান্স সব ছেড়ে পালালো,—জাপানকে রুখে াঁড়াবার দায়িত্ব পড়লো কাম্বোজেরই ওপর। জাপানকে পাত্তা দিতে যেই রাজী হোলো রাজা প্রথম নরোদমের ভাইপো রাজা শিশোয়ৎ মোনিভোং মনি জাপান কাম্বোজের একটা বড় হিস্‌সা শ্যাম (থাই) রাজাকে দিয়ে তাদের দলে টানলো। এখন সেই রাজত্ব ফিরে পাবার লড়াইটাই প্রিন্স রোদমের অর্থাৎ শিহানুকের লড়াই। উপরন্তু শিহানুক সমাজতন্ত্রী ; অর্থাৎ আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির হাঁ-তে হাঁ না মেলালেই সে কমুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী যাই বলো। মোদ্দা গণতান্ত্রিক নও।

এ হিসেবে জাপানের জবর সার্জারির প্রতিবাদে কাম্বোজের যে দাবী আজ সোচ্চার তাকে হেনাতন্ত্র, তেনাতন্ত্র বলে যতই মারপেঁচ করো,— আসল কথা কাম্বোজের প্রাচীন সীমারেখা কাম্বোজ চাইবে পুনশ্চ সঠিক করতে। (সবাই তো আর অহিংস ভারত নয়)।

আমি সেই মেনামের তীরের গ্রামে শুয়ে আছি। এ নদীর তীরে আরও উত্তরে ছিলো থাই রাজধানী সুখো থাই। শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সে রাজধানী নদীর তীরেই আরও দক্ষিণে এলো। তখন থাইরা কাম্বোজের খ্মের-দের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে।

সেটা ১৩৫৭। রাজা রামাধিপতি কাম্বোজের রাজধানী আঙ্কোর ধ্বংস করে লুট করে এনে নতুন রাজধানী গড়লেন সুখো থাইয়ের জৌলষ ভুলিয়ে দেওয় 'আউথিয়া'—অযোধ্যা। নিজের নাম রাম,—সেই ছন্দে তাল দিয়ে। নৈলে এই তল্লাটেই ছিলো নগরী লাভো, যার প্রাচীন নাম ছিলো দ্বারাবতী। তারপর নাম হোলো লোপ্‌বুরী। লাভো, লোপ্‌বুরী, আউথিয়া এখন পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপ। হোক ধ্বংসস্তূপ। তবু ওসব দিকে যাবো। যাবো প্রাচীন দ্বারাবতীর দোরে যে নগরী বাণিজ্য বন্দর ছিলো। সেকালে মলয়ের উত্তরে ব্রহ্মের দক্ষিণে এই 'থান্‌'-বাসীরাই বার বার ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ-সাজস করে শ্যামকে বিপর্যস্ত করেছিলো। এই ব্রহ্মের সঙ্গে—থানের সঙ্গে—দ্বারাবতীর মানুষদের সঙ্গে চির-বিবাদের ফলশ্রুতি আউধিয়ার প্রাচীন স্মৃতিতীর্থ—আউধিয়া রানীর স্মরণীয় মৃত্যু, যে কাহিনী গাথায় গাথায় এখনও শ্যামের জনতা গায় নাটকে নৃত্যে পরিবেশন করে।

এ অযোধ্যা সাকেত নয়; এ রাম সরযু তীরের পত্নি ত্যাগী স্বামী নয় এ রাম রাজা রামাধিপতির আদরের নগরী; রামাধিপতির সাহসিনী প্রিয়া স্মৃতিপূত নগরী।

আজ ধ্বংসস্তূপ। হোক। আমি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ভালবাসি। মানুষ মানুষের কথা, মানুষের সংগ্রাম সবকালে এক। মহাকালের স্রোতে মানুষে জীবনী পরিচরণ যেন এক সেতুবন্ধন।

আউধিয়া থেকে ফেরার পথে একটি মজার কিন্তু করুণ কাণ্ড হয়েছিলো অউধিয়ার কাছে শ্রীরাম-পার্ক-এর কাছাকাছি একটি মোটামুটি বড়ো নদী। নদী অত্যন্ত সুন্দর। দু পাড় ভরতি নৌকো আর মানুষের বসতি। জোর টানে প্রবাহ। প্রচুর বন বাদাড় ভেসে যাচ্ছে। দেখলে ডায়মণ্ড হারবার-হলদিয়া গঙ্গায় জোয়ার মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় কোলা ঘাট। তার ওপরে যে সাঁকো সেটি লোহার এবং বেশ পোখ্‌তো। কথায় কথায় বহ্নিকে বললাম,—কী সুন্দর নদী। গম্ভীর ভাবে ও বললো, হ্যাঁ সুন্দর!

কী নাম ও নদীর?

বহ্নি জবাব দিলো না। কণিকা ইশারা করলো কোঈ বাত হ্যাজ্‌। চুপ করে রইলাম।

ফিরবো সেই পথে। হঠাৎ বহ্নি গাড়ি ঘুরিয়ে নেমে এলো পুলের নীচে

নদীর একেবারে তীরে। জন বসতির অপূর্ব শোভা। একদা এরা ছিলো রাজধানীর নাগরিক। আজ এরা ততো ধন্য নয়।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, নদীটার কী নাম? কী যে বললো। শুনলাম মেকং! (কিন্তু আসল নাম মেপং)।

শুনেছি 'মেকং'। সব ভুলে চমকে উঠলাম, মেকং! শ্যামের গঙ্গা মেকং! (মেকং নামটা নাকি 'গঙ্গা'রই অপভ্রংশ 'মা গঙ্গা = মেকং।) হো-শী-মিনের মেকং!! দিয়ে বিঁয়ে ফুঁর মেকং! ভিয়েৎনামের ধমনী মেকং। মেকং ডেলটার মা মেকং!! অবাক হয়ে চেয়ে আছি। উত্তেজনার মুখে মনে হয়নি মেকং তো আরও উত্তর দিয়ে থাই-ল্যাণ্ডের সীমা রচনা করে গেছে। এখানে মেকং কী করে হবে?

পুতচিত্তে জলস্পর্শ করেছি মেকং ভেবে। পুলকিত হয়েছি গঙ্গার মতো মেকং স্পর্শ করে। বহ্নি তখন শুধু বললো মেকং হোক মেপং হোক এ নদী এখন আমাদের নয়। দেখুন পরখ কোরে এখানে ফোটোও নিতে পারবেন না। মিলিটারির অধিকারে দাসী হয়ে আছে থাইল্যাণ্ডের সব নদী!! বুঝলাম ভায়া কেন চটেছিলেন। ক্ষোভ!!

সেই ক্ষোভের পরেই সর্ববহ্নি বোধকরি লজ্জিত হয়েছিলো। নদীর পুলের ওপর থেকে ছবি তুলতে পারিনি! ঘোরাপথে অন্যত্র নদীর কিনার পেতেই ছবি তুললাম। কিন্তু বুঝলাম আমাকে খুশী করার জন্য সর্ববহ্নি পেট্রল সংগ্রহে ছুট দিলো।

আর আমি মনশ্চক্ষে চেয়ে দেখি একটি ঐতিহাসিক নদী। সিন্ধু, নীল, য়ুফ্রাতিস্, গঙ্গা, ভোল্গা,—আর যে নদীর নামের ধ্বনি আমায় বিহ্বল করলো—সেই মীকং। এ মীপং; মীকং নয়। না হোক। যখন পেট্রলের দাম দিতে গেলাম, দেখলাম কোকাকোলার চেয়েও কম দাম। ওদের সঙ্গে সড় আছে ঐ সব মিলিটারী আমেরিকান ঘাঁটীর। ওখানে গিয়ে শুধু ট্যাঙ্ক ভরে নাও। এই ভাবে গ্যাস খরচ করতে পারলে, অর্থাৎ সর্ব-বহ্নিদের খুশ্ তবিয়ৎ রাখার জন্য খরচ করতে পারলে থাই মনে করে তার স্বর্গের সিঁড়িতে কেউ সোনালী তবক গুঁজে দিচ্ছে।

পথ অবশ্য তোফা। রোদ আছে, হবেই! ধুলো?—না! ভীড় আদৌ নয়। সর্দারজীর ইণ্টারস্টেট ট্রাক নেই; সরকারী ইণ্টারস্টেট বাসগুলো বাসের মতোই দেখতে। যাত্রীরা ভেতরেই বসে।—গরুর গাড়ি নেই বললেই হয়, কারণ গরু এরা খায়। মোষের গাড়ি মাঝে মাঝে। তবে ফ্যাক্টরী আছে। গুড-ইয়ার, থাই-কুবাকো—অর্থাৎ আমেরিকান ফুড-প্রোসেসিং কারখানা। ধানের জন্য চালের কল। মদ চোলাইয়ের কল। মাঝে মাঝে ঝুপ-ঝাপ গুপ্

ঢুপ এয়ার পোর্ট। পাশে পাশে রেল লাইন দৌড়ুচ্ছে!—এক এক সময়ে পথের পাশে এসে পড়ছে রেল লাইন।

নাথোন পাথোন আগে পড়লেও আমরা না থেমে সোজা প্রথমেই গেলাম ফেৎ-বুরীতে (পর্বত-পুরী)। পর্বতপুরী তো পর্বতপুরী। যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলাম তখন পর্বতের মধ্যে মধ্যে এমনি গুপ্-চুপ মন্দির দেখেছি। বিষ্ণোদেবীর মন্দির, নুরুদ্দীনের পীঠস্থান, নন্দঋষির সাধন স্থান, মার্তণ্ড মন্দিরের পথে গুহা, এমন কী স্বয়ং সেই অমরনাথ গুহা-সব মনে করার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি কৈলাস-ইল্লোরার গুহা মন্দির মনে আনতে। পদ্ম, এ এক অভিনব ব্যাপার।

সঙ্গে সঙ্গে কণিকা চেপে ধরে আমার হাত! দাদা! কী আশ্চর্য! কী সুন্দর। দুই চোখে মোর কুলায় নাকো!

আমি বলি, কণিকা পৃথিবীটাই আশ্চর্য কণিকা! দেখো, কাপ্রী বলে নেপ্‌ল্‌সের কাছে ছোট্ট একটা দ্বীপের ব্যসন হোলো জুয়ায়, মেয়েতে, মদেতে খরচ করা। এমনি শৌখীন অসচ্চরিত্রতার পীঠ ক্যানেস; মোনাকো মণ্টি-কার্লো। কিন্তু আমি সেসব খাস্তা পীঠে গিয়েছিলাম দুটো জিনিষ দেখতে। টাকা তো নেই যে ঐ সব বাদদে একটু রস গ্রহণ করি! তবু···

কণিকা বলে, আহা, থাকলে যেন করতে! আমি শুধু হাসি। তবু গেছিলাম। কেন জানো? অগষ্টস্ সীজরের প্রমোদশালা দেখতে, আর Blue Grotto দেখতে। ভাড়ায় নৌকো পাওয়া যায়। গাইড নৈলে যাওয়া যায় না। আলো নৈলে দেখা যায় না। কিন্তু সেই আলো যখন জ্বলে,— সিলিকোন, গন্ধক (সাল্‌ফার), স্ফটিক (কোয়ার্‌ৎজ্), তুঁতে—সব মিলে চাপ চাপ যেন সোনা, হীরে, পান্না, মরকৎ, বৈদুর্য!! সেই ছাদ থেকে লাভার মতো ঝুলে আছে রংয়ের ঝালর, রংয়ের বন্যা, রংয়ের ঝলক। ভীষণে ভয়ঙ্করে সে এক সুন্দর।

এমনিই আরেক সুন্দর দেখেছিলাম ভার্জিনিয়ায় স্মোকী মাউন্‌টেন্‌সের তলায় লুরে ক্যাভার্ণস্‌এ। সে সব নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের গম্ভীর রুদ্ররূপে ভয়ালে-মনোহরে মেশানো বর্ণ মাধুরী যতো দেখা যায় কেবল মনে হয় বর্ণনার চেয়েও মনোহর অনির্বচনীয় চমৎকার। প্রকৃতির কারখানায় যে সব অলঙ্করণ তৈরী হয় তার মধ্যে অতিবর্ণনার অতিশয়তা আতিশয্য বোলে ধাক্কা মারে না। কী সাহিত্যদর্পণ, কী কাব্য প্রকাশ, এখানে এসে চুপ।

কিন্তু এ অন্য ব্যাপার। গৈরিক বর্ণের পাহাড়ের গহ্বর পাতালের দিকে ঢুকে গেছে। অসংখ্য গুহার ইশারা এড়িয়ে একটা বিরাট গহ্বরের মুখে এসে দেখা যায় নীচে ঝকঝক করছে গৈরিক চত্বর। চত্বরের চারপাশে পর্যটকদের

সার জন্য ঐ পাথরেরই বেঞ্চি। ধাপ কাটা আছে। নীচে থেকে ওপরে তাকালে হু উঁচুতে আকাশের ফালি দেখা যায়। সেই ফাঁক বয়ে সূর্যালোক যেন য়ে চুয়ে আসছে। মেঝেয় সে আলো প্রতিফলিত। সেই প্রতিফলনের প্রভায় মালোকিত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি। তার দুপাশে হাঁটুমুড়ে সে আছে দুই ভক্ত, বন্দনারত। গুহার চৌদিকে পাথরের বেদীতে উপবিষ্ট শত শত বুদ্ধ। শ্রমণদের শত শত বৎসরের ভাস্কর্য সাধনার ফল।

কিন্তু ফেৎ-বুরী সমুদ্রের ওপর। বেশ বড় শহর। তিনচাকার রিক্সা-সাইকেলগুলোর নাম 'সাস্লোর'। ব্যাঙ্কক-ফেৎবুরির এই পথ থাইল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পথ। ফেৎবুরীর বাজার ভর্তি ঠুনকো সওদার ঢের। ফেৎ-বুরীর নগরে বন্দরগাহের কোলাহল। অথচ ফেৎবুরীর অদূরে নিভৃতে এই বন্দরে বহু-শতাব্দীরর অতীতে রচিত এই শান্ত বুদ্ধপ্রেম।

আমাদের সময় নেই। নাথোন্-পাথনে পেঁছে রাতে থাকবার জায়গা বার করতে হবে। দৌড়ুলাম,—মানে গাড়িতে চাপলাম।

নাথোন-পাথোন (নাবিক্পট্টনম্ ?) ব্যাঙ্কক থেকে ২৭ মাইল। এখানে আছে চৈত্য, থাইল্যাণ্ডের প্রাচীনতম, এবং আমার মতে সম্পূর্ণতম ও সুন্দরতম। দেখে মনে হয় ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা! কিন্তু এ রূপ সাম্প্রতিক। প্রাচীন প্রাহ্-পাথন্-চেদীর (প্রিয়পত্তন-চৈত্য) স্তুপ বুদ্ধের শরীরের কোনও অংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হতে পারে, নখ, কেশ, দাঁত বা কাপড়-কমণ্ডলু। জানা নেই। এ স্তূপ থাইল্যাণ্ডের বহু-সম্মানিত শীর্ষস্থানীয় তীর্থ। বহুবার, বহুরাজা বহু প্রজা এর সংস্কার সাধনে, শ্রীবর্দ্ধনে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেছেন। ধর্মের কী যে রহস্যময় আকর্ষণ। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বর।

কোনও নৃপতি কখনও এ স্তূপের সমুখ দিয়ে কোনোখানে যাবেন না। এমন কি এ শহরের পাশ দিয়ে গেলেও এখানে এসে পূজা করে তবে যান। রাজা মুকুট (১৮৫১-১৮৬৮) এই স্তূপ আমূল সংস্কার করান। এর চতুর্দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে যাত্রীদের বাসের যোগ্য করে তোলেন। এর পাদদেশে উঁচু চত্বর ঘিরে সুন্দর রেলিং। এঁরই বংশধর রাজা ষষ্ঠ রামের অস্থি যে বেদীর তলায় সমাহিত করা হয় তার ওপর দণ্ডায়মান মুদ্রায় অতি সুন্দর এক বুদ্ধ মূর্তি স্তূপ সংলগ্ন উদ্যানের প্রবেশদ্বারের সুমুখেই যাত্রীদের অভয় দিচ্ছেন।

জঙ্গলে ঢাকা এই স্তূপের উদ্ধার ও নির্মাণ থাইবাসীর গৌরব। কিন্তু রূপকথার মতো এক আখ্যায়িকা জড়িয়ে আছে এ স্তূপকে ঘিরে। কী করে যে গ্রীসের ইতিহাসের এক পাতা ছিঁড়ে এখানে উড়ে এলো কে জানে। কিন্তু এই স্তূপ এবং সেই কাহিনী সূর্য এবং চন্দ্রের মতো একই আকাশের দুটি বালব্।

বুদ্ধের মৃত্যুর কিছু পরে থাইয়ের রাজার গণৎকার গুণে বললেন তাঁর

সদ্যোজাত ছেলে হবে পিতৃহন্তা। রাজা চমকে উঠলেন। রানীর আতঙ্ক অশ্রু সত্ত্বেও ঠিক হলো এ ছেলেকে বনে ফেলে আসা হোক। থাইয়ের জঙ্গলে বাঘের অভাব নেই। ছেলেকে ফেলে আসা হোলো।

কিন্তু রানীর সেই কান্না ধাঈ মা সইতে পারেনি। সে কারুকে জানায়নি। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে জঙ্গলে অপেক্ষা করেছিলো। রাজ পুরুষের অগোচরে অন্য পশুর রক্তে ভেজা রাজপুত্রের কাঁথা জামা জঙ্গলে ইতস্ততঃ ফেলে দিয়ে ছেলে নিয়ে চলে আসে।

আর পুত্র হয়নি সে রাজার।

এবং এই স্মৃতি তাকে পাগল করবে এতে আশ্চর্য কী! শিশুর ক্রন্দন শুনলেই, নতুন জন্ম শুনলেই রাজা যেন উন্মাদ হয়ে যেতেন এবং রাজ্যে অশাসন কুশাসন, অত্যাচার,—বেড়েই চললো। রাজ্যময় হাহাকার। রাজার শিশুহন্তা রাক্ষসীবৃত্তির দোরে বসে রানী ক্ষয়ে যান ধীরে ধীরে।

হাহাকারের প্রতিবিধান এলো কুড়ি বছর পরে যখন বন্যদল নিয়ে সেই ধাত্রী পুত্র (?) এসে রাজাকে যুদ্ধে নিহত করে স্বয়ং রাজা হয়ে বসলো ; এবং তখন ধাত্রী এবং রানীর সাক্ষ্যে সত্যকথা প্রচারিত হোলো। অবশ্য গ্রীসের নাটকের মতো এই বিজয়ীপুত্রকে জননীকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে হয় নি।

রানীকে তো ছেলে জানে না। কিন্তু ধাত্রী তো দিনে দিনে সব জানতো। ধাত্রী উৎক্ষিপ্ত করেছে রাজপুত্রকে এই উন্মাদ রাজার হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে। যুদ্ধ এবং প্রাণ নাশ ছাড়াও তো অন্য উপায় হতে পারতো। তবে এ পিতৃহত্যা কেন তাকে করতে হোলো? রাজপুত্র প্রাণদণ্ড দিলো সে ধাত্রীর।

এই পিতৃহননের প্রায়শ্চিত্তে ঐ স্তূপ। এমন চৈত্য গড়ে দিতে হবে যে উচ্চতাকে কোনো পাখিও ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না! উড়ন্ত বন্য পারাবতকে তার নীচে দিয়ে উড়ে যেতে হবে। আজও থাই রাজার কাছে, থাই দেশের কাছে এ তীর্থ সর্বাগ্রগণ্য মহাপীঠস্থান। এখানে সমাহিত হওয়া পরম গৌরবের। থাইল্যাণ্ডের মণিকর্ণিকা এ তীর্থ।

রাতে থাকার জায়গা হয়েছিলো সঙ্ঘারামেরই অতিথি নিবাসে। কিন্তু কণিকা বললো এখানে খাওয়া সেরে নিয়ে তারপর চলা যাক দাদা। রাতে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। ঘণ্টা দুইয়ের বেশী লাগবে না। বেশ হবে। তুমি গাইবে, আমিও। কতোদিন পরে দাদা পেয়েছি। কতোদিন পরে মনে হচ্ছে আমি হাল্কা, আমি মুক্ত। কাল তোমার কী যে হয়েছিলো আমি কি অ বুঝিনি দাদা? এই তুচ্ছ সসীম প্রাণটুকু বাঁচানোর আশায় মানুষ যে ক

াকুল হয়, আর কী চরম মূল্য দিতে রাজী হয়ে যায়, আমার বেশী তা কে জানে া ? তোমার সেই যন্ত্রণা আমি বুঝেছিলাম বলেই বললাম আমার ঘরে গিয়ে াও। সে বলাটায় ছিলো আমার আরাম। শুধু কর্তব্য নয়। কিন্তু আমিও ল থেকে ভাবছি মানুষের জন্যে পথের মানুষের জন্য এতো ভালোবাসা কোথায় ম পাও ?

সকালে ও কখন গেলো রে ?

আমার আগেই উঠেছিলেন। ঘরে আমাকে দেখে কিছু বোঝেনও নি লেনও নি। শেষ রাতে বা খুব ভোরে উঠেছিলেন। আমার জাগার অপেক্ষা রছিলেন। একটা নোট্ লিখে রেখেছিলাম যদি চোখে পড়ে। সেইটা দেখে মার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন। খুব বুদ্ধিমতী। স্নান সেরে জামা পরে ুছিয়ে নিয়ে নিজেই টেলিফোনে কফির অর্ডার দিয়েছিলেন। কফি আসতে াসতে আমিও রেডী। তোমার ঘরে টেলিফোন করি নি, তা নয়। কিন্তু াড়া পেলুম না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলুম। বললুম তুমি সারারাতই প্রায় াগেছিলে। বলতে গেলে সকালেই হয়তো শুয়েছো। শুনেই উনি উঠে ড়লেন। তৈরী হয়ে চলে গেলেন। যেমন পার্সনালিটি, তেমনি িস্টক্রাটিক। তবে একটা কথা বলে গেলেন, ভাবছি তোমায় বলি ক না।

আমি বললাম,—বেশতো ; বোলো না। না বলে থাকতে পারলে একটা তহাস হয়ে থাকবে। দেখাই যাক না কেন! পারো কি-না! চেষ্টা বা।

লাল হয়ে উঠলো কণিকা। বললো, ওঃ! কী দুষ্টুরে বাবা। এই সব সময়ে ন হয় তোমার মালিকা-কে কাছে পাই ; বলি,—এই পেটভরা দুষ্টুমী নিয়ে া—করার সিক্রেটটা আমায় শিখিয়ে দেবে বৌদি ?

'বৌদি'—কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় কণিকার মনে পড়ে গেলো দাকে, বাবা-মাকে, সুখের সংসারকে,—যে সংসার আর হবে না। বার বার াখ মুছতে লাগলো সে।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে চৈত্যের ধারে সেই সিঁড়ির ধাপে এসে বসেছি। চাঁদের ালো এসে আছড়াচ্ছে চার ধারে। কোথায় ফুটেছে মুচকুন্দ। তার ভারী গন্ধে ন আমের বোল ধরা শেষ বসন্তের মৌতাত। দূরে কাছে লোকজন ঘুরছে। ূপের তলায় দুলছে মোমবাতির নিবেদন।—

আমি শান্ত কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই বললাম, কণিকা, অযথা মনকে ভারী রে তুলো না। বয়স তোমার হাল্কা ; মেজাজ তোমার মিষ্টি ; দেহ তোমার কুল-মঞ্জরী ; মনে তোমার সৌরভ। কবিতা লাগছে হয়তো, কিন্তু সবচেয়ে

সত্য কথা সবচেয়ে নিবিড়ে সবচেয়ে চরম মুহূর্তে বললেই কবিতা হয়ে যায়।
হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—

Youth ended I shall try
My gain or loss thereby ;
Leave the fire ashes ; what survives is gold
And I shall weigh the same
Give life its praise or blame :
Young, all lay in dispute ; I shall know,
being o.

কণিকার চোখের জল টপ টপ করে পড়ছে। বললো, থামলে কেন ? ব
আরও বলো,—

কিন্তু আমার অপেক্ষা না কোরে নিজেই বলতে লাগলো,—

Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language, and escape
All I could never be,
All, men ignored in me.
This, I was worth to God, whose wheel the
pitcher shaped.

হ্যাঁ, কণিকা—you too are worth to God। God আছে কিনা
জানি না। থাকলেও তা অ-দৃষ্ট। কিন্তু যা দৃষ্ট, এই পৃথিবী, এই জীবন,
এই তুমি, আমি—এ সবই সত্য। জীবনের যে কোনো বিপদের চেয়ে সত্য।
কারণ বিপদরা আসে যায়। ব্যক্তির ঘাটে ওরা ঢেউ। যা সত্য তা নদী ; নদীর
জল ; জলে তৃপ্তি। তোমার ঘর হবে, হবে, হবে। কণিকা,—জীবনের ধন
কিছুই যায় না ফেলা।

ব্রাউনীং ছিলেন বাবার প্রিয় কবি। আমরা ভাই বোনেরা রাবি-বেন্-এজ্রা
প্রায় পুরোটাই বলতে পারতাম।

চুপ করে এসে দাঁড়িয়েছে বহ্নি।

কখন এসেছো ?

বেশ লাগছিলো। কিন্তু রেশমী কবিতা চড়ে তো ব্যাঙ্ককে পেঁছোনো
যাবে না। চলুন খানা খেয়ে দৌড়। খানা তৈয়ার।—

সকালে আমি চেষ্টা করছি পরের দিনের সীট বুক করি, যাবো সিঙ্গাপুর।

স্তাসা করিনি কণিকা যাবে কি-না। সীট নিজেই বুক করছি। সাড়ে ছটায় টা প্লেন। সকালে যেতেও কষ্ট ; তা ছাড়া পরের দিনে সাড়ে পাঁচটায় ছাড়তে হোটেল। এমন কায়দা করে প্লেন নিতে হবে যে চব্বিশ ঘণ্টার কম থাকলেও গাপুর দর্শন হয়ে যাবে। এয়ার লাইনের ঘাড়ে থাকা যায় ঐটি হলে।— ন একটা পেলাম সাতটায়। পেঁছিবো নটায়। সারা দিন, সারারাত। পরদিন র ছটায় প্লেন পাচ্ছি হংকং।

এমন সময়ে নেমে এলো কণিকা। সব শুনে বললো, ওমা, তা কী করে ব? সবে এখন সিহানুক এসেছেন কাম্বোডিয়ায়। আমি ভিয়েতিয়েনে বোই ; দক্ষিণেও যাবো।—তোমার তাড়া-টা কী? বলো তো? আমার ছে টাকা নেই ভেবো না। যা আছে সবই নয় খরচ করবো। লাওস্ রেও যাবো।—পাথেট্-লাও এলো বোলে। এই মেকী রাজ্য আর তস্য লর বিল্বপত্র সোঁকার-ও দিন আগত অই! বাধার সৃষ্টি কোরো না অনর্থক।— বোই আমি, এবং তুমিও যাচ্ছো।

তবে তো স্টেশনে চলতে হয়। বুকিং করার হাঙ্গামা আছে।

কোনো হাঙ্গামা নেই। বহি সব করে দেবে। ওকে কালই আমি টাকা য় রেখেছি। আজ সকালে খবর নিয়ে আসবে। এখন চলো বহিকে বাদ য়ই আমরা আসল ব্যাঙ্কক দেখে আসি। দিনে দিনেই মন্দিরগুলো দেখবো।

ভিকটরের বাইরে আসতেই দেখি শ্রীমান ফুমী থানারাৎ। পিট পিট করে য় হাত কচলাতে কচলাতে একটু ঝুঁকে বললো, ছেলে গেছে কন্‌টাক্‌ট্ ঠিক তে। ব্যাঙ্কক আমিই দেখিয়ে দিতে পারবো—

মনে মনে ভাবছো জামাইবাবুর হোলো কী! ব্যাঙ্কক যেন পরোঠা। উলটে লটে ভাজা ভাজা করছেন। ছাড়তেই চাইছেন না।

তাই গো তাই। ঐ অরুণের মন্দির। ও কী দেখে ফুরোনো যায় ; নাকি জাদ বাড়ির সেই মন্দির। সেদিন আসল মন্দির দেখে ফিরেছি। কিন্তু ার গিয়ে ওর বাইরে অলিন্দের পাশে টালি ঢাকা বারান্দার তলায় দ্যালে দ্যালে সকো দেখলাম। মাদুরার মন্দিরের ভেতর যে পুকুর, ত্রিচিনাপল্লীর মন্দিরের তর যে পুকুর তার পাশে যে বারান্দা তার গায়েও ফ্রেসকো পাবে। সে হোলো থরের ওপর প্লাস্টার। তার ওপর বাজে তেল রং এর খুব অর্বাচীন পট্টাঙ্গ -ওকে আঁকা বলি না। সে নিন্দের জন্য কলম ধরি নি। আসল কথা এই , মন্দিরের চারপাশের খোলা জায়গার ধারের দ্যালে আঁকার এই যে প্রথা এটা লু হোলো কী করে? ঐ দক্ষিণ ভারত আর এই ব্যাঙ্কক, দুটোর মধ্যে এই ণের মিল আমায় ভাবায়। পদ্ম, দক্ষিণ ভারতের শিল্প, কৃষ্টি, রান্না, বসন, ন, বাজন, নাচ, পুজো আর শ্যাম বালি বহির্দ্বীপের এই কৃষ্টির মধ্যে যে নিবিড়

যোগাযোগ এর তত্ত্ব কোনোদিন কোনো পণ্ডিত বার করবেই। আমার মনে ডা
দেয় ফিনিশীয় সাগর-ভজা দামাল সভ্যতা। কিন্তু আমি তো আর তেত্তাবড়
পণ্ডিত নই; আর এ জায়গাও সেই পাণ্ডিত্য ফলাবার জায়গা নয়। কিন্তু
সিংহল, মহাবাল্লীপুরম, চম্পার পাণ্ডুরঙ্গম, শ্রীবিজয়, শ্যামের আউধিয়
কাম্বোজের আঙ্কোর-ভাৎ এরা একটি মালারই ফুল। ছড়িয়ে পড়েছে বাঁধ
হারিয়ে।

দ্বিতীয় কথা এদের রং ব্যবহার। হাল্কা হাল্কা রংয়ে ছাইয়ের কাজ, সাদা
কাজ, স্লেটের কাজগুলো ফুটিয়েছে সোনা আর কালো দিয়ে। লাল দিত
গেলে পাট কিলে, নীল দিতে গেলে তুঁতে, ফিরোজা অথবা ভ্যান্-ডাইক ব্লু-এ
গ্রে। আসল যা প্রাইমারি রং তা বিশেষ নেই। তুমি কি সারনাথে জাপান
কাজ দেখেছো? তা হলে বুঝতে পারতে কী বলছি।

আর বিষয় চয়ন। বিরাট বিরাট বিষয়ে মহাকাব্যের নিপুণতা। রামায়ণ
বিশেষ। তবে এ রামায়ণ দেখলে, এর চরিত্র চিত্রণ দেখলে আশ্চর্য হয়ে ভাবে
কৈ রামায়ণে যে এতোখানি রস, এতো ড্রামা, এমন সব চরিত্র থাকতে পারে কখন
ভাবিওনি তো।

সমুদ্র বন্ধন ধরো। রামের সেই রাগ; বা রাবণের সঙ্গে সীতার মোকাবেল
বা ধরো লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের সেই নিদারুণ নার্ভাস ডিপ্রেশন,—এ সবে
চিত্রণ অপূর্ব, অপূর্ব। আর দেখো,—ঐ ছবিটা। কোন্‌টা বলোতো?-
সীতার অগ্নি পরীক্ষা। প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে শিল্পীর অরিজিন্যাল (স্বকী
মৌলিক) চিন্তা। শিল্পী বাল্মিকীর কথিকাকে জেনেছে, বুঝেছে, হজ
করেছেন। তারপরে নিজে সমালোচকের দৃষ্টিতে কটু আর অপরিণতকে, হাল
আর অস্পষ্টকে চেপে ধরে তাঁর নিজের দৃষ্টির মাইক্রোস্কোপের তল
রেখেছেন। সূক্ষ্ম এবং নগণ্যকে বিরাট, মহান ও গণ্য করেছেন। বলে
একে তুমি সৃষ্টি না বোলে যাবেটা কোথায়?

ওরে বাপু, দেশ দেখা কী চাড্ডীখানা কথা রে ভাই, যে নয়নদুটিকে
করিয়ে রেখে হোটেলে কেত্তা খরচ, ফেরতি প্লেন কখন, পোস্টাফিস কোথা
মেজো কত্তাকে চিঠি দিতেই হবে, দাদুর শরীর খারাপ দেখে এসেছি, ক্ষেন
পোয়াতী—কী হোলো কী জানি,—এই সব ভাববে, আর দেশ দেখবে? চালা
পায়া?

প্রতি দেশকে দেখা নতুন নতুন দিগন্তে নতুন নতুন ছাঁদনাতলায় নতুন ন
শুভদৃষ্টি, সপ্তপদী এবং তারপরে পুষ্পশয়ন।

ওর ভাগাভাগি নেই। ওতে তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বা
নাই ভুবনে।

ব্যাঙ্ককের চার শো মন্দিরের মধ্যে একটা নেই যা তোমার নাকছাবির চমক-কে, তামার নয়নের ঠমক-কে কাবু করে দিতে পারে না। ব্যাঙ্ককে যখন মন্দির দেখতে আসবে,—আরো আরো চোখ ধার নিয়ে এসো। মানুষ এনো মনের ানুষ।—সীতার বনবাস দেখছো, সেই সময়ে কেউ না দোক্তা চেয়ে বসে।

ওয়াৎ-অরুণের অঙ্গনে কতো যে মন্দির, কতো যে আশ্চর্য আশ্চর্য প্রতিমা! ঠাৎ মনে হয় ইয়ত্তা নেই।—একটি মেয়ে এক গোছা কমল-কলি নিয়ে এসে এক াল হেসে দাঁড়ালো। কণিকা হাত বাড়িয়ে নিলো। আমি সামান্য পয়সা দতেই তেমনি হেসে চলে গেলো। কমল-কলিগুলো মন্দিরের 'ভাস্'এ পুঁতে াখা হোলো।

যদি ফতেপুর সিক্রীর সেই পীল গম্বুদ দেখে থাকো ওয়াৎ অরুণের একটা ন্দির বুঝতে পারবে। ছুঁচলো। সিঁড়ি দেওয়া বেদীর ওপর সেই অপূর্ব কাজ করা মিনার। 'অপূর্ব' বলছি, বলতে হয় তাই। তা বলে কুতব মিনারের গায়ের খাঁজের কাছে, চিতোরের জয়স্তম্ভের কাছে কিছু নয়। ইঁটের ওপর প্লাস্টার। তার সঙ্গে পঙ্খের অতি সূক্ষ্ম কাজ। সোনায়, লালে, পাটকিলের আর কাঁচে, পর্সেলিনে, আর্শীর টুকরোয় এক করে একটি চার দরজার মন্দিরের মাথায় ঠিক যেন থাই নর্তকীর মাথার মুকুট। আহা, পদ্ম,—সূর্যের আলো সেই যে পড়েছে ঐ নয়নাভিরামের বুকে, আর ছেড়ে যেতে চাইছে না। কোমরে ডান হাতের মুঠোটি কায়দা করে রেখে ডান পাটি ঠাটের মাথায় বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতে শক্ত লাঠি বাগিয়ে চেপে ধরে টিনের পোশাক টুপী পরে যিনি যৌবনোচিত পৌরুষে দাঁড়িয়ে, তাঁর অতি-চিরুণীত গোঁফ জোড়ার জমক ঝুলেছে প্রায় আট ইঞ্চি; গোঁফটি চওড়ায় নাক এবং গালের খানিকটা জুড়ে। দাড়ি গজিয়েছে চিবুকের তলায়। চিবুকটি সমতলে চাঁছা। হায়রে হায় অতো সাধের দাড়িতে নিষ্ঠুর কাল-ধর্ম সাদা রং ধরিয়ে দিয়েছে! পৌরুষ যৌবনোচিত হলে কী হবে যৌবন পার হয়ে গেছে দুই তিন শতাব্দী আগে। এবং ঐ সত্যটি চাপা দেবার জন্য পোশাকের—ওঃ! সেকি ঘটা গো। অবাক হয়ে দেখতে হয়। বাইশটি এমনি শিল্পকর্ম দেখার পর বাইরের বাজারে কিনে যদি গোটা দুই কমলা আর দু-বাটি বাতাবি নেবুর কোয়া খেয়ে থাকি, মাপ কোরো ভাই।

পথেই সেই ভাসা-বাজার। সেই ভীড়। নৌকো আর নৌকো। কতো ফল, সব্জী, ডাব, বাতাবী,—কতো দর কষাকষি, কতো রস রসিকতা—আর মেয়েদের কতো তৎপরতা! ওপারে নতুন ব্যাঙ্কক। এপারে কোন হোটেলে সমারসেট ম'ম ছিলেন। আমার নামেও ওরা বলবে ভিক্টরে ছিলো লীলাময় ভট্টাচার্য।—রাগ করো না পদ্মময় ভট্টাচার্যই লিখতাম, কিন্তু কেউ যে মানবে না ও নাম। মানায় না কেন কে জানে!

রাজবাড়ি না গেলেও ওদের সেই রাজমন্দিরের প্রাঙ্গনে রাজবাড়ির রাণীদে
রাজার পরিবারদের গড়া ওঃ কতো সোনা, কতো মন্দির! ধরো পাঁচ ফুট উ
পাখির বাসার মতো স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির, আবার চল্লিশ ফুট উঁচু বাংলাদেশে
নবরত্ন ধাঁচের মন্দির। প্রতিটি ইঞ্চিতে শিল্পকার্য, প্রতিটি শিল্পকার্য—ঝকঝ
করছে। সূর্যের আলোর জন্য বুক পেতে কাড়াকাড়ি যেন, প্রায় প্রতি মন্দিরে
টালির ছাদ। টিনের ছাদের কোণের মতো খাড়া কোণ। কিন্তু টালিগুলো
চিনামাটির। টালির রং বাহারের। টালির ছাদ যেন পাড় লাগানো কার্পেট
বাজে, কুৎসিৎ, নিরলঙ্কার বৈধব্য কোনোটায় নেই। এ বৌদ্ধেরা ছিলেন স্প
জীবনবাদী, পঞ্চ মকারে মশলাদার—ধর্ম মানেন। অজন্তার বৌদ্ধেরাও আমাদে
দেশের তিলক-মালা ভজা বোষ্টোম যে ন'ন তা তাঁদের চিত্রকলার মননে বিন্যা
তুমি বুঝতে পারো। কষ্ট হয় না। একটি মূর্তি গভীর নীলে কালো।
ফাঁক করে উর্ধ্ববাহু হয়ে,—আমায় ভয় আর কি দেখাবে,—ওরই যেন বেগতিক
মনে হচ্ছে পাজামার দড়ি ছিঁড়ে গেছে, বা সায়ার দড়ি। বোঝা যাচ্ছে না 'হি
কি 'শী'। এদিকে এটা গড়ুর পক্ষী। দুটি সোনার পায়ে তিনটি করে আঙুল
পরে আছে সুবর্ণ পাজামা, নীলম খচিত। আর জামার কি বাহার! সা
বৌবাজার উজাড় করে দিলেও এ সোনার সাজ পারবে না। হাতে পলকা
সোনার ডাণ্ডা। মাথায় যা মুকুট তা দিয়ে রাবণের বিশ মাথায় হয়েও বাব
থাকতো। কিন্তু অতো সত্ত্বেও মুখখানা সেই বৌ-হারানো। আর কতদূরে বে
ভ্রূ কুঁচকে তাই খুঁজে খুঁজেই যেন বেচারী হয়রান। এই সব অদ্ভুত মূর্তি দি
অঙ্গন সাজানো। এ কায়দাটা চীনা প্রভাব।

বাইরে মণিহারী শিল্প কার্যের বাজার। আমার পেয়েছে তেষ্টা। ফু
থানারাৎ সঙ্গেই। ও গিয়ে স্টলে কি বলতেই এক গ্লাস গরম চা। তা বলে
নয়। চা-পাতা সেদ্ধ করা জল। এতো পাৎলা যে চায়ের গন্ধ ছাড়া ও শু
জল। মজার একটি পেচ্ছাবখানা এখানে। বিরাট ঘর। গোল জায়গাটা
মাঝে ফোয়ারায় জল উঠছে বেগে এবং পড়ছে ঢালু সিমেণ্টের মেঝেয়। ছিটে
ছাটার বালাই নেই। এতো জোরে ফোয়ারা যে মুহূর্তে সব ধুয়ে যাচ্ছে
গোল। ঢাকা নেই। আলাদা নেই। পুঙ্গবরা পাজামা খুলছেন এবং দাঁড়াচ্ছেন
গোল হয়েই দাঁড়াচ্ছেন। ফোয়ারার জলের 'ধোঁয়া'-ই যা আবডাল; অব
আবডালটি দুর্ভেদ্য। গন্ধ নোংরা বিলকুল নেই। কানে-পৈতে আমার বড়
এলে কি করতেন সে আমি জানি না ভাই।—প্র্যাকটিক্যাল 'জোক-এ' ফরাসি
ওস্তাদ জানি; এও সেই ফরাসি ছোঁয়াচ লাগা থাইল্যাণ্ড।

চুলালঙ্করণের মন্দিরের বুদ্ধ দাঁড়ানো। কিন্তু প্রাঙ্গণটি একেবারে খালি
মন্দিরে মন্দিরে ভরতি নয়। সে হোলো শোয়া বুদ্ধের মন্দিরে। আটটি দরজ

ড়ে শুয়ে আছেন ওয়াৎ-পো-র বুদ্ধ, লম্বায় ১০০ ফুটের বেশী। সোনার গায়ে
না উঠছে, সোনা চড়ছে, ভারা বাঁধা-ই আছে। পুরুতরা বসে বসে পাঁজি
খছেন। পাঁজি দেখে সে দিনে কার কি রকম ভাগ্যের যোগাযোগ বাৎলে
চ্ছন। ধূপকাঠী আর সোনার তবক পয়সা দিলেই মিলছে।—বেচছেন ঐ
রুতরা-ই।

মন্দিরে রক্ষক ঐ ছাদের নাগ। নাগ মানে হাতি, ঐরাবত, ইন্দ্র-বর্ষা। এ
গ বর্ষার দেবতা। মন্দিরে বেশী নাগ ভালো নয়। এ নাগ ভাবছে ও নাগ
'া ডাকবে, ও-নাগ ভাবে সে-নাগ। ফলে, ভাগের মা গঙ্গা পান না। বর্ষাই
না। দু চারটে থাকলে দায়িত্ব থাকে। শাশুড়ীর বাতের জন্য গরম জলের
'কে অনেক বেটার এক বৌ বা এক বেটার অনেক বৌ, দুটোই বিপজ্জনক।

বুদ্ধ মন্দির ভাঙ্গুক গড়ুক যায় আসে না। বুদ্ধের মূর্তি হবে ঢালাই
সার ধাতুর। যে কোনো মাপের হোক, কিন্তু সুষ্ঠু, সুন্দর, পোক্ত।
কা ভ্রূ, লম্বা কান, ধ্যানস্তিমিত আকর্ণ চোখ, আমের আঁটির মতো চিবুক,
স্ত ললাট, বিশাল কাঁধ, আজানুলম্বিত বাহু। পদ্মাসনে বসা এ বুদ্ধের
ন্দিরের বুদ্ধ সোনার বুদ্ধ। তাই সিপাহীসান্ত্রীও অনেক, এবং বন্দুকধারী।
দ্ধ বসেও আছেন অনেক দূরে, অন্ধকারে। বাইরে সমস্ত নাটমন্দির জুড়ে
পের্ট। বড় বড় ধূপদানীতে ধূপ পুড়ছে।

খুব বিমর্ষ বহ্নি। সেই গিয়েছিলো ভিসার ব্যবস্থা করতে। আমাদের
সপোর্ট আমাদের ফেরৎ দিয়ে বললো, যাওয়া চলবে না। ওরা পাসপোর্ট বা
সা কোনোটাই দিচ্ছে না। দিলেও স্ক্রীনিং করতে লাগবে তিন সপ্তাহ।

আমরা চুপ।

কিন্তু বহ্নি নয়। বললো, তাই ভিয়েতিয়েনের পথে যাবো না। তবে
বো। 'আমাদের' পথে যাবো। দক্ষিণের দিকে পথ। জঙ্গল এবং
পজ্জনক। কিন্তু আমরা হামেশাই যাই। কণিকা ঠিক আছে। মাথায়
তা দিলেই ও থাই। আপনাকে থাই পোশাক পরতে হবে এবং হয়তো রুগী
য়ে বাঁশের ডুলিতে চাপতে হবে বা ডুলী বইতে হবে। রাজী?

বহ্নি ঠিক করে ফেলেছে দুটো আন্দাজ রওনা হবে।

আমি বলি পথঘাটগুলো একবার দেখে শুনে নিলে ভালো হোতো না? ধর
দি কোনো কারণে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, জানা দরকার কোন্ পথে কী
বে যাচ্ছি।

বহ্নি জবাব দিলো, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সিদুনে পর্যন্ত যা ভয় ছিলো
জ তা নেই। গত এপ্রেল থেকেই কাম্বোডিয়ায় ধ্বস্ নামা শুরু হয়েছিলো।

—ঐ একটি আকাট মূখ্যু ইয়াঙ্কী গোঁয়াড়দের কুত্তা ছিলো (কী জানি কে
সব মনই লালে রাঙ্গা হয়ে গেলে ভাষা যেন এক বিষয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে
পশু আর যোনি ছেড়ে ভাষা মাছিটি যেন আর নড়তেই চায় না) লোন নল
হেগো বুটের লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে তাকে। ঐ সব জন্তুগুলোর আ
দুটি। পোর্তো-রীকো, আর হাওয়াঈ। ওখানে এই সব কুত্তিয়ার বাচ্চাে
'জম্‌ঘট্‌'। কয়েক মাস আগে এ সব পথ ছিলো আগুন। কিন্তু এই
সপ্তাহেই তো শিহানুক এসে গেছেন। এখন চাপ-টা কাম্বোজে নয়। থাই-
দাঁড়ান ম্যাপ দেখাই।—এই ব্যাঙ্কক। পূবে যেতে হবে। রেল লাইন
হাই-ওয়ে। দুটোই যায়। আমরা যাবো না। থাইল্যাণ্ড আর কাম্বে
বর্ডারে ক্ষেরাক ফোম্‌ থেকে সিহানুকভীল্‌, বোকোর, কাম্পোৎ, কেপ্‌,
গেরিলাদের অধিকারে। ফলে ক্ষেরাক থেকে উত্তরে থাই বর্ডারে আমেরিব
সৈন্যবাহিনীর দারোগাগিরির আর অন্ত নেই। থাই-কাম্বোজ পথ এবং রে
বড় ঘাঁটি শা-জিউং-ত্রাও। বরাবর পূবে যেতে গেলে শা-জিউং-ত্রাও পার হ
হবে।

বহ্নি একটু দম নিতেই আমি বললাম,—এবং তা তুমি হবে না!

—করেক্‌ট্‌। তা আমরা হবো না। পথ ও রেল লাইন ধরে খবরদা
অন্ত নেই। গেরিলা না আসে।

কণিকা বললো, হাসি পায় শুনলে। 'গেরিলা না আসে!' গেরিলা
কোনো ব্যক্তি? না কোনো পল্টন?

আমি সায় দিই, তা সত্যি! ওরা কী পড়েনি 'ফর হুম্‌ দ্য বেল্‌ টোল্‌জ
গেরিলা একটি মতবাদ, একটি শপথ, একটি বাতাস। আগুনের পরশমা
ছুঁয়ে গেলেই আগুনের মুকুল ধরে বনে জঙ্গলে পাতায় পাতায়। আগুনের প
ছড়ানো যাযাবর হাসের দলে ভরে যায় নদী, বিল, পুকুর, হ্রদ, নালা।—
গ্রামে, হাটে হাটে, গঞ্জে গঞ্জে, নালায়, ভেলায়, নৌকোয়, গরুর গাড়িতে চ
মজদুর কিষাণ কিষাণীর বুকের ভেতরে দোল খেতে খেতে পেরিয়ে যায় ইতিহা
পেরিয়ে যাবে দিগন্ত। ঝাঁটা দিয়ে কেউ আকাশ ঝাড় দেয়? কুলোর বাত
কেউ মেঘ সরায়?

আমাদের নিতে হবে অন্য পথ। জঙ্গল আর নালার পথ। ইচ্ছে বে
'ভুল' পথ নেবো দক্ষিণে। যাবো পেত্রিন। সমুদ্রের ধারে। ব্যাঙ্ককের কা

ইতি—

জামাইবাবু।

৬

পরমরমণীয়াষু

পদ্ম,

আমরা দক্ষিণের দিকে সোজা খোলা সড়ক দিয়ে বুক চিতিয়ে চলেছি। কোনো অপরাধে অপরাধী নই। মাত্র দুজন পর্যটক ট্যাক্সীতে থাইল্যান্ড দেখতে চলেছে। পথে বারবারই নানা ধরনের মিলিটারি গাড়ি পার হই। বোঝাই বোঝাই গাড়িতে থাই মিলিটারি সৈন্য দেখি। মাঝে মাঝে মন্দির দেখে থামি। দোকান দেখে ডাব খাই, বাতাবী লেবু খাই। বিয়ের উৎসব দেখে নামি। বাঁশবাজী বা সং দেখে থামি। লক্ষ্য করি বহ্নিকে শুধু সকলে জানেই না, সম্মানও করে। বহ্নি তো বহ্নি। সবাই চায়।

এদিকে পথে মাঝে মাঝেই উট্‌কো ফ্যাকটরী। পশুর গায়ে যেমন লেগে থাকবে এঁটুলী পোকা, বিয়েতে যেমন শাশুড়ি, ঋণের ফুটানীর গায়ে যেমন সুদের জোঁক,—তেমনি ফ্যাকটরীর গায়ে গায়ে অখাদ্য, ভ্যাড্‌ভেড়ে, ঘিঞ্জী, ছাতাপড়া বস্তী-নগরের নরকটি থাকবেই, নির্ঘাৎ। সেই দু-একটি মুদি দোকান, একটি দুটি কেমিষ্ট এবং মণিহারী, একটি সিনেমা, কাঁচা তরকারী আর মাছ মাংসের সুবাদে ছড়ানো নোংরামী। চা-ওলা, রেস্টুরাণ্ট; সব সেই এক। যা খিদিরপুরের, বাইখাল্লার ফ্যাকটরিতে, তাই ম্যাঞ্চেস্টারে, ব্যাঙ্ককে, সিহানুক-ভিল্‌-এ। এমন কি ঐ কোম্পানীগুলোও;—নামও এক। কোকা কোলা, গুড ইয়ার, ফিলিপ্‌স, জি. এম্‌., টয়োটা, শেল্‌, সোকোনী, ইত্যাদি।

পাত্রিন, চাংতাবুরি,—অবশেষে ক্রা-তে। এবারে চলেছি খাড়া উত্তরে। বেশ খানিক গিয়ে এর পরে চলা দুর্ঘট, দুর্গম। সৈন্য কমেছে, কাদা এবং জঙ্গল বেড়েছে। অবশেষে থামতে হোলো। ধীরে ধীরে, প্রথম চমকটা কেটে যাবার পর, এখন ভালো লাগছে। আসলে আমি মানুষটা ভবঘুরে।

এই যেখানে থামলাম এখান থেকেই সত্যিকার যাত্রা আরম্ভ। বুঝতেই পারছো এই অংশটুকু নানা কারণে খুঁটিয়ে বলা বারণ! সঙ্গে নোট ইত্যাদি নেবার সরঞ্জামও নিষিদ্ধ। তবুতো কিছু বলা যায়। তাতে হয়তো কাহিনী পর্দানশীন হয়ে যাবে, কিন্তু পর্দার ঘেরাটোপ পরেই ভ্রমণ-বিবি এগিয়ে যাবেন। এ সংবাদ জাহির হলে যে সব অঘটন ঘটতে পারে, সে সব কথা ভেবে সংবাদ বাদ দিয়ে চলতে হবে; নৈলে বাদ সাধতে পারে আইন বা গুলি। আমি তো আমি, বহ্নি, এমন কি কম্বোডিয়াও হয়তো বিপাকে পড়তে পারে। ফলে ভ্রান্তিকর

নাম, নির্দেশ তো থাকবেই ; ম্যাপ চাপা দেবো ; প্রিয়ং অনৃতং ব্যবহার করে নীতি বজায় রাখবো।

বুঝলাম, বিনা ভিসার যাতায়াতই যখন কপালে সেঁটেছি তখন এ অযাত্রা পথে নেমেও গান গাইতে হবে 'ওগো বধূ সুন্দরী'! খানা খেতে হবে ব্যাঙ্গ সাপ-ব্ল্যাক পুডিং-ও সোনা মুখ করে। মশা, মাছি, ব্যাঙ, জোঁক, সাপ সবাইকেই হারুন্‌অল-রশীদের সরাইখানার মতো ছেলাম দিয়ে স্থান করে দিতে হবে। কী ফ্যাসাদ!

প্রত্যক্ষে ভীড় আছে একটা এঁদোপড়া রেস্তরাঁয়। কিন্তু তার একটা অপ্রত্যক্ষও আছে। নারকেল শাখায় শীতল, বাঁশ ঝাড়র বাতাসে মুখর, কেয়ার গন্ধে সির-সিরে—একটা ও-পার। সেই দিকে লম্বা লম্বা রঙিন বাঁশের ঝোলানো কাঠির চীক। তার ওপরে ঘর। মেঝে থেকে টিন পর্যন্ত জিনিসে ঠাসা ; তেমনি ঠাসা গন্ধে।

খাচ্ছি যে কী বুঝতেই পারছো। সেই পোড়াবদন মেয়ে কণিকা আর ছাই কপালে বিচ্ছু বহ্নি অথচ সেখানে নেই। তারা যে কোথায় উধাও,— ভগা জানে।···'উত বা ন বেদ'। সেও জানে না! অথচ আমাকে ঐ ভরসায়ই থাকতে হবে। যদিও রাত কাছাকাছি তথাপি,—যেতে হবে, যেতে হবে। চরৈবেতি। থামা চলবে না। চলবে না।

* * * *

হঠাৎ কী জানি কেন পায়ের তলার মেঝেটা খড়বড় করে উঠলো। আমি চমকে নীচু পানে চাইতেই দেখি কুমারী কণিকা ডাকছে নেমে এসো, নেমে এসো। এই তো একশো নব্বইয়ের গতর। বললেই কী আর অধঃপতন সম্ভব পদ্মদি? তোমরা জানো, অথচ মানো না যে অধঃপতনে আমার গভীর অরুচি : পদস্খলন ভুলেই গেছি বলতে গেলে।

কিন্তু সে পড়া আমায় পড়তেই হোলো। জলের শব্দ ধরতে দেরী হোলো না। একখানা শালতী গোছের ডুঙ্গা। ছইটা পুরো পাতায় ছাওয়া। বুঝছি তীর থেকে কারা গুণ দিয়ে টানছে। শব্দ নেই একটুও।

দাঁড় বাইতে পারবে?

প্রশ্ন করছে বাংলাদেশের মেয়ে কণিকা কাশী-দিল্লীর একটি 'ল্যান্ড্‌-হাগার্‌'কে।—তবু বলি এদের মতো সামনের জল পেছনে টেনে এনে পারি না : কিন্তু পেছনের জলকে সামনে নিয়ে আসার মাস্টারী আয়ত্বে আছে।—কিন্তু এ কি দুর্দৈব! এর মধ্যে আমি কেন, বলতে পারো?

পথ এখনও অন্ধকার। যদিও জানি চাঁদ উঠবে। কিন্তু যতোই যা অন্ধকার হোক, অন্ধকারে পরিপূর্ণ রহস্যঘন বুকের মতোই নদীর বুকেরও একটা মাদক

আকর্ষণ। তরতর করে তোলে উত্তেজনার রহস্য পথগুলো। দু ধারে অবহেলিত বন। তার বুকে বুকে নিভৃতে জ্বলছে বাধাবন্ধহীন কোটি কোটি জোনাকী ; সুতরাং তারই পাশে পাশেই কোটি কোটি মশা। এই স্তব্ধ পারিপার্শ্বিক ততো যে স্তব্ধ নয় তা মাঝে মাঝে টের পাচ্ছি। ঐ যারা গুণ টেনে চলেছে তারা বেশীক্ষণ টানছে না। মিনিট পনেরো বড় জোর। তার মধ্যেই অন্য কেউ এসে এসে মুক্তি দিচ্ছে। তাই হেঁটে না টেনে বেশ দৌড়ে টানতে পারছে। মাঝে মাঝে গ্রামের আলো দেখা যাচ্ছে। তার ওপারে গাছ পালা যেন কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই দেখা যায় বিরাট পথ। পথের পাশে রেলপথ। মাঝে মাঝে আবার তিমির পেটের অন্ধকারের মধ্যে সব তলিয়ে যাচ্ছে।

কণিকা বলে,—সত্যিই তোমার ভালো লাগছে না দাদা ?

কী করে কণিকাকে বোঝাই বহ্নির সঙ্গে ভিক্‌টর হোটেলে আমার সাক্ষাৎ হতে পারতো ; পরের দিন ওকে এক মুঠো সেলামী দিয়ে আমি চড়ে বসতাম সিঙ্গাপুরের বিমানে। কিন্তু ঐ যে কণিকায় বহ্নিসংযোগ ওতেই তো কণা ফেটে এই রক্তক্ষরা দিগন্তে আমার প্রবেশ !

দিগন্ত নতুন। তার উত্তেজনাও নতুন। এই যে আমি বাংলার ছেলে, প্রবাসে বসে বসে বাংলার চিন্তন করতে গিয়ে গোটা বাংলার রূপ দেখতে পেলাম, বিদেশে এসে গোটা ভারতবর্ষের রূপ দেখতে পেলাম, এই যে দিগন্ত ছিঁড়ে অন্য দিগন্তের তীরে বসে সমগ্রতাকে আপন বলে জানলাম,—এ দৃষ্টি, এ মনন আমি পেতাম কোথায় যদি না খাম-খেয়ালের পিঠে চেপে রাশ ছোটো করে চেপে ধরে রেকাব না ঠেলে দিতাম !

না। তা নয়। উত্তেজক মাদক বিপদের পাত্রে পান করার মতো দুঃসাহসের একটা আলাদা মর্যাদা আছে। মণির মালিক গায়কওয়াড় নিজামরাও সাপের মাথার মণির জন্য হা হুতাশ করেন। জীবননদী যদি মন্দাক্রান্তা তালে চলায় সার্থকতা পেতো তা হলে না আসতো বিপ্লব, না আসতো অভিযান ; না নেচে উঠতো স্পর্ধিত মন প্রতিস্পর্ধার লল্‌কারে। সেই কবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ জীবনে বাধা ও সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করলো। বার হতে হোলো তাকে গাছের আরাম ছেড়ে, গুহার নিরাপত্তা ছেড়ে। দ্বৈরথের উত্তেজনায় সে উঠলো মেতে। ভয় ? হ্যাঁ, ভয়ের তাড়নাতেই তো সব কিছু আবিষ্কার। ক্ষুধার ভয়, মৃত্যুর ভয়, শত্রুর ভয়, রোগের ভয়। তা থেকেই তো সব কিছু দিকে দিগন্তে ছড়ালো।—সভ্যতা ও কৃষ্টির শিরা আর নাড়ী এই ভয়। তারই তাড়সে জীবনের উত্তেজনা। সংগ্রাম বাদ দিলে জীবন একমুঠো ভিজে ছাই।

কিন্তু ভয়ের মধ্যে সেরা ভয় ছিলো অপ্রত্যক্ষের। 'কী আসছে অতঃপর' —এই সংশয়েই ওৎ পেতে ছিলো ভ্রূকুটি বিকৃত করাল ভয়, কালীয় ভয়।—

এই ভয়ের সঙ্গে লড়াই করেই মানুষ তার মস্তিষ্কে পেলো নতুন স্বাদ ; নতুন তথ্য জন্ম নিলো তার অভিজ্ঞতায়। সে জানলো ভয়ের বিষণ্ণ আবরণের চেয়ে সংগ্রামের উত্তেজনা অনেক মধুর। পাহাড় বাধা উপড়ে তুলে আছাড় মারার পর যে স্বেদ বিন্দু কপাল বেয়ে জিভের ডগায় এসে মিশে যায়,—তাতেই স্বাক্ষরিত অমৃতের স্বাদ। এই প্রতিপক্ষকেই জীবন অন্তরে অন্তরে কামনা করতে লাগলো, কোনো কোনো মিষ্টান্ন দাঁতের চাপে যখন কড়্ কড়্ কোরে ভাঙ্গে তখন সেই প্রতিস্পর্ধায়ই ভোজনের আনন্দ বাড়ে।

মনে পড়ছে 'চিত্রাঙ্গদা'য় কবি মাধুরী ও সাফল্য ক্লান্ত অর্জুনের একটি বিষণ্ণ চিত্র খাড়া করেছেন। এই বিষাদ থেকে মুক্তির প্রয়াসে নগর-ক্লান্ত পোষ জীব আবিষ্কার করেছে কুস্তী, ঘুষোঘুষি, ফুটবল, হার-জিত।···আর আমর কেউ কেউ আবিষ্কার করেছি এই ভ্রমণ। সখে নয়, জীবনের তাগিদে। বাঁচতে হলে এ তাগাদায় সাড়া দিতে হবে! ভ্রমণের পক্ষে বিমান-আরাম ছেড়ে দুঃখের দুর্গমের অন্ধকারে ডুবতে হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ শক্তিধর। এই জল পার হওয়াও শক্তি-সাহস সাপেক্ষ। তারও পরে আছে বর্ডারের সেই মারাত্মক বাজী।

জঙ্গল যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে ঘিনঘিনে গায়ে হাত দিয়ে দেখছি। জোঁক লেগেছে। তখনকার মতো করণীয় কিছু নেই! দু-একটা জোঁক কণিকার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। আঁৎকে উঠেছে বেচারী। সঙ্গে সঙ্গে ওর ছুটন্ত হাতটা আমি সরিয়ে দিলাম,—'টেনো না ; পারবে না ; ক্ষতি হবে।' কিন্তু চোখে ওর আতঙ্ক ; স্পর্শে ওর আকুল মিনতি। সাহস দেবার জন্য রসিকতা করেই বললাম,—প্রেমের জন্য ক্লিওপাত্রা ঐ ইস্টিশানের কাছাকাছি একটা বিষাক্ত সাপই চেপে ধরেছিলো বলে নজীর আছে! এ-তো একটা জোঁক ভেবো না। একটু অবকাশ পেলেই এক চিমটে নুন লাগবে বৈ নয়।—বসে থাকো।

এই ভাবেই তিন চার ঘণ্টা কেটে যাবার পর নালাটা নদী পেলো। নদী পথে দাঁড় ধরলাম আমরা। নদীর বুকে খোঁটা পুঁতে সেই খোঁটার ওপরে চালাও বারান্দা ; বারান্দার শেষে তীরের মাটির বুক ছুঁয়ে বাড়ি। গিজ গিজ করছে বাড়ি। প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে ছোটো বড়ো নৌকো বাঁধা। আমরা নেমে এলাম যেখানে সেখানে প্রবল মশা। এবং মশা তাড়াবার অজুহাতে তীব্র ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার আবডালে কোথায় হারিয়ে গেলো বহ্নি আর কণিকা।

আবার আমি একা।—

হাতে পায়ে একটা তেল লাগালাম। টাইগার বামের গন্ধ। তারপর আমায় এক বুড়ো নিয়ে চললো মন্দির প্রাঙ্গনে। আরতি শেষ হয়ে গেলে

ধূপের ধোঁয়ায় ভরতি মন্দির। একটা দিকে খান কয় বেঞ্চী আর টেবিল পাতা। মস্ত বড় একটা রবার গাছ। তার তলায় বসার জায়গা।

খেতে দিলো।

এক রাশ মাছ ভাজা একটি সুস্বাদু 'সস্' দিয়ে বিনা পরিশ্রমে শেষ করে ফেললাম। 'সস'-টি তৈরি হয়েছে চাল্‌তার ক্বাথে হোগ্‌লার ফলের গুঁড়ো, লঙ্কা, নুন, চিনি এবং সামান্য রাই সর্ষের গুঁড়ো ফেটিয়ে। অপূর্ব! মাছের সঙ্গে ফিট করে যেন উত্তমের সঙ্গে সুচিত্রা, কত্থকের সঙ্গে তবলার চাঁটি।

কিন্তু তখন কী জানতাম এই 'অদ্ভুত' খাদ্য পরে কী ধরনের কিম্ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে।

দূরে আড় বাঁশি বাজছিলো। আড় বাঁশি বাজাতে জানলে, এবং পরিবেশ পেলে কী যে মীড় টানতে পারে; যেন সব ভুলিয়ে দেয়। একটু একটু করে শব্দের দিকে এগিয়ে গেলাম। মস্ত কয়েকটা নাগমণি গাছ। তার মধ্য থেকে তিন চারটে ডাঁটা বেরিয়ে প্রায় নয় দশ ফুট উঠে গেছে। গায়ে ভর্তি স্তরে স্তরে ম্যাগনোলিয়া সাইজের ম্যাগনোলিয়ার মতোই সাদা ফুল। একটু একটু করে চাঁদ উঠছে। সেই আলোয় ফুলগুলো দেখাচ্ছিলো যেন তুষারের ফুল।

ছেলেটি একা নয়। বাঁশির সুরে 'রাধা' রাধনারই মাধুরী।—সে রাধাটি সারং বিছিয়ে মেলে হাঁটু কোলে করে বসে গান গাইছিলো। সঙ্গে একটি ললিতা বা বিশাখা। মাঝে মাঝে সুরে সুর যোগান দিচ্ছিলো। ওদের এই মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত করার ইচ্ছে উবে গেলো। গানটার সুর যেন স্পানীশ। উঃ! কী যে ভালো লাগছিলো। বাঙ্গালী মেয়ে হলে বলতো ভীষণ ভালো।

এই পরিবারেরই ওরা। গানটাও পরে জেনে নিলুম।

> পাতার সবুজ রংয়ে ছোপানো সারং
> গভীর হয়েছে লেগে চোখের কাজল,—
> অতো মুছে লাভ কী?
> নদী বইবেই;
> নৌকোরা আসবেই,—
> নৌকো যাবেই;—
> ঢেউ আর মেঘ, তারা আসে আর যায়,—
> ঢেউ আর মেঘ খোঁজে কী জানি কোথায়।

ফিরে এলাম আমার হ্যামকে। দোল খেতে খেতে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।—হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিযে বুড়ো ভদ্রলোক তুলে দিলেন। আমায় পরতে দিলো ওদের সারং, ওদের শার্ট, ওদেরই জুতো আর টুপি। আর সেই ওদের অব্যর্থ ছাতা। ঐ ছাতা ধরা যদি অভ্যস্ত না দেখায়, যতোই বহুরূপী সাজো,—থাই

হতে পারলে না। বোধহয় ভোর হবে। বাতাস হালকা। বাঁদরের হুপ হাপ্, পাখির চিৎকার, টিয়ার ঝাঁকের ব্যস্ততা,—সব টের পাচ্ছি।—বহ্নি নেই কণিকা নেই।

এসে হাজির আধখানা এক বুড়ো এবং এক শালতী।

বর্ডার কাছেই। ক্ষেমর রিপাব্লিক-এ সিহানুক ফিরে আসছেন খবর পেয়েছি খবর পেয়েছি লোন নোলের শরতাজ হিলেছে। এখানে শালতি ধীরে চলে ; ধীরে চলে পা ; কিন্তু খবর চলে বাতাসের বেগে।

আরও অনেক কিছু হয়েছে। শিরিক মাতাক্-এর বেইমানী ধরা পড়েছে। আমেরিকান বোমারুরা কাম্বোজের সেই বিখ্যাত রবারের জঙ্গলকে জঙ্গল পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে। অথচ এই কাম্বোজ, ক্ষেমর রিপাব্লিক চেয়েছিলো নিউট্রাল থাকতে। এদের ক্ষ্যাপাবার কোনো দরকার ছিলো না। কেমন দেমক্রাসী ওরা ? আমরা থাকতে পাবো না আমাদের দেশে আমাদের মতো হয়ে ?

সর্বহারারা যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ করে তখন 'নিউট্রাল' কথাটাও বেইমানী। 'যদি আমার সাথী না হতে চাও, তা হলেই তুমি আমার শত্রু'—ভগবান্ যীশুর বাণী।

এই থাই ছিলো এক দৌড়ের সবুজ ঢালা শান্ত দেশ ;—এক রাজা, এক জনগণ। এর মধ্যে ক্ষেমর, থাই এ সব হোলো জনগণের নাম। থাই-রা নাকি তিব্বতী আর চীনেদের মিলিয়ে জাত, উত্তর থেকে এসে ঠাঁই পেয়েছিলো! কিন্তু এদের সভ্য করলো ভারতীয় সংস্কৃতি, ব্যবস্থা, শিল্প। কাম্বোজে ক্ষেমর ; আনাম (অন্নম্)-এ, লুয়াং-প্রবাং-য়ে, এখন বলে লাওস ; এও ক্ষেমর। নৈলে সবই তো কাম্বোজ। এই নিউট্রাল থাকার জন্যেই তো এতো! কেং-দ্য-বোমো জুটে গেলো এদের সঙ্গে। ভেবেছিলো লুঠ করে ভাগবে। এখন ভাগুক। আমেরিকার কথায় নেচে যারা পিতৃভূমি, পিতৃধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে ভেগেছিলো আজ তাদের কী হাল!

সে দেখেছিলাম পরে। তার বর্ণনা দেওয়া অসাধ্য।—দিতে যদি যাই তোমরা আমায় সাডিস্ট্ বলবে, সেটা খুব স্বাদিষ্ট খেতাব হবে না।—রেফুউজী মানে যে কী, এখানে এলে বোঝা যায়। দেশটাকে যেন জামঝাঁকান ঝাঁকিয়ে দিয়েছে!

ন্যাশন্যাল এ্যাসেম্ব্লীতে সিহানুককে রাজ্যচ্যুত করার ভোট পাশ করিয়েছিলো লোন্ নল্, এ্যাসেম্ব্লীকে সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে। এখন পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার পয়লা নম্বর ঘাঁটি। ব্রহ্ম আর বাংলাদেশ এ দুটোও আধাগেলা হয়ে আছে। ভারতেও যদি ঐ দেমক্রাসীর অঙ্কুশ চালিয়ে পুরোনো পাপীদের দিল্লীর গদীতে বসাতে পারে তবেই আমেরিকা এশিয়ায় তার ব্যবসাকে কায়েম

করতে পারবে। ও দুনিয়ায় ক্যাস্ট্রো, জগন, আয়েণ্ডী যেমন, এ দুনিয়ায় হো-শী-মীন, সিহানুক তেমন। থাই পার হয়ে গেলে আর আমাদের বিপদ নেই। নাখোঁরাচাশিম থেকে সীয়েম রীপ, ক্রাতে—পুরো এলাকায় এখন কেবল লাল ফৌজ। কোনো ভয় নেই। সব এখন ক্ষেমুর পল্‌টন্‌।

আমরা যাচ্ছি কোথায়? কেন? উত্তর অন্ধকার। বুড়ো হয়তো জানে। একটি আকাঙ্ক্ষা মনে নাচে, তবু নাচে। আঙ্কোর ভাৎ! যদি দেখতে পাই। ভারতে আঙ্কোরকে ওঙ্কার বলা হয় জানি। বলা উচিত যশোধরপুর। মীকং বয়ে একদা ভারতীয়রাই এসে এখানে নগর বসায়। জয়বর্মণ আর যশোবর্মন চার পুরুষ ধরে (৮০২—৮৮৯) এর সমৃদ্ধি রচনা করেন। আঙ্কোর কথাটার মানে 'নগর'। নগর থেকে আঙ্কোর, তোমরা বলো ওঙ্কার। ভালোই লাগে। কিন্তু ওসব জঙ্গলে ভেঙ্গে পড়া সর্বনাশ দেখেই বা কি করবো? বই লিখবো? কেন? লিখে লাভ কি যদি নিজে ঝাঁপ দিতে না পারি? ভগবানকে না পেয়ে ভগবানের ওপর বই লেখার মতো দাগাবাজী নপুংসকের লেখা রতিশাস্ত্র পড়ার মতো আহাম্মুকী। হঠাৎ বুড়ো থেমে গিয়ে পথ দেখায়। কষাড়ের মধ্য দিয়ে চেয়ে দেখি সারি সারি মোষের গাড়ি।

গাড়িগুলো মোষের। খড়ের গাদার মধ্যে এক কোণে আমি। বুঝতে পারছি অনেক কিছু। দেখতে পাচ্ছি শুধু আকাশ। আমার সঙ্গী এক বুড়ি থাই। বুড়ি নিজেকে বুড়ি বলে মানতেই চায় না। ভারী পোক্ত, ভারী রঙীন্। ওর ব্যবসা শোর পালা; আর শোরের মাংসের 'আচার' তৈরি করে বেচা।—ওর শোরের পাল কদিন আগে রেলগাড়ি চেপে গেছে। এখনও যাচ্ছে। পুলিসের দপ্তরে ওর ভারী বদনাম ও কাম্বোডিয়ার রাণীমায়ের (শীহানুক-এর মায়ের) গুপ্তচর। ওর মহৎ দোষ ও ইংরিজী জানে! বহুভাষীর গুপ্তচর হবার সম্ভাবনা বেশী।

জানো ঐ লোন্‌-নল্‌ কি শ্রীক্‌ মাতাক্‌ ওরা কম নাকি? রাণীমায়ের কুত্তার মতো ছিলো ওরা। কিন্তু ডলার। লোন্‌-নল্‌ তো পুরোদমেই ছিলো ঐ ডলারের ওপর। ও বা ওর সরকার কাম্বোডিয়ার মানুষের কাছ থেকে একটি পয়সা পায়নি। কিন্তু ওরা রাণী-মাকে কি নির্যাতনই না করেছে।

তোমাদের এখনও এ সব 'রাণীমা' 'রাজা'—এ সব কেন?

দোষ কি? তোমাদের যে রাজা নেই, তা বলে তোমাদের গবর্ণরেরা ইংরেজ গবর্ণরদের ঘাড়ে হাগে তা জানো? তোমাদের রাষ্ট্রপতি ভবন! ও তো 'গরিবী-হটাও' ভারতবর্ষের শ্বেতহস্তী পোষার খাঁচা। যে রাজা যে রাণী চিরকাল প্রজাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রইলো সে রাজা রাজা বলেই মহাপাপ? ...না, না। কাম্বোডিয়ার শিহানুক্‌ সত্যিই আমাদের প্রজানুরঞ্জক। রাণী-মা

তখন কি করলেন জানো ? আমাদের দেশের বাজারু মেয়েদের নিয়ে ক্লাব করলেন। এ দেশের নৃত্যকলার মাধ্যমে তাদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিলেন।

মানে বলতে চাও এ দেশে বেশ্যা নেই ?

ওতো সভ্যতার নর্দামা, থাকবেই। কিন্তু ব্যাঙ্কক ঘুরে তো এলে। কি পেলে ? সায়গন থেকে দিল্লী পর্যন্ত মেয়ে বাজারের তো আম দরবার। দেখোনি ব্যাঙ্ককের শো-কেসে মেয়ে বাজার ? দেখোনি ?

আমি হাসলাম।

লজ্জা করেনা হাসতে। বোমা ছুঁড়ে ভেঙে দিয়ে আসতে পারলে না ? ঐ বস্তির বোনটি, বাংলাদেশের মেয়ে—কণা নাম বুঝি ? ওকে তুমি বেশ্যা বলবে ? বলবে ? বলো না ! ঐ সব মেয়েদের জন্য রাণীমায়ের খুব টান।—অথচ যখন কাম্বোজ রিপাব্লিকের শুয়ার-কে-বাচ্ছারা শিহানুককে বরখাস্ত করে নিজেরা নিজেদের গোটানো ল্যাজের ওপর চেপে বসলো তখন রাণীমাকে বললো, নিকালো হিঁয়াসে। ওরা শিহানুকের গর্দান নেবে বলে ফাঁসীর হুকুম দিলো। রাণীমার নামে কুৎসা রটালো। আমাদের দেশে, নম্‌পেন্‌-এ এখন কতো ভিয়েৎনামী এসে আছে। এ দেশ তো ভিয়েৎনাম রিফিউজীতে ভর্তি। লন নোলের সেই ভাড়াটে গুণ্ডারা আমেরিকানদের ওস্‌কানীতে, আমেরিকান কর্তাদের খুশী করার জন্য সেই ভিয়েৎনামী রেফুইজীদের কৎলে আম করলো। হাজার হাজার ভিয়েৎনামীকে এখানে খুন করিয়ে ভিয়েৎনামে গো-হারান হারার বদলা নিলো। দেখলে সাদা হারামজাদ্‌গী ? আর গান্ধী, টাগোর,—আর ঐ নেহেরু—ওঃ, সাদাদের ওপর কতো বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ! বমি আসে ভাবলে। আর পৃথিবীতে খবর ছড়ালো নম্‌-পেন্‌এ রেস্‌-রায়ট। জানো তো তোমরা অমন রায়টের তত্ত্ব। তোমাদের দেশেও হোতো—হয়ও হিন্দু মুশ্লেম রায়ট। শিহানুক কখনও বিশ্বাস করতো না। খ্মের-রুজ্‌-এর লাল দুনিয়া এই সব খবরের মুখে থুথু ফেলে।

কিন্তু শিহানুকের জীবন আর তার আয়েষ নিয়ে অনেক কিছুই আমরা পড়ি ; টি-ভিতে দেখি পর্যন্ত। লোন নল্‌ হয়তো আছে আমেরিকার ডলারে ; শিহানুকও আছে মাও সী তুংয়ের ডলারে।

বিশ্বাস করো ? সত্যি করে বলো। এই যে দুর্ণাম রটিয়ে এক একটা দেশের সেরা সেরা দিকপালকে নর্দামায় টেনে ফেলার কারচুপি, ওরা বলে স্মিয়ারিং ক্যাম্পেন্‌, এতে তুমি বিশ্বাস করো ?

শেষ প্রহরের বদ্ধ কুয়াশা জঙ্গলের ডালে আটকা পড়ে পথ হারিয়েছে। ওস্‌ পড়ছে পাতার ডগা বেয়ে। যেখানে সেখানে নালার জলের ধারে বালতী নিয়ে বসে মেয়েরা বাসন কোসন ধুচ্ছে। কেউ কেউ স্নানও করছে বিবসনা হয়ে। ভাবছে কেউ নেই, বা ভাবছেই না কিছু। অবাধ অসঙ্কোচ আরও অবাধ

ঃশঙ্কতা না থাকলে এমনটি হওয়া তো সম্ভব না। লাল লাল কুমুদের পাশে
সের দল হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছে! অত্যন্ত ভীত ছাগশিশু হঠাৎ চেয়ে দেখছে।
ন্দরের মধ্যে ঘণ্টা বাজছে। গ্রামের পথ ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াচ্ছে। গানের
লর সুর ওষু-ভরা বাতাসের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিতে মুখর। মাঝে মাঝে
লার জমাট অন্ধকার ভেদ করে যে বাতাসের দমকাটা আসছে তার গায়ে
ফালী আর নাগচাঁপার গন্ধ।

বুড়ী লক্ষ্য করছে গানের সুরটা শুনেই আমি যেন অন্য কিছু হয়ে
ছি। হাসলো। বললো, কী গান গাইছে জানো?

আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বলি,—বলো না কী গান! আমি তোমাদের
নের একটা সংগ্রহ বার করবো। তাজা গান। তোফা।

এ দেশের একালের গান! এ দেশের ছেলে মেয়েরা খুব গায়!

পুড়ে যাও, আরও পুড়ে যাও;—
জ্বলে ওঠো রাবারের বন!
জ্বলবার জ্বালাবার সময় এখন।
আরও জ্বলা অধিকার পৃথিবীর দেওয়া
আরও জ্বলা অধিকার আকাশের দেওয়া
আগুনে ও বাতাসে যে মিতালী আঁকা সে
সে মিতালী রক্তের স্বাদে রেখো চিনে
সে মিতালী নিয়ে যাও উতরে দখিণে।
নিয়ে যাও নিয়ে যাও সাগরের পারে,—
মাঠ, কারখানা, ক্ষেতে, সড়কের ধারে।
বন্দর খন্দর এক হয়ে যাক।
বাধা-বন হয়ে যাক খাক।
জ্বলে লাল হয়ে ওঠো রবারের বন
জ্বলবার জ্বালাবার সময় এখন।

যে গ্রামগুলো পার হচ্ছি তারই একটাতে থামলাম। মুখ হাত পা ধুয়ে
স্নানও সেরে নিলাম। এক বাটি বাতাবী লেবুর কোয়া; পেঁপে; এক বাটি
সটীর পালো। মাছ দিচ্ছিলো। কিন্তু খেলাম না। পেটটা যেন বিগড়েছে।
এ সেই মাছের শস্। কিন্তু ভাবলাম ও কিছু নয়। বুড়ির যা কথা, মাথা
না বিগড়ে পেট বিগড়েছে তাই ভালো। একটা তবু শোধরায়; অন্যটা
শাধরাতে চায় না।

দূরে দূরে মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে। আমেরিকান এয়ার ফোর্সের
প্লেন বারবার উড়ে যাচ্ছে। থাইয়ের বর্ডারে। আমি এখান থেকে জীপে

যাবো। বুড়ি চলে যাবে। দিনটা আমার জীপে কাটবে। কিন্তু সন্ধ্যা
আগেই বর্ডার পার হতে পারবো।

বুড়িও বুঝিয়ে দিলো এ তল্লাটে বাহির বন্ধুর কোনো ভয় নেই। 'তুমি
তো রাজা'।

আমি বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিতে পারিনি। কারণ অতি সামান্য
আর দেখা হয়নি।

আমায় হাঁটতে হোলো প্রায় মাইল দুই। একটা মন্দিরের ভাঙ্গা তোরণ
গোটা কয় স্তূপ। শ্রমণরা ভিক্ষায় চলেছে। আমায় কেউ লক্ষ্যও করছে না
জীপটা ভর্তি দিশী তাড়ি। আমাকে ওরা পাঁড় মাতাল 'করে' পিপেগুলো
মধ্যে শুইয়ে দিলো। সে অবস্থায় আমায় দেখলে আমার পুত্রবধূর শাশুড়ি
উপেক্ষা করে যেতো।

সন্ধ্যার আগে যে চালাটায় এলাম সেটা সত্যিকার কাম্বোডিয়া অর্থা
আমাদের কাম্বোজ। শ্যাম, কাম্বোজ, চম্পা। এই সেই কাম্বোজ। আ
এখন স্মাগ্‌ল্‌ করা মাল। খুব দামী। চৌরঙ্গীর ফুটপাথে আমায় তু
বেচলে দাম পেতে। দিশী গন্ধ ছেড়ে যেতো। কিন্তু আমায় নিয়ে এদে
এখনও খুনোখুনীও হতে পারে, কারণ আমি ইন্দিরা গান্ধীর দেশের দো আঁশল
গিরগিটি। রং বদলাতে বদলাতে নিজের রং কী তা-ই ভুলেছি। দেখলা
ভারতবাসীকে কাম্বোজী ভেবেচিন্তে বিশ্বাস করে।

সেই প্রথম যেমন নালার ধারে বনের মধ্যে বাড়ি ছিলো এও তাই। অ
বড়ো নয়। তেমনি পানশালা; তেমনি রেস্তরাঁ বলো সরাইখানা বলো
বলো। এখন থেকে এদিক ভর্তি ভিয়েৎকং ও ভিয়েৎনামের লাল ফৌজে,—
'রুজ্‌-ক্মের'। তা-হোক, কিন্তু এ বাড়িটি গুঁ্যাড়াকল। এটি এ পারে
ও পারেও। মাঝে মাঝেই সিপাহী,—মানে থাই মিলিটারী ফৌজ খোঁচাখুঁ
করে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয় এ দোকানের মেয়েটির আসঙ্গ। আর ক
মেয়ে সে!

নৈলে নালার এপার-ওপার এ সেতুবন্ধন পুলিস কখনও আমল দিতো না
যুগে যুগে এমন এমন মেয়ে জন্মে গেছে যার পাল্লায় পড়ে তা-বড়ো তা-বড়ে
মনিষ্যি খুইয়েছে 'জীবন-যৌবন-ধন-মান'; 'মুনিগণ ধ্যানভঙ্গে দেয় পদে তপস্যা
ফল'। এ সব তো তোমার জানা।

এ মেয়েটিও গত বসন্তের ফুল। এর কাজ ধরে রাখা; থাবা থাবা খা
দিয়ে পশুকে বসে রাখা; দেহের কিনারে কিনারে নৌকো লাগিয়ে গান শোনানো
সব ইন্দ্রিয়ের সব জানালাগুলো খুলে দিয়ে বাইরের জগতের লীলা দেখা,—এ

পটিয়সী বৃত্তির রূপালী চরিতার্থতা। সেকালে এদেরই নাম ছিলো
হকন্যা'। তুমি জানতে চাইছো বয়েস। মেয়েদের বয়স আমি ধরতে পারি না।
কে যায়। মিষ্টি খাজার ত্বক্ তো বলি রেখায় ভূষিত। কিন্তু তার বলিতে
াতে রস বলেই সে খাজা। খাজা যদি ঠাস পাটালি হোতো, খেতো কে?
যার আছে, বলি তার করে কী? তালশাঁসের রস তার নিরেট জমাট ভাবের
দরে গোপন রস।

মেয়েটির নাম কিতাং মায়ো। এ তল্লাটের ডাক সাইটে নাম! ভালো
উ বাসে না। অথচ নিকট হবার জন্য সবাই পাগল। কেউ ভরসায়, কেউ
লসায়; কেউ প্রাণের তাগিদে, কেউ ইন্দ্রিয়ের ভোগে। কারুর এ আশ্রয়;
রুর এ ব্যসন। রতির নিমন্ত্রণ যদি একের, আরতি নিবেদন এক শো জনের।
অদ্ভুত মেয়ে। অদ্ভুত।

এখানে আমার ঝাড়া-হাত-পা মেলে "নিজের" হবার কথা। কাম্বোডিয়া।
। আনাচে কানাচে সাধারণ মানুষের বুক সেঁচা, নাড়ী-বাঁধা সেই সব সংশপ্তক
রিলা যাদের কণ্ঠে বক্ষে 'শিকল ভাঙ্গার পণ'। এ সব দেশ তারা চেয়ে নেয়নি;
তে নিয়েছে। একে একে পর্যায়ে পর্যায়ে থিউ সাম্পানের দল, পি.
। এল. এর ফৌজ, কর্নেল লন নোল, ইন্-তাস্, শিরিক মাতাক্-দের মতো
রা-তারা মার্কা দাগাবাজ খুনে চাঁইদের যেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য
রছে।

বলছি না চিচিং ফাক-এর মন্ত্র সিদ্ধাই-য়ের মতো 'লাল' বলার সাথে সাথেই
তের কলাই করা শানকী খানা সোনার হয়ে উঠবে, বা রাতে আর্জানো পান্তা-
তের সাঁতার সহসা লাল সূর্যের উদয় কিরণ স্পর্শে ক্ষীর সাগরে ময়ূরপঙ্খী
ও হয়ে উঠবে। উঠবে না; তা হয় না। যা হয় তা আর কিছু। হয়
রত্রাণ, এবং মেলে সাহস। সাহসই প্রগতি। সাহসই সাধনার মোটর,
দ্ধির মন্ত্রগুপ্তি।—জলে হাঙ্গর নেই, এটা জানলেই সাঁতারের সাহস বাস্তব
ত পারে।

বাড়িটার বাইরে বেরিয়ে একটা কাঠের তক্তাপাতা সাঁকো। খুব বেশী
লা জায়গাটায় কলমী, ভাঁটবেত, লজ্জাবতী, মুথা,—আর কষাড় এবং বাঁশ।
। দেবে কার সাধ্য। জোঁক ছাড়াও বহুৎ কিছু। সাঁকোটা পার হয়ে বিরাট
লবন। তলাটা তাই দেখা যায় দূর অবধি। সন্ধ্যা তো হতে দেরী আছে।
ন্তু ধোঁয়ায়, কুয়াশায়, ভাপে ছম্ ছম্ অন্ধকার। দূরে চাপ চাপ ধোঁয়ার
ণ্ডলীর মতো। পোড়ো বাড়ি হবে। আরও এগিয়ে যাই। হঠাৎ চোখে
ড়ে পুড়ে যাওয়া বন; ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাঁ; তার তীরে একটি ধ্বসে পড়া
ব মন্দির। এরা জানে বুদ্ধ মন্দির। কিছু আর তার বাকী নেই। তবু

ভাঙ্গা থামের মাঝের বেদী তক্ তক্ করছে পরিষ্কার। একটি মহিলা মোমবা
জ্বালছেন। আমার পায়ের শব্দে চেয়ে বললেন কিছু; থাই ভাষা। বুঝল
না। হাত ইশারা করে জানালেন বিমান আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।···আব
একটু পরে বললেন, কিতাং মায়ো?···খানিক পরে বুঝলাম আমি কিত
মায়োরই অতিথি।

ঘুরছি বটে। কিন্তু মনে হচ্চে আমায় শত শত চক্ষু রক্ষা করছে
দেখছে। মনে হচ্চে একা আমি নই; হতে পারি না। ঐ চালার ঐ নারী
মধ্যে এমন কিছু আছে যার ফলে সকলে সন্ত্রস্ত। এ দেশ প্রকৃতই একা
সর্বহারার দেশ।

কুমার নরোদাম (নরোত্তম) সিহানুক প্রথম থেকেই ছিলেন ভিয়েৎনামের-
যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। হো-শী-মীন মারা গেলে কাম্বোজের রাষ্ট্র
হিসেবে হো-শী-মীনএর সম্মানে তিনি যা যা করেন যে কোনো জাতির নায়কে
মৃত্যুতে স্বাধীন দেশের নায়ক মাত্রই তাই করতেন। এককালে হিন্দু চীনে
কম্যুনিস্ট প্রতিপত্তির প্রসারের বিপক্ষেই সিহানুকের ছিলো অত্যন্ত প্রতিপত্তি
কিন্তু ক্রমশঃ যতই সিহানুক এবং চাউ-এন-লাইয়ের বন্ধুত্ব দৃঢ়ীভূত হয়ে উঠতে
লাগলো, ততই শিথিল হতে থাকলো ভিয়েৎনামের খুনেদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব
সিহানুকের পরিবার যখন শিরিক মাতাক্-এর অত্যাচারে দেশ ছাড়তে বাধ
হলেন তখন চাউ-এন-লাই কুমার নরাদিপোর (নরাধিপ) শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিলে
পিকিনে। পরিবারের প্রত্যেকের ওপর অত্যাচারের পর অত্যাচার করেছিলে
ইয়াঙ্কী পুষ্ট সেই ছত্রধর কাম্বোডিয়ান 'রিপাব্লিকের' দালালরা।

এবং এই সমগ্র ন্যক্কারজনক ইতিহাসের মধ্যেও কাম্বোজের জনতা আড়ালে
থেকে 'রিপাব্লিকের' বিপক্ষে লড়েই চলেছিলো। কে লড়ছিলো পদ্মা কা
বিপক্ষে? রক্ষা করছিলো কে? আজ তারা কোথায়? এবং আজ এ
বিধ্বস্ত গ্রাম, দগ্ধ প্রান্তরের প্রান্তে বসে যদি আমি ভাবি,—তোমরা কারা, সাগর
পার থেকে উপরি চড়াও হয়ে একটা স্বাধীন দেশের জীবনযাত্রার ধারা পালটাতে
বাধ্য করো? কেন করো? কী তোমাদের যুক্তি! একটিই উত্তর পাই পদ্ম
"আমাদের ধন-মদ-মত্ততা, আমাদের শক্তি। এই আমাদের যুক্তি। সে শক্তি
আমরা ভাড়ার গাধা খাটিয়ে সংগ্রহ করেছি দেশ বিদেশ থেকে। কারণ আমরা
জাতকে জাত শেকড়হীন পরগাছা, খিচুড়ী (অ)সভ্যতা, জারজ (অ)কৃষ্টি
এই নঞ্-অর্থে আমরা পুষ্ট বলেই নস্যাৎ করি আমরা মানুষের রচা, মানুষে
গড়া সমস্ত সভ্য সাবধানবাণী।"

ন্দিরের পাশে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। দুটো খরগোশ পায়ের কাছে ফালাফি করছে। পেছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ;—পুড়ে যাওয়া গ্রাম তে খামার দেখে দমে যেও না অতিথি। জ্বালিয়েছে সত্যি ; চলেও গেছে। দ্র হয়ে গেছি ; তবু মুক্ত, স্বাধীন। ঐ তো খরগোশরা ফিরে এসেছে। না বেঁধেছে। পাখিরাও আসবে ; সবুজ পাতাও দেখা দেবে।—সব ঠিক য় যাবে। বড়ো কথা যে মন্দিরে প্রদীপ জ্বলেছে, জ্বলছে, জ্বলবে।

কিতাং মায়ো ! এসে পাশে বসলো।

আমি বলি, ফরাসী গন্ধ। পাও কোথায় ?

ফরাসী নাগর আজকাল পাওয়া দুর্ঘট বটে। কিন্তু কি জানো,—কী যে মার কাছে পায় ওরা জানি না,—থাইল্যাণ্ড থেকে অফিসারেরা এখনও এ সব াগায়।

আর তুমি ব্যবহার করো ?

আর আমি ব্যবহার করি। ব্যবহার আরও করি। আমেরিকান শিফমের ঞ্ঘিয়া, আমেরিকান ব্রাশিয়ার,—আমেরিকান পিলস্—আরও আরও গভীর ত্ব। যাতে ওদের একটুও মনে না হয় যে মানাহাটনের ঘরে শুয়ে নেই। দেশে গিয়ে যখন তোমার মায়ের দেশের হাতের রান্না খাও বেশ ভালো লাগে না ! এ-ও তেমনি।

কিন্তু আমায় কেন লোভ দেখাও ?

তুমিই কি জানো তুমি কতো লোভ দেখিয়েছো ?

কাকে ?

সে খোঁজে আমার কী দরকার ? আমার দরকার আমার লোভে। পুরুষ খলেই আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। আবার তেমন পুরুষ দেখলে মি একেবারেই কাদা কাদা বিছিয়ে পড়া মেয়ে হয়ে যাই। (এতো যখন লাচাতুরি দিয়ে প্রোজ্বল করে বলে কথাগুলো, বুঝতে কষ্ট হয় না মেকী)। লো, এটা ভালো জায়গা নয়, নিরাপদও নয়। নৈলে এই বুদ্ধের মন্দিরের রে শিবজীর সেবাইৎদের বীজ নিয়ে দ্রূণ পাকানো সে এক নাকি নিদারুণ র্মিক ব্যাপারই ছিলো। এখনও তা অবশ্য একেবারে বন্ধ নেই। এখানে শ্রমণ নে শ্রমণ। খাওয়া ইত্যাদি বাছ বিচার কেউ-ই করে না। তবে আমাকে মণরা নানা কারণেই দয়া করেন। আর আমারও ভালোই লাগে ওদের নিয়ে খেলা রতে। বড় ভীরু ; বড় শিশু !

কিতাংমায়োকে,—জানো পদ্ম,—আমার আজও যেন জ্বল্ জ্বল্ মনে পড়ে ; ন দেখতে পাই। ওর দিকে তাকালে ওর আবরণ খসে পড়ার অনেক আগে র বয়স খসে পড়ে যেতো। আশ্চর্য মেয়ে। কেবল মেয়ে, কেবল রমণী,

কেবল রঙ্গিনী। অতো যে চারিধার বিষণ্ণ, ওর যেন গায়েই বাধে না। অ
চপল চঞ্চল নয়। বলে, চঞ্চল করে তোলাই আমার কাজ। আমি চঞ্চল হ
কী? একেবারে ঝুনো পাকা, তবু মিষ্টি।—ওর ভঙ্গীতে ছলা; বিন্য
কলা। পাকা দাবা খেলিয়ের মতো ওর প্রতিটি চাল চালবার মুহূর্তে একেবা
যেন নির্লিপ্ততার ছবি। সাহসিকা—নিপুণিকার অব্যর্থ আত্মবিশ্বাসের গ
সায়রে ও যেন সূর্য অভিসারের পদ্মফুল: টলোমলো টলোমলো যে
সরসী নীরে।

ওর ভাষা তো আমি জানি না। আমার ভাষাও ও জানে না। অত্যন্ত ভা
ইংরিজী (আমেরিকান খন্দের ওদের মনে রেখো); এবং আরও অত
অ্যাল্‌বেলে ওদের উচ্চারণ। বিনিময় করে দেখেছি যে নীরব আলাপচার
আমাদের ভাষা যেন স্পষ্টতর। অব্যক্তের ভাষা যে গভীরে গিয়ে নাড়াচাড়া ক
তার সাক্ষ্য উপনিষদ্‌ থেকে জামাইবাবু পর্যন্ত। মুকুল ধরা শাখার যে ভ
নদীর প্রবাহ ব্যেপে নির্লজ্জ রৌদ্রের রঙ্গলীলার যে ভাষা, যে ভাষা লোভ
পাখির আকাশ মাপা পাখায়, ভীত ছাগশিশুর ডাগর চোখে,—সে তো প্রকৃ
মনের ভাষা। অনন্ত সেই প্রকৃতি, যার চিতিশক্তি নাড়িয়ে দিয়ে যায় মানসলো
সাততলা উঁচু সোনার মীনার।

অথচ, পদ্ম-দি, এও তো ঠিক ওঘাটে আমি সওদা করিনি। তবু বল
কিতাংমায়োর গতির বেগ যে কোনো ঐরাবত শপথকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁ
ভেঙ্গে দেয়। সন্ধ্যার ঘাট পেরিয়ে চাপা পায়ে ঐ সেতু, জলা, জল পার ক
এসেছি ঘরের ওম্‌-এ ফিরে। বড়ো একটা স্নান-টবে ফুটন্ত জল থেকে ধোঁ
বার হচ্ছে। সারি সারি পর পর বালতি করে জল। স্নানের এলাহি ব্যাপার
ওর তোলা জল; ওর গড়ে তোলা যত্ন। আমার ক্লান্ত গায়ে তেল মালিশ ক
ওর নিপুণ যত্নে আমায় ও স্নান করিয়ে দেবে,—এই যাদুমন্ত্রে ও আমায় তুলতু
করে দেবে,—এই উমর-খৈয়ামী প্রস্তাবনা। সেই কল্লোলমুখর বাহুনয়নে
ভাষাকে নিরস্ত করে ঐ অত্যন্ত দুরূহ কর্মগুলো আমাকে নিজেকেই কর
হোলো।—আমার এই পাথুরে সংযমের অনড়ত্বে আমি নিজেই অবাক্‌। ব
বুদ্ধুরে!

রান্না করেছিলো বেতের ডগা আর চিংড়ি। পদ্ম,—বিদেশে বেড়াতে গি
আর যা না-খাবার দুঃখে প্রাণত্যাগ করো, করো; বারণ করবো না।—কি
চিংড়ি না-খাবার কোনো দুঃখ রেখো না দিদি। পথি চিংড়ি বিবর্জিতা! কেন
পরে বলছি।

রান্নাটা ও নিজেই করেছিলো। এবং সুমিষ্ট সোয়াবীনের ক্ষুদে রুটির সঙ্গে
সেই বেত-চিংড়ি—অহো, পদ্ম। তারপর, এক বাটি কফি! এবং সেই সঙ্গী

পরিস্থিতিতেও একটি ব্যাঞ্জো-জাতীয় আদিবাসী তন্ত্র-যন্ত্র সহকারে গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরলো।

বনের জোনাকী, মনের পাওয়া,
নদীর স্রোত, মেঘের বাওয়া ;
চাঁদের পানসী, বুকের মানুষ
কাছের পাওয়া, দূরের ফানুষ।
চুলের ছোঁয়া, আশার দোলনা,—
কাছে এলোনা, কাছে এলোনা।

ওটা যে গান নয় গালাগাল তা কী জানি ? সেই বাঁশচেরা চিকের আড়ালে কঠিন তক্তাপোষের ওপরে মেলা গালিচার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি।—এই ঘুমকাতুরে আমাকে আবার ও ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলো !

* * * *

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ কি একটা অস্বস্তিতে উঠে বসবার আগে ঠিক পরিস্থিতিটা ঠাওর করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ দুটি মুক্ত বাহুবন্ধ আমায় মোক্ষম জড়িয়ে এক অনিল আদরের উথলপাথাল সমুদ্রে নাকানি চোবানী দিতে লাগলো। জলে দম বন্ধ হবার কথা ঠিকই ; আমি তো ডাঙ্গায় ; তবু বে-দম হাঁপ লাগছে। —ব্যাপার কী ? হাত মেলে যাকে ধরবো তার গায়ে হাত পড়তেই, সর্বনাশ ! কোথাও হয়তো ঘুনসী ইত্যাদি আবরণ থাকলেও থাকতে পারে ; কিন্তু খোঁজ করার মতো দুঃসাহস আমার আঙ্গুলের পরশে ছিলো না। আগুন ছাড়াও যে ফোস্কা পড়তে পারে সেই অনুভূতি এবং জ্বালা সে রাতে মগজে আছড়ে পড়েছিলো। ওর কোনো কোনো অঙ্গের পেশিল কাঠিন্য আমার পিঠে দাগ কেটে বসেছে। ওর বাহুবন্ধ আমায় জাপটেছে। ওর অধর ইত্যাদি আরও আরও স্পর্শ গীত গোবিন্দে হয়তো নৈবেদ্যর শুচিতা পেয়েছে ; পাক ! তখনকার মতো আমি কিন্তু ঘাবড়ে গেছি। গীতগোবিন্দ দূরে থাকুক ; কান্না-গোবিন্দও টুঁ শব্দটি করছে না। কারা টর্চ ফেলে এগুচ্ছে।

একটু যে বাড়িয়ে বলছি না তা নয়। কিন্তু সত্য কথা এই যে খুবই ঘাবড়ে গেছি, কারণ বুঝেছি মেয়েটির এই লাস্য সত্য নয়। কিতাংমায়ো তেমন ছাব্লা ফ্যাল্না মেয়েই নয়। যেমন তার ব্যক্তিত্ব তেমনি তার প্রখর বুদ্ধি। আমি কিছু বলার আগেই চুপি চুপি কানে কানে আমায় বললো,—প্লীজ, প্লীজ ! জড়িয়ে ধরুন আমায় ; জড়িয়ে ধরুন। অভিনয় করুন। মাত্র দুটি মিনিট। টর্চের আলোটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে পড়বো। ততক্ষণ আমায় এখন এ অভিনয় করতে হবে। সহযোগিতা চাইছি। প্লীজ্।

এবং টর্চের আলো পড়লো।

কিন্তু ততক্ষণে ওর কণ্ঠস্বর বদলে যে কী হয়ে গেছে তার মদির পিচ্ছিল আবেশ তোমায় এই কারণে আমি বোঝাতে পারবো না যে আমিই বুঝি না। অভিনয় যে কখনও এতো নির্মম হতে পারে আমি জানতাম না। আমায় সে ওদের পাড়ার বহু প্রগল্‌ভিত নানা নামে, নানা অভিধানে আবিষ্ট করে তুলছিলো। ওর চুল ছড়িয়ে পড়েছে আমার চোখ মুখ ঢেকে: ওর গন্ধ আমার মস্তিষ্কের গ্রন্থীগুলোকে সজল করে তুলেছে।

সেই আশ্লেষে, সে অধরে, ভাষা ছিল পদ্ম! আমি কিতাংমায়োকে জড়িয়ে বললাম,—জানো তো ইংরিজী, তবে আমায় আগে থেকেই······

কিন্তু শেষ করতে কী দেয় সেই কথা? একটি ঝলকে তোড়ে থাই ভাষার ঢেউয়ের পর ঢেউ বইয়ে দিলো। মাথায় বুকে মুখে এমন ভাবে যা-তা বন্য আদরের বন্যা ডেকে আনলো যেন গত কয়েক রজনী থেকেই আমরা সেই বিছানার ভাঁজ হয়ে পড়ে আছি। আমি যেন ওর বিছানার থাই ছারপোকা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ভারী বুটের শব্দ। টর্চের ঝিলিক। টর্চের আলোর দৌড় এদিকে ওদিকে। পুরুষ গলায় হাঁকাহাঁকি, হল্লা।—দুজন য়ুনীফর্ম-পরা উৎপাতের একজনকে ধরেই নিলাম আমেরিকান।—দুজন আরও। য়ুনীফর্ম নয়; সারং; টুপি; শার্ট। এই একটা জাত আছে টিকটিকি বলে; এবং টিকটিকির মতোই বিশ্বব্যাপী তাদের রূপ-রুচি এক। টিক টিক করাই তাদের ধর্ম, ব্যবসায়, রুজী। বলতে পারো পদ্ম কিতাংমায়োদের মতো বেশ্যা আর এই সি-আই-এ ভজা টিকটিকিগুলোর মধ্যে কারা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবে? কেউ না? আমি বিশ্বাস করি না পদ্ম।—বরং বিশ্বাস করি স্বর্গ নরক কিছু নেই। যদি থাকে, স্বর্গের বিচার আমাদের বিচার বা স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার নয়। তাদের চোখে বেশ্যার তবু একটা ধর্ম আছে; কিন্তু নিজের মা-কে যারা বেচে তারা নরক।

চোখের কোণটা খুলে রেখেছি। অথচ সেই সব্বোনেশে মেয়ে কিতাং-মায়োর পরণে কি ছিলো? মাত্র মাথার চুল দিয়ে দেহ ঢেকে ওয়েল্‌শ্‌-এর রানী বডেশিয়াকে রানীতমা বলে মনে হয়েছিলো। সে কথা গল্প না-ও হতে পারে। নিজের দীর্ঘ কেশজালে আচ্ছন্ন মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো দু-হাতে বুক চেপে! ···তবু আপ্রাণ গালাগালে ওদের যেন ভূত ভাগিয়ে দিলো। দেহটাকে মুহূর্তে যেন বস্তির নরককুণ্ডে পরিণত করে নোংরামির পর নোংরামির ঝড়ে উথোল পুথোল করে তুললো। বীভৎস !! আমি তো না রাম না গঙ্গা। সজ্ঞানে ভীমি খেয়েছি। ওদের টিকটিকি-গিরি মাথায় উঠলো।

আমেরিকানটা ওর আগুনের শিখার মতো লক্‌লকে হাত দুখানা চেপে ধরতে যেতেই এক ঝটকা মেরে কিতাংমায়ো ওর কাছ থেকে দূরে সরে যেন হাঁপাতে

াগলো। পরক্ষণেই আবার তারই নিকটতম হয়ে, একটু অন্ধকারে টেনে নিয়ে গয়ে পায়রা-গলায় কী সব বক্‌ বকুম বুলি-ও শুনিয়ে দিলো। আমেরিকানটা হসে উঠতেই ওর সঙ্গের অন্যজন এগিয়ে আসতে গেলো আমার বিছানার দিকে। াঘিনীর মতো কিতাংমায়ো হুঙ্কার দিয়ে উঠেই আমেরিকানটাকে জড়িয়ে ধরলো।

পরিস্থিতি বুঝে,—আমায় মাপ করো পদ্মদি,—চাদরটি ঢাকা দিয়ে আমিও যন আদ্যিকেলের নাগর সেজে পড়ে রইলাম। মনে হয়েছিলো,—হঠাৎ বুদ্ধির টে যাদের খোলে না, আপৎ কালেও যারা অর্থং ত্যজতি করতে 'নজ্জা' পায়, তাদের ক্ষে এ পথে পা দেওয়া গুখুরী।

—আর মনে মনে গাল পাড়ছিলাম সেই পূর্ববঙ্গী ভূতটিকে, যে তাজমুল াম নিয়ে আমার ঘাড়ে চেপেছিলো। এবং তারপর পর পর এসে অবলীলাক্রমে, আমার বিনা পরিশ্রমে ঐ কণিকা. সর্বহ্নি, ফুমী থানারাৎ এ গুলোও চাপলো। ভ্রমণলীলা সাংগ করে ঘরের গোপাল ঘরের লীলায় ফিরে যাবো,—বলো তো পদ্মদি এসব কি ঝামেলা!

—ভাগ্যি আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। সেই অনামেরিকান থাই বনমানুষটা আমার বিছানার পাশে এসে এক হাতে টর্চ জ্বালিয়ে এক ঝটকায় যেমন আমার চাদরটা টেনে তুলেছে ঠিক ততোটা তৎপরতার সঙ্গেই ঝপাং করে সেটা না ফেলে দিয়ে পারে নি!

আবার ফুটানী কতো! আমায় একটি বুটের লাথি মেবে বললো,—ইংরেজী ভাষায়, য়ু আর নৎ এলোঁ! ওয়েয়ার দ্য অদর্স? ও-ও, কোম্‌ আউৎ? ওয়ে আর দে?

আমিও তখন ছাড়ি আমার রামবাণ। ছাড়বো না কেন? এটা যে কাম্বোজ। আমার চারধারে গেরিলা। চার ধারে বনে জঙ্গলে আমরাও একা নই। তবে মোট কথাটা থেকেই যায়। যদি গুলী চলে জিতবে হয়তো গেরিলারাই। কিন্তু মরবে কে তার তো কোনো ঠিকেদারী নেই। তবে একটা কথা; এই সব পরিস্থিতির আঁতের কথা এই যে সবারই প্রাণে ভয়, কে কাকে কখন মারে। ওরাও খুব যে মজায় আছে তা নয়। কাজেই ছাড়ি রামবাণ! বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় বলি, কী যে তুমি কও তুমি নিজেই জানোনারে গোঁসাই! খোদাতালায় জানলে জানতে পারে কও কী তুমি! আমি এ হনে যা চাই—তা—ঐ কিতাংমায়ো!—বলেই একেবারে অপদার্থের মতো হয়ে দেখাই ঐ কিতাংমায়ো-কে! আর দাঁত র করে হাসি যেন ছত্তিশ-রাতের বাসি লম্পট!

কিতাংমায়ো এসে বিছানায় আমায় জড়িয়ে ধরলো।

আমিও সাথে সাথে ওর চুলের মধ্যে আমার মুখ গুঁজে দিলাম।

কিন্তু তার পরের পরিচ্ছেদ বড়ই সকরুণ।

হঠাৎ কিতাংমায়ো যেন হয়ে গেলো তাজমহলের নিথর পাথর। সব কিছু সুন্দর হয়েও আর তার সাড়া নেই।

কেবল বললো,—ওরা আবার আসবে কমরেড। তার আগেই চলে যেত হবে। ভেবেছিলাম বিশ্রাম পাবেন। হোলো না। রাতেই চলে যেতে হবে এতোগুলো গ্রাম এরা পুড়িয়েছে যে এখান থেকে সাজিং ত্রাও নদীর কিনার পর্যন্ত কোনোখানে কোনো আস্তানা নেই।—তবু যেতে হবে।

আমি চলে যাচ্ছি। আকাশে তখনও জিল্‌জিল্‌ অন্ধকার। কিতাংমায় বললো,—বিপৎকালে আত্মরক্ষার জন্য আপনার শরীরের খুব ঘেঁষাঘেষি আসত হোলো। আপনার বুদ্ধির কৌশলে আমার অভিনয়ও খাঁটি তাৎপর্য লা করেছিলো। তবু আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমি তো শো-কেসের ওদের দি ছাড়া কিছু নই।

সময় ছিলো না। আমি কিছু বলতে যেতেই ও আমার হাত ধরে সাঁবে পার করে নিয়ে এলো মেগামী থাম্‌মার চালায়। মেগামী একখানা জ্বলন্ত কা নিয়ে এগিয়ে এলো।

আমি না বলে পারি না, তোমায় আমি ভুলবো না কিতাংমায়ো। দে দেখার জন্যে দেশ দেখা আমার ভালো লাগে না। সবার সেরা দেশ, মহাদে মহাকাশ, মানুষ; তার মন। এই মন দেখার বড়ো তৃপ্তি আর আমার কিছু নেই। তবু বলতে পারি কিতাংমায়ো, রমণী হিসেবে তোমাকে ভোগ কর মধ্যে নিসর্গের কোনো সুন্দরকে ভোগ করার মর্যাদা আছে। আমি সন্ন্যাসী নই।

আপনি রোম্যান্টিক। রোমান্টিকের একটিই পাওনা। বেদনা।

তুমি?

রোম্যান্স বেচি। যারা যা বেচে, তারা তা খায় না।—দেরী হবে চা যান। শান্তি লুকুনো আছে। বুড়ো দাপ্‌সান সঙ্গে যাবে। ও পথ চেনে শুধু ও বোবা এবং কালা। সজাগ থাকতে হবে। তবে ভয় নেই। র পোয়াবার সঙ্গে সঙ্গে পেঁাছে যাবেন শাজিউং ত্রাও। আরাং প্রাতেৎ। মোক্কল থেকে আক্কর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল। আক্করে যাচ্ছেন যান দেখতে পাবেন কি-না জানি না। সারা এলাকা আউট অব বাউন্ড্‌স্‌। মিলিটারি তবে আপনি সেরো বেন্নোর অতিথি!

ওরা কোথায়?

তা জানি না। কিন্তু ওরা জানে কোথায় আপনি। আপনি শুধু চ যেতে থাকুন। দাপসান সঙ্গে থাকা পর্যন্ত আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

সে পথের অন্য ইতিহাস। অন্য স্বাদের। পরে লিখছি। কিন্তু পদ্ম

স্পষ্ট করে সব বলার অপ্রাধ যদি তুমি নাও, তোমার গলার দড়ি। আমার সাথেও জন্ম-আড়ি। ইতি—

তোমার জামাইবাবু।

৭

কল্যাণীয়াষু,—

পদ্ম, আমি যখন শালতীতে ভেসে চলেছি তখন আমার সঙ্গে কেবল সেই বোবা বৃদ্ধ দাপু-সানু। মনে মন্ত্র, 'আপনি শুধু চলে যেতে থাকুন।'

কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি পদ্ম-দি, সত্যি করে তোমাদের আমি আজও বুঝিনি। জীবনে তো কত পড়লাম, কতো দেখলাম কতো হাজার হাজার মানুষের সংশ্রবে এলাম। কিন্তু এখন বলতে ইচ্ছে করে তোমাদের কাছে যা পেয়েছি, যা শিখেছি এতো কোথাও শিখিনি। তোমরা প্রকৃতি, তোমরা মায়া, তোমরা বিদ্যা, তোমরা অবিদ্যা। তুমি যখন কামাখ্যায় তোমার দিদির সঙ্গে বসে একাগ্র মনে কুমারীর পায়ে জবা আর সিঁদুর ঢালছিলে আমি আমার মন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছিলাম তোমাদের ঐ ভক্তির পায়ে। তোমরা বিচিত্র! এই বিধবা ধুমাবতী, কাত্যায়নী হয়ে ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে যাও, এই আবার ষোড়শী, দুর্গা অন্নপূর্ণা হয়ে সাজে সজ্জায় ভরন্ত উঠোনে পা ছড়ানো 'মা' হয়ে যাও ; এই আবার তারা ছিন্নমস্তা হয়ে নিজের টুঁটি নিজেই দাঁতে চেপে ধরো ; এই আবার মাতঙ্গী, বগলা, ভুবনেশ্বরী হয়ে পরমরতাতুরা স্বৈরিনী হয়ে যাও, কাণ্ডাকাণ্ড বোধ থাকে না। বিবসনা কালী, ভীষণা চণ্ডী, প্রগল্‌ভা বাণী, রহস্যময়ী নীলসরস্বতী—এরা পৌরাণিক নয়, তান্ত্রিক নয় ; এদের আমি এ জীবনে বারবার দেখেছি শয্যা থেকে শ্মশানে, রঙ্গশালা থেকে পাকশালায়, ব্যসনে, অভিসারে, কলহে, হিংসায়, রমণে, পালনে, শৃঙ্গারে, রণে—কতো রূপ, কতো রঙ্গ! কিন্তু কিতাংমায়ো জানলো না, জানবে না যে ওকে আমি আজও সেই শো-কেসের বন্দিনী বলে মনে করি না। মনে করি মুক্তিযজ্ঞের দাবানল আহুতি। কিতাংমায়োর সঙ্গে আমার কতো কথা বলার ছিলো। কতো ক্ষমা চাইবার ছিলো। তার ছলা-কলাকে মুরুব্বী-ব্রহ্মচারীর ভড়ং দেখিয়ে কতোই না লঘু উপহাসে এবং নীরব নিন্দায় ঘৃণিত করেছি। সেই নিপুণা সাহসিকার সমগ্র বেদনার নিবেদনের পাঠোদ্ধার করতে অক্ষম হয়েছি। হেরে গেছি তার মন্ত্রগুপ্তির এবং মন্ত্রসিদ্ধির দুর্ভেদ্য কবচের মধ্যে প্রবেশ করতে। আজও আমার কাণে আগুন ঢালে ওর বলা শেষ কথা—

You had taken me for a harlot! Writers and poets are naturally too fast; yet how houndishly greedy they appear te be! (আমায় তো তুমি বাজারু মেয়ে বলেই ঠাউরেছিলে ঠাকুর। লেখক কি না! লেখক আর কবিগুলো হয় যতো-না চালু ততোই কুত্তার মতো হ্যাংলা)।

* * * *

হঠাৎ আমার পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হোলো। গা বমি বমি, এবং জিভ শুকিয়ে আসছে। আমি শুয়ে আছি শালতীতে। নড়তে চড়তে পারছি না। বসতি নেই। একটা সুবিধা এই যে চারধারের বন পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এখানে সেই নরোদম সীহানুক পালিয়ে যাবার পর থেকে গেরিলা তাড়ানোর নাম করে, কাম্বোজ রিপাব্লিকের ভাঁড়ামী বাজিয়ে যতো বম পড়েছে সব-সং সব মেড্ ইন্ আমেরিকা।—কিন্তু যেদিন সিহানুকের বুড়ি মাকে তার বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়ে খেদিয়ে দেওয়া হোলো সেদিন এক অস্ট্রেলিয়ার লেবার অপোজিশনে হুইটল্যাম্ ছাড়া কোনো দেশ একটি সাড়াও তোলেনি। যাদের বোমা কাম্বোজকে পুড়িয়ে খাক করে দিলো, তাদের চাঁই নিক্সন্ বাণী দিলেন,—"লন নোলের সরকার বিদেশী সরকার। কাম্বোডিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা কিছুই করতে পারি না! যদি করি তা হলে তা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অসৎ হস্তক্ষেপ!" তা বলে বোমা ক্ষেপণে ওসব আবডালের দরকার নেই। কিন্তু ফাঁস করে দেয় লিখিয়ে-রা। 'চেন্লা-২'য়ের লড়ায়ে লোন নলের কাগুজী ফৌজকে ছাতু করে দিলো কাম্বোডিয়ান লাল বাহিনী। '৬নং হাই-ওয়ে'র লড়ায়ে লোন নলের বারো হাজার সৈন্য আমেরিকান পোশাক গায়েই ধুলোয় পড়ে রইলো। কিম্ উইলেন্সন্ একজন আমেরিকান সাংবাদিক। তিনি ফাঁস করে দিলেন বিদেশী রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার দোহাই। তিনি লিখলেন,—"আজ একথা অস্বীকার করার আর কোনো উপায়ই নেই যে যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ান ফৌজের ওপর যে ভার ন্যস্ত করেছিলো, এবং যে আশায় তাদের মজবুত করেছিলো সে আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে।" তবুও যুক্তরাষ্ট্রের বাহানাবাজরা বলবে কাম্বোডিয়ান রিপাব্লিক বিদেশী রাষ্ট্র।

জানো পদ্মদি? শীহানুকের মায়ের বাড়ির জানলার সামনে বসে টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে অর্বাচীনের দল বাহ্যে করেছে, মেয়েরা ন্যাংটো হয়ে নেচেছে, তার মায়ের নামে খিস্তি খেউড় করেছে, ফ্লাগ্ শ্লোগ্যান তো ছেড়েই দাও। কেন? ভদ্রমহিলাকে অতিষ্ঠ করে বাড়ি থেকে তাড়ানোর মতলব! অবশেষে লন নোল নিজে ধমকেছে,—যে হাজার হাজার মানুষ রানীর প্রতি অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছিলো, যে শত শত ভিয়েৎনামী উদ্বাস্তুকে

ন নোল দাঙ্গার অজুহাতে গুলী করেছিলো, লন নোল হুমকি দিলে
য, তাদের মৃতদেহের স্তূপ জড়ো করে রাখা হবে রানীর জানালারই
নীচে !···আর একদিন ঐ সব ছাত্রেরাই যারা ঐ আন্দোলনে লন নোলের
য়ে শ্লোগ্যান মেরেছিলো, তারাই স্কলারশিপ পেয়ে প্যারিসে পেঁছেই
রা লাগালো 'লন্ নোল নিপাত যাও'; 'স্বাধীন লাল ফৌজ জিন্দাবাদ';
শিহানুক জিন্দাবাদ'। আর ওদের যখন প্রশ্ন করা হোলো, এ তোমরা করলে
নী? এ কায়া পালট্ হোলো কী করে? ওরা জবাব দিলো কী জানো?
লেলো, এ না করলে বাইরে আসতাম কী করে? লন নোলের মুখোস ভাঙ্গতাম
কী করে? যুক্তরাষ্ট্রের ছেনালী দেখতাম কী করে? আজকের দিনে কাম্বোডিয়ায়
শহানুকের প্রতিপক্ষ সেজে ভাঁওতা দেওয়াই গেরিলাদের বড়ো একটা
কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে! এদের মতো যুবকদের কাঁধে বন্দুক রেখেই যুক্তরাষ্ট্র
কায়েম রাখতে চায় এশিয়ায় দেমক্রাসীর নিরাপত্তা। দেমক্রাসীতে ঘেন্না! মা
বোনের ইজ্জৎ বেচেও দেমক্রাসী রাখতে হবে? মুখে নুড়ো জেবলে দিই অমন
দেমক্রাসীর।

অথচ আমি ভালবাসি দেমক্রাসী। সে ভালোবাসায় কালি ঢেলে দিলো
কে পদ্ম? ভালোবাসতাম যুক্তরাষ্ট্রকে। কোথায় গেলো তা? কে সে
ভালোবাসার বুকে তীর মারলো? ···শালতি চলছে গুপ্ত পথে।

ভাগ্যিস কাম্বোডিয়ায় এসেছিলাম। কিন্তু দেখেছিলাম কী? এখানে এসে আমি
তো কই টুরিস্ট হয়ে সাজানো বাজার দেখিনি। বড় বড় জুয়েলারী দেখিনি।
ঢাউস ঢাউস আমেরিকান গাড়ি দেখে তাজ্জব বনে যাইনি। বড় বড় পথ দেখেছি,
গাড়ির ভীড় দেখি নি; মাইলের পর মাইল ফুটপাথ দেখেছি, পেট্রল পাম্প
দেখেছি; জন মানব দেখি নি; কোকাকোলার কোম্পানী দেখি নি, গুডইয়ার
টায়ার কী টোয়াটো ফ্যাকটরি দেখি নি; কিন্তু দেখেছি মানুষের মধ্যে আবালবৃদ্ধ-
বনিতার মধ্যে সংগ্রামের জন্য দাঁতে দাঁত লাগা শপথের জিদ্। আর সে জিদের
উত্তাপ আমার বুড়ো হাড়েও ভেল্কী লাগিয়ে দিয়েছে। শালতী চলে। আমি
এই সব ভাবি।

কিন্তু আমি অসুস্থ। গত দুদিন থেকেই নোটিশ পাচ্ছিলাম। ঐ চিংড়ি!
আজ ভোর বেলায় বুঝলাম যা হয়েছে তা রক্ত আমাশা। পড়ে থেকে বিশ্রাম নিয়ে
চিকিৎসার দরকার। কিছুটা জীপে এলাম; অল্প কিছুটা মোটরে।

এখানে মোটর পথ নেই। কিন্তু গ্রামে গ্রামে দুধ আছে। জীপে করে দুধ
যায়। আমিও এখন তেমনিই একটা দুধের গাড়িতে যাত্রী। সব ব্যবস্থা
বুড়ো দাপসমানের। উদ্দেশ্য মোঙ্কোলে পেঁাছোনো। কী যে সুন্দর দেশ
এই কাম্বোডিয়া। দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত। আর মাঝে মাঝে মানুষে ভরা

গ্রাম। ছাপা, রং, কারুসজ্জা, শিল্প মনোরমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মে, ছন্দে দেউলে, হাটে পরম শান্তি। ওরা ব্রস্ত ; বিব্রত ; যাযাবর-অস্থিরতায় টাটিয়ে আছে ওদের শান্তি-সুখ-নিদ্রা-অন্ন। তবু মানুষ ওরা।

আজ এরা ছত্রভঙ্গ। খাদ্যাভাব। মাঠ পুড়ে গেছে। রবার বন নিশ্চিহ্ন। বড়ো বড়ো ফলের বাগান, কিছু নেই। নারকোল গাছগুলো পুড়ে দুমড়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি আর মোটরের জীপের কঙ্কালের পাহাড়। আর পাহাড় খালি টিনের, কৌটোর, বাক্সর। ওতে ছিলো খাদ্য, চা, কফি, বীয়ার।—আর সেই সব পাহাড়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর। চাষীদের ঘোর শত্রু ইঁদুর। মুর্গীর ডিম খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। চাষীরা কোনোমতেই সামাল দিতে পারছে না। তবু ওরা ভদ্র, শান্ত। চাষী চলেছে হাল বলদ নিয়ে। ক্লোং-য়ের জল নেড়ে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে কম্বুকণ্ঠী কাম্বোজিনী সারং ধুচ্ছে। জলের বালতি মাথায় নিয়ে একদল মেয়ে বাড়ি ফিরছে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।

আমি আর পারছি না। আমাকে আর নড়তে দিচ্ছে না রোগ। ভয় পাবো কী পাবো না ভাবছি। সঙ্গীরা মিলে পরামর্শ করলো একটা ডুলী করে দেবে। আমাকে ডুলী করে নিয়ে যাওয়া হবে। খানিকটা পথ পাহাড়ী। পায়ে হাঁটা। ডুলী ছাড়া গত্যন্তর নেই।—জ্বর খুব।

জীপ বলো, শালতী বলো, পায়ে হাঁটা বলো,—কাম্বোডিয়া মানে ধান ক্ষেত, ধান মাড়াই, নালা, মাছ, পাখি,—আর মানুষ, মানুষ।

আগে ছিলো এ দেশ হাসি খুশী। এই যে এতো শিল্পকার্যের গৌরব, এ কেন ? এরা খাবার কষ্ট পেতো না, এবং পরিশ্রমকেই সম্পদ বলে জানতো। শিল্প—শিল্পীকে এরা স্রষ্টার মতো দেখতো আশ্চর্য রূপলোকের দূত। জানতো না ওরা যে ফ্যাক্টরি, লোহা, বিদ্যুৎ, বাষ্প এই সব আসুরিক বলপ্রয়োগে নিষ্কর্মা লোকেরা শুধু বসে বসে ফিকির চালিয়ে শিল্প জগত থেকে আনন্দকে চির নির্বাসিত করে কেবল পুঁজীবাদের যক্ষ হয়ে থাকবে। এবং শ্যাম, লাওস্, কাম্বোজের মানুষের মন এখনও এ দেশের আকাশের মতো নীল, মাটির মতো সবুজ। ধ্বংস করে দিয়েছে এ দেশটা আমিরিকী 'সহায়তা'র গুঁতো।

দূরে একটি নৌকো, আলোটা শুধু দুলছেই নয়, আলোর প্রতিফলন জলে। আমি রুগী। ডুলিতে চেপে ধীরে ধীরে পাহাড়ী পথ নেমে নৌকোয় চাপবো। কিন্তু চলেছি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। চতুর্দিকেই ঘুমন্ত গ্রাম। একটা শহর মতো জায়গা দূরে দেখছি। ওরা বললো মোঙ্কোল। নামটা আমার জানা। আঙ্কোর যাবার পথ। কিন্তু এ পথের আর কিছু রাখে নি। এইখানেই আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গে (অবশ্য নামকে ওয়াস্তে সেটা কাম্বোডিয়ান

[পাব্লিকের বাহিনী) গেরিলাদের সব চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই হয়। এখানেই বোমা-বর্ষণ হয় মাইল মেপে মেপে। এখানেই পর পর গ্রাম, বন, রাবারের বাগান, মন্দির, ইমারত, স্কুল,—গুঁড়ো হয়ে যায়। আঙ্কোরও যেতো। কেবল আঙ্কোর-ভাৎ বিশ্ববন্দনীয় কীর্তিকে বুকে ধরে আছে বলে ধ্বংস হয় নি। তখন আমেরিকার কাগজে প্রচারিত হোতো আঙ্কোর-ভাৎ-এর মধ্যে নাকি গেরিলারা গোলা বারুদ ভরে রেখেছে। হায় রে হায়! গেরিলাদের গোলা বারুদের শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগই আমেরিকান ডিপোরই মাল। সেই বস্, সেই দিনে ডাকাতি কিছুতেই রুখতে পারলো না বলেই তো আমেরিকান ইতিহাসে কাম্বোজ-ভিয়েৎনামের দেশভক্তরা আখ্যা পেয়েছে 'ডার্টি ওরিয়েণ্টাল্স্' পিগ্স্ অব দি ঈস্ট'; 'ট্রেটরস' ইন য়ুনীফর্ম''!

তবুও বহু মন্দির এখানে ওখানে। কাম্বোডিয়া মানেই ভারতবর্ষের পুরোকীর্তি। সেই ভারতবাসী আমি। তবুও আজ এ দেশে আমায় দেখে সবাই নাক সিঁটকোয়। বলে তোমরা এখনও দেমক্রাসীর নামে পুঁজিবাদের তলায় দেশের মানুষকে লুঠছো। তখন তো আবার এমার্জেন্সী; ত্রিশ চল্লিশ হাজার বন্দী বিনা বিচারে জেলে। এ সব অপবাদ সত্য কিনা আমি জানবো কি করে! দেশে আছো তো তোমরা। আমি তো দেশ ছেড়েছি বহুকাল। তখন নেহেরুর হুঙ্কারের তলায় রাম-রাম পার্সনালিটিরাও চুপ করে থাকতেন। রামমনোহর লোহিয়া, মানবেন্দ্র রায়, সাভরকর, শ্যামাপ্রসাদ,—এঁরা যেন পালা করে মরে গেলেন। কৃপালনী তো সময় মতো রা-কাড়লেন না। অসময়ে পাইলেন পার্লামেণ্টের চেয়ার ভাড়ার রোজগার। ঐ যে পার্লামেণ্টের রোজগার, দিয়া দিল্লীর কোয়ার্টারে বাস, মাঝে মাঝে স্পেশাল কমিটিতে নির্বাচন আর বিদেশ ভ্রমণ এই স্বার্থের কাছে নাকি দেশের ভবিষ্যৎ বিকিয়ে দিয়েছি আমরা। এ ঘৃণা কাম্বোজের ঘরে ঘরে। ওরা বলে হাথিয়ার হাঁকিয়েই হাঙ্গর মারা যায়। হাঙ্গরের সঙ্গে পার্লামেণ্টী ডিবেট সময়ের অপব্যয়। হাঙ্গরের ক্ষিধে পাবে,—এবং তখন গীতা পাঠ করে তা শান্ত করা একমাত্র জাতকের পাতাতেই মনোহর।

* * *

কোন অসতর্ক মুহূর্তে কণিকাকে বলেছিলাম আঙ্কোর যাবার কথা। কোন অলৌকিক বিপর্যয়ে পেলাম ফুমী থানারাৎ এবং তস্য পুত্র 'সর্ববহ্নি'। এ সবের ওপরেও সেরা কথা সর্ববহ্নি এবং কণিকার মধ্যে অকস্মাৎ গড়ে ওঠা নিদারুণ আঁতাত। আমি বুঝতে চাইনি কিছু; কিন্তু মনে হোলো তার দাদার নামের মারফৎ কণিকা এমন কিছু কিছু সংবাদ জাহির করেছে যে সর্ববহ্নির কাছে কণিকার মর্যাদা এখন শুধু তীব্রই নয়, সুতীব্র।—সুড়ঙ্গের তলায় মৃত্যু-সহা প্রেমের বন্ধন বড় নিবিড় বন্ধন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে underground

activist সেই আনন্দমঠ থেকে আজও অব্যাহত। কণিকার দাদা ে
গোত্রের।

ওরা যৌবনের প্রহরী, দুঃসাহসের অগ্রদূত। মিটে গেলে ওরাই যাবে ;-
পিছটান বলে যদিও বা কিছু থাকে সে বিগত পুরুষের বংশ ; আগামী বংশধরে
টানে বাঁধা পড়েনি। ওদের গতি অব্যাহত ; ওরা এগুবে।

আমার জীবনের অর্ধ শতাব্দী আরও দশ বছর আগেই বিগত। আ
ওদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারবো কেন? আমি ওদের বাধা। রো
এসে আরও বাধার সৃষ্টি হোলো।—রক্ত আমাশয়ে চঞ্চলতা নিষিদ্ধ ; খাদ
নিতান্ত নিয়ম সংহত। জ্বর এলে তো কথাই নেই। মনে মনে ভয় ; অথ
মনে মনে আঙ্কোর। পথে পথে কেটে গেলো রুগ্ন তিনটি দিন।

অবশেষে আমরা এসেছি সীয়েমরীপ নামক শহরের কাছাকাছি নিবিড় বনে
সীয়েমরীপ ছিলো তোনলে হ্রদের কিনারে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। সে বন্দর দিয়ে
মেকং নদী ধরে বাণিজ্য জাহাজ চলে যেতো চম্পা, চীন, যবদ্বীপ ; ব্রহ্ম, ভারত
সিংহল। তোন্‌লে-শাপ হ্রদের একদিকে মেকং নদী প্রবেশ করছে, অন্য ধা
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জেনেভা হ্রদে-ও রোন নদী পশ্চিম থেকে ঢুকে দক্ষি
দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এই তোনলে অববাহিকার মাপ পুরো বাঁকুড়া-বীরভূম জিলা। সমস্তটা
এককালে জলে-জলায় আচ্ছন্ন ছিলো। মানুষই একে উদ্ধার করেছিলো
মানুষের অবহেলাতেই হ্রদের জলে বন্যা নেমে গোটা কাম্বোজ সাম্রাজ্যে
ধ্বংস করে দিলো। এ হ্রদের সমৃদ্ধি নানা কারণে। মাছের চাষের জন্য এ
প্রাচ্য ভূমি জোড়া খাতির। ওদের ইতিহাসের কিম্বদন্তী 'তোন্‌লে যা
কাম্বোজ তার।' কথাটা যে কতো সত্য পরে বুঝবে।

আমার বোধ হয় একটু ঝিম ধরেছিলো। আমি শুয়েছিলাম প্রথমে নৌকায়
তারপরে হ্যামকে। মশার প্রতিষেধে ধোঁয়া ছিলো প্রচুর। রাতে চার পাঁচ বা
উঠতে হোলো। দাপ্‌-সান ছিলো। ঘন জঙ্গল হলেও ভয় ছিলো না।

কিন্তু ভোর রাতে উঠে দেখি দাপ্‌-সান নেই। কেউ নেই। একা
স্তব্ধতা। যে স্তব্ধতার মানে বোঝা যায় না, যে স্তব্ধতার কেউ সাথী নেই ে
স্তব্ধতা যেন মনকে ঠেসে ধরে। আমার জ্বর। আমি একা।

জ্বর তখন খুব বেশী। ভোর হবার আভাস অরণ্যের মধ্যে পেতে দের
হয় না।—কিন্তু তোমায় বলে রাখি গায়ে জ্বর, পেটে যন্ত্রণা এবং সাথী সঙ্গ
হীন অরণ্যে পড়ে থাকার বেলায় মনেই থাকেনা কী বা দিন, কী বা রাত্রি
কোথায় কাব্য! কোথায় নিসর্গ।

খানিক হয় তো ভাবছিলাম এটা কাম্বোজ। কিন্তু আঙ্কোর কতদূর

লোকোবুরি মন্দিরের ধ্বংস।
আউধিয়া—থাইল্যাণ্ড

—চুলালং খড়ন প্রাসাদ-সংলগ্ন পান্নার বুদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গনে লেখক।
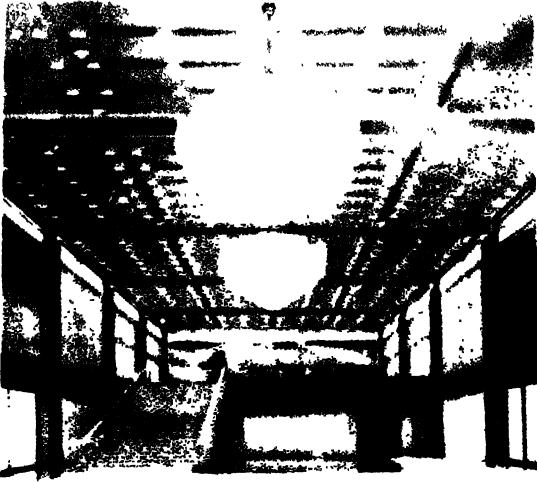
টোকিও রাজপ্রাসাদের একটি ঘর।
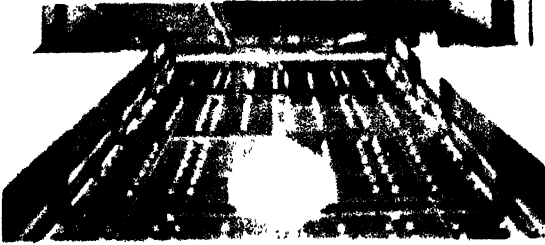
টোকিও রাজপ্রাসাদের সেতু।

বছিলাম যদি ফিরে যাই কী ভাবে যাবো ? ভাবছিলাম এমন ফেলে যাবে ন ? হঠাৎ মনে হোলো,—'আপনি চলতে থাকুন। ওরা ঠিক আপনাকে জে নেবে।' কিতাং মায়ো-র বাক্য !

এরই মধ্যে (হয়তো জ্বরের তাড়সে) আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। রোদের মেজে উঠলাম ! কেউ নেই। এবং আর বসে থাকা গেলো না। হ্যামক কে নেমে পড়লাম। যদি কোথাও কোনো আস্তানা, মানুষ, ওষুধ, খাবার— ওয়া যায়। অমন নিঃস্ব একাকী কখনও হইনি। পায়ের জুতো মোজা দুদিন র খোলা হয় নি।—ফলে ঘা ; ফাঙ্গাস্। সে ঘা আজও চলছে। ডাক্তার ল 'এলার্জি'। আমি জানি কী।

অরণ্য যেন আর শেষ হয় না কিন্তু আমি দিক নির্ণয় করেই চলেছি। যেতে ব উত্তরের কোণ ঘেঁষে পশ্চিমের দিকে। জলের খালটা ধীরে ধীরে রে যাচ্ছে। জন প্রাণীর চিহ্ন নেই ; অথচ নিপাট অরণ্য। নিরুদ্ধ রণ্য।

বহু বহু মৃত্যুকীর্ণ ভয়াল ক্ষণ কেটে যায়। যেন দিশেহারা হই। একটা য়ে মনে হোলো অরণ্য শিথিল হয়ে আসছে। দূরে বেশী বেশী আলো খতে পেলাম।···কিন্তু যাই বলি তোমায় সবটাই চলেছে আধা জ্বরে, াধা যন্ত্রণায় ; তা ছাড়া মাঠে বসা তো আছেই। নেশার ঘোরে চলা। ুধার তাড়না না থাকলেও যেতে হবেই শুধু একটি সন্ধানে চলা। মানুষ চাই, ানুষ। আমাদের সঙ্গী। আমাদের প্রাণ। মানুষের গায়ের গন্ধ, গ্রামের গন্ধ, ান্নাঘরের ধোঁয়ার গন্ধ। বিশ্বাস কোরো তখন মনে হচ্ছে মানুষের বিষ্ঠার গন্ধও যন অমৃত বলে বোধ হবে। মনে হবে কোনো গ্রামান্তে এসেছি।

মনে হোলো পায়ের ছাপ ধরা পথের নিশানা।—মনে হোলো কী যেন দখছি। বুনো কলা, সুপুরি ছাড়া নারকোল গাছ। একটা জলাশয়ে ভাঙ্গা পঠা দেখলাম। মুরগীর ডাক শুনলাম। মুরগীর ডাকও যে কানের ভিতর দয়া মরমে পশে এই প্রথম মর্মে মর্মে বুঝলাম।—মনে হোলো এগুচ্ছি।— ানুষ ! মানুষের দিকে যাচ্ছি।

ঝিমই ধরুক, ঘুমই পাক, তোমার হঠাৎ মনে হয়—ঘরে কে যেন এসেছে। ক আছে। আমি যেন একা নই। চকিত হয়ে ওঠো। এটা সবার হয়।··· মনে হয় দাপ্ সান হয়তো হ্যামকে ফিরেছে। কিন্তু ফিরে যাবো সে চিন্তাও নেই মনে। সঙ্গে আগুন নেই ; সেখানে মশা আছে, রাত আছে। ফেরা যাবে না। তা ছাড়া পথ ? তাই কী জানি ? "শুধু চলে যেতে থাকুন !" সেই কথাই সত্য !

হঠাৎ মনে হোলো খুব দূরে যেন জঙ্গল ফুরিয়ে গেছে। যেন চূড়া।

কিন্তু এগ্নবো সাহস হচ্ছে না। সাপ না হোক স্নাইপার আছে। হঠাৎ গ্নি
আসতে পারে।

কিন্তু এগ্নতে আমায় হবেই।

হাঁটতে থাকি। দ্নর্বার, কঠিন, অজেয়, সর্বনাশা একটা টান আমায় টেনে
নিয়ে চলতে থাকে। নায়াগ্রার মতো জলপ্রপাতের ধারায় পড়লে অজ্ঞাতসারেও
যেমন একটা দিকেই ক্রমাগতঃ এগিয়ে যেতে হয়, তেমনি টান। গ্ৃহ পারাবত
জানে না, মের্ন-স্বপ্নে বিভোর হংস বলাকার টান।

মনে মনে স্মরণ করি আশ্চর্য সেই 'চাম্' ব্রাহ্মণদের কথা। এদেশের নগরে
না হলেও অরণ্যের প্রত্যন্তে, অজস্র গিরিমালার ভাঁজে ভাঁজে এ ব্রাহ্মণরা আজও
ক্রিয়াশীল। তান্ত্রিক। পরশ্নরাম তন্ত্র, শিরশ্ছেদ তন্ত্র, ছিন্নমস্তা প্নজা এদের
অভ্যস্ত ধর্ম। এরা ভার্গব, এরা জামদগ্ন্য! এরা এখনও এসব ভঙ্গ্নরতাকে
ভঙ্গ্নর বলে স্বীকৃতি দেয় না। এরা আছে। আছে তাই মহাযান শ্রমণরা
আছে। সতীচ্ছদ বলির ব্যবস্থা আছে।—এই বিস্ময়কর তন্ত্রের টান আমার
নাড়ীতে। আমি পথ পাবোই। অদ্ভ্নত একটা সাহস ব্রহ্মদৈত্যের মতো ঘাড়ে
চেপে আমায় চালায়।

এই আঙ্কোরেই আমি য্নগে য্নগে আসতে চেয়েছি।—তবে কেন পিছ পা!
চলন্ বৈ মধ্ন বিন্দতি চরণ্ স্বাদ্ন ম্নদুম্বরম্! চলাই অম্ৃত, চলাই স্নফল!

* * *

তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে, এ বয়সে এমন প্নট্নর-প্নট্নর করে বের্নেনো কেন
কেন যে এমন আসতে চাই জানো? এই অপর্নপা কুত্ৃহল-গরীয়সী গ্ৃহহার
প্রতিভার নাম জিজ্ঞাসা।

বসে বসে ভাবি তব্ন তো এই কম্ব্নজ দেশ। আমি পা রেখেছি এই প্নণ্য
ভ্নমিতে। প্রথম যে ভারতীয় এদেশে এসে নিজেকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
করে, যার থেকে চন্দন বংশের প্রবর্তন তার নাম কৌণ্ডীন্য। আমি সেই কৌণ্ডিন্য
না হতে পারি, কিন্তু আমি ভারতের, কৌণ্ডিন্যের ভারতের।

একটি ঝাঁক ছাতারে এসে বসে গেলো দ্নরে। কী পেয়েছে খাদ্য। দ্নটো
শ্যালে তাড়া করতে পালিয়ে গেলো। দ্নর আকাশে ভাসছে চিল। আমি যন্ত্রণায়
অধীর। কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। ম্ৃত্যুর কথা ভাবছি না। যা ভাবছি তা
ইতিহাস, যা তোমরা ভালোবাসোনা।

হঠাৎ দেখি জঙ্গলের মধ্যে অজস্র গাঁদাফ্নল ফ্নটে আছে। জানতাম গাঁদার পাতা
ও বীজ রক্তক্ষরণের প্রতিষেধ। এক ম্নঠো পাতা এবং ফ্নল চিবিয়ে খেলাম।

* * *

বোধ হয় গাঁদার পাতা কাজ করেছিলো। মিনিট দশেক চলার পর পেলা

ঃধারে ছড়ানো মন্দিরের পাথর, প্রচুর ভাঙ্গা মন্দির, মাঝে মাঝে পায়ে চলার
ঃ কাটা পথ। ভাঙ্গা মন্দির মানেই সাপ। কিন্তু জানি সাপ এগিয়ে এসে
ক্রমণ করে না। সাবধানে এগুলে ওরা ভয় পায় না, সরে যাবার সময় পায়;
। না পেলে ওরা খামোকা ডাঁশে না। সাপের চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মকভাবে
ড়ে আসে 'শিগেলা-শিগাই',—ডিসেণ্ট্রির জনক।

কিন্তু একটা জরাজীর্ণ মন্দির আমায় টানছে। ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়াও সেই
ার কড়া গন্ধটি পেলাম যেটি কাশীর দশাশ্বমেধঘাটের ইতি উতি আশৈশব
মার চেনা। প্রচুর লম্বা কলকের মধ্যে বড় তামাকের আমেজ আমায় অব্যর্থ
থ নিয়ে চললো।

হোক ধুনী, হোক সাপ, হোক গাঁজা। এখন সবাড় বড়ো কথা 'মানুষ'।
লে এ হবে মানুষের সঙ্গে পরিচয়, মানুষ ব'লে। কণিকা নয়, সর্বহি
, দাপ্ সান নয়,—আমার মানুষ পরিচয়ের ছাড়পত্র আমারই হাতে। আমি
গয়ে গেলাম।

*   *   *   *

এই নিরাতঙ্ক আতঙ্কের পারে দেখি বিস্তীর্ণ এক অঙ্গন। আগাগোড়া
কো করে কাটা পাথরের টালি ছাওয়া হলেও ফাটলে ফাটলে ঘাস, আগাছা।
বহাওয়াটা নির্জন, স্তব্ধ, ভুতুড়ে। বাইরে কাঠঠোকরার ঝিম্ ধরা একঘেয়ে
়। অঙ্গনের শ্যাম পিচ্ছিল বিস্তারের মাঝে পায়ে দাবানো দোমড়ানো ঘাসের
ক্ষ্য।—ওপরের খিলানের তলা দিয়ে ধোঁয়ার সাক্ষ্য নির্লিপ্ত একা-আকাশের
়ে নানা লেখা লিখে ইন্দ্রজাল রচনা করছে।

প্রাঙ্গণে নামার আগে হাঁটু মুড়ে প্রণাম করি,—'ত্বয়ৈ-কয়া-পূরিতমম্বয়ৈতত্
তে স্তুতি?' আমি তো শুধু আমাকেই নিয়ে এসেছি। আমার ভিতরের
' মলিনতা, সর্ব অশুচি আজ বাইরে এসে আমায় জাপটে ধরেছে। নোংরা
মি; নোংরা সারং; নোংরা কামিজ। তবু আমি আমি, তোমার
মি। তুমি তা জানো সর্বস্যার্তিহরে। আমার কলম গেছে, খাতা গেছে,
ষ পুঁটুলী ব্যাগটাও হ্যামকে পড়ে আছে। আমি শুধু আমাকেই নিয়ে
সছি। গ্রহণ করো আমার প্রাণের নৈবেদ্য। আমি আজ বড়ো একা। মাথা
লাম।

তারপর এগুলাম। যদি মন্দিরে কোনো মূর্তি পাই। যদি কোনো মূর্তি
খ। পেলাম না কিছু। কিন্তু দেখলাম!

বুঝেছিলাম এ পাথর শুধু পাথর নয়। এ ভূমি কেবল রাশীকৃত ইঁটের
ড়োয় ঢাকা জটিল কঙ্কালী পোড়ো জমি নয়। কী যেন আছে এখানে!

তখন হঠাৎ চোখে পড়লো। মন্দিরের অঙ্গন পার করে বারান্দা। বারান্দার

মাঝে পাথরের চৌকাঠ। তার ভিতরে পর পর কয়েকটা থামের মাথা থেকে
পা পর্যন্ত শুধু অন্ধকারের প্রলেপ। তার ওপারে জমাট অন্ধকার ; ভিজে অন্ধকার।

তবু যেন চোখে পড়লো একখানি তামসী প্রতিমার শীর্ণ মুখের মহাকোটরে
মধ্য দিয়ে ক্ষুধাতুর অগ্নিক্ষরা প্রোজ্বল দৃষ্টির সম্মোহন আকর্ষণ। চোখে
চাওয়ার আকর্ষণে বিহ্বল বিভ্রান্ত হওয়ার কথা তুমিও শুনেছো ; আমিও শুনেছি
বিবেকানন্দ দেখেছিলেন রামকৃষ্ণের চোখে ; দান্তে দেখেছেন বিয়াত্রিচে-র চোখে
লেডী ক্যারলীন দেখেছেন বায়রণের চোখে। রাশীকৃত ইঁটের, ধুলোর
পাথরের স্তূপের ওপরে বসে আছেন অস্থি-চর্মসার উলঙ্গিনী জরতী। রু
চোখে চেয়ে আছেন সেই পরমতৃষা ; সেই লোলার্ক লেলিহা।

দূর ঘন নিঃশ্বাসে যে বুক ওঠা নামা করছে তার চামড়া ঢেকে রেখেছে
শঙ্খ, মহাশঙ্খ, প্রবাল, স্ফটিক, রুদ্রাক্ষের রাশ। এবং আরও লক্ষ্য করতে স্পষ্ট
হোলো ঐ দোলন ছন্দের চাঞ্চল্যের আশ্রয়ে বাস করছে বশীভূতা নাগিনী দল
লালে কালোয় অন্ধকারে যা কুঁচ বলে মনে হয়েছিলো সে কোরালের কেউ
মহাশঙ্খের বেড়ের মধ্যে শঙ্খিনী নিজেই জড়িয়ে আছে।

নৈনীতাল জেলায় হল্‌দোয়ানী কাশীপুর জঙ্গলের মধ্যে চামুণ্ডা মন্দিরে
একদা এমনি এক দিগম্বরী প্রতিভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমার মা
সঙ্গে ছিলেন। ভয় পেয়ে বললেন, কাজ নেই এগিয়ে। ফিরে চল্‌। এ
মন্দিরে মানুষ জন আসে না। সেই ভয়ঙ্করী তখন নির্জন সেই মন্দিরের চাতালে
পোঁতা যূপের পাশে রাখা পাথরের স্তম্ভের ওপরে খোদাইকরা বাটির মধ্য থেকে
আঙ্গুল্ দিয়ে চেটে চেটে যা খাচ্ছেন তা কিছুক্ষণ আগে বলি দেওয়া কোনো
প্রাণীর রক্তই হবে। মা-র ভয় হয়েছিলো।

আমার হয়নি। আমি সেই যূপের পাশে দাঁড়িয়ে সেই রক্তমাখা মাটি
কপালে দিয়ে প্রণাম রাখলাম। উঠে দেখি সেই পরমা মাতৃকা সরে গিয়ে বিশাল
অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে বসে আঙ্গুল চাটছেন।

ভয় আমার হয়নি। একটা কাক এসে বসলো কার্ণিশে। হঠাৎ ডেকে
উঠলো তীব্র শাসনে। পরক্ষণেই উড়ে এলো দুটো নীলকণ্ঠ। কাকটা উড়ে
চলে গেলো।

* * *

একটু একটু করে এগিয়ে যাই। চৌকাঠ পার হয়ে অলিন্দে এলাম। এক
যজ্ঞবেদী। কিন্তু ভস্ম পড়ে থাকা ছাড়া কিছু নেই। ধোঁয়া যা বার হচ্ছে
ভিতরের ধুনী থেকে। কড়া গন্ধও সেদিক থেকে। যজ্ঞবেদীর ভস্ম নিয়ে কপালে
দিলাম। অপরূপ ক্লান্তি ; নির্মম অবসাদ ; ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি
জ্বরের তাড়সে সেই অলিন্দের আশ্রয়ে এই প্রথম ভূমিশয়ান হলাম। ভয়কে

তক্রম করে যে অবসন্নতা সেই ঘোর অচৈতন্যের কোলে আমি ঢলে পড়ার আগে রে ধীরে আবৃত্তি করি—

চিতাভষ্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো।
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈক পদবীং।
মৃড়ানী ত্বৎ পাণিগ্রহণ পারিপাটি ফলমিদম্‌।
ন মোক্ষাস্যাকাংক্ষা নচ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে।
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ।
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ।

তখন আমি সেই মৃত্যু শীতল পাথরের ধুলোয় পড়ে কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ড়ে আছি।

এর পরে কী হয়েছিলো তা আমি বলতে পারবো না পদ্ম। তা বলতে পারা য় না। সে হোলো গম্ভীরার নির্ভাষে মহাভাষের স্পন্দন। দ্বৈতের আসঙ্গে দ্বৈতের অনুভব। তোমরা একদা মাল্যে-গন্ধে-গীতে-পরিহাসে-প্রজল্পিতে-প্রমালাপে আমার পুষ্পশয়ন রজনীকে মদাতুরা করে তুলেছিলে। সেই প্রমোদের র্ণনকথা হয়তো আমি বলতে পারি; কিন্তু তার পরেই তো তোমরা ঘরের রজা টেনে দিয়ে তোমার দিদিকে এবং আমাকে দ্বৈত যামলের নিবিড় কাকীত্বে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে। আর সেই বন্ধ দুয়ারের ওপারে অর্গলাবদ্ধ ামরা যা ডুবলাম সে গম্ভীরার বর্ণন, সে অনির্বচনীয়ের কথন, সে আমি ারবো না। 'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোনো বাধা নাই ভুবনে'।

* * *

অচৈতন্য থেকে চৈতন্যে ফিরে এসেছি। সে দেবী অন্তর্হিতা। আমি কা। একটু একটু ঘাম হচ্ছে। জ্বরটা কমছে হয়তো। কিন্তু শুয়ে থাকা বে না। বাইরে যেতে হবে। রক্ত পড়ছেই। একটু একটু ভয় করছে। ঠাৎ প্রচুর দুর্বল বোধ হচ্ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। বেশী অক্সিজেনের রকার হচ্ছে। তবু উঠি। তবু চলি।

সামনে পথ মতো দেখলেও পথ বলে বিশ্বাস করতে পারছি না। মিনিট দশেক গুলাম রাবার, দেবদারু, না-জানা বিশাল বিশাল গাছের এপার ওপার দোলানো াটা মোটা লতা, লিয়ানাই হবে। কিন্তু পর পর অনেকগুলো ভাঙা পাথরের চাঁই। াকড়ে, লতায়, গুল্মে পথ দুরধিগম্য। খুব সাবধানে চলেছি। পড়ে যেতে চাই া।...হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর সঙ্গ নিলো। কুকুর আমি ভালোবাসি; কুর আমার প্রিয়। কুকুরের উপস্থিতি সংবাদ এনে দেয় গ্রাম কাছে।

পরে জেনেছিলাম আমায় ওরা ঠিক আঙ্কোর থোমের উত্তরের বনে 'রেখে গিয়েছিলো ; হ্যাঁ, রেখেই। ওরা জানতো আমি পথ পেয়ে যাবো। ইচ্ছা করে ওরা আঙ্কোর ভাৎ-এ যায় নি। আরও পাঁচ ছ' মাইল উত্তরের জঙ্গলের শে প্রান্তে আমায় নিশ্চিন্তে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। আমি দিক ভুল করতে পারতা কিন্তু সব দিকেই কঠিন অরণ্যের অবরোধ। কেবল দক্ষিণেই ক্রমশঃ অর পাতলা, এবং পথ করে চলা যায়। অন্যদিকে চলা অসম্ভব। ওরা স্থানী বনেচরদের সাহায্য পেয়েছিলো বলেই বুঝেশুনে লটকে গিয়েছিলো আম হ্যামকে।

যে মন্দিরটায় গিয়েছিলাম সেটার ইতিহাসও পরে জানলাম। মন্দিরটির ন ছিলো প্রা-থান্। নগরীর গৌরব নীয়েক পীয়ে°। এ তল্লাটের ইতিহা ভারতেরই এক বিস্মৃত অধ্যায়।

*　　　*　　　*

৮০২ থেকে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (দ্বিতীয়) জয়বর্মণের রাজত্ব ছিলো এই জয়বর্মণের গল্প বড় মনোরম। গল্প ছিলো ; আজ নেই। শঙ্খদ্বীপে 'কলম্বস্' পল্লব নৌ নায়ক কৌণ্ডিন্যের স্থানীয় আদিবাসী স্ত্রী বেতসপর্ণা (ল্যুই-য়ে) সময় থেকে প্রায়ই কাম্বোজে বড় বড় রাণীরই শাসন চলেছে শ্রেষ্ঠবর্মণ মামাতো বোন রাজলক্ষ্মীকে বিয়ে করেন ; রাণীই তখন প্রধান রাজ্যের 'পরিষদ্-সেনানী' ভববর্মণের ষড়যন্ত্রে রাজলক্ষ্মী রাজত্ব হারান। ত কিছু পরেই, প্রথম জয়বর্মণের সময়ে, তাঁর স্ত্রী জয়াদেবীও রাজত্ব ভালো করছিলেন। কিন্তু······

এই সময় থেকেই পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আরব অভ্যুদয়। যবদ্বী থেকে মুসলমানেরা শ্যামে বাণিজ্য করতে আসতো। কাম্বোজের সিংহাসে রাণীর প্রতাপ ইসলামীয় নীতিবোধের নাকে ঝামা ঘষতে লাগলো। শ্যামে সঙ্গে জোট বেঁধে প্রায়ই কাম্বোজে আক্রমণ চলতে লাগলো। যে মহা বিক্রমে বলে শ্যাম অবধি দখল করে কাম্বোজ নিজের প্রতাপ কায়েম রাখতে পারতো, তেম সুসংবদ্ধ সংগঠন কাম্বোজে তখন ছিলো না।

তবু জয়াদেবী ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এঁর পরে এক অর্বাচীন যুব সিংহাসন পেয়ে অযথা যবদ্বীপ রাজদূতকে উপহাস করেন। তাঁকে বলেন যবদ্বীপ নরেশের উচিত দূতের বদলে নিজেই এসে কম্বোজের সভায় কুর্ণিস কা যান। তবে, যদি তা একান্ত অসম্ভব হয়, যবদ্বীপ নরেশ নিজে না এসে কেব তাঁর মাথাটা পাঠিয়ে দিলেও চলবে। তাতেই প্রণাম করার সুফল ফলবে।

উপহসিত যবদ্বীপ রাজ "নিজেই" এলেন। এসে সেই অর্বাচীন রাজা মহীপা বর্মণের শিরশ্ছেদ তাঁর প্রাসাদেই করেন এবং সেই মাথাটা বিজয়ের স্মৃতি হিসা

বদ্বীপে নিয়ে গেলেন। এ ছাড়া রাজ্যে কোনো লুটপাট কোনো বিশৃঙ্খলা তিনি রেন নি। নতুন রাজা ভববর্মণ কেবল প্রতি প্রাতে যবদ্বীপের দিকে মুখ করে পূর্বদিকে) প্রণাম করতেন তাঁর জেতার সম্মান রক্ষার্থে।—অবশ্য মুখে বলতেন ূর্য প্রণামের কথা। কেউ বিশ্বাস করতো না। জয়া দেবীর নামে উৎকীর্ণ ক শিলালেখ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হবার পর এ আখ্যায়িকার গুরুত্ব খুব বেড়েছে।

এই যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশজাত বিজয়ী রাজা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন াম্বোজের কুমার জয়বর্মণকে। বন্দী করে নয়; তবে কাম্বোজের সুব্যবহারকে াশ্চিত করার জন্য। ফলে জয়বর্মণ কাম্বোজে শৈলেন্দ্র সমাজের প্রগতিশীল শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে ফিরলেন।

রাজ্যের সুরক্ষা কল্পে জয়বর্মণকে বহুবার রাজধানী পরিবর্তন করতে হয়েছে। ন্দ্রপুর, হরিহরালয়, অমরেন্দ্রপুর। কিন্তু এঁর প্রধান কীর্তি কুৎ-লেন পাহাড়ের পর গড়া দুর্ধর্ষ দুর্গ মহেন্দ্রপুর, মহেন্দ্র পর্বতের ওপর (Thobong Chmum)।

হঠাৎ যে মন্দির ও পুকুর দেখে মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণা ভুললাম,—সেটি াম্বোজের এক প্রসিদ্ধ মন্দির নীয়েক্ পীয়েং। খুবই ভেঙ্গে চুরে ধ্বংসই য়ে গিয়েছিলো। শিমুল-বটের শেকড়ের গ্রাসে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ায়েছিলো এ মন্দির। সম্প্রতি সংস্কার হয়েছে।

* * *

তখন কী জানি কোথায় আমি দাঁড়িয়ে? নয়ন ভরে দেখছি। লক্ষ্য রলাম এ মন্দিরের ভিত্তিতে দুটি সাপ অঙ্গাঙ্গী হয়ে বেড়ে পরস্পরকে চুম্বন রছে। মাথা দুটো সামনে। তাই কেমন যেন মনে হোলো। এ মন্দির দ্ম-সাপের প্রতীকে মিথুনতার, জীবনায়ণের, এক থেকে বহুর সৃষ্টির প্রতীক য়তো? ঘুরে ঘুরে পিছনের দিকে এসে আর সন্দেহ রইলো না। লেজের দকের শিল্প কৌশলে মিথুন-ভঙ্গি! দৃঢ় সংবদ্ধ সর্পমিথুন পরস্পরে পগত। যে রমণ রস থেকে আধুনিক সভ্যতা (?) ভণ্ডামীকে পোষণ করেও মণীয়তাকে বাদ দিয়ে অশ্লীলতাকেই সরাসরি ডেকে এনেছে, সেই স্পষ্ট ীবনরসের অতিস্পষ্ট শক্তিকে বন্দনায় সম্মানিত করার এই অনিন্দ্যসুন্দর ায়োজনকে বার বার প্রণতি জানালাম।

ভুলে গেলাম রোগ যন্ত্রণা। ভুলে গেলাম এ বনে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই নদারুণ অন্ধকার, অনাশ্রয় নেমে আসবে।—ঐ জঙ্গল পার হতে হতে চোর-াঁটায়, কণ্টিকারিতে, বাবলায়, ফণীমনসায়, বিছুটিতে ছাল চামড়ায় সহস্র ক্ষত হাল। প্রাতিষেধিক একটা পাতা জানা ছিলো। তাই ঘষে ঘষে এসেছি। কিন্তু াড়ো কথা,—এসেছি।—এসে এই পদ্মে, পানায় ভরা সরোবরের তীরে দাঁড়িয়েছি।

কুকুরটা আমায় ছাড়ে নি।—ও থাকলে আমি মানুষ পাবো এই দৃঢ় প্রত্যয় তখন আমার সম্বল।—দেহ এতো নোংরা যে জলের দিকে নামলাম। যতটা পারলাম নিজেকে ধুলাম।

বনের গূঢ় কুণ্ডলী পর্দার মতো এপার ওপার ছেয়ে আছে। তার এক টেরে বিরাট মন্দির প্রাসাদ প্রা-থান্। (তখন জানতাম না) পরে জেনেছি আঙ্কোর ভাৎ-এর মতোই বিশাল ছিলো এ মন্দির। চার দিকের চার সিংহদ্বার দিয়ে জলের পরিখা পেরিয়ে বাগান পার করে মন্দির প্রাসাদে যেতে হোতো। আজ যে কী অসাধারণ ধ্বংসের কবলে সেই মন্দির ধারণা করা যায় না।

একটু একটু বাতাস দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে পাতা পড়ে, পায়ের তলায় পাতা কাদা ভস্ ভস্ করে। এক এক ঝাঁক পাখি আসে। গাছ ভরে যায় টিয়ায় চন্দনায়, দোয়েলে, বৌ কথা কও-এ,—এবং সাদা সাদা বকে। ঝুর ঝুর করে পাতা পড়ে। হঠাৎ আবার সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।—কোনো জন্তু আমার অগোচরে চলেছে। ঝোঁপ নড়লো; পচা ডাল ভাঙলো; ক্কাঁও ক্কাঁও করে-বুনো মোরগ তিতির এ অন্ধকার থেকে ও অন্ধকারে মিশে গেলো।

তবু মনে হয় এ প্রচ্ছদপট না হলে এ ধ্বংস-চমৎকারকে ধরে রাখতো কে চিত্রকর-শিল্পী নিজে জানে চিত্রকে তার প্রতিভায় প্রতিভাভ করে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তার ফ্রেমটি কেমন হবে; তাকে কোন্ দিকের দ্যালে, কতো দূরে কোন আলোর ঠাওরে রাখতে হবে। যে মহান চিত্রকর এই মহারণ্যের জঠরে এই মহান সৃষ্টিকে মহাপ্রলয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন তিনিই সার্থক সৃষ্টি করেছেন অরণ্যের এই প্রচ্ছদপট আর এই বনস্পতি মহীরুহের ফ্রেম।

পাড়ে অনেকটা জায়গা পাথর বাঁধানো। পরিষ্কার। জ্বরের জন্য কিছু দুর্বলতার জন্য কিছু, ঘুম পাচ্ছে। চাতালে শুয়ে পড়েছি।

বেশীক্ষণ ঘুমোই নি। কিন্তু উঠে দেখি বেলা আর নেই। কুকুরটা দূরে শুয়ে। দারুণ পিপাসা। জলে নেমে জল খেতে যাবো। হঠাৎ শ এলো,—নহি, নহি।

নীক্ পীয়েনের দিক থেকে এক শ্রমণ আসছেন। প্রৌঢ়, পীতবাস বৌদ্ধ পোশাক। মুণ্ডিত মস্তক।—আমি বিস্মিত। চোখে জল এসে গেছে মানুষ, মানুষ। আমি বাঁচবো। আমি হারিয়ে যাই নি। সেই ক্ষণ মনে হলে আজও নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়েও আমি চমকে উঠি। চো আমার জলে ভরে যায়।

কুকুরটার লেজ নাড়া দেখে বুঝলাম এ শ্রমণকে চেনে এ কুকুর।

শ্রমণ কিন্তু একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। "নারসিংহী মন্দিরে তুমিই গিয়েছিলে?" স্পষ্ট সংস্কৃত।

বহুকাল আগে এ ভাষা বলায় অভ্যস্ত ছিলাম। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল না বলার ফলে জিহ্বা আড়ষ্ট হলেও বুঝতে বেগ পাচ্ছিলাম না।— বললাম, জানি না। বলতে বলতে প্রণামও করি বার বার। তারপর বলি,— এক বৃদ্ধা তাপসীর দর্শন হোলো।

তবুও আরও মন্দির,—আরও দ্রষ্টব্য দেখতে চাও?

জানি, এ শ্রমণ আমায় ঠিক ধরেছে। আমি মূর্খ। বলি, চাই, যদি বাধা না থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিক? পুরাবিদ্?

পরমমূর্খ। লোভী। আত্মার রাজ্যে তস্কর। সত্যের রাজ্যে প্রবঞ্চক।

হাসলেন সেই অপূর্ব সরল সাধু। পরে বললেন, এসো।—

পুনশ্চ প্রবেশ করলাম জঙ্গলে। বুঝলাম সরোবরের পূর্বে চলেছি। আধঘণ্টা চলার মধ্যেই আমায় দুবার জঙ্গলে ঢুকে বসতে হোলো। মনে হচ্ছে শ্রমণকে বলা উচিত হবে কি-না যে আমি চলতে আর আদৌ পারছি না।

শ্রমণ নিজেই প্রশ্ন করলেন অনায়াস সংস্কৃতে আমার 'ভান্ড' চালিত হয়েছে নাকি। এখানে যত্রতত্র জলের ব্যবহার করার ফলে এই ভীষণ ব্যাধি হয়। তাই জল খেতে নিষেধ করেছিলেন। প্রশ্ন করলেন রক্তক্ষরণ হচ্চে কি-না। অম্লাধিক্য না পিত্ত?

কী আর বলি। বোঝাবার চেষ্টা করলাম বৈদেশিক খাদ্যই আমার অনভ্যাসে অখাদ্য হয়েছে। (মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছি সেই চিংড়ি, সস্ ও জলযাত্রা)।

শ্রমণ কিন্তু বললেন, মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, নিদ্রাভাব,—এগুলিকেও দেহ বিকারের কারণ বলে জেনে রাখা ভালো।

ভৎর্সনা। হোক। তবু মনে বল, আমি নিরুদ্বেগ। এখন আমার মুক্তি। এখন অরণ্য আমার, আমি অরণ্যের নই।

উনি চলতেই লাগলেন, তবে ঝোঁপ ঘেঁষে ঘেঁষে। চোখের মধ্যে চকিত সন্ধানের ক্ষিপ্রতা। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কুকুর ছাড়ে নি আমার পাশ। বার হলেন কতকগুলো পাতা-লতা সঙ্গে নিয়ে। হাতে করে রগড়ে আমায় হাঁ করতে বললেন, এবং নিংড়ে নিংড়ে মুখে দিতে লাগলেন। আর ধুতরো ফলের মতো একটা ফল ফাটিয়ে ভেতরের জেলি ধরা এক রাশ বিচী আমায় চুষে চুষে ফেলে দিতে বললেন। এইভাবে প্রায় চার পাঁচটা ফল খেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ বোধ করলাম; কিন্তু বুঝলাম ঘুম আসছে। পাতার ভেলাটা মুখে রাখতে বললেন, যতক্ষণ পারো রাখো। পিপাসা আর রইলো না।

দূরে আলো দেখতে পেলাম। একটা বাড়ি। সেকালের বাড়ি হলেও

পরিচ্ছন্ন এবং ছোটো। পরে জেনেছিলাম যশোবর্মণ এই নগরী স্থাপন করেন যশোধরপুর। এর চারপাশে তিনি গড়ে তোলেন বহু প্রাসাদ, বহু মন্দির, বাজার, অতিথিশালা, বিশ্রামাগার। এ ছাড়া রাস্তা, ঘাট, সেতু। নদীতে বাঁধ দিয়ে, খাল কাটিয়ে, বিশাল বিশাল পাঁচ ছ মাইল দীর্ঘ দীঘিকা রচনা করে জলের ব্যবস্থায় তিনি এ নগরীকে এবং দেশকে একধারে বন্যা থেকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে কৃষির স্বর্গ রচনা করেছেন। এবং মনোরম করে সাজিয়েছেন। প্রাসং প্রে, ক্রোল্-কো সেই সব বিশ্রামাগারদেরই অন্যতম।—পর পর কয়েকটা ভাঙ্গা দেউলকেই বাসযোগ্য করে রাখা।

লম্বা থাম দেওয়া বারান্দা। বেশ চওড়া। বারান্দাতেই থাকা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঘর মতোও আছে। এরই একটা কোণের ঘরে আমায় শুইয়ে দিয়ে গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে দেওয়া হোলো।

* * *

ধূপের গন্ধ এবং ঘণ্টাবাদ্য শুনে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠতে গেছি। দু-খানা হাল্কা হাত আমার বুকের ওপরে ঢাকা কম্বলের ওপর চাপ দিলো।

যাঁরা আমার সেবা করছিলেন তাঁরা শ্রমণী। এঁদের বাসস্থান বেশ দূরে এমন বিপন্নদের সেবা এঁরা এখনও করেন।

আমি অনুরোধ করলাম পূজা দেখবো।

আমায় অপেক্ষা করতে বলে একটু পরে আমায় ধরে বসিয়ে দিলেন দুটি বালিশের সাহায্যে। বেশ নরম গদী। একজন ঘন একটা পানীয় দিলেন কোনও অপরিচিত ফলের পানা। সুগন্ধ এবং সুস্বাদু।—দু জনেই পাশে বসে রইলেন।······আশ্চর্য, সেই অন্ধকারেও বুঝলাম কুকুরটি কাছে কাছেই আছে

সামনে চোখ মেলে চাই। যার নাম 'মণ্ডপ' তারই একটা কোণে আমি বসে। গর্ভগৃহে পূজা চলেছে।

মূর্তি ষট্‌ভুজ শিব, সঙ্গে পার্বতী। বজ্র, খড়্গ, পদ্ম, পাত্র এবং অভয় মুদ্রা। ষষ্ঠ হাত দেবীর কাঁধের ওপর দিয়ে আলিঙ্গিত। সুন্দর, সুঠাম নিপুণ ভাবে শিল্পিত নন্দী ও ভৃঙ্গী। সমস্তটাই কাঁসার ঢালাইয়ের মতো সম্ভবতঃ নব ধাতুর। একটু বাইরের দিকে লিঙ্গ মূর্তির ওপর কলস ঝুলছে চার ধারে পূজার্থী বসে। জলে ফুলে ধূপে দীপে, বিশেষ করে মালায় মালা সাজিয়ে পূজা দিচ্ছে। যাঁরা পূজা করছেন তাঁদের শ্রমণের সাজ, মুণ্ডিত মস্তক তবু যেন পৌরাণিক পূজা।—

শরীর তো দুর্বলই। মাঝে মাঝে চোখ বুজে আসছে। নিঃশব্দ অবলোকনে সবটা অন্তর্লীন করার চেষ্টায় আছি। পুরোহিতের মাথায় ত্রিপুণ্ড্রক, চোখে কাজল। গলায় রুপো বাঁধানো বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা।

বিস্মিত হবো সে সামর্থ্যও আমার নেই।—এখানেও গরম জলে গামছা ভিজিয়ে নিংড়ে আমার পা, পায়ের তলা, হাতের তেলো বারবার মুছে দিচ্ছে। পটে লাগিয়ে দিচ্ছে প্রলেপ।······কিন্তু না !! এ চলবে না।

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে উঠে বসলাম।

শাঁখ ঘণ্টা বাজলো। তিব্বতীদের মতো ভাত ছিটিয়ে ছিটিয়ে পুজা। ভাতের মধ্যে, এবং আলাদা-ও পিঠে, ভাজা, মাংসও। বোধহয় মাছও। চ্যাম ভাষায় মন্ত্র পড়লে কী হবে, ওঁ-কার ধ্বনি, হুম্ ধ্বনি, আর তন্ত্রের কিছু কিছু বীজ ধরতে পারছি। বুঝতে পারছি হোমের—মন্ত্রে বৈদিক সংস্কৃতের প্রয়োগ। খানিকটা তার শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়। বুঝতে পারছি আঙ্গুলে আঙ্গুলে বাধিয়ে মুদ্রাসাধন। বুঝতে পারছি আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-ন্যাস। বিশেষার্ঘ্য স্থাপনটি পরম ভক্তিভরে বেশ সময় নিয়ে হোলো। অদ্ভুত ভালো লাগছে। প্লুতস্বরে উচ্চারিত মন্ত্র শুনে পর পর কিছু কিছু আবৃত্তির সঙ্গ নেওয়া আমার অসম্ভব হোলো না।

হোম জ্বলে উঠলো। ব্রাহ্মণের বিচিত্র দীপ্ত চেহারার গৌরবের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিচিত্র নারী, বিচিত্র বেশ। জটাজুট সমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবাং। চোখ দুটি ক্ষুধাতুরা ; জ্বল্ জ্বল্ করছে। মালায় রয়েছে মহাশঙ্খ, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ। তখন স্বভাবতঃই আঁখি চায় দেখতে সেই বিচিত্রবর্ণ শঙ্খচূড়কে, যেটি আগে ঐ দেবীর গলায় দেখেছিলাম ভাঙ্গা মন্দিরের অন্ধকারে। লক্ষ্য করে দেখি সেই নাগরাজ বেড় দিয়ে পড়ে আছে লিঙ্গ মূর্তির গললগ্ন হয়ে।···কিন্তু এখন সেই দিগম্বরীর নেই সেই নির্জন একাকীত্বের নিরবয়বতা ; তাঁর পরণে জ্বলদর্চিবরণ চোখ ধাঁধানো লাল রেশমী শাড়ি,—গ্রামের চিরন্তন প্রতিভার অক্ষয় দান।

কিন্তু কা এষা ? এ নারী কে ? এতোখানি বৈভব, এমন মহিমোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা, এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তামসী গরিমা কার সাধনের সিদ্ধি ?

আমি ব্যাকুল। আমি তাকাতে যাই, লুটোতে যাই ; ছুঁতে যাই সেই চরণ···।

হঠাৎ সেবকদের দুজন দাঁড়ালেন,—"প্রসাদম্"। আমার এবং দেবীর মাঝে দাঁড়ালেন। এবং আমি দেখছি মূর্তি ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছেন। সে দিক অন্ধকার। ছিলো অন্ধকার ; হয়ে উঠলো রহস্য কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন ধরণীর গর্ভকোষ।

মন ডেকে উঠলো, ওগো তুমি কে, দাঁড়াও···

দেবী তখনও অন্ধকারে। তবু দেখি।

এরা প্রসাদ দিয়েছিলো। খেলুম।

প্রসাদ ? নাকি অমৃত ? না বিষ ?

দেখেছো পদ্ম, যা দেখি, যা শুনি, যা পাই,—প্রাণ দিয়ে লিখতে গেলে তারই রূপ যেন রূপকথা হয়ে ওঠে। শোনো পদ্ম, প্রকৃত রূপকথার মতো সত্য না হলে পরম কথায় এতো রূপ হোতো না।

*　　*　　*

সে রাত গভীর হয়েছিলো। সেই মণ্ডপের তিন ধারে পর্দা পড়েছিলো। একটা কড়া ধূপের আমোদে মশা ছিলো না। রেশমী গদির মধ্যে আমার কোনোই অসুবিধা ছিলো না। ঔষধের ক্রিয়ায় খুবই ঘুম হলেও বুঝেছিলাম আমি সংরক্ষিত, নিরাপদ।

সেই আশ্বস্তিভরা মনে ঘুম এলো যেন সুষুপ্তি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলো ভোর বেলায়। ঊষারও আগেকার সময়।

জঙ্গলে কখনও ঘুম ভেঙ্গেছে ? নিছক জঙ্গলে ? দেশ-বিদেশে "ভ্রমণ" করতে যাই। Sight-seeing নামক ব্রত পালন করি। দেখার list দেখে দেখি। কী দেখি ? যা দেখি তার কতটুকু আমার হোলো ?—তারও বড় প্রশ্ন, কতটুকুর সঙ্গে আমি মিশে গেলাম ?

অরণ্যের 'দেখা' তো 'লিস্ট'-এর মধ্যে পড়ে না। অথচ আমি ধ্রুব জানি, অরণ্য যারা দেখলো না তারা ধরণীর গূঢ় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হোলো না। পৃথিবী-প্রেমের সংকেত-কুঞ্জে তারা প্রবেশই করলো না। ইতি—

জামাইবাবু

৮

কল্যাণীয়াষু,

ঘুম ভেঙ্গে যেতেই বাইরে হয়ে এলাম। শরীর ঝরঝরে লাগলেও খুব দুর্বল। রক্ত পড়া মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু সর্বাঙ্গে বেদনা। মুখ বিস্বাদ।

আমায় আরো পুরো দুদিন ঐ আশ্রমে থাকতে হোলো। সেই শ্রমণই আমায় এনে দিলেন এক উৎসর্গীকৃতা,—শ্রমণী বলবো, না সেবাদাসী বলবো, জানি না। মন্দিরের পরিচর্যা-ব্যবস্থার অঙ্গ, অথচ বেতনভুক্ ন'ন। বহুদূরে গ্রামে পরিবার আছে। কিন্তু মন্দিরের আকর্ষণেই বিবাহ না করে আছেন। নাম মী কেয়ো। শ্রমণ দয়া করে আনিয়েছেন আমার সুবিধার জন্য। সুবিধা আর কিছু নয়,—মী কেয়ো ইংরিজী জানেন।—বুঝতেই পারছো আমার সুবিধাই হোলো।

সেদিনই বেলা দুটোর পর একবার বার হলুম। সঙ্গে মী-কেয়ো এবং একটি ছেলে ছাতা নিয়ে। এ দেশে মেয়েরা সব সময়ে ছাতা রাখে। পায়ে চটি থাকে। প্রায়শঃই কাঠের তলা। জুতো না থাকলেও ছাতা থাকবেই। আমার আবার ছাতার অভ্যাস নেই। মাথায় একটা রঙীন রুমাল বাঁধা। পরণে সারং এবং একটি গেঞ্জী। কিন্তু সঙ্গের ছেলেটির হাতে ছাতা। মী-কেয়ো বুঝিয়ে দিলো দুর্বল হাতে এই বাতাসে ছাতা ধরতে বেশ কষ্ট হবে। বরং শক্তিটুকু সবই চলায় ব্যয় করা বুদ্ধির কাজ। কথায় প্রচুর শান। কণ্ঠে পরিশীলিত লালিত্য। ইংরিজীটি চমৎকার, কিন্তু ফরাসীদের বলা ইংরাজীর মতো আদুলে।

জঙ্গল হঠাৎ থেমে যায়। নদী দেখা যায়। দেখা যায় মানুষ, চাষ। থৈ থৈ করছে ধান। নদীর বুকে একটি সাঁকো। কেবল বাঁশের তৈরী। মানুষ তো যায়ই, মেয়েরা মাথায় বোঝা, হাতে ছাতা ; পুরুষরা বাঁক নিয়ে, কিন্তু দেখেছি কুকুরও পার হয় সে সাঁকো।

কিন্তু আমি নয়। আমার চরণভর মাটিকে কামড়ে থাকে। আমি বাতাসে ভর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত নই। আমার জন্য নৌকো। পার হতেই দেখি সামনে এক জীপ। পুরোনো ঝর্ঝরে। তবু জীপই বটে।

আমি বিস্ময় বিহ্বল ; কিন্তু মী-কেয়ো মার্জিত সপ্রতিভ যুবতী। হাসে, একটু স্মিত। সেই স্মিত যার বিশ্ববন্দিত খ্যাতি, সায়ামীজ স্মাইল। এ স্মিত

বিধৃত হয়ে আছে হিন্দু চীনের প্রতিটি স্থাপত্যে। এতো শোনো মোনা-লীজার হাসির কথা; সে হাসি ফোটাবার জন্যে দা-ভিঞ্চিকে নাকি নানা বাদ্য, এমন কি হাস্য-রসিকদের মেলাও বসাতে হয়েছিলো। কতোই শুনি! হায় যদি দা-ভিঞ্চির জানা থাকতো সীয়েম রীপ নদীর ধারে মেয়েদের ঠোঁটে এ হাসি হামেহাল লেগে আছে!

হঠাৎ প্রশ্ন করলো, নারসিংহী মন্দিরে গিয়েছিলেন বুঝি?

এবার নিয়ে এ প্রশ্ন দুবার শুনলাম। আমি কী জানি আমি কোথায়, কোন তর্কে কোন দিকে যাচ্ছি। বড়ো আর্ত, বড়ো ভীত আমি তখন। মন্দিরে প্রবেশ করেছি।—কিন্তু কেন? এতে এতো বিশেষ কী হোলো? নারসিংহী কে?

কেউ যায় না তো। সাপের আড্ডা। গহিন জঙ্গল। এতোখানি জীবনে কখনও শুনিনি কেউ গেছে। তা ছাড়া·· ···

প্রণাম করি হাত তুলে সেই অদৃশ্যান্তী দেবীর কৃপাকে।···তা ছাড়া?

দেবী নিজেই থাকেন। আমরা ওঁকে দেবী বলেই জানি। কখনও ওঁকে দেখিনি। কখনও সমাজে ঢুকে কিছু গ্রহণ করেন না। কী খান, কোথায় থাকেন কেউ জানে না। আমাদের ভাগ্যে দেখাই হয় না। আপনি তো পুজোও করেছিলেন।

পুজো? তাকে পুজো বলেন?···হাসলাম; কিন্তু চোখে জল।

আপনি কে? জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। শ্রমণী তো ন'ন।

না। তবে শ্রমণদেরই কাছে পিঠে থাকি। প্রয়োজনমতো সেবাও করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হয়ে যায় ভোগের সেবা; তবে রোগের সেবাও করি। বস্তুতঃ আমি নার্স। পরিচর্যা করাই আমার কাজ। তবে শ্রমণদের কাছে থাকার দরুণ কিছু কিছু ভাষা শিক্ষা করেছি। দো-ভাষীর কাজও করতে হয়। ···শ্রমণ গ্রাম থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এলাম।···আমার রোগীটি কিন্তু ভালো। স্ম্যাগ্‌ল্‌ড্‌ মালের কদর বেশী।

হেসে বলি, ধন্যবাদ। তা বলছি না; বলতে চাইনি। নিশ্চয় আপনাকে আগে দেখিনি; অথচ মনে হচ্ছে যেন খুব চেনা। এ রহস্য ধরতে পারছি না।

রহস্য কি ধরার জিনিস?

আপনি শ্রমণের অতিথি। ভি-আই-পী।

উনি বুঝি এখানে শ্রমণ সংঘের প্রধান?

প্রধান? প্রধানকে কেউ দেখে না, জানে না। প্রধান বুদ্ধ অমিতাভ। সবার অগোচর।

আবার হাসে মী-কেয়ো।·· আবার মনে হয়, আমি কি ওকে চিনি। হোক রহস্য; কিন্তু কী অস্বস্তি।

এখানে বুঝি সব বৌদ্ধ ?

রাজ জয়বর্মণের নাম শুনেছেন ? তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি বুদ্ধ অমিতাভের শরণ নিয়ে মানুষকে মানুষেরও বড়ো, অমর আত্মা, সৃষ্টির চরম চরিতার্থতা বলে জানতে শিখলেন। তাই তিনি নিজে বৌদ্ধ-শ্রেষ্ঠ হয়েও হিন্দু পূজা, হিন্দু দর্শনকে মূল্য দিতেন।

তাই নাকি ? কিন্তু পশ্চিমের এবং চীনের পর্যটকরা যেন বেসুরো বলেন।

ওঃ ! সময় আসুক। সে কথাও বলবো। হয়তো আমরা উৎফুল্ল, কিন্তু উদ্দাম নই। ব'লেই, একটু হাসি।

এটা স্বপ্ন রাজ্য। জীপ থামতেই মাটিতে পা দিয়েই আমি হাঁটু গেড়ে বনের ধুলো-মাটি ঢাকা বুকে মাথা ঠেকাই।

চেয়ে দেখলে মী-কেয়ো। বাঃ আপনার এ অভ্যাসটি তো বেশ ! মাথা নীচু করে প্রণামের যে কতো মূল্য আমরা আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হয়ে বুঝি না। প্রণামের প্রভাব স্বভাবের উগ্রতা, কঠোরতার ওপর স্বস্তি বুলিয়ে দেয়।

···আপনি এসেছেন খালি হাতে। এটিই আপনার আশীর্বাদ-লব্ধ মহতী কৃপার ফল। নৈলে আনতেন কেতাব, ঝুলি, আড়ম্বর আর ঐ ভূতের বাক্সো, ক্যামেরা।

পর্যটক আসে এখানে ? শুনেছি আর আসে না।

ভুল শুনেছেন। কাম্বোজ সম্বন্ধে ভুল শোনাই রেওয়াজ। পর্যটক কি কেবল সমুদ্রপার থেকেই আসবে ? এ দেশের পর্যটক কি কম ? কাম্বোজের জনসংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ। শতকরা নব্বই ভাগই নদীর ধারে থাকে। তারা বৌদ্ধ। তবু দলে দলে আসে ! এখন রাজনৈতিক কারণে কাম্বোজের বাইরের লোকের আসা-যাওয়া নিরাপদও নয়, যুক্তিকরও নয়। তবু আসে। এই তো আপনি এসেছেন। আসল আঙ্কোরে গিয়ে দেখবেন বাস ভর্তি কেবল যাত্রী।

আমার তো দেড় দিন ধরে মনে হয়েছে এ দেশ জনমানবহীন।

কাম্বোজ জনমানবহীনই বটে। তবু এ তল্লাটে পূজাপাঠ হয় ; আরতি হয়। মন্দির বলতে জীবন্ত প্রতিষ্ঠান এখানে গোপনে হলেও কয়েকটা আছে। সঙ্ঘারামও আছে। শ্রমণীদের বাসও আছে। কিন্তু সবই যাত্রী-ভ্রমণ বিলাসীদের চোখের বাইরে। ··ভারত-বিশ্বাসের প্রাচী পরিক্রমণের প্রথম পদচিহ্ন এই অরণ্যের মধ্যে।

মী-কেয়োর কথা সত্য ! বদ্ধ ঘোর অরণ্য। তবু জীবন আছে।

কিন্তু সময়টা কখন ? বুড়ী ভারতবর্ষের জঠরে তখনও হিন্দু ঐতিহ্যের অনেকগুলি নামকরা শিশু। কাশ্মীরে তখন ললিতাদিত্য, রাণী দিদ্দা !

প্রতিহার, চন্দেল, চালুক্যেরা বিদেশে ভারতবর্ষের রূপকে বর্ণপ্রতিভায় প্রসারি
করছেন। সাগর পার হয়ে যাচ্ছে চোল সম্রাট রাজরাজ-দি গ্রেট্-এর বাণিজ্যতরী
বিক্রমাদিত্যের যশোগাথায় পল্লী নগরী ধ্বনিত। হর্ষও তখন স্মৃতি হয়েছেন
নালন্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা এশিয়ার কৃতী ছাত্র জড়ো হয়েছে। পণ্ডিতর
আসছেন জ্ঞানান্বেষণে। হূণরা এসেছিলো ভারত জয় করতে; তাদের খেদা
দিয়েছি তখন আমরা। মামুদ গজনীর পাত্তাও নেই। শ্যামে, কাম্বোজে
যবদ্বীপে পল্লব শৈলেন্দ্র এবং গঙ্গা বংশের শাখা ফলে ফুলে সমৃদ্ধ। সে এ
দিন গেছে পদ্ম। এদিকে চলছে শঙ্করের দিগ্বিজয়, আর তার খ্যাতির সৌর
প্রলুব্ধ হয়ে আসছে আলবারুণী, আরব দুনিয়ার বরেণ্য মনীষী। ভাস্করাচার্যে
জ্যোতিষের গণিতের খ্যাতি আরব পারস্যকে চঞ্চল করেছে। এই ৭৫০-১৩০
ব্যাপী ভারত, কী ভারতই ছিলো। সেই সময়ের য়োরোপ? বলা হোলে
'ডার্ক-এ-জ্'—তমসাবৃত যুগ!

এ মাটিরই গুণ; ভাবায়।

আর ভাববার মতোই এ জায়গার অবাধ, অধীর, বিপুল স্পন্দন।

জায়গাটার নাম বান্তিয়ে শ্রেঈ। আমি নামকরণ করি বনিতা-শ্রী। 'মা
কী হোলো?' জিজ্ঞাসা করে মী-কেয়ো। বুঝিয়ে দিলে পর হাসে; ব
পাগলকে কেউ সুন্দর বলে না। কিন্তু সুন্দরকে পাগল বলতে হলে ক
হতে হয়।

রাজা দ্বিতীয় রাজেন্দ্রবর্মণ এই বিচিত্র মন্দির-ক্রম আরম্ভ করেন (৯৬৮)
এবং শেষ করেন পঞ্চম জয়বর্মণ (১০০০)। তখন এ তল্লাটে ছিলো বিশা
রাজধানী যশোধরপুরের অঙ্গ। সে সময়টা সারা কাম্বোজের শ্রী আপনা
মণ্ডিত করেছে বহু স্থাপত্য ও শিল্প গরিমায়ঃ প্রাসাৎ-ক্রাভান; বোক্
শাম্-ক্রোঁ; প্রে-রূপ; প্রাসাৎ বান্তিয়ে। এমন কি প্রসিদ্ধ সেই লীক নীয়া
এবং কাম্বোজে আমার সেই প্রথম প্রণয়, নিয়েক-পিয়ে।

এই যে রাজধানী, 'শ্রীবিশালা বিশালা', সাগর, পুষ্করিণী, পথ-ঘাট, সব
তো রাজধর্মের মহিমা প্রচার করছে। এই গঠন, সৃষ্টির মাধ্যমে জনতাকে কা
মননে শ্রমে ব্যস্ত রাখতে হোতো। তাই ধান চাষ থেকে নিয়ে হীরে মাণিক
কাজ, বাণিজ্য থেকে নিয়ে অদ্ভুত শিল্প সৃষ্টি, কালজয়ী গৌরব, সেই রাজ
রাজ্য, শাসনের ফলশ্রুতি। রাজতন্ত্র যখন জনগণের প্রতিভূ হয়, বোধকরি তখ
গণতন্ত্র হয়ে সত্যকার লাভবান।

যে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেটা প্রধানতঃ ছিলো না
কেন্দ্রিক মন্দির। মেয়েদেরই এখানে ছিলো রবরবা। মন্দিরের ছাদগু

রের ছাঁদ হলেও ছাদের দুই ঢলের প্রান্তের কোণটাকে তোরণ করা হয়েছে
ঃ সেই তোরণের কারু অনবদ্য। পঙ্খের কাজের মতো নিপুণ কাজ। তা
া কথায় কথায় ভরা। রামের সমুদ্রজয় ও লঙ্কায় প্রবেশ। হাতি, ঘোড়া,
, নানান পশু তো আছেই অজস্র লতা পাতা ফুল ফল। এক ইঞ্চিরও
কাশ হীন। শুধু লীলাময় ললিতছন্দ।

গেটের বাইরে দ্বারপালরা বসে। বানর, সিংহ, গরুড় পাশাপাশি বসে।
পালরা স্কন্ধহীন হয়েও কিন্তু দ্বার ছেড়ে যায় নি। জানলার গরাদগুলোর
টার্ন যেন বাঁশ। হালেবিদেও এমন আছে। মন্দিরের দ্যাল লাগা রকের
র কাঈ, ঘাস, ঝরাপাতার রাশ। কোণাকুণি দুটি মন্দির গায়ে ঠেকিয়ে
লও, দুটোর মাঝে সরু অবকাশ আছে। একটি গেটের ওপর বালি সুগ্রীবের
াই। বারান্দার এক কোণে বসেছি। তন্ময় হয়ে গেছি।

সিক্কের শব্দে জেগে উঠি। পাতার ডোঙ্গায় ভরা ফলের রস এনেছেন
ণী। কিছু অনন্তমূলের পাৎলা ফালি। বেশ কিছু মুথা-ফল (অর্থাৎ
কড়ের গাঁঠ)।

কিন্তু যা দেখি, যত দেখি বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে চলে যেতে হয়।
যন্ত্র ব্যবহার করতো? শিখতো কোথায়? ধাতুর গঠন এবং প্রয়োগ
খলো কি করে? 'ভাগ্যবান আমাদের দেশ' বললো মী-কেয়ো, 'চীন এবং
রতের মতো দুটো যুগন্ধর সংস্কৃতি প্রতিভার মাঝে আমাদের বাস। এ দুটি
থাকলে ব্রহ্ম, মলয়, সিংহল, যবদ্বীপ কোথায় পড়ে থাকতো!'

...তবু তো যা আছে, যত আছে তার বিশগুণ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির
ায়।...তবু সে বিস্মৃতি ভারতের ইতিহাসের মতো নির্বেদের পালিশের
ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। আমাদের লিপিকারেরা প্রশস্তি ছাড়াও বহু
তহাস লিখে গেছে। মিশরের ইতিহাসের মতো সুলিখিত না হলেও তবু
থণ্ড আছে। বলে মী-কেয়ো।

পাথরগুলো লাল না হলেও গাঢ় গোলাপী। তাই নকসীগুলোয় রোদ
ড়, সূর্যের আলোয় প্রতিভাত হয়ে, কিংখাবী আলো ছায়ায় প্রগল্ভ। মনে
যেন সূর্যের আলোকেই কেটেকুটে বসিয়ে দিয়েছে শিল্পী।

স্থাপত্য শিল্পের মর্মকথা যেন কবিতার ভাষ্যের মতো। তা-থেকে একটি
দ, একটি ছন্দও, একটি পংক্তিও আড়ম্বর বা আতিশয্য বলে সরানো চলে না।
মনি কারিগরীর নামই 'পরমশিল্পগ্রন্থনা'। সেরা শিল্পকৃতি। রাম, রাবণ,
গ্রীব, বালি, উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অনন্ত,-কী নেই?
রপালদের আসন, ভঙ্গী, দৃপ্ততার প্রাণবানতা দেখে মনে হয় কোন মায়াবী
দুস্পর্শে এদের হঠাৎ পাথর করে দিয়েছে।—

দলে দলে অপ্সরা নৃত্যপরা। কীবা তার লালিত্য, কীবা তার চারুছ
সবার সেরা, কীবা সেই স্মিতহাস্যের অনপব্যয়িত মিতিবোধ। বহু সাধ
প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিই এমন সম্মোহিনী মায়া বৈভবের সৃষ্টি। দেবতাদের ভুলি
রেখে নাচ দেখাতে গেলে হাসিটি এমনি অপ্রকাশের প্রকাশ হওয়া চাই।—

* * *

কোথা থেকে তিনটের বেলা পিছলে সাড়ে চারটেয় এসে গেছে টের পাইনি
কোথা থেকে নীল-কণ্ঠ আর কাঠ-ঠোকরার একটা দল ঝুপ ঝুপ করে মাটি
নেমে পচা পাতার রাশ আঁচড়াতে লেগে গেলো। দেখতে না দেখতে হাজ
হাজারে টিয়া প্রায় ঢেকে ফেললো শিমুল গাছ দুটো। অনেকক্ষণ থেকে
জোড়া কাকাতুয়া মন্দিব সংলগ্ন কার্ণিশের সঙ্গে লাগা বটফলের মতো ড
কুরকুর করে খাচ্ছিলো। হল্লা দেখে পাখার শব্দ তুলে চলে গেলো। শিম
গাছটি যেন নতুন করে সবুজ হয়ে গেছে। প্রশংসা করতে যেতেই মী-কে
বকুনী খেলাম।

গাছ? গাছের প্রশংসা? তার চেয়ে বরং মৃত্যুর প্রশংসা করো, কা
হবে। তাই ব'লে সাপের বিষের, কচুরী পানার, কাঠের ঘুনের, কলেরা-বস
প্রশংসা? ছিঃ! তোমায় নিয়ে যাবো প্রোম্-এর এলকায়। এই গাছের শি
রাক্ষসীর চোয়ালের মতো ঠেসে ধরেছে মানুষের কতো সৃষ্টি! পাথরের সৃ
রক্ত চুষে খোলসের মতো ফেলে ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে।

পরিষ্কার করা অসম্ভব বুঝি? তবে আগে হোতো কী করে?

কতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাতের মধ্যে ছিলো যশোধরপুর?
হতভাগিনী বহু-প্রসবিনী উর্বর মাটি জন্ম-নিরোধ অস্বীকার করলো। আ
পেরে উঠি না এর ভ্রূণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমরা মুষ্টিমেয়। মো
পেয়েছে কি মেতে গেছে ধ্বংসে; জন্ম দিয়েই ধ্বংস! অতগুলো হাত জীব
যশোধরপুরকে যে ভাবে পরিষ্কার রাখতো, এই শ্মশানে কি আমরা মুষ্টিমে
তাই পারি?

শুনতে পাই আঁরি মুয়োই এই জঙ্গলে প্রথম আবিষ্কার করেন এই
ঐশ্বর্য। কিন্তু সে অবধি তোমরা কী করছিলে? এ সব পুজা-অর্চা, এই
গ্রাম্য পরিবেশ, চাষ-আবাদ······

হঠাৎ হাসি দেখে থেমে যাই। সহজ মেয়ে নয় মী-কেয়ো। কী বলতে
বলেছি। কিন্তু ছাড়বেনা সে।

থামলে কেন? বলে যাও। ওরা আবিষ্কার করেছে মানে বুনো, হ্যাং
লুটেরা, ঠগীদের দুনিয়াকে ডেকে এনেছে। বলেছে লুঠে নাও। পেয়ে
সাত রাজার ধন এক মাণিক। মিশর, গ্রীস, সিরীয়া, পার্সিপোলিস, বাগদ

মাস্কাস, উর—সব ওরা আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে আমেরিকা, মক্সিকো, পীরু। এ সব জায়গায় কিছু ছিলো না, কেউ ছিলো না। জন রণ্য অরণ্য নয়। বন অরণ্য অরণ্য নয়। ভীষণ হায়েনা অরণ্য এই সব সাদা ণ্ডিতদের লোভ, তাদের বিজ্ঞান, তাদের উন্নতি। পৃথিবীর সেবার জন্য খবরদারী। যে কী অরণ্য। দেখো গে যাও, এই একটি বহুপ্রসবিনী নারীর অঙ্গ অঙ্গ র্ষণ করেছে; তাজা মাংস উপড়ে নিয়েছে; নিয়ে প্রতিটি ম্যুজিয়ামে ভরে রেখেছে না দেশের লুটপাট। দেখনি? যাওনি লুভে, বিক্টোরিয়া-এ্যালবার্ট ম্যুজিয়ামে? ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামে? এলগিন মার্বল্‌স্, কোহিনূর, থিব'র সম্পত্তি, ণজিৎ সিংয়ের সম্পত্তি, ফারাওদের সম্পত্তি,—ওঃ! বোলোনা বোলোনা। আঁরী য়োকে পথ দেখিয়েছে কারা? সেদিনও এখানে এমনিই পুজো, এমনিই মণ, এমনিই গ্রামীণরা ছিলো। তখন কেবল এই শৌখীন পর্যটকদের হল্লা পড়ে য় নি।—

অন্যায় কী হোলো? জগৎ তো জানলো এ ঐশ্বর্যের কথা।

আগেও জানতো। চীন জানতো, জাপান জানতো, ব্রহ্মদেশ জানতো, ভারত নতো, সারা বৌদ্ধ দুনিয়া জানতো। তারা ম্যুজিয়াম রোগে ভুগতো না। দ্যার অজুহাতে লোভকে, চুরিকে সম্মান দিতোনা।—১৯০৭ তো বেশী দিনের থা নয়। এই মন্দির-দৌলৎ রক্ষা করার অজুহাতে ফরাসী সরকার, গণতান্ত্রিক ান্য সরকার বাতাম্বা, সীয়েম রীপ, সীসেফোঁর বিস্তীর্ণ এলাকা স্রেফ হড়প য়ে নিয়েছিলো। শুনতে পাই ফ্রান্স নাকি লড়েছিলো এককালে দেমক্রাসী তিষ্ঠার জন্য। হায় কলম্বাস, হায় ভাস্কো, হায় আঁরি ম্যুয়ো,—আবিষ্কারের রোগে যদি তোমরা না পড়তে।···জানো, এ দেশ চীনও জয় করতে পারে নি। না কুবলাঈ, না চেঙ্গিস্।·· আমরাই আমাদের খেয়েছি।

চক চক করছে চোখ। গলার স্বরে আর সেই চাপা স্বচ্ছ মাধুরী নেই। থুতনীর মাংস পিণ্ড দুটো কাঁপছে। ওপর ঠোঁটের ওপরটা ঘামের কণায় ভরে গেছে। তখন হঠাৎ মনে হোলো কোথায় যেন দেখেছি এ মেয়েকে। এ মুখ, এই উত্তেজনা আমার চেনা। কিন্তু তাই বা হবে কি করে? (ওগো, তুমি কে?)

···তবে কী জানো? আমরাই আমাদের তুলবোও।···এ দেশ কী একটা সামান্য দেশ ছিলো! চীনের কড়চা, জেঙ্গিস খাঁয়ের কড়চা, মার্কো পোলোর কড়চা. সপ্তম জয়বর্মনের প্রশস্তি,—কতো ইতিহাস, কতো সাক্ষ্য। এ দেশের ইতিহাসের লেখায় ভাটা পড়ে নি। কাম্বোজে ইতিহাসের পরম্পরা ভারতের চেয়ে ঢের বেশী উচ্চারিত স্পষ্ট।···

···হাজার হাজার মুণ্ডিত-মস্তক, কেশর রংয়ের বস্ত্রধারী কঠিন পরিশ্রমে

এবং নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রেখেছিলো এ সমাজ। এ সমাে ব্রাহ্মণ ছিলো সে, যে নিয়মানুবর্তী, শিক্ষাবিদ্‌ ; যে অপরের জন্য ভাবিত তোমাদের সমাজে পুরুৎ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ পুরুৎ। এ সমাজে তেমন জাতিভে ছিলোও না ; নেইও। বৌদ্ধ প্রভাব বলতে পারো। প্রতি পরিবার থেকে ছে মেয়ে এই শিক্ষা নিতে বাধ্য। কিছু দিনের জন্য হলেও শ্রমণ-শ্রমণী হ বাধ্য। পরিবারের একটি সন্তান চিরদিনের জন্য দান করা এখনও পিতামাত কাছে অবশ্য পালনীয় না হলেও গৌরববহ কর্তব্য।·· রাজপরিবারও এ নিয় মানে···

···কারণ ব্রাহ্মণ সুন্ন্যাসীর গড়া এই শৃঙ্খলা। শিবকৈবল্য ছিে দ্বিতীয় জয়বর্মণের গুরু। সেই গুরুই রাজাকে মর্ত্যে ইন্দ্রের প্রতিভূ বলে ঘোষণা করলেন। তিনি রাজার হাতে শিবের লিঙ্গমূর্তি দিয়ে বললেন,— এই মূর্তিরই সব ; তুমি শুধু সেবায়েৎ। প্রজারা তোমার ধর্মের সন্তান ; রাজ্য শাসন করে তুমি প্রজাদেরই দেওয়া এই দায়, ঋণ শোধ করবে। পুরুষানুক্রমে এ দায় তোমার।

···এক একটা মেলায় লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হোতো। কতো শিল্পী বাদ্যকর, বাজীকর, বেসাতীর দল নাচ গানের দল দিক দিগন্ত থেকে আসতো। তাদের জন্য পান্থশালা, যাত্রীনিবাস, হাসপাতাল, সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা, ধর্মশালা— সব ছিলো সরকারের দায়িত্ব।

আমি হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠি। সাবধানে প্রশ্ন করি মী-কেয়ো তোমার সান্নিধে এসে কতো জানছি। জানো মী-কেয়ো আমি যখন দেশ দেখি চোখ হয়তে কাজে লাগাই ; কিন্তু তা শুধু মনের দোর হিসেবেই। মনটাকেই বেশী দেখাতে চাই। চাই দেশের গভীরে ইতিহাসে, সমাজে, অর্থকাঠামোতে চলে যাই কতো ভাগ্য আমার যে তোমার মতো···

সেই হাসি! থাক-থাক-থাক। অতো 'আমড়াগাছি' না করলেও চলবে বুঝছি হাঁড়ি চাটতে চাও, অথচ রান্না ঘরে ঢুকতে পাচ্ছো না। বেশ। ত যদি হয় মানুষের মতো আসন পেতে বোসো। লেজ নাড়া থামাও।

সপ্তম জয়বর্ধনই প্রথম মুগ্ধ হন মহাযান বৌদ্ধ মতের সংসার ও শূন্যত বোধের তাৎপর্য চিন্তা করে। ফলে থেরবাদ এদেশের অন্তরে প্রবেশ করলো আজও সেই থেরবাদ সেই সাধন পথে আছে ; তবে স্বতন্ত্র ভাবে। এব সেখানে নারীর অধিকারই শুধু নেই, নারী যোগ সাধনের অঙ্গও হয়ে পড়েছে ···আরো জানতে চাও ? জ্ঞানের চরমে বোধি। ভোগের চরমে জ্ঞান। চে এসো সে পথে। আমি তাতেও পিছ পা নই। আমি প্রকৃতিই। আর কিছু নই

চুপ করেই থাকি। এ মহিলাকে কী আর বলা যায় ?

·সবাই পরীক্ষায় পাশ করে না। তবু পরীক্ষা সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত। াঁতার জানা সত্ত্বেও অনেকে ডোবে; আগুনের ক্ষমাহীন ক্ষুধা জানা সত্ত্বেও াগুন লেগে মানুষ, গ্রাম পোড়ে। এগুলো ভাগ্য বলে এড়ানো যায় না। াগুলো পথে চলার হোঁচট। প্রফেশনাল হ্যাজার্ড।·· কী? এগুবে?

হঠাৎ থেমে যায় মী-কেও। গলাটা সামলে নিয়ে বলে, আমিই একজনকে ানি। পাগল হয়ে গিয়েছে সে। তবু তার কথা ··সে থাক। বলবো না। াবণ সে অপরের কথা।

কিন্তু সেই লিঙ্গমূর্তি? তার কি হোল?

এখনও কাম্বোজে রাজবাড়ি আছে। রাজবংশও আছে। সেই রাজবাড়িতে াছে লিঙ্গমূর্তি। শ্রমণরাই পুজো করেন।—

আমি যে সম্পূর্ণ সুস্থ আদৌ নই বুঝিয়ে দেবার জন্য মী-কেয়ো এবার ফলের রসের সঙ্গে ওষুধ দিলো। অনুচরটি এনে দিলো কটা-খয়েরী রঙের এক বাকস সেদ্ধ পাঁচন, গরম।

খাওয়া শেষ করে দেয়ালে খোদাই করা অপ্সরীদের দিকে চাইছি। চাইছি মী-কেয়োর দিকে; ওর সেই নীল হলদে সিল্কের শীথের অতিস্বচ্ছ মসৃণতার লঘু বিন্যাসের দিকে; ওর সমৃদ্ধ দেহ গৌরব এবং লালিত্য চোখে ধরার মতো।

বুঝেছে মী-কেয়ো। মুখে সেই মহা রহস্যঘন স্মিতভাষ।···ওই যাদের পাথরে দেখছো ওরাই সত্য। জরাহীন। আমি ভঙ্গুর। নারীর পরম গৌরবের চিহ্ন দুটিকে সূর্যের পরশের এতো কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ করে রেখে ওরাই ধন্য।

ধন্য? তবে এ সত্যধর্ম মেটালো কে?

তুমি! তোমার মতো সভ্যরা।

জানো, কৌণ্ডীন্য প্রথম এসে যে রানীর সঙ্গে নৌ-যুদ্ধে নেমেছিলো তার অঙ্গে সেদিন লাবণ্য আর গরিমা ছাড়া আর কোনো কিছু আবরণ ছিলো না। একটি বাণের আঘাতই সেই বেতসপর্ণাকে চিরদিনের মতো কৌণ্ডীন্যের অঙ্ক-শায়িনী করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হোলো। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। অর্থ করতে গেলে ওয়েবষ্টার ঘাঁটতে হয় না। আমি লঘু হেসে বলি,—আমি যেন কোথায় পড়েছি যে আদিবাসী জোরাঈ, লোলী, মোঈদের সমাজ অবাধ, যত্রতত্র এবং পতি-প্রভুতাহীন মিলনে···

মিলন বলছো কেন সভ্য ভারতীয়? বলো মৈথুন। তাই তুমি বলতে চাও। কিন্তু পশুরাই কি অমন করে? যত্রতত্র? যদাতদা?

প্রয়োজন বোধে আহ্বান না জানালে পুং-পশু তার কর্তব্য জোর ফলিয়ে

করে না। তার প্রতিক্রিয়ায়-জোড়ার জোড়ও যে কেটে যায় তাও নয়। এগুলো দোষ হলে মোঙ্গদের আছে; গুণ হলে আমাদের নেই। তবে মোঙ্গরা মানুষ এটা প্রমাণিত হয় একটি লক্ষণে। ওদেরও ঋতু বৎসরে একবার নয়, একাধিকবার। যেমন আমাদের মতো সভ্যের। সুতরাং বীজ চাইবার ডাক ওরা বহুবারই ডাকে —আর উৎসবে অনুরাগে যখন দেহরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন মিলনে যদি সামাজিক জোট বন্দীতে মুক্তির বাণ ডাকেও সমাজ তা নিয়ে হৈ-চৈ করে না সমাজের গায়ে তা লাগে না। বাড়ির পুরুষ বা স্ত্রী কেউই এ বাবদে হা হুতাশ করে না। এটাও রঙ্গ তামাশারই অঙ্গ বলে মানে।

আরও শুনেছি ওরা বস্ত্র ত্যাগ করে জলে নেমে স্নান করে।

চোখ খুলে রাখলে দেখবে যে শুধু মোঙ্গ নয়। এ সমাজে অনেকেই করে, কারণ এটা প্রধানতঃ অরণ্য এবং সমাজটি লোকচক্ষুর অগোচরে।

শ্রমণদের মুখে তো কতই শুনি। দেশ ও জলবায়ু বহু প্রসবিনী। ফলে যৌবনের উদ্ধত প্রখর গরিমা এই আবহাওয়ায় সহজেই স্তিমিত হয়ে যায়। বালিকা কিশোরীদের সহজ বৃদ্ধত্ব থেকে রক্ষা একমাত্র শিল্পীরাই করে গেছেন পাথরে। কিন্তু যে অতিথি এই এলো এবং এই গেলো, তাকে নিয়ে মাঝের কটা বছর খুব একটা আবডাল রাখার দায়িত্ব বোঝা হয়ে ঘাড়ে চাপে না।

সত্যি বলতে কী, আমার নিজেরই ও-স্পৃশ কম। নাচ দেখাবো তোমায়। আসল নাচ। নকল নাচ মন্দিরে দেখবে। তারপর আমি নিয়ে যাবো জঙ্গলে। সে হবে কাল দুপুরের পর, আঙ্কোর ভাৎ দেখারও পর। আসল নাচ দেখবে। বুঝবে নাচের আঙ্গিকে আনন্দই প্রধান; যৌবন নয়। নাচ প্রধানতঃ দেহ মনেরই তরঙ্গ, কাপড়, মুকুটের বা হারের তরঙ্গ নয়। দেহে যার ভাষা মুখর হয়, আনন্দ দেয়, তারই নাম নাচ। দেখলে বুঝবে। দেহের যৌবনই এমন কিছু আনন্দের পাট্টা কবুলতি নিয়ে বসে নেই। আনন্দ একটা ঐশ্বরিক বিভূতি; আনন্দ-লোকের সুধাবর্ষণ; দেহ তার উপাদান নিশ্চয়,—কিন্তু ইন্ধন নয়।

লক্ষ্য করে দেখো, এই যে শিল্প সম্ভার এর মধ্যে স্ত্রী রূপের প্রাধান্য কতো বেশী। হোক বেশী, কিন্তু অশালীন নয়। শুনেছি তোমাদের দেশের মন্দিরে যেমন সম্পূর্ণ রামায়ণ ছবিতে উৎকীর্ণ আছে, তেমনি আছে তামাম নাট্য এবং নৃত্য শাস্ত্রও। হোক; কিন্তু তারও পরে শুনতে পাই কামকলার যতো বর্ণন ব্যাখ্যা তাও আসনের নামে তান্ত্রিক মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে। আমি তোমায় নিয়ে যাবো এক জায়গায়। বেদীর গায়ে উৎকীর্ণ দেখবে মেয়েদের শোভা। কোথাও অশালীন নয়। কী পুরুষ, কী নারীর গুপ্ত অঙ্গকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার কোনো অপচেষ্টাই নেই। নির্বসন দেহ পাবে, কিন্তু যোনিকে রূপায়িত করার কোনো সার্থকতা আমাদের নন্দন

শাস্ত্র দেয় নি। য়োরোপে আছে, আমি জানি, দেখেছি। তোমাদের দেউলে তা আছেই।—অবশ্য দু-একটি ব্যতিক্রম পাবে, আমার যা জানা, বলতে পারি। একটি অপ্সরী বহু অপ্সরীর মধ্যে অনাবৃতা। ভাস্কর হয়তো বলতে চেয়েছে য এরা অপ্সরীই,—অনাবৃতা থাকাই যাদের স্বভাব। আর আছে রাজা যশোবর্মণের (হতে পারে কোনো যক্ষের) এক বসে থাকা মূর্তি। সম্পূর্ণ নিরাবরণতা সত্ত্বেও কোনো যোনি চিহ্নের কোনো প্রয়াস নেই। য়োরোপীয় ভাস্কর্যে এতো বিমূর্ত সৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও যোনি, বিশেষ স্ত্রী যোনিকে উন্মুক্ত করবে। আরও বিকৃতির কথা বলি। ওদের ঐ পাতা ঢাকা আবডালের চেষ্টা আরও কটু। এ বিষয়ে গ্রীসের ভাস্কর্য উদাসীন। স্রষ্টাকে উদাসীন হতে হয়। অশ্লীলতা নন্দন রসের পরিপন্থী।—

অতি সাবধানে প্রশ্ন করি, তবে অশ্লীল কী? তোমার মতটি কী?

হঠাৎ বক্তা থেকে মানুষ হয়ে গেলেন এই বিদুষী। হাসলেন। হাসিতে কৌতুক। মোনা লিসার চোখে কি ঐ ব্যঙ্গ কৌতুকেরই সুর আছে?—

জীপের দিকে যাচ্ছি না। পথ চলছি পাতার পাহাড় ঠেলে। পা দেবে যাচ্ছে। বেশ লাগছে। বেলা এখনও তিন-চার ঘণ্টা থাকবে। রোদের আঁচ সবুজের ছাদ ভেদ করে ঝিলমিলি ঝরোখার ধারা বয়ে নামছে। মাঝে মাঝে গোসাপ, কাঠবেরালী। মাঝে মাঝে বেরাল, বড়ো, ছোটো। বড়োগুলো বুনো বেরাল। বহু আছে!—এক সঙ্গে অনেকগুলো ছোটো বড় কচ্ছপ পেলাম।—

কিন্তু মন আসলে পড়ে আছে মী-কেয়োর সংলাপে। আশ্চর্য সংলাপ। ব্যাখ্যা করা, বোঝানো, পর্যটকদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে ভাষায় অনর্গলতা,—সবই হয়তো মেনে নিলাম। কিন্তু তার পরেও মনে লেগে থাকে এক একটি বর্ণন, —আশ্চর্য! আমাদের দেশে পর্যটকদের কারা বোঝায়? মী-কেয়ো যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা।

অশ্লীল কি?···নানা জবাব দেওয়া যায়। হঠাৎ এই বনপথের নিভৃতে যদি চোখে পড়ে এক জোড়া দম্পতি দেহ ভোগের উদ্দাম যৌবনে গা ভাসিয়ে দিয়ে লীলাবিধুর, তারা অশ্লীল নয়। মুক্ত। কিন্তু তুমি আমি দাঁড়িয়ে সেটা দেখছি সেটা অশ্লীল। তাও যেমন অশ্লীল, তারা খাচ্ছে, আমরা দেখছি, সেটাও তেমনি অশ্লীল। যে আনন্দ কেবল নিজের জন্য, সবার জন্য নয়, তাকে ঢাক পিটিয়ে জানান দেবার রূঢ় ইচ্ছা অশ্লীল। সে ইচ্ছার প্রচার আরও অশ্লীল। আবার উঁকি মেরে সেটার তাপে তপ্ত হয়ে ওঠার নপুংসক চেষ্টাটিও অশ্লীল। সে সম্বন্ধে নীতিবাগীশতার ধুয়া তোলা আরও অশ্লীল, এবং ভণ্ড। যে কোনো ব্যক্তিগত ভোগ,—যৌনভোগ, নিদ্রাভোগ, আহারভোগ, প্রাচুর্যের ভোগ সবই প্রচারের তারতম্যে অশ্লীল। কেউ 'অব্‌সীন', কেউ 'ভাল্‌গার'। অবশ্য

'মর‍্যাল' 'ইম্মরালের' প্রশ্ন 'সেক্রেড প্রফেনের' মতোই তর্ক দূষিত। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে মঞ্চে এগুলোকে দেখানো সেকালেও নিষিদ্ধ ছিলো; একালেও নিষিদ্ধ।···কিন্তু সবার বড়ো অশ্লীলতা আমরাই করছি। এখুনি করছি। করেই চলেছি।

চমকে উঠি। সেটা কি? কেন?

একজন রুগীকে ধরে লেকচার শোনাচ্ছি অনর্গল। অশ্লীল। আর রুগী হয়ে, বিদেশে স্যাগ্‌ল্‌ড্‌ উপস্থিতির উৎপাত হয়ে এতো জানার ইচ্ছায় এতো পরিশ্রম করা ভাল্‌গার। অশ্লীল।

আশ্চর্য হয়ে শুনছিলাম। হাসলাম। হাত ধরে বললাম, কতো জানো তুমি, কতো অল্প বয়সে, কতো সহজে।

ঐ শ্রমণের দয়ায়!

শেখায় কে?

এ আশ্রমে পঠন-পাঠনের পরম্পরা আছে।

আশ্রম কোথায়? এখানে তো তেমন কিছুর আভাস পেলাম না।

তবু আছে। এই জঙ্গলের মধ্যেই; অজ্ঞাতে। যুদ্ধ চলছে। এখন ওসব কথা বলবো না। কোথায় কি আছে জিগ্যেস করবে না। তুমি সম্পূর্ণ বিদেশী; স্যাগ্‌ল্‌ড্‌।

জিগ্যেস করছো না-তো আমি কি করে এলাম।

সে সব জানা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বলেই তোমার এতো খাতির। তোমার বোনের আরও খাতির।···চলো সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে। নৈলে নাচ আর দেখতে পাবে না। যা দেখছো পাথরে, তাই দেখবে জীবনে।

* * *

পথ বিশ মাইলের বেশী। নাম কর্তেই মন্দিরটি শিব-পার্বতীর। আসলে এটি গণেশের; তবে গণেশ বসে আছেন নর-কপালের আসনে। সাতটি নরকপাল খোদিত আছে আসনের পাটাখানার ধারে। আর···এ আমাদের মায়ের বাছা গণেশ নয়। দুই জানুর ওপরে দুটি শ্যামলী দিব্যাঙ্গনা বসে। রসবিদ গজাননের চার হাতের দুখানিই (বেড় দিয়ে) সেই সুন্দরীদের যৌবন ভাণ্ডে অর্পিত অবশ্য তারপরে আর আলাদা করে না প্রয়োজন শঙ্খ, না পদ্ম, যদিও বাঁ হাতের ফাঁকে দীর্ঘ মৃণালে বদ্ধ অর্ধস্ফুট পদ্ম, এবং আসনের ধারে শঙ্খটিকে বেড় দিয়ে একটি নাগ।—নাগে নাগে ছয়লাপ। গজাননের মুখেও মদির হাসি। চোখ দুটিতে মকরন্দ পানের মাদকতার চেয়েও আরও গভীর মাদকতা। সে চোখ দেখার মতো। মডেল সামনে রেখেও এমন উন্মদ-মদন-মনোহর দৃষ্টি রূপায়িত করা দুষ্কর।

সুদীর্ঘ বারান্দা চার দিকে বেড় দেওয়া। মাথার ছাদ পাথরের হলেও পর্ণকুটীরের ছাঁদে ঢালু। এককালে চার দিকে চারটি গোপুরম্ ছিলো; এখন নেই। সুপ্রশস্ত অঙ্গনের মাঝে বাগান ঘেরা পুষ্করিণী। বাগানে কয়েকটি নারকোল গাছ।

এই অঙ্গনে বসে আছে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশজন এ দেশীয় পর্যটকই বলি, দর্শকই বলি,—সবই গ্রামান্ত থেকে আগত।—মনে হোলো বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই নাচ গণেশের প্রীত্যর্থে নিবেদিত হয়। গণেশ খুব রসিক।

এদের নাচের ঢংটি এদেরই। এ আর কোথাও নেই। ওরা যেন একটা "কথা" নাচে নিবেদন করছিলো। ব্যাপারটা উমা পার্বতীকে প্রণয় দিয়ে জয় করলেন (মনে রেখো তপস্যা করলেও সেটা "ভগবান"কে পাওয়ার তপস্যা নয়; প্রণয়কে সার্থক করার তপস্যা)। সেই তপস্যার ফল পার্বতী-নন্দন গণেশ এবং কার্তিক। —একজন শক্তিতে অসীম, অন্যজন রূপে অনুপম, যুদ্ধে কুশলী। একজন বণিতা-প্রিয়, তন্ত্রযোগ বিধৃত অর্থে, অন্যে বণিতাপ্রিয়, যৌবনের প্রতীকি অর্থে। এ দুটি প্রচ্ছন্ন গূঢ়তত্ত্বই নাচের এবং হাবভাবের মুদ্রায় স্পষ্ট।

নাচটি দেখে মনে হোলো নারকেল গাছের হিন্দোলের মধ্যে যুগ যুগ বসবাস না করলে এ নাচের সৃষ্টি হতে পারতো না। মেয়েরা সেজেছে, মী-কেয়োর ভাষায়, ঘাঘরা পরা বাঁদরীর মতো।···কিন্তু কেন? কেন এ বিরাগ? বিরুদ্ধবাদ?

অবাক হই। মী-কেয়ো বোঝালো কথাটা। কুকুর, বেরাল, বাঁদর ততক্ষণই কুকুর, বেরাল, বাঁদর থাকে যতক্ষণ তাকে কাপড় চোপড়ে ঢেকে রাখা না হয়। ঢাকলে মনে হয় হাস্যকর লালিকা (প্যারডী)। মনে ভাবো তো এককালে এরা আমরা সবাই ছিলাম ঐ অপ্সরীদের মতোই সজ্জায়, কিন্নরীদের মতো কণ্ঠে, দেবীর মতো মর্যাদায়। এরা সারোং পরবে, তাও ঘাঘরা করে। তারপরে আবার কোমরেও জড়াবে আর এক ফের কাপড়। থাকে থাক তাতে বৈচিত্র্য। কিন্তু নড়লে চড়লে কাপড়ের দোলনই দেখতে হবে। সে কার নৃত্য! কাপড়ের ছন্দ? না দেহের? দেহ ছন্দই তো গৌরবের। তারই প্রকাশ তো নাচ। কাপড়ের ঢেউ আবার নাচ নাকি? আর ওপর অঙ্গে? ঐ কব্জী পর্যন্ত ঢাকা মিহি সাদা অর্গাণ্ডীর শার্ট না ব্লাউজ? ওর কোনো লিঙ্গই (gender) নেই।—ওতো এ দেশে কী পুরুষ কী মেয়ে সবাই পরছে, কাপড়টা এমন ফিনফিনে যে বুকে কোন কোম্পানীর কি ফ্যাশনের চোলা আঁটা তা পড়াও যায়। তাই যদি দেখাতে পারা গেলো, তবে আবার কাপড়ের মধ্যে কব্জি ঢুকিয়ে নাচা কেন? এগুলোই অসভ্যতা। তার চেয়ে 'মোঙ্গ' মেয়েদের নাচ ঢের সত্য।

কিন্তু ক্রমে আবেশ আসছিলো। মাথার লম্বা চূড়াওলা মুকুট, গায়ে অজস্র ঝলমলে অলঙ্কার, কাঁধের ওপর দিয়ে গুছিয়ে রাখা উত্তরীয়, আঙ্গুলে

পরা ধাতব নখ-দ্যুতিকা। আর সেই ছন্দ। ধীর, সৌম্য, ত্বরাহীন দোল যেন নারকেল পাতার দোল। সারা দেহ কথা কয়ে কয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে গল্প। মন-মানসে পরতে পরতে লেখা আঁকা হয়ে যাচ্ছে নানা রসের নানা ভাষ্য। নানা কথার নানা চিত্র। উমার সাধনা, মহাদেবের উষ্মা, বসন্তের পরাজয়, কামের করাল ধ্বংস, রতির আর্তনাদ, ব্রহ্মার মধ্যস্থতা, কামের প্রভাবে মহাদেবের চঞ্চল ভিক্ষা, উমার তপশ্চর্যা, মহেশ্বরের বর প্রার্থনার সফল সমাপ্তি। তার পর মুখোষের খেলা। যক্ষ, সিদ্ধ, গুহকদের আমোদ। গণেশের যুদ্ধ। কার্তিকের দিগ্বিজয়। তারক নিপাত। দীর্ঘ ব্যাপারের সমাপ্তি হোলো দেড় ঘণ্টায়। আমি বিহ্বল। আমি চিত্রায়িত নিজে, ছন্দোময় নিজে। আত্মার সমাধি হলে বাহিরের প্রেয়ই আত্মার আত্মীয় হয়ে ভেদহীনতার যামলে আবদ্ধ হয়ে যায়। এক হয়ে যায় শিল্প এবং শিল্পের নিবেদন। কি আশ্চর্য মিশে আছে এদের মননে চিন্তায় স্বপ্নে চিত্রে রামায়ণ-মহাভারত। এটি ভারী চমৎকার লাগে।

বাজনার মধ্যে টানের প্রবহমানতা নেই; আছে বিন্দুর স্ফুরণ। জলের স্রোত, পাখির ডাকের মতো সুরের চমক ধরা বিন্দু; বর্ষার বিন্দুর মতো সুরের ছিটে; পল কাটা হীরের ওপর ঘা খাওয়া আলোর মতো টুকরো টুকরো তারার ঝলক। অথচ তারাও যেন এক হয়ে মিশে যাচ্ছে অনন্তের প্রতিবেশী হয়ে।

এরা নৃত্যগীত শিখতে আসে যখন কন্যা অষ্টম-বর্ষীয়া গৌরী। বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ে। তা বোলে রাজার মেয়েও আসে। অন্ততঃ শেখে কৈশোর থেকে তারুণ্যে পদক্ষেপের ঘাটে ঘাটে যেমন যেমন এদের দেহ গরিমায় রং-রস লাগতে থাকে, তেমন তেমন বয়িয়সী শিক্ষয়িত্রী বুঝিয়ে দেয় নারী দেহের লাবণ্যকে সুষমায় বিধৃত করার উদ্ভাবনীকৃতী, সে সুষমাকে দেহের পাত্রে পরিবেশন করার কঠিন দায়িত্ব এদের সানন্দে বহন করতে হয়। এ শিক্ষা পশ্চিমের পটুতা অবলম্বী কৌশল সৌকর্যই নয়; এ শিক্ষা সুপ্রাচীন সংযমের সাধনায় উত্তীর্ণ দেহাতীতকে, সুন্দরকে, শিবকে, কল্যাণরূপে প্রতিষ্ঠা করা, সবার অন্তরে অন্তরে। পরিচ্ছন্ন. মার্জিত, পরিশীলিত স্নিগ্ধ রুচির একটি নিবেদন।

ফিরে আসতে সন্ধ্যা হোলো। মন্দিরে আলো। আরতি শেষ হয়ে গেছে। আমার ঘরে (ঘরে-ই বলি) ধূপের গন্ধ। এক রাশ চাঁপা।—এবং ভাত ঝোল।

অনেক রাত হবে তখন। বাইরে যাবো। সন্তর্পণে উঠেছি। বাইরেও এসেছি।

অজস্র জোনাকী। আরও অজস্র পাতার ঘন আচ্ছাদন। অজস্র ঐ অনন্তের

মহাকাশে মহাবিশ্বলীলার সাক্ষ্য গণনাতীত নক্ষত্র। আমি এই মহাসিন্ধুতীরে এক কণা বালুকার সহস্রতম অংশ। তবু পিণ্ড আমি। শরীর পিণ্ড মাত্র। একাকীতা এ পিণ্ডের সহজাত অনুভূতি। দোসরের ইচ্ছা বা অনুভূতি এ সত্যের ব্যতিক্রম। এই একাকীত্বই সত্য। নির্মম সত্য।

Only a beauty, only a power,
Sad in the fruit, bright in the flower,
Endlessly erring for its hour,
But gathering as we stray, a sense
Of Life, so lovely, and intense.
It lingers, when we wander hence ··

It lingers—যখন রবোনা আমি মর্ত্যকায়ায়, তখন স্মরিতে যদি হয় মন,—মনে রবে এই অসম্ভব রাত্রির আরও অসম্ভব আবেদন।

শরীর যখন সুস্থ, সম্পূর্ণ, সক্রিয়,—তখন সমস্ত জগৎ, কাল, চিন্তা মনন ঝলমল করে রূপের রসের স্পর্শে। সে একা তো একা নয়। 'নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভিরে আপনার একাকীত্বে'! সে একক নির্জনতা পরতে পরতে প্রাণবান ; রূপং রূপং প্রতিরূপং! এ নৈঃশব্দ্য মুখর, গুঞ্জরিত। এ এমন অবস্থা মন মেলে দেয় সহস্র চোখ ; সহস্র বাহু অন্তর থেকে বাহির হয় অধরাকে ধরতে। ···কিন্তু কি বিকল আমার দেহ। কি অবসাদে ঝিম লাগা রক্ত। যেন বন্ধ ঘরে শুয়ে আছি, আর বাইরে জানালায় ঝড় করাঘাত করছে ; যেন সমুদ্র আছাড় খাচ্ছে। অথচ আমি তাদের কেউ নই।

* * *

সকালেই সেই জীপ এসেছে। চলেছি নতুন দিশায়।

নদীর ধারে এসে গেছি। এর পারে ছিলো তুঁত গাছের বাগান। সারা তল্লাট-টায় ছিলো রেশমের চাষ। কারিগরির পীঠস্থান ছিলো যশোধরপুর। সব গেছে। আরও গেছে যুদ্ধের হিড়িকে। কারা সন্দেহ করেছিলো যে আঙ্কোর ওয়াৎ-এর এলাকা সংরক্ষিত এলাকা হবার অজুহাতে এই বিশাল নগরীর নানা ভগ্নস্তূপের মধ্যে গেরিলাদের আড্ডা, এবং গোলা-বারুদের ভাঁড়ার।— কাজেই এ তল্লাটের, নদীর ধারের যাও বা চাষ-বাস ছিলো,—এখন চিহ্নহীন বিপর্যস্ত।—তুঁত বনের দীর্ঘশ্বাস সত্ত্বেও নদীতীরে দুর্বাঙ্কুর, কাশ, বিস্তর বাসক, ভাঁট, মুচকুন্দ।—

পথ নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। ঘন জঙ্গলের পাড়। হঠাৎ মী-কেয়ো ইশারা করলো, দেখো ; ভেবেছিলাম কোথাও না কোথাও আসল জীবনের ছবি দেখাতে পারবো। বাঁধের ডান ধারে বাঁশ বনের তলা দিয়ে দেখো।

দেখলাম। বিশাল পুষ্করিণীতে দূরে দূরে পদ্ম ফুটে আছে।—পুষ্করিণীর বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে কাপড় রাখা। তিনটি মেয়ে স্নান করছে। এরা যে আজও নিরাবরণ স্নান করে বুঝলাম।—অথচ আমাদের গতিশীল উপস্থিতি সম্পর্কে ওরা উদাসীন। মী-কেয়োর ভাষ্য অনুযায়ী 'অশ্লীল' হলাম না। গাড়ি থামাতে বললাম না।

এ যেন মথুরার যমুনা, কাশীর গঙ্গা। না; সে সব নদীর ধারে ঘাট আর ইমারত। এদের তা নেই। এদের গ্রাম।—মনে হয় মহানদী, দামোদর, গড় মুক্তেশ্বরে গঙ্গা।—তীরে তীরে ছিলো ঘন বসতি। বাঁশ, সেগুন কাঠের কারিগর; হাতির-দাঁত, সাপের চামড়া, সোনা রুপোর শিল্পী।—বন্দুক নিয়ে কতোকাল এদের দিন কাটাতে হয়েছে। আজ বন্দুক ফেলে করাত, তুরপুণ, ছেনী, হাতুড়ি ধরছে আবার। এদের মাথার টুপি, গলাবন্দ ছোটো কামিজ, সারং এবং স্ত্রীলিঙ্গমুখর কর্মজীবন ভুলতে দেয় না যে এ দেশ কাম্বোজ, চাঁদ-সদাগরের শঙ্খদ্বীপ।—শিবপুজো ছেড়ে যে নাগিনী কন্যার পুজোয় ছিলো তার পৌরুষসুলভ আপত্তি, এ সেই নাগিনীকন্যার দেশ।

যশোধরপুর, প্রা-থান ছিলো যশোবর্মনের রাজধানী। চতুর্থ জয়বর্মনের গরিমার উজ্জ্বল অধ্যায় বিধৃত নগরী। কিন্তু এ এলাম কোথায়? অরণ্যে ঢাকা অনেকগুলি ইমারৎ। যেন তপোবন। তলায় যতো ঝরাপাতার মেলা, এতো আলোছায়ার দোলা। এ কোথায়?

আমরা এসেছি আঙ্কোর থোমের পথে। বুঝতে পারছি। কিন্তু তবু এ তেমন বড়ো কিছু নয়। বেশ ছোটোর মধ্যে বেশ নিভৃত, নির্জন।—কিন্তু তা বলে সমগ্র শহর-টি, (মন্দিরটিকে নিয়ে) পরিকল্পনা অপূর্ব ও নিখুঁত। পাঁচশো বছর ধরে এই আঙ্কোর ছিলো কাম্বোজের রাজধানী। একে কেন্দ্র করেই পূর্বে আনাম, পশ্চিমে শ্যাম, থাইল্যাণ্ড থেকে লাওস্ ভিয়েৎনাম সবটা কাম্বোজ শাসন করেছে। শাসন করেছে তোন্‌লে-শাপের হ্রদ, মীকং, মীনাং-এর মোহানা।

সুপরিকল্পিত যশোধরপুরের স্থাপত্য ছিলো অতীত যুগের কিম্বদন্তী। পরিকল্পনার মধ্যমণি মন্দির। মন্দিরের চারপাশে সমচতুষ্কোণতাই প্রধান। প্রাচীর, খাত, জলপ্রণালী, সেতু, পুষ্করিণী সব পর পর সাজানো এই চতুষ্কোণ পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। এমন কি এই পরিকল্পনার ফলে শাসন বিভাগ, সেনা বিভাগ, ধর্ম ও শিক্ষা বিভাগ সবার দপ্তরখানাই চারভাগে বিভক্ত ছিলো, চারভাগে গড়া সৌধে। খ্‌মের-দের নগর-শিল্পের খ্যাতি সকলেই করে গেছে, বিশেষ করে এদের জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা।—

পূর্বের বিজয় তোরণ থেকে দীর্ঘ তিন মাইলের সোজা পথ আঙ্কোর থোমের পরিখা, সেতু, প্রাকার ভেদ করে বিশাল উত্তর-দক্ষিণে মেলা এক বারান্দার তলা দিয়ে বিস্তীর্ণ অঙ্গনে মিশেছে। সে অঙ্গনের উত্তরে রাজপ্রাসাদ ছিলো; দক্ষিণে 'বিমানক'। সেও এক কীর্তিমান স্থাপত্য।

সেকালের এশিয়ার নানা রাজসভায় এই 'বিমানক'কে কেন্দ্র করে নানা কিম্বদন্তীর অন্ত ছিলো না। লাল বালি পাথরের পিরামিড পদ্ধতিতে গড়া এ প্রাসাদে ওঠার খাড়া ত্রিশটি সিঁড়ি। এমন সিঁড়ি চতুর্দিকেই ছিলো। পূবের দিক থেকে রাজা উঠতেন। এই ঘরে রাণী নাগমণিকা থাকতেন। পূর্বজন্মে সাতটি ফণা ছিলো তাঁর বিশেষ অলংকরণ। রাণী জন্মে তাঁর ফণা না থাকলেও তাঁর সম্মান ছিলো এমন যে রাজা নিজে বিশেষ ভাবে শুচিশুদ্ধ এবং সজ্জিত না হয়ে এ প্রাসাদের শয়ন-বিমানে প্রবেশ করতেন না। রাজ্যের শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীরা ছাড়া কেউ পরিচারিকা হোতো না। ভিতরের কোনো খবর বাহিরে আসতো না। সমস্ত মহলটি আগাগোড়া সোনার; এবং সেই অনুপাতে ছিলো তার অন্যান্য আসবাব উপচার। স্বয়ং বিষ্ণুর মন্দিরে লক্ষ্মী থাকলে যেমন যেমন অর্চা হোতো দেবীর, ঠিক তেমন সম্মানই মানুষ দিতো বিমানকের এবং তার অধিকারিণীকে। যেদিন নাগকন্যার কৃপা বর্ষিত হোতো না, রাজা রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়তেন। সমগ্র প্রজার মধ্যে নাগকন্যা সম্বন্ধে প্রবাদ তাকে প্রায় যক্ষিনীর মতো এক গুরু গম্ভীর সম্পর্কে বেঁধে দিয়েছিলো। তাদের সব বিপদে আপদে বিমানকের নাগ-রাজ্ঞীর ওপর ছিলো তাদের অসীম ভরসা।

এই বিচিত্র রহস্যময়ীর নিঃসঙ্গ নির্জনতার খাতিরে প্রাসাদের চার পাশে অনবদ্য উপবন ছিলো। লোকে প্রবাদ ছিলো যে বিমানকের সাজসজ্জা ব্যবস্থা আসল রাজপ্রাসাদেরও বেশী ছিলো। এর জলাশয়ে বহু নাগ প্রতিপালিত হোতো।

—এটাও কাম্বোজে নারী প্রাধান্যের একটি দলিল হয়ে আছে। বলে মী-কেয়ো। এ প্রাসাদের সেবায় সাম্রাজ্যের তা বড়ো সেরা সুন্দরী মেয়েদের নিবেদন করার রীতিমত রেশারেশি ছিলো।

আজ ভগ্নস্তূপ। সোনার ছিলো বলেই ছাদও নেই। বহু দেয়ালও নেই। হীরা মণি মরকতে গাঁথা দেয়াল থাকবেই বা কেন? আমরা ওপরে গেলামই না। এখন কিছু নেই দ্রষ্টব্য।—যদি বা নাগ কন্যা থাকেন হয়তো ডাঁশবেনই। দরকার নেই।—

পূর্ব পশ্চিমে মেলা বারান্দার দোতালায় পর পর গম্বুজ। মনেহয় এখান থেকেই রাজারা স-পারিষদ এবং স-পরিবার কুচকাওয়াজ এবং বার্ষিক উৎসবের মেলা দেখতেন, বৈদেশিক এবং সাম্রাজ্যের প্রধানদের দর্শনও দিতেন। এখানে রাজ ব্যবহারের জন্যও বসতেন।—

*　　　　　*　　　　　*

এই বারান্দার পূর্বে, উত্তর দিকে এক বিচিত্র বেদী।

ঠিক এমনি এক বেদী দক্ষিণেও।—আমরা প্রথমেই এই উত্তরের বেদীর তলায় এসেছি। বেদীর দেয়ালে পশ্চিমের বিশালতা দেখতে দিচ্ছে না। যা দেখতে দিচ্ছে তা পেয়ে আমি বিহ্বল।

সারা আঙ্কোর থোম বস্তুতঃ চারভাগে ভাগ করা। এর মধ্যমণি সুপ্রসিদ্ধ শিব মন্দির 'বায়ন' (সে কথা পরে বলবো, কারণ পরে গেছি)। এখন আছি উত্তর পশ্চিম 'স্কোয়ার'টায়। এটাতেই প্রাসাদ। এটি মনে না রাখলে আঙ্কোর নগরীর বিশালতা মালুম হবে না।—এই উত্তর পশ্চিমের স্কোয়ারের ঠিক মাঝের পথের উত্তরের বেদী। তার ওপরে আসীন এক নগ্ন সুস্থদেহ যৌবনোত্তীর্ণ সুঠাম পুরুষ।—কেন যে একে বলে 'কুষ্ঠী রাজার বেদী' ভগবান জানেন। দু-চারজন কুষ্ঠীকে এ বেদীর ছায়ায় দেখা গেলেও রাজার গায়ে কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। পাথরের গায়ে ছাতা অবশ্যই পড়েছে। তা অন্যান্য বহু মূর্তির —গায়েই পড়েছে। লোকে বলে প্রথম যশোবর্মন কুষ্ঠে মারা গেছিলেন। কিন্তু এ প্রবাদের কোনো ভিত্তি নেই। তা ছাড়া কুষ্ঠ ব্যাধি যে এক মহা বিপদসঙ্কুল ছোঁয়াচে ব্যাধি এমন ধারণা খ্মেররা পোষণ করতো না। অনেকে বলে এটি কুবেরের মূর্তি। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে কাম্বোজের মানুষরা কোথা থেকে তুলে এনে সুন্দর মূর্তিটিকে এখানে স্রেফ বসিয়ে দিয়েছে। এরও মুখে সেই স্মিত। জানি না স্মিতের কারণ নিকটস্থ একটি দ্যাল কিনা। যে বেদীতে রাজামশাই বসে তারই গায়ে, পদ্ম, ঠিক তার গায়েই পর পর চারটি পংক্তিতে কতো যে সুন্দরী সাজে সজ্জায় ঝলমল রূপে বসে আছে কী বলবো। যেন রাজার জেনানা মহল! সঙ্গ দিচ্ছে বিরহী রাজাকে। একটিরও ঊর্ধ্বাঙ্গে আচ্ছাদন নেই। সুঠাম লালিত্যে বিনোদিনী প্রতিমারা কি রাজদাসী? কিন্নরী? কি?

ইতি—

জামাইবাবু

৯

কল্যাণীয়াষু,

আমি একটু একটু করে দেখি! মী-কেয়ো সরে এসেছে কাছে। বললো, —এক সঙ্গে সবটা ঘোরা চলবে না। একটু একটু করে দেখতে হবে।—এই নগরের প্রতিটি দেয়াল অন্ততঃ দু মাইল। বেদীগুলি এক একটি এক থেকে দেড় ফার্লং, উচ্চতায় পনেরো ফুট! বারান্দা আধা মাইল। কোনোটাই ছোটো নয়। চারদিকে পরিখার বেড় সাড়ে নয় মাইল। দুটি পুষ্করিণীর এক একটি তেরো মাইল। সব দেখা এমনিতেই অসম্ভব। অধিকন্তু তোমার শরীর খারাপ।

কিন্তু আমি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ মী-কেয়ো।

অসম্ভব নয়। খেয়ে নাও যা দিয়েছি। আরও সুস্থ হবে। রোদ চড়ার আগে ফিরতে হবে। রাতে ঘুমুতে হবে। উঠোনে বসে রোম্যান্টিকতা চলবে না। কাল রাতে উঠোনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে। খবর পেয়েছি। খুব অন্যায়।

বারান্দার কার্ণিশের ওপরে নাগ প্রতীক প্রলম্বমান। নাগ প্রতীক শুনেছি সাঁকোর দুধারেও। অনতিদূরে মন্দির বায়ন। সুপ্রসিদ্ধ বায়ন। তার প্রবেশ পথে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য,—মুখের দিকে অসুর, লেজের দিকে দেব।—মন্দিরে কেন, যশোধর পুরে প্রবেশেরও চারদিকে চারপথ। কেবল পূর্বদিকে পাশাপাশি দুটিপথ,—বোধকরি 'আপ্' আর 'ডাউন্'। রাজবাড়ি আর সিংদরজার মাঝের মন্দিরটি একেবারেই বিধ্বস্ত।—ফরাসী সরকার তবু যা সংস্কার করেছিলো, এই যুদ্ধ বিগ্রহের টালমাটালে এখন আর এ দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। অরণ্যের জঠর ক্ষুধার্ত। গিলে ফেলে প্রবল হারে।

নগরীকে সুদৃশ্য এবং সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সূর্যবর্মন সীয়েম রীজ নদীকেই বাঁধিয়ে নগরীকে বেড় দেওয়ালেন। এ তাঁর বিরাট কীর্তি। একটি বিস্ময়।

ফলে আঙ্কোর থোম, আঙ্কোর ওয়াৎ সমগ্র সুবিশাল যশোধরপুর নগরী তার দীর্ঘ প্রাচীর এই নদীর তীরেই শুধু রাখা হোলো না, প্রাচীরের সঙ্গে সমতা রেখে সরলরেখায় রূপায়িত হোলো।

মী-কেয়ো ফল ছাড়াচ্ছে। গুণ গুণ করে গান করছে। ওর মাথায় সবুজ

রুমাল বাঁধা। পরণে দামী সিল্কের তীব্র লাল সারং। ওপর গায়ে স্বচ্ছ একটি কামিজ। ও কখনও তার তলায় কিছু পারে না। বলে, অসভ্যতা, অনিয়ম চোখে হাল্কা কাজল। সেজেছে আরও অনেক অসাজের ভাগে। সকালটা মৃদু। চলন্ত বাতাসে হাল্কা ফুল-মিতালী সৌরভ। ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি যতো, ঝাঁক ঝাঁক পাখিও ততো। আঁনিথোলজিস্টের স্বর্গ।...

আমি যেন কোনো দিনই অসুস্থ ছিলাম না। আমি যেন শক্তির কল্যাণদীপ্ত শিবের মতো, কার্তিকের মতো যৌবনসুলভ তৎপরতায় যদৃচ্ছ-চারণ, যদৃচ্ছ-করণে সিদ্ধ।

নদী দেখছি,—দেখছি না। মনে মনে দেখছি লক্ষ লক্ষ মানুষ একটি রাজার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেবার সাধনায় একটা বন্য ভূখণ্ডকে সাজাচ্ছে। ভগীরথের মতো গঙ্গার সহজ প্রবাহ পথকে পূব মুখ থেকে ফিরিয়ে দক্ষিণ মুখে এনে পিতৃপুরুষের ভষ্মাস্থির পাহাড়কে ধুইয়ে দেবার সে প্রচণ্ড উৎসাহে কতো লক্ষ মানুষ কাজ করছে জানা নেই। কিন্তু জয় বর্মণের স্বপ্নকে সার্থক করতে করতে দুশো বছর কেটেছে। খেটেছে লক্ষাধিক হাত।

নদী দেখছি,—দেখছি না। তখন যে আমি দেখছি হাজারে হাজারে শ্রমিক ঠিকাদার, রাজপুরুষ, অন্ততঃ চার পাঁচ পুরুষ ধরে এই নদীর তীরে জলে কাদায় ধুলোয় ঘামে বৃষ্টিতে কাজ করে করে ক্ষয়ে গেছে। তাদের নাম জানি না কোনার্কে স্থপতির নাম লেখা থাকলেও নাম রাজার। দিল্লীতে একটি মন্দির আছে,—(বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বারেও) তার নাম বিড়লা মন্দির। দেবতারও নাম ছাপিয়ে গেছে ধনীর প্রতাপ। তবে আর গণদেবতাই বা কে, গণপতি গণেশই বা কে।' এ সব সৃষ্টির স্রষ্টারা রাজার নামের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তাদের কথাই ভাবছি।—দুশো বছর ধরে একটা দেশ, একটা সমাজ মন্দির গড়া, রাজধানী গড়া ছাড়া কিছু জানে নি!

দেখছি, সেই সুদূর চম্পা, আন্নাম, মালয়, শ্যাম, দ্বারাবতী থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে আর আসছে রাজপুরুষের অভিঘাতের, শাসনের, ভয়ের প্রকম্পে অমানুষ হয়ে, পোকা মাকড় হয়ে, গরু, গাধা, ঘোড়া, হাতির মতো কেবল কাজ করতে। সুকো থাই, লুয়াং, শ্রীবিজয়, লাভো, ফুনান তো বটেই চীন থেকে, সুমাত্রা থেকে, বহির্দ্বীপ, যবদ্বীপ থেকে কেবল আসছে দলে দলে মানুষ।

তাদের হয়তো সেই দুর্গতি হয়নি যা হয়েছে ইরাণে, বোগদাদে, কাইরোয়, কার্ণাকে, আলেকজেন্দ্রিয়ায়, সুয়েজে। কী যে এদের সৈতে হয় একটা মানুষের স্বপ্নকে সার্থক করতে তার পরিচয়চিত্র জ্বলজ্বল করছে টলস্টয়ের 'ওয়ার-এণ্ড-

াস্’-এ, সাঁনক্লেয়ার লুইস-এর ‘জাঙ্গল্’এ। এবং পরমাশ্চর্য রাজা জয়বর্মণের স্বদেশে এই সব নগরী-মন্দির প্রাচীরের গায়ে-ও। কতোই যে রিলীফ উৎকীর্ণ ওদের শ্রমচিত্রের। হালাবিদ, বেলুড়, কোনার্ক, গোমতেশ্বর, তাজমহল, লালকেল্লা গড়া। এতোটা নৃশংসতার মধ্যে হয়নি এ কথা ভেবে কোনো স্তোক পাই না। ব্যবহারের দিক দিয়ে পল্লব রাজারা, গঙ্গা রাজারা, শৈলেন্দ্র রাজারা বা এই চেন্-লা বংশের ‘চন্দন’-রাজারা তফাৎ হবেন কেন? রাজা-প্রজা ধর্মের গোড়ায়ই যে গলদ, দেনেওলার দলে এবং লেনেওলার ব্যক্তি বিশেষতায়। এ ভাগ অসম ভাগ। গীতায় এটাকেই অধর্ম বলেছে। ধর্ম হলো সমতা। মানুষকে মানুষ না ভাবতে পারো, ভাবা কঠিন বোধহয়, অন্ততঃ দেবতা ভাবো। তাতেও সমতা পাবে।—তোমরা আইন গড়ো, স্মৃতি গড়ো, আর,—

‘ওরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে।’

এবং কাজ করেই গেছে, যাচ্ছে,—যাবেও বোধ হয়। ‘শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ ’পরে, ওরা কাজ করে।’

পাতায় করে যা পরিবেশন করে মী-কেয়ো সেটি ছানা, জলশুদ্ধ। পেঁপে ফলটা চিনতে পারি। আর চিনতে পারি সেই আঠা আঠা জেলী-ধরা কালো বীজগুলোকে,—প্রথম দিন শ্রমণ যা খাইয়ে ছিলেন। ছোটো এক গেলাস দই দিয়ে বেলের পানা।

পাতাটা আমার হাতে নামিয়ে দিতেই বোধকরি আমি একটু চমকে উঠেছিলাম।

কী ভাবছেন? এতো তন্ময় হয়ে?

কিছু না। বলি অলস কণ্ঠে।

ঐ সময়ের ভাবনাটাই তো সেরা ভাবনা। অন্তর্মনের ভাবনা।

চেয়ে দেখতে হয় এ মেয়েটাকে। বলে ফেলি যা বলতে চেয়েছি—এতক্ষণ। তুমি কি আমার চেনা মী-কেয়ো? আমি কি তোমায় চিনি?

কেন? ওর ঠোঁটে মৃদু স্মিত। ‘হাসি’ বলছিনা ইচ্ছে করেই;—এ হাসি নয়। হাসি-কে চিনি। এটি শ্যামের নিজস্ব। শ্যামের বেরালের দৃষ্টি যেমন তার নিজস্ব।—শ্যামের বেরালকে আমি বেরাল বলি না; বলি একটি দুরূহ সমস্যা, একটি ‘উপস্থিতি’, একটি-ব্যক্তি-বিভাস।—হাসিটির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাক্কা আবার। চিনি কি তোমায়, হে সুন্দরী?

আমি এই শ্রম ও শ্রমিকের কথা তুললাম,—শিল্প-সাধনা, সৃষ্টি-চিত্র, প্রকাশ-বিকাশের আনন্দ এ সব মামুলী রাংতা লাগানো কথার চটচটে মধু বাদ দিয়ে।···

…কিন্তু বন্ধু তুমি ভুলে যাচ্ছো যে এখানে যারা কাজ করতে আসতো তারা না ছিলো দাস, না ছিলো অন্ত্যজ। আমাদের সমাজে 'অন্ত্যজ' বলতে বিশেষ কিছু নেই। সভ্য-অসভ্য আছে; এবং যা একান্তভাবে শ্যাম-ক্ষ্মের নয় তেমন সমাজ বা সংস্কৃতিকে আমরা সমাজে আমল দিতে ভয় পাই…তোমাকেও ভয় পাই! হও না কেন পৈতেধারী ব্রাহ্মণ।—

লোলো, মোঙ্গ প্রভৃতি জংলী জনতা যারা মন্দিরের বা বাড়ির কাজে ঢুকতো তারা এ সব প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে গিয়ে যুগ যুগ থাকতো। সেটা দাসত্ব নয়। এতো গ্রীসে—রোমে—ভারতেও খুব সমৃদ্ধির সময়েও ছিলো।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ও তুমি বুঝবে না। বরং পেঁপে খাও।

হেসে বলে,—পেঁপে না খেয়েই বলতে পারবো। চটছো কেন? মনে রেখো যারা নদীর প্রবাহ সোজা করিয়েছিলো, তারা ওদের জন্য নার্স, ডাক্তার, হাসপাতালও হাজার হাজার করিয়েছিলো। মেয়ে নার্স, পুরুষ নার্স! কেবল রুগীর ব্যবস্থাই নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও শেষ অবস্থায় আশ্রমে থাকতো। সবই বিনা খরচায়। ওষুধ? সে লিষ্ট দেখলে মাৎ হয়ে যাবে! প্রসব হতে পারতো বিনা যন্ত্রণায়।—অস্ত্রোপচার হোতো বিনা যন্ত্রণায়। অর্শের দাওয়াই ব'লেই দু-হাজার ওষুধের লিস্ট। স্রা-শ্রাং, কাছেই দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী, হয়তো বলা যায়,—বান্তিয়ে-ক্রী রাজমহলের পাশে বিশাল করে গড়া পুষ্করিণী। বর্ষার বন্যা থেকে চাষ আবাদের জমি, প্রজার বসবাসের জমিকে রক্ষা করার জন্য। জলা জায়গায় রেশম হবে না। এ সবই প্রজার সুখের জন্য চিন্তা করার ফসল! চাষ ও জলের এই সার্থক ব্যবস্থায় রেশম পরতোনা এমন ক্ষ্মের ছিলোনা।—না খেয়ে ক্ষ্মের সেকালে কখনও মরেনি। সে সব দিনে ক্ষ্মের মাত্রের মাথা গোঁজার স্থান ছিলো। আজ তা স্বপ্ন। কারণ, যে কোনো সংস্কৃতি, বিপ্লব ছাড়া বহুকাল বেঁচে থাকলে ঘুণে ধরবেই। ইমারত, ছবি, বই, ব্যবহারের জিনিষের অদলবদল না হলেই ঘুণ ধরবে। ঘুণ প্রকৃতির দাঁত, চিবুবার দাঁত। তা থেকে নিস্তার পেতে চাও, সর্বদা সতেজ থাকবে! অনেক দিনের ব্যবস্থা নিস্তেজ হয়। ঘুণ ধরে। ধ্বস্ নামে। ভারতেও তাই, এখানেও তাই। প্রজা শোষণ বা দাস তাড়নার দেশ ক্ষ্মের ছিলোনা।—তা ব'লে এটা খতিয়ে দেখা দোষের নয়। শুধু পেঁপে খেতেই এখানে আসা বৃথা আসা।—তবুও খাও। উপস্থিত তোমার ওষুধ ওটা!—

আঙ্কোর থোম কি মন্দির ছিলো? কিসের মন্দির? সীয়েম রীপের পূর্বে এবং আঙ্কোর থোমের পশ্চিমে গোটা শহরের প্রাচীরের বাইরে 'সাগর' দুটি ছাড়াও পুষ্করিণী, কুয়া, খাল, পরিখায় ভরা। আঙ্কোরের ঐশ্বর্য, শ্রী

শৃঙ্খলার খ্যাতি এই নগরে সেকালেও দশ লক্ষের বেশী মানুষকে টেনে
ছে। কতো শিল্পী জ্ঞানী, গুণী, বৈদ্য, জ্যোতির্বিদ, পণ্ডিত, রাজনৈতিক,
নক, কী না ছিলো, কে-না এসেছে? এই শহরের আশী মাইল দূরে, বায়ু-
ণে দুর্গম বনের মধ্যে খসে ধ্বসে পড়ছে অপূর্ব এক কীর্তিসৌধ। এতো
র সুঠাম, এতো বিস্তর ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা,—যে কেউ কেউ ভাবে
অন্য এক রাজধানীই। অন্য শহর। তা ছাড়া আবার অনেকেই ভাবে
সপ্তম জয়বর্মণের সমাধি স্মৃতি। কী যে, ঠিক কেউ জানে না। পঞ্চাশ
রে মানুষ দশ বছর খাটলে অমন বিশাল সৌধ রচনা করতে পারে। এখন
ই যায় না, অরণ্যের বাধায়। এমনি ছড়ানো কতো মন্দির, কতো সৌধ?
হাসহীন কতো ইতিহাস।

বেসাতিনীরা বসে আছে ছাতার তলায়, সারংয়ের বর্ণ সম্পদে আলো করে।
ন কারুশিল্প, পাথর, বেত, বাঁশ, হাড় (হাতির দাঁত বলে চালানো),
অজস্র ফল।—কাপড়, সিল্ক, পুঁথী, পাথরের নক্সী সবই আছে।
ক্স্, জেড্ জাতীয় পাথরের সঙ্গে নেহাৎ ওঁচা সোপ স্টোনও আছে।
টালও কিছু কিছু। আঁকা ছবি, কাটা ছবি, কাগজ-কাটা নক্সী জালি।
সা যেন বাজার করতেই এসেছে। ভীড়, কোলাহল।

কিন্তু ভালো লাগছিলো মী-কেয়োর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ কথার আমেজ।
হোলো। মী-কেয়ো বললো, বায়ন বহু আগের। বায়নকে ঘিরে
ঙ্কোর থোমের বর্তমান রূপ সপ্তম জয়বর্মনের সৃষ্টি : ত্রয়োদশ শতকের
ম্ভ সেটা।

আমরা যাত্রী-দেখার মতো দেখছি না। এই খুঁটিয়ে দেখাটা আমার ভালো
গ।—১৫ ফুট উঁচু × ১০০০ ফুট লম্বা × ৩০০ ফুট চওড়া দুটি বেদীর
য দিয়ে অতি প্রশস্ত পথ সোজা চলে গেছে পূবে, প্রধান নগরী আঙ্কোর-এর
রের প্রাচীর ভেদ করে।—এই পথের উত্তরে-দক্ষিণে, প্রতিসাম্য রক্ষা করে
কে দু'টি, ওদিকে দু'টি 'টাওয়ার', মন্দিরের মতো, কিন্তু মন্দির নয়।
তো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, মন্ত্রী বা বৈদেশিক দূতদের বসার জায়গা ছিলো।
কে মনে করেন ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করবার জন্য যাঁরা সমবেত হ'ন
দের বিশ্রাম বা পোষাক বদলাবার জায়গা। উত্তরে দক্ষিণে আরও দুটি বড়
ধ আছে। বলে ক্লীয়াং। মনে হয় এগুলোয় বার্ষিক উৎসবের সাজ সরঞ্জাম
তো। নানা দেশ থেকে আগত সম্ভ্রান্তদের অনুচরদের জন্য রাজ-অতিথি-
লাও এখানে ছিলো বলে খুব ব্যবস্থা। চমৎকার গঠন। এখন ছত্রখান হলেও
খা যায়। সূর্যবর্মন যখন কংপং-এর 'প্রা-খান' থেকে আঙ্কোরে রাজধানী
য়ে আনলেন তখন এই সব বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো (১০০২—৪৯)।

আবার সেই গুণ গুণ সুর। বুঝলাম সেই আগের গানটাই সুন্দরী[illegible] আজ পেয়েছে। খাম্বাজেরই একটু রকমফের। জিগ্যেস করলাম, বলোনা [illegible] গান?···সেই চাপা হাসি। বলবো। কিন্তু কী আশ্চর্য তোমাদের গান, তুমি জানোনা? আরও উৎসুক হলাম। কিন্তু সুরটা বন্ধ হয়ে গেলো।—

ঘুরে ঘুরে প্রাসাদ দেখা সম্ভব নয়। আঙ্কোর থোমের যা কিছু সং বায়ন। দেখতে সময় লাগবে। কিন্তু একটা জিনিস দেখছি, যদিও দ্বিতী জয়বর্মণের মন পূর্বপুরুষদের লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে, বিষণ্ণ হয়ে (অশোকে মতো, হর্ষের মতো), শান্ত, সৌম্য, আত্মনিবেদিত বৌদ্ধ মতের দিকে ঝুঁকেছিলে তাঁর প্রাসাদ এবং এই আঙ্কোরে যা কিছু উৎকীর্ণ দেখলাম সবই হি পুরাণের ব্যাপার। রাম, রাবণ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, কার্তিক তে আছেনই, আছে ইন্দ্রসভা, অপ্সরী, যক্ষদের সঙ্গে অতি প্রিয় হনুমান, গরুড় নন্দী, ভৃঙ্গী। এ ছাড়া পশু-পাখি, প্রাত্যহিক জীবনের ছবি। এরা দেব[illegible] নিয়ে এতো প্রমত্ত থাকেনি যে পৃথিবী ভুলবে। এ-দিকটা মোটামুটি সে ক্ষ্মেরদের অন্যতম অপূর্ব কীর্তি বাফুয়েন এবং ফিমানক দেখলাম। ফিমানক বিমানক।—একটি প্রাসাদ। বিশেষ করে গড়া বৈদেশিক সম্ভ্রান্তদের জন্য ঠিক রাজপ্রাসাদের সামনে।

কিন্তু বাফুয়েন তা নয়। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় উদয়াদিত্যবর্ম স্থির করলেন স্বর্গকে মনে রেখে মর্ত্যেই সৃষ্টি করতে হবে ইন্দ্রেরই প্রতিভূ এ মর্ত্য রাজার প্রাসাদ। কিন্তু প্রাসাদটির মধ্যভাগ হবে স্বর্ণমেরুর মতে প্রাসাদের চারিপাশে বয়ে যাবে মন্দাকিনী, এপাশ ওপাশে থাকবে ক্ষীর সমুদ্র মানসসায়র। বাফুয়েনের চূড়া ১৫০ ফুট উঁচু। এবং মন্দিরের চূড়ায়, ভারতী প্রথায় সোনা মুড়ে দিলেন। এই বাফুয়েনের দেয়ালে উৎকীর্ণ কাজ, এ ভিতরের রানীর শয়নকক্ষ,—সারা কাম্বোজের গৌরব ছিলো। এই সোনা কাজের বহু প্রশংসা চৈনিক পরিব্রাজক করে গেছেন।

তা এখন নেই। ভেঙ্গে গেছে। গাছের শিকড় ঠেসে ধরেছে। ঝ[illegible] শুকনো পাতায় আকীর্ণ। এক এক দমকা বাতাস আসে, পাতাগুলো এ দেয়া থেকে ও দেয়ালে, বাঁধানো মেঝের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। সে শব্দের হি বিরহ রক্তকে ঝিমিয়ে দেয়।—খোলা বারান্দার ফুকুর দিয়ে গ্যালারীর চোঙে ভিতর দিয়ে হু হু বাতাস দিচ্ছে।—আর গান গাইছে—'সকালে ধরানো আগে মুকুল ঝরানো বিকাল বেলা'!

মী-কেয়ো বসলো বাইরে উঠোনে একটি কুয়ার পাড়ে। ড্রাইভার এ ছত্রধর আগেভাগে বেতের চাটাই বিছিয়ে রেখেছিলো। পাতার থালা, পাত বাটী, পাতার গেলাস। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সদ্য সদ্য গড়া। পাত

রালে এক ফোঁটা জল বাইরে পড়বে না। দিলো ডুমুর কাঁচকলার ঝোল। শামুকের পাৎলা,—ঐ ঝোলই বলবো। গরম ভাত। আমি অবাক।—

এ সব এরা করলো কখন ?

এরা করবে কেন ? বাইরের বেসাতিনীদের বলে করিয়ে আনলো।

খেয়ে উঠে গেলাম একটু উঁচু বারান্দায়। তেমনি চাটাই, পাখা। বালিশের বদলি দুটি সারং জড়িয়ে রাখা।—আমি শুতে চাইছিলাম না। কিন্তু কঠিন আদেশ। একটি সর্তে রাজী হলাম। পাখার প্রয়োজন হলে আমিই চালাবো। ভীষণ ঘাম। গরম ভ্যাপসা। পাথরের তাত উঠছে। যাত্রীরা বাস উড়িয়ে চলে গেছে। আমি বললাম, কৈ গান শোনালে না ?

শুনবে ? ভোর রাতের গান।

দিনেই তো গাইলে।

সুরটা বড় ভালো। দিনের বুকেও আঁচড় কাটে।—নাম জানি না। সুর জানি। যেমন গান জানি না গাই।

গানটা শোনালো। পরে অনুবাদ করে দিলো।—

দাও গো দাও তোমার অরুণ বরণ রথে
কিরণ জুড়ে দাও।
ছুটে এসো, এসো ত্বরা,
দূর করে ঐ তামসের কুহেলি,
খুলে ফেলে তোমার বুকের বসন,
নিয়ে এসো তোমার কলস ভরা স্নেহ ;
ছড়িয়ে দাও পৃথিবীর তৃষার পরে
শান্তি পাক বনস্থলী।
ওগো এসো ত্বরা,
দুটি পাখার ভরে আকাশ ভরে দাও
ভরে দাও এ-মন, এ-পৃথিবী
রসে, রংয়ে, গানে।
শান্তি পাক বনস্থলী।—

চিনতে পারি না গান। মী-কেয়ো এবার একটু বেশী হাসে। বলে, শুনেছি তা এ বেদের বাণী। বেদ গাওনা তোমরা ?

গাইতাম যখন তোমরা গাইতে না। এখন বেদ তোমাদের কণ্ঠ পেয়ে আমাদের ভুলেছে। আর কোথাও যেতে চায় না।

(পরে সন্ধান করে জেনেছিলাম এটি সামবেদের উত্তরার্চিকের একটি মন্ত্র—

এষো ঊষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিব ইত্যাদি মন্ত্রের আভাস)। ঋগ্বেদের দু
সূক্তও এই সূত্রে বারবার মনে হয়েছে)।

গুন গুন করে মন গায়—

হে অতীত,
শান্তি তুমি নির্বাণ বাতির
অন্ধকারে,
সুখ দুঃখ নিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
রচিতেছ আখ্যায়িকা!

* * *

মন্দিরটি নগরের মধ্যমণি। মন্দিরটির চূড়া নগরের পরমস্পর্দ্ধিত চূড়া
অসংখ্য চূড়া। প্রতিটির চারদিকে বিশাল মুখ। খাড়া আছে কেবল গাঁথুনী
পারিপাট্যে। শিকড় লতার নৃশংস অবাধ আক্রমণ সত্ত্বেও টিঁকে আছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছি প্রাচীরের কাজ। অবাক হয়ে আছি বায়নে
নাগপাশ দেখে। হঠাৎ মী-কেয়ো বললে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা য়োরোপ থেকে এসে বলে
আমাদের এ ছন্দ নাকি মেক্সিকোর তিয়োকাল্লী থেকে পাওয়া। বলে আর হাসে।

মেক্সিকো? সে তো ঠাস পাথর মাটির পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি গাঁথা
তার ওপরে মন্দির। মেক্সিকোর সাথে এর গদাই লস্করী মিল থাকলেও এ-সৃষ্টি
বৈচিত্র্য, পরিমাণে নেই, বিশালতায়ও নেই। এ সৃষ্টির গৌরব এর সূ
অনুভূতি।

আঙ্কোর থোমের বাহির প্রাচীরের সঠিক মাপ প্রায় দুই মাইল (৩৩০০ গজ)
চারদিকে এক মাপের চার প্রাচীর। সুতরাং এ নগরের মধ্যমণি বায়নে মে
থেকেই প্রবেশ করি পাকা এক মাইলের দীর্ঘ প্রশস্ত পথ। পথ পার হয়ে যা
প্রাচীর সংলগ্ন পরিখার ওপর দিয়ে।—এ পরিখা শত্রুকে মনে রেখে গড়া নয়
প্রজার প্রয়োজন মনে রেখে গড়া। তিনশো ফুট চওড়া, ষাট ফুট গভীর আ
৩৫০০ ফুট লম্বা! একি পরিখা? বড় বড় নদীও এ মাপের নয়।

এর বাইরে এ ছাড়া ঐ 'ব্যারে' (পুকুর-ঝিল)। পূবে এক পশ্চিমে এক
বিশাল নগরীর জল যোগাতো। তুমি যেখানে বসে কথা বলছো এটা তো উত্ত
পশ্চিমের সমচতুষ্কোণ তল্লাট। এমনি আরও তিনটি সমচতুষ্কোণ এক ব
মাইলের প্রাঙ্গণ আছে। মাঝে বায়নের স্মৃতি সৌধ। বা মন্দির। এ নি
মতভেদ আছে।

পূর্ত এবং জলসেচ কাম্বোডিয়ার প্রাণ সম্পদ। ওরা সব এই জলে কিছু কিছু সব্জী, পানফল, মুথা,—ছাড়াও মুলো-গাজরের মতো ফসল ফলায়। পথও খুব ভালো নেই। অবশ্য জীপের কথা আলাদা। সব পথই ভালো। কিন্তু জীপের চাপে অসাবধানে কিছু নষ্টও হতে পারে। নৈলে এ পূবের প্রাচীরের সঙ্গে সমরেখায় সীয়েম-রীপ বয়ে যাচ্ছে। তার কোলে কটি গ্রাম। তারা, ধরে নাও, এই ভগ্নস্তূপের ক্যাম্প-ফলোয়ার্স।

কিন্তু আমি যে ওদের দেখবো।

যাবো। যদি এদিকটায় শেষ করতে পারি, ওদিকটায় আজ সেই আসল নাচ হবে। ওখানে তোমার খাবার কথাও আছে। নেমন্তন গো, ব্রাহ্মণ দেবতা। অবশ্য রক্তামাশার রুগীর নেমন্তন্ন। নিশ্চিন্ত থাকো।

খুবই তৃপ্ত হলাম শুনে।

* * *

জীপ নিয়ে এলো পশ্চিম গেট দিয়ে। এ দিকে কিন্তু দুটি গেট পাশাপাশি। অন্য সব দিকে এক-একটি গেট।—গেটের পরেই সেই বিশ্ববিখ্যাত নাগ-রেলিং। সে নাগের ফণা বিচিত্র। প্রায় সুন্দর বলতে ইচ্ছা করে।

নাগও সুন্দর হয়। এই সূত্রে মনে পড়ছে দুটি চিত্র। দুটিই থাইল্যাণ্ডের প্রাচীর চিত্র। একটি শেষ নাগের। লক্ষ্মী-নারায়ণ শেষ শয্যায় শয়ান। দুজনেই আনন্দে মগ্ন। আর (গুরুজনের লীলা ললাম বিলাস মূর্তি দর্শনে) পরম লজ্জিত শেষ তার নানা ফণার নানা ভঙ্গীতে নিজের বিব্রত অবস্থায় চঞ্চল। দ্বিতীয়টিও থাইল্যাণ্ডেই। বসুদেবের মাথায় ছাতা হয়ে বাসুকী। বালক শ্রীকৃষ্ণকে ঢেকে বাসুকীর সেই তন্ময় আনন্দের দোলা! কোথায় তার বিষ, কোথায় তার ভয়ানকতা।

এখানে এ সাপ সমুদ্র মন্থনের রজ্জু। পুরাণকে একটু প্রশস্ত করে চারটি সেতুর ওপরে চারটি সাপ। পশ্চিমে এবং উত্তরে সাপের মাথার দিক। দু ধারে দুটি সাপ। এক একটির 'সহস্র' ফণার বাহার অপূর্ব। —পূর্বে ও দক্ষিণে সেই সাপেরই লেজের দিক। মাঝে বায়নকে তারা বেড় দিয়েছে। শুধু এই পরিকল্পনাটির বিস্তার দেখার জন্যই বায়নে আসা সার্থক।

পূবের গেট (সব দিকের গেটই দুটো। একটা শহরের পাঁচিল : একটা বায়নের পাঁচিল) পেরিয়ে দ্বিতীয় গেটে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম :—ছাদ ঢালু, কুঁড়ের ভঙ্গী। কিন্তু ছ-সাত ধাপ সাজানো সিঁড়ি পেরিয়ে বেদী। মুখেই দুই সিংহ। আর তার পিছে দ্বারপাল। মানুষের মাপেরও বড়ো। এ পর্যন্ত সাপের লেজ মন্দিরকে বেড় দিয়ে এসেছে। গেটের মাথা ত্রিকোণে ফুলের মালঞ্চের বেড়ের মধ্যে রাম ও রাবণের তুলক্লাম দ্বৈরথ। রামের ঘোড়া

লাফিয়ে উঠে রাবণের ঘোড়াকে কাহিল করে ছেড়েছে। ওপরে দেবতারা দেখছেন। আসল কথা এই পাথুরে শিল্পীদের পরম অবদান এই যে এরা প্রতিটি মূর্তির মাধ্যমে কথাকে রূপবন্ত এবং বিষয়-মূর্তিদের প্রাণবন্ত করেছে। গতি এবং কর্ম-প্রবণতায় প্রতিটি রেখা জীবন্ত।—

ছাতা পড়েছে বিস্তর। ভেঙেচুরে পড়ছে। জঙ্গলের গ্রাস এই ধরে ধরে। চারদিক স্যাঁৎসেঁতে, বিষণ্ণ,—বিশেষতঃ নিদারুণ জনহীনতা। কিন্তু ঠায় দাঁড়ানো মূর্তিগুলোর প্রাণপ্রবাহ অন্তহীন। যদি দুটি মন্দির পেলাম বেশ মোটামুটি দাঁড়িয়ে, চারটি দেখলাম শেকড়ে গিলছে। আঙ্কোর মানেই যেন ধ্বংস আর ধ্বংস।—

তখন হয়তো আমার রোগ আর নেই। কিন্তু দুর্বলতা তো প্রচণ্ড। সারাদিনই ঘুরছি। ঘোরায় আমি ক্লান্ত হই না। ফিরে গরম জলে স্নান; নুনের গার্গ্‌ল্‌, ম্যাসাজ এবং প্রোটিন খাওয়া এ হলে ক্লান্তি কাকে বলে আমি জানি না। প্রচুর ঘুম দরকার। সেটাই হচ্ছেনা।

রোগ আমায় ক্লান্তি দিয়েছে। পা আমার সোজা পথে চললেও ওপর নীচ করতে পারছে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে মী কেয়ো বললো ধীরে ধীরে একটা তালা ওঠো। ভিতরের বারান্দার মধ্যে বহু নন্দনীয় শিল্প, অনিন্দ্যসুন্দর তৃপ্তি তোমার অপেক্ষায় আছে। এসো, আমার হাত ধরো। ভয় নেই। দেখতে আমি যাই হই, পদস্খলনের সহকারিণী হতে পারবো না। সে বাবদে আমার চরিত্রে নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট শক্তি আছে।

একবার বাইরে দাঁড়ালাম। পর পর ছ থাক গুণলাম। নীচের থেকে ওপরে থাকের পর থাক চূড়া পাঁচ-পাঁচের পংক্তি।

কী করছ?

চূড়া গুণছি।

পাগল? গোণা সম্ভব নয় আজ। কতো ধ্বংস হয়ে গেছে। গাছের শেকড় গিলে ফেলেছে। মধ্যমণিটি দেখো। শিখর নেই। গুণতে পারো কতো মুখ ঐ মাঝেরটাতে? চারিদিকে দৃষ্টি ও মুখের। মানুষ বলেছে ও চতুর্মুখ শিব; বলেছে চতুর্মুখ ব্রহ্মার; আমরা জানি রাজা যশোবর্মণের কীর্তিস্তম্ভ সম্রাট জয়বর্মণ করে গেছেন·· আবার এও বলে লোকে যে সম্রাট নিজেই ছিলেন গৌতম বুদ্ধের অবতার। তাঁর মুখে গৌতম বুদ্ধেরই আবেশ। এ কীর্তি তাঁরই স্মারক। এর গর্ভগৃহে তাঁরই অস্থি।

থেমে যায় মী-কেয়ো। হতাশ স্বরে বলে, সব ফুরিয়ে গেছে। ওই অরণ্যের ঝরা পাতার ভাষা পড়া সহজ। এ পাথরগুলোর ভাষা ভুলে গেছি, ভুলে গেছি।

অতি ধীরে ধীরে মী-কেয়োর সাহায্যে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। া উঠলে বড়ই ভুল করতাম। বরুণ কোণেই নিয়ে এলো। এককালে ঢাকা াদ ছিলো। খসে গেছে। দেয়ালে আলো পড়েছে। সমগ্র দেয়াল ভরা াজ। চার দিকের চার দেয়ালে। সবই কথা, কথিকা, সমাজ, ইতিহাস, বৌদ্ধ, হিন্দু, তন্ত্র। স্পানিশ এবং লাতিন আমেরিকার চার্চে যে সব পঙ্খের কাজের প্রাচুর্য তার মধ্যে নিপুণতা খুব, কিন্তু বিষয় প্রায় নেই। সৌষ্ঠব হারিয়ে গেছে প্রাচুর্যের অরণ্যে। এ তা নয়। প্রতিটি ছবি কথা-মুখর, একক. ম্পূর্ণ। অথচ পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন দর্শকের স্মৃতি চারণে সাহায্য করার আশা বুকে নিয়ে। সাধু, রাজা, অপ্সরী;—পশু, পাখি, ালগু; সহজ জীবন, গ্রামীণ জীবন, যুদ্ধ; বুদ্ধ. শিব, দেবাসুর সংগ্রাম, হিষ মর্দিনী, ত্রিপুর বিনাশ কী নেই? প্রচণ্ড সংগ্রামে উদ্যত-মুষল সেনাপতি, ঙ্গে সৈন্যদল ঢালে বল্লমে শিরস্ত্রাণে সুরক্ষিত। এরা চলেছে কখনও দুরারোহ পর্বত অতিক্রম করে, কখনও বিশাল নৌকায়, সারি সারি দাঁড়ীদের দুরপাল্লার বৈঠার জোরে। আবার নৃত্যপরা সুসজ্জিতা গান্ধর্বী। অপ্সরাকুল কমলদল বিহারিণী হয়েও ছন্দে মাতোয়ারা। এরই মধ্যে একটা বারান্দার প্রত্যন্তে বুদ্ধ সমাসীন,—বলে মুচলিঙ্গ বুদ্ধ। শেষ-শায়ী বিষ্ণুর মতো শেষের আসনে বসে বুদ্ধ. শেষের ফণার আশ্রয়ে। শুদ্ধ. চমৎকার মূর্তি, কিন্তু জলে ঝড়ে প্রখর সূর্যতাপে সর্বাঙ্গে ছাতা. ভেলভেটের মতো শাদ্বল শৈবাল। এক কোণে হঠাৎ দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কুলাঙ্গী আলো করে সারং পরা এক নর্তকী। া, সেকালে বক্ষ কেউ ঢাকতো না। মী-কেয়োর ভাষায় সে 'অসভ্যতা' এ কালেই চালু হয়েছে। ৭০০ × ৫৫০ × ১৭ ফুটের এই বারান্দাগুলোতে স্থপতিরা অবকাশও যতো প্রচুর পেয়েছেন, কারিগরীও ততো ফুটিয়েছেন।

নেমে আসছি। ধীরে ধীরে মী-কেয়ো বলে, পেলে কিছু মেক্সিকান? আজতেক? তিয়োকাল্লীর কোনো ঢং? তুমি তো ভবঘুরে।

কিছু-না। মেক্সিকো এবং আজতেক সংস্কৃতি মোটামুটি আমার অজানা নয়। কিন্তু সেখানে এক এই বিশালতা ছাড়া তেমন কিছু মিল পাচ্ছি কই? নাঃ, এ অনন্য। স্বপ্রতিভ।

সে নয় যাক্। কিন্তু হিন্দু? ভারতীয়? তার কী পেলে?

সেটা ভাবতে হয়। মূল বক্তব্য এক তো বটেই। কিন্তু আফ্রিকায় যীশু-মেরী হয়ে আছেন কালো মায়ের কালো ছেলে; চীনে থ্যাবড়া গোল-গাল মায়ের ট্যেরা চাউনী, চ্যাপ্টা নাক সত্ত্বেও কোলে সেই মঙ্গোলীয়ন যীশু। সে হিসেবে হিন্দু এর সবই। তবুও কোথায় যেন এটা শৈলেন্দ্র, পল্লব, গঙ্গা বা চোল থেকে আলাদা। এটাও সত্য।

পল্লব ? তারা কারা ?···বলে হাসে মী-কেয়ো। হিন্দুস্তানের ইতিহ
মজাদার ইতিহাস।

জানি না। জানি তো উড়িষ্যার পল্লবদের। এবং জানি এই পল্ল
শক—গ্রীক—পার্থিয়ানদের বংশ। এও জানি আফগানিস্তান থেকে মথু
উড়িষ্যা এবং আরও দক্ষিণে এরা বার বার যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তা
চেষ্টা করেছে। মাদ্রাজের কাছে মামাল্লাপুরমে পল্লব শিল্প বিখ্যাত।
কথায় এরা ভারতে ফরেন ইম্মীগ্রান্ট্স্, তবে ন্যাশনালাইজ্ড্। যেমন য়ু-এস-এ
আইরিশরা।

* * *

মনে পড়ে কী পারস্যে পল্হবেরা থাকতো ? পারস্যের সম্রাট 'পহ্লবী'
'অল্হবী' ? মনে পড়ছে ? মনে পড়ে মিশরের পিরামিড ? কার্ণাকে
মন্দির ? জগদ্দল মনুষ্যমূর্তি ? মনে পরে ইরাণের জীগারাৎ ? সেই পার
মিশর থেকে এ তল্লাটে আসতে আসতে পল্লবদের বহু বছর কেটে গেছে। বহ
শতাব্দী। তার মধ্যে গ্রীকদের বেশ মেলামেশা হয়েছে ইরাণীয়দের সঙ্গে
পার্থিয়ান বংশবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে পল্লবদের মধ্যে ইরাণ—গ্রীক—কুশান স
মিশে গেছে। পারস্যে জিগারে মনে পড়ে ? পহ্লবী জিগারেৎ আর পল্ল
গোপুরম্ ? মিল দেখতে পাও কিছু ?

আরও মনে করাবো তোমায়। প্রাচীন মিশরীয়দের সমাধি মন্দিরের না
ছিলো ক্ষ্মীশ্। জাতি হিসাবে তারাও ছিলো ক্ষ্মের। তারাও রাজাকে দেবতা
প্রতিভূ বলতো। কাম্বোজ দেশটা আজ এখানে ; কিন্তু রামায়ণে মহাভার
তাকে পাবে আফগানীস্তানে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ক্ষ্মের এ দেশে 'এসেছে'
তারা এখানকার নয়। সে আমি নই। আমি বন্য।

স্থপতিরা এই ক্ষ্মের বাস্তু নির্মাণ পদ্ধতি এবং মিশরীয় পদ্ধতির মধ্যে বহ
মিল দেখে থাকেন। কাজেই নীল নদের কারিগরী পারস্য-ভারত বয়ে এখা
আসার একটা সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না, তা-নয়। এর মধ্যে ভারতে
দান যা আছে তা তার ধর্ম, নীতি, সমাজ এবং বোধ হয় পোষাক।—সেটা অব
জল হাওয়ার দানও হতে পারে। রূপটা ক্ষ্মের ঠিকই, প্রাণটা ভারতের। তোমা
না পেলে এক সঙ্গে এতো জানতে পেতাম কি ? আমিই তো মিশেল ক্ষ্মে
মিশেলের ইতিহাস আমি জানবো বিচিত্র কী ? জানি বা বলি, এটা খুব আশ্চ
নয়। আশ্চর্য তুমি। অতি আশ্চর্য। এসেই তাঁকে পেলে যাকে পে
আমরা হিমশিম খেয়ে যাই। তার পরেই ঠিক সেই মানুষটি তোমায় আপ
করলেন যাঁর একটু স্পর্শ আমরা সারা বছর ধরে কামনা করি। কী ব
দিলেন জানো ? সত্যিই আশ্চর্য তুমি।

কী করে জানবো ?

বললেন, লোকটি আশীর্বাদপুত।—লোকটি মানুষকে সত্যিই ভালোবাসে : নৈলে যার সঙ্গে এসেছে, সে সঙ্গ দিতোনা। ওকে যত্ন কোরো। তাই করছি। I'm under orders ! নতুন মানে কোরোনা।

তাই তোমায় আজ আনন্দ দেবো, এমন আনন্দ যা তুমি যাবজ্জীবন মনে রাখবে। এ আনন্দে বয়স বাধা নয়, সহায়ক ; রিপু অন্তরায় নয়, উদ্দীপক।

* * *

সে সন্ধ্যায় আমি যে কোথায় এলাম জানিনা। তবে বোঝা যায় যে সাঁয়েন-রীপের ধারে। চার ধারে চালাঘরের চক্র। মাঝটায় পোড়া টালী ছাওয়া খানিক জায়গা। জীপ এই পর্যন্ত। মাইল খানেক জঙ্গল ; তারপর লোকালয়। সীমান্তে একটি দীন চৈত্য। চালাগুলো মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে। জল, সাপ থেকে বাঁচবে।

এখানেই খেয়ে নিলাম।

প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু মী-কেয়ো যতটুকু দিলো তার বেশী খাওয়া যাবে না। যে পানীয়টা দিলো সেটা জারক। গন্ধটা কাঁজীর মতো। বুঝলাম মাদক। ইতস্ততঃ করতেই কানের কাছে মুখ এনে বললো খেয়ে নাও। ওষুধ :—কাল তোমায় বহু পরিশ্রম করতে হবে। নেশা লাগানো আনন্দের ভোগ চড়ানো ! ভয় কি ?

মী কেয়োর আদেশে 'নার্স'-রা পায়ে একটা ওষুধ মালিশ করছিলো। সেই অবসরে যে নাচটা হবে মী কেয়ো সেটা বোঝাচ্ছিলো। ...অরণ্যে বসন্তের পর নামবে দারুণ গ্রীষ্ম, তারপরেই বর্ষা। সে বর্ষা মেদুর নয়। তার বন্য রূপ দেখবে। সে নাচ নকল বন্য নয় ; আসল। যাদের দেখেছো দ্যালে পাথরের স্তব্ধতা, তারাই মানুষ হয়ে নাচবে।

ঘণ্টাখানেক একটু বিশ্রাম করতে না করতে বাঁধানো জায়গা লোকে ভরে গেলো। বনের মাঝে ঐ পঞ্চাশ ষাট জনকেই বহু লোক মনে হোলো।

সারি সারি তেলের বড়ো বড়ো প্রদীপ অন্ততঃ গোটা দশ বারো। গাছের গায়ে গোঁজা আঠার মশাল। ধীরে ধীরে বাজনা আরম্ভ হোলো। খুব মৃদু, খুব ধীর লয়ে যেন বাতাসেরই অঙ্গ। একটা সুন্দর গন্ধ বাতাসে। মশালের আর প্রচণ্ড ধূপের ধোঁয়ার দৌরাত্ম্য থাকলে এ গন্ধের আশেপাশেও ঘেঁষা যেতো না।

চাঁদের আলোর তলায় ধোঁয়ার পর্দার মধ্যে সে নাচের উপস্থাপনা আজো আমার মনকে ভাবায়। বসন্তের কতো আভরণ, কতো সজ্জা, কতো সুকুমার শৃঙ্গার ভঙ্গী। ফুল চাইছে ভ্রমর ; ভ্রমর চাইছে মধু ; মধু হতে চায় ফলের মাধুরী ; কুমারীর বক্ষ ভরে ওঠে মাতৃত্বের রসে।

সে ফল শেষ হয়। কঠোর দুর্বার দাহ নিয়ে আসে গ্রীষ্ম। নির্মম, ক্রুর, পিপাসা জর্জর। সব নাচ লয় পেয়ে যায় এক উদ্দণ্ড অকরুণ নিষ্প্রভতায় !

বনের অঙ্গে বাস থাকে না। সব পাতা যেন পুড়ে যায়। কে যেন আগুন ধরায় বসনে ; নির্লজ্জ বন শুধু শাখা কাণ্ডের বিস্তার নিয়ে দোলে, গায়ে লাগা ফলগুলির দু চারটে দোল খায়। কিন্তু তাদের শিকড় থেকে শিখর পর্যন্ত কেবল তৃষ্ণা, তৃষ্ণা।

তখন আসে মেঘ, গর্জন, অশনি, চকিত-ত্রাস, ধারাপাত, বর্ষণ, মুখর-চণ্ডের মাতন, সব ভাসানো, সব কাঁপানো অবিশ্রাম বারিপাত। বনের শাখা উপশাখা রস পানে ব্যস্ত। বনের মুক্ত দেহ, মুক্তকেশ, মুক্তমন গান গেয়ে ওঠে কেকা, দাদুরী। হাসের সাঁতার, মৃগের লম্ফন, ময়ূরের পেখম, সাপে রঙ্গভঙ্গী। বিমুক্ত মনের বিমুক্ত প্রকাশ অতিমুক্ত অবয়বে। তনু তনুতে বাঁধনহারা ! নাচে গ্রাম্যতা তেমনই মধুর, গুড়ের তপ্তরসে গ্রাম্যতা যতো মধুর ;—সদ্য মথা-নবনীতের ভাণ্ডে গ্রাম্যতা যতো মধুর। বনভরা মহুয়া, আমের বোলের গ্রাম্যতা যতো মধুর।

নাঃ ! সে রাতে আমার ঘুম হয়েছিলো। কিন্তু আমি ধন্য আমি বলতে পেরেছিলাম——মী-কেয়ো, কী আশ্চর্য নাচো তুমি ! কী অসাধারণ দীপ্তি তোমার দেহে। ডাইনে বামে ছন্দ নামে নব জনমের মাঝে। তোমার মনের সচেতনতার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তোমার দেহের সজীবতার তুলনা নেই। সত্যিই পাথর সজীব হলো।

কি সজীব ? সব তো পাথর হয়েই রইলো।

কথাটার খোঁচা পরিপাক করে প্রশ্ন করি, এমন নাচ শিখলে কোথায় ?

আশ্চর্য হবে শুনলে। এই উদ্দাম নাচ। কিন্তু শিখেছি জন্মদাতা পিতার কাছে। এই নাম কাম্বোজের আসল নাচ। এ তুমি সহজে অন্য কোথাও দেখবে না।

পরদিন সকাল হোলো খুব ভোরে। কিন্তু তখন আমি একা। সকলে যে যার নিয়মিত কাজে গেছে। পাখির ডাকে কার সাধ্য ঘুমোয়। আমি আমার সিল্কের বিছানায় ফিরে গিয়ে আবার শুলাম। উঠেছি বেলা আটটা। নদী বা পুকুরে স্নান চললো না। বারণ। ঈষৎ উষ্ণ জলে ঘরের পাশেই স্নান সারলুম।

বাইরে বসতে না বসতেই প্রাতরাশ। ওষুধ।

এবং ঠিক যেন নাটকের সীনের মতো রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো নতুন সজ্জায় মী-কেয়ো। নীল-সবুজের খেলার ওপরে কালো রংয়ের বাতিকের কাজ। ঝলমল করছে সিল্কের চমক। বাহুবন্ধে তাগার সঙ্গে ঝুমকো। হাতে কাঁকন ছাড়াও বড় থেকে ছোট হারে একসার চুড়ি হাতির দাঁতে সোনা বাঁধানো। কানে লম্বা দুল। সবার চেয়ে মনোহর মাথায় আঁট করে বাঁধা আলতো খোঁপার পাড়ে একটি ডালে ধরা চারটি ক্রীসেনন্থিমাম। এই সূর্য-ধোয়া ফুলটির

াঁটা ঘিরে গোল বেড় দেওয়া অপরাজিতার একটি মালা জড়ানো। অপূর্ব ৃষ্টি বৈচিত্র্যে কবরীটি যেন মুকুট হয়ে গেছে।

তা যাক। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি পরিপাক করার চেষ্টা রেছি যে এই গৌরবিনীই কাল রাত্রের বিজয়িনী ছিলো। এই সজ্জায় যা এতো ুন্দর তা-ই সজ্জাহীনের সুন্দরতায় মোহিনী মায়া বিস্তার করেছিলো নুভূতির চূড়ান্তে? প্রাতঃঅপি অবনতমুখী ইয়ং সা, বর্ণন করেছেন াতবাহন হাল। একী সত্য? সত্য কী এতো বিস্ময় নিয়ে আসে? মনে ড়লো, সেই কথা, এ পথ ভণ্ডের নয়, অসমসাহসীর।

প্রশ্ন করা চলেনা। 'অ্যাবস্ট্রাকট্'-এর জগতে 'কী' 'কেন' নেই। যা ুব 'পজিটিভ' তার মধ্যে সমস্যা থাকলেও প্রশ্নের স্থান নেই। অসমাধানের হস্যালোকই তো জীবনের অলকাপুরী। এ জীবন থেকে 'মিস্ট্রি', রহস্যালোক অন্তর্হিত হলে বড়ো পানসে হয়ে যাবে জীবন।

কী দেখছো অতো করে? সাজ যে দেখছোনা তা চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।

বলতে গেলে কবির কথায় বলা যায়। তা আবার তুমি বুঝবে না। অন্য ভাষায় তোমায় বোঝানো যায় না।

বলো। পরে বুঝিয়ে দিও।

'যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর।'

বলেই হাত বাড়িয়ে দিই। চলো। কোথায় যাবো?

কোথায় যাবো?

কোনো কেলিকুঞ্জে নয়। মাত্র আঙ্কোর ওয়াৎ। নগর-বাটিকা। আশ্রমপুর। ঐ অর্থই হয়। কী হোলো? যাবেনা? আমায় লজ্জা দিওনা। একটু পরিহাস কর্লাম মাত্র। দ্বিতীয় সূর্যবর্মন আরম্ভ করেন, শেষ করেন, তার পৌত্র দ্বিতীয়—ধরণীন্দ্র বর্মন। 'বর্মন' পদবীটি পহ্লবীদের চিহ্ন ছিলো।

প্রায় ৭৮ বছর লেগেছিলো আঙ্কোর ওয়াৎ তৈরী হতে। বাফুয়ন, আঙ্কোর থোম হবার ১০০ বছর আগে আঙ্কোর ওয়াৎ হয়ে গেছে। এবং আঙ্কোর ওয়াৎ না হলে আঙ্কোর থোমের জন্য অমন তৈরী একটা মডেল পেতো না। এ কথা আঙ্কোর ওয়াতে এলে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মন ছিলেন বিষ্ণুভক্ত।—ভক্তি ছিলো রামায়ণে, মহাভারতে। চারুভাষী সভাসদরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতো। বলতো পরম বিষ্ণু, পরম বৈষ্ণব। কাজেই তাঁর জন্য একটি বৈকুণ্ঠও দরকার। সেই পরমবিষ্ণু লোকের প্রতিরূপ আঙ্কোর ওয়াৎ। মর্ত্যে বৈকুণ্ঠ! বৈকুণ্ঠের মতো অপ্সরায়

দেবতায়, ঋষি, যক্ষ, নাগে ভর্তি আঙ্কোর ওয়াৎ। প্রাচুর্য এবং পীবরতা, শিল্প এবং সাধনা, স্থাপত্য এবং শৈলী একাধারে।

সেই সমুদ্র মন্থন। সেই নাগ-রজ্জু। এবং সমুদ্র মন্থনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লক্ষ্মী, পদ্মালয়া লক্ষ্মী, সারা আঙ্কোর ওয়াৎকে প্রভাবিত করে রেখেছে। আঙ্কোর ওয়াৎ কেন আঙ্কোর-ভুক্তি পুরোটাতেই পদ্ম, লক্ষ্মী, নাগ আর অপ্সরা।

তা বলে এর সবটাই আর হিন্দু নেই। সপ্তম জয়বর্মণের সময়ে এই আঙ্কোরেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অনেক ভাষা শিলায়িত রূপ নিয়েছে।—অনেক শিলা হয়েছে জীবনের ভাষ্য, মরণের সান্ত্বনা।

আঙ্কোর ওয়াতেও সেই পরিখা, সেই দেয়াল, সেই সেতু। সেই জলাশয়, সেই অজস্র শিখর মণ্ডিত সমৃদ্ধি। বায়নের মতোই সমচতুষ্কোণ প্রথায় মধ্য শিখর ঘিরে নির্মিত। সমচতুষ্কোণ প্রাসাদের প্রবেশ পথেও সেই চারটি নাগ-চিহ্নিত অপরূপ সেতু। রীতিমত বাঁধানো। প্রভেদ কেবল প্রবেশ দ্বারের তোরণ অলংকৃতিতে। তিনটি আকাশের দিকে ধাওয়া ছন্দোময় শিখর। মাঝেরটি বড়ো : নদীর ওপর থেকে সেই এক মাইল ব্যাপী প্রাচীরের দৃশ্য দেখে মনে হয় মানুষ তার স্বপ্ন সাধ, তার সৃজনী প্রতিভা, তার দুঃসাহসের শক্তির কাছে কতো ছোটো! সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য দেখলাম। য়োরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ এবং গির্জা দেখলাম। কিন্তু এমন কল্পনাতীত মহিমা, এই মহতো মহীয়ান সাধন কোথাও দেখিনি। বিশাল এর আয়তন ; দিগন্ত প্রসারিত এর বাহু ; আকাশ ছোঁয়া এর প্রতিভা।···আজ ধ্বংসের মুখে।

প্রথম প্রাচীরের বাইরে জীপ থামলো। পঁচিশ ফুট গভীর ২০০ গজ চওড়া পরিখার বাইরের চারধারের বেড় সাড়ে বারো মাইল। অথচ দেখতে গেলে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। ছাতা, জল, খাবার অবশ্য সঙ্গে। আমরা যথেষ্ট ভোরেই বার হয়েছি তাই এখনও পর্যটক, ভিক্ষুক বা বেসাতীদের দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুধু যারা ফুল নিয়ে বসে, তারা কেউ কেউ এসেছে।—কিন্তু সবটা ঘুরে দেখার সত্যি কোনো অর্থ হয় না।

পদে পদে বাসুকী নাগের সেই গাত্র পীড়ন। দেবরাও টানছে, অসুররাও টানছে। সেতুটি সত্তর ফুট চওড়া। পাথরে বাঁধানো। জমি থেকে ধাপে ধাপে বেদী উঁচু হয়ে গেছে। তার ওপর গোপুরম্ ৩টি। মধ্যেরটিই বড়ো।—

হাঁটতে কষ্ট একটুও হচ্ছে না, কিন্তু উঠায়-নামায় হচ্ছে। কিন্তু দুধার থেকে দুজনে আমার দুহাত ধরে থাকছে। এমনি চারটি থাক পার হবার পর বৃহৎ এক প্রাচীর। এ প্রাচীরটি একটি আধা ঢাকা দেওয়া বারান্দা। আসলে এটি একটি গভীর ঘেরাও পরিক্রমা। পরিক্রমা প্রতি তালায়। তাই প্রতি তালায় ঢাকা দেয়াল পাওয়া গেছে ; কাজেই খোদাই চিত্র হতে পেরেছে অজস্র। এই থাকটির নাম

মরাবতী ! এরও ওপরে আর এক তলা। সে আর এক থাক। এবং সেটিই কুণ্ঠ ; বিষ্ণুলোক ; 'পরম বিষ্ণুলোক'—বলে ক্মেররা। এই ছন্দটি আমায় মনে রিয়ে দেয় ইল্লোরার কৈলাস মন্দিরের মধ্যমণির ওপরের তলা, এবং তিনধারের রিক্রমা। সে পরিক্রমার দেয়ালেও খোদাই শিল্প।

মোটামুটি গড়ন এই। কিন্তু স্থাপত্যের গড়নে এই আশ্চর্য বৃহত্তা যতোই স্ময়কর হোক ভারতীয়দের চোখে মনে হয়,—'চিনি উহারে'।

তার কারণ আঙ্কোর ওয়াতের গোপুরম্ অর্থাৎ শিখরগুলো বার বার কাঞ্চী, নাক্ষী, থিরুভান্নামালাঈয়ের গোপুরম্গুলির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। তবু ফাৎ আছে। তফাৎ এই যে ভারতীয় গোপুরম্ জমি থেকেই খাড়া। এ নয়। খানিকটা বেদী করে উঁচু করে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তার ওপরে কটি নয়, এক সারিতে তিনটি শিখর। গোপুরমের গঠনও শিখরের মতো। র সজ্জাও স্থাপত্য শৈলীর আদর্শ। সমচতুষ্কোণ মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু রে কমলকলির মতো ছুঁচলো করে নেওয়া। দেশের কোনো গোপুরমই মচতুষ্কোণ নয়। সে হিসেবে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির একক।

প্রথম প্রাচীর এবং প্রথম পরিখা পার হয়ে যাওয়া গেলো জীপে। জীপ সে থামলো দ্বিতীয় প্রাচীরের দ্বারে। মী-কেয়ো বললো, এর ফলে চার দিকে রে দেখা সহজ হবে। জীপ ছাড়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রাচীরের আগাগোড়া মামাল্লাপুরমের কুটীর-ছাদের নক্সা। তবে াগাগোড়া ঢাকা দেড় মাইলের বারান্দা। এক দিকে থাম। একদিকে দ্যাল। ঝা যায় উৎসবে পার্বণে লক্ষ লক্ষ জনতা স্থান পেতে পারতো। এটিকে মন্দির লে ভাবলে বোকামী হবে। এক একদিকের বারান্দা দেড়-দু মাইলের কোনো ন্দিরেরই হয় না। ভিগারাৎদের মতো, দক্ষিণের মন্দির নগরীদের মতো, এটি লো প্রাসাদকে প্রাসাদ, মন্দিরকে মন্দির। এরই নাম হোলো 'মন্দির নগরী', াঙ্কোর ওয়াৎ—তা ছাড়া অত্যন্ত সুরক্ষিত নগরী। এ মন্দিরকে ভাবতে হবে াটা একটা নগরের পরিপ্রেক্ষিতে। সেকালের লণ্ডন এর মধ্যে দুটো সেঁদিয়ে তো, দিল্লী বা আগ্রাও দুটো। আজও একটি তো যাবেই।

দ্বিতীয় প্রাচীর বারান্দা পার হতে গিয়ে গুটি ত্রিশেক সিঁড়ি উঠতে এবং মতে হোলো। গম্বুজগুলির শিখর মোটামুটি ভালো আছে।—

কিন্তু তারপরে আবার পরিখা, আবার সেতু, আবার নাগের লেজ।—যতো রান্দা, যতো রেলিং সব নাগের লেজ। নাগ থেকে পরিত্রাণ নেই। ভিতরের রিখা শুখিয়ে গিয়ে মাঠ হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো গাছও আছে। তবু বড়ো ড়ো পুকুরও আছে। সেকালের জলের সাক্ষ্য। জলটি টলমলে পরিষ্কার। হু বুনো হাঁস।

এখানে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সেটি না বলে পারছি না। মাঠে
কয়েকটি মেয়ে কাজ করছিলো। ফুলের গাছের সঙ্গে আগাছা জন্মেছে
সেগুলো তুলছে। দূরে দ্যালের কোণ দেখে আবডাল রেখে দুটি মেয়ে সা
সরিয়ে দাঁড়িয়ে; যে ভাবে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্য করে অনুমান করতে বেগ পেতে হোলে
না যে সামনে দিয়ে সারংটি নিশ্চয় খোলা। সঙ্গে মী-কেয়ো। তাই খুব লক্ষ
করতেও পারছি না।—কিন্তু মী-কেয়োর অনুভূতি প্রখর। কাঁধে হাত দিে
টানলো! বললো, নতুন কিছু করছে না যে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। ওরা দূ
গ্রাম থেকে এসেছে। জঙ্গলের উপজাতি। পুরুষরাও তো দাঁড়ায়। আমর
তো দেখি না। অবাক হবার কী আছে?

খুবই অপ্রস্তুত হলাম। কিন্তু প্রশ্ন চাগিয়েছে। করি কী? বললাম
তা নয়। কিন্তু মেয়েরা এই কর্মটা দাঁড়িয়ে সমাধান করে,—অ্যানাটমীর সাহায্যে
পুরুষরা যা নিষ্পন্ন করে, সেটা অ্যানাটমির অভাবে মেয়েরা নিষ্পন্ন করতে পাে
ভাবা যায় না!

কখনও দেখোনি? সত্যি? ঠিক জানো এটা পল্লবদের সংস্কৃতি নয়
একটু সন্ধান কোরো। এখন তো প্রাচীন গ্রীস প্রাচীন রোমের জীবন ধার
সম্পর্কে খোলাখুলি বই বার হয়েছে। জীবনের ঢাক-ঢাক গুরুগুরু নেই
পড়লেই পারো। বুঝবে এটা নতুন নয় আদৌ, অসংস্কৃতও নয়। পল্লবরা যে
প্রথায় জীবন যাপন করেনি, ঠিক জানো?

পল্লব? মনে করার চেষ্টা করি। থই পাই না। এখন মনে করতে দ
একটা ছবি মনে ভাসছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর প্যারিসের কথা। পথে পাে
রং করা টিনের আবডাল থাকতো দেখেছি। মেয়ে পুরুষ আলাদাও নয়
কাজেই সবাই দাঁড়িয়ে। গুরুবল যে একটি অমন টিনের আশ্রয়ে এক কালী
মাত্র একজনই যেতে পারতো। কিন্তু সেটা হয়তো আপৎকাল। আর প্যারিে
ও বাবদে সবই সম্ভব। (এই সেদিনে বোদেঁরির পথেও এ বিভ্রমের সঙ্গে সাক্ষা
হয়েছে)।

কিন্তু এখানে এ প্রথাটার নাম পশ্চিমী প্রথা। ভাবতাম ভারতীয় নাকি।

হতে পারে। জানি না। কোথাও কখনও দেখিনি, শুনিও-নি।

হতে পারে জানো না? হেসে উঠলো মী কেয়ো! সে কি? ভারে
মেয়েরা এ সাধন দাঁড়িয়ে মেটায়? ভাবতে পারো?

না, তা বলছি না। কিন্তু মহাভারতে যখন কর্ণ এবং শল্যে দারুণ ঝগড়
চলছে তখন কর্ণ শল্যকে নানান গালের মধ্যে এক গাল দিয়েছিলেন—মদ্র দেশে
ব্যবহার সম্পর্কে। তোদের মদ্র দেশের মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে···ইত্যাদি। তা
ভাবছি দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে হয়তো কখনও এ রেয়াজ ছিলো।···সত্যি কি জানি না

এবং তুমি ভাবছো এটা এ দেশে দ্রবিড় সংস্কৃতির প্রভাব? না, তা নয়। ধনও গ্রামে, পাহাড়ে এ অভ্যাস আছে। অভ্যাস থাকলে, অভ্যস্ত হলে, এ ্রীতিকে যতো নোংরা মনে হয় সত্যি ততো নোংরা নয়।··তা ছাড়া এখানে ।াপ বিছের ভয়, ঝোপে ঝাড়ে হঠাৎ কেউ বসতে চায়ও না। মানুষের সব ।ভ্যাসই দেশের প্রকৃতির চাপে গড়া।—

দ্রবিড় সংস্কৃতির অন্য একটি ব্যবহার যে এ দেশে চালু, তা পড়েছি। সেটির ধা জিজ্ঞাসা করবো কি না ভাবছি।

ভাবছো? দেখো তো, ধরতে পারলুম কি-না। পুরুতদের ব্যাপার তো? তান্ত্রিক?

কিন্তু জিজ্ঞাস্য যেটা সেটা আধিদৈবিক কথা নয়, নিতান্ত আদিভৌতিক। কনিয়ায় মেয়েদেরও সুন্নৎ হয় জানি। সেই ধরণের প্রথার কথা।

একটু ভেবে মী-কেয়ো বললে, ওঃ! বুঝেছি। বলেই খুব হাসতে লাগলো। এতে এতো লজ্জার কী? তোমার বয়সও নবীন নয়। আমিও আর যুবতী নেই। যুবতী সেজে থাকি, সে আমার দেহ এবং মুখের দোষ।

বয়স কতো তোমার?

কতো মনে হয়?

মেয়েদের বয়স কখনও মন বলতে চায় না। আমি তিরিশকে তেরো বলতে ভালোবাসি।

তেরোকে ত্রিশ বোলো, আমায় ছুঁতে পাবে।—আমারও আর লজ্জার বয়স নেই। বিয়ে আমি করি নি। তন্ত্রেও অবশ্য এ তল্লাটে মেয়েদের মাঝে মাঝে বসতে হয়; আমি তো এদেরই। কাজেই সে তত্ত্ব আমি কিছু কিছু অভ্যাসও করেছি। কিন্তু 'আমি কুমারী' বলতে যে দেহগত আবরণের কথা নিয়ে আবডাল দিতে পারা যায়, সে আবডালও আমার নেই। এটাই সত্য।—আধুনিক কাম্বোজের নগরে বন্দরে 'শিক্ষিত'দের মধ্যে এ প্রথা কমে এলেও দেশের অন্ধকারে, নিভৃতে এ ব্যবস্থা এখনও চালু। যারা একটু ধনী মধ্যবিত্ত তারা নয় থেকে এগারোর মধ্যে কোনো মঠে গিয়ে এটা সেরে নেয়। ছেলেদের কানফুটো করা, মাথা কামিয়ে সন্ন্যাসী করার মতো, বা মুসলমানদের সুন্নৎ-এর মতো এটা একটা সহজ এবং চালু প্রথা। অন্যেরা ভেবে ভেবে এটাকে বিকার অবধি বলেছে। কী যায় আসে?

একটু আরও বলো। জানতে ইচ্ছে করে। দেশ দেখার অভিজ্ঞতায় সমাজের কথা জানার রোগ আছে আমার।

পরে বলবো। তৃতীয় প্রাচীরে উঠতে হবে। অনেকগুলো সিঁড়ি। এতেও বারান্দা! একই ধরণে। এ প্রাচীরের চার কোণে চারটে শিখর। কোথাও বিশ্রাম নিতে হবেই। তখন বলবো।

প্রাচীর পার হলাম, সেই সি'ড়ি ওঠা-নামা করে। তার পথটিও গোল ছা
ঢাকা। সামনে মাঠ পেরিয়ে আবার ঢাকা, আবার সি'ড়ি।—এবং এর প
সি'ড়িগুলো তুঙ্গ। প্রাণ সংশয় করে ওঠা। উঠছে গিয়ে সেই কুটীরে ছ
দেওয়া বারান্দায়, কিন্তু এই ঢাকা পথ লম্বা; একেবারে মাঝের সেই "বৈকু
গিয়ে থেমেছে। এ বারান্দার চার কোণে চার শিখর।—মাঝেরটিকে "মৈনা
বলা হয়। তার ওপরে স্বয়ং বিষ্ণু; মন্থনদণ্ডকে সোজা রাখার দায়িত্ব তাঁ
নীচে কূর্ম। এটাই ভেবে নিতে হবে।

ভারতের ভাস্কর্যে নারী মূর্তিরা আপন ব্যক্তিত্বেই শুধু নয় অভিব্যক্তিতে
একক, সজাগ এবং কৃতিমতী। অর্থাৎ প্রত্যেকেই এমন একটা কিছু করছে
যেটা আমাদের দেখতে হয়। এই দেখাটার ফলে একজন অন্যজনের সঙ্গে মি
নৈর্ব্যক্তিক 'দল' হয়ে যায় না। সে হিসেবে তাঁদের মানবীত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ
দেবীমূর্তিও যেন কোনো কোনো ধ্যানের কর্ম-মূর্তির অনুশাসনে অভিব্যক্তি
'মুড'-টিকে ব্যক্ত করছে। চামুণ্ডা দুর্গা নয়; সরস্বতীকে ইন্দ্রানী ব
ভুল হয় না। মামাল্লাপুরমের মহিষমর্দিনী বা হিরণ্যকশিপু বা নরসিং
পাথরের মাধ্যমে মেজাজেরই অভিব্যক্তি।

এ মন্দিরের গায়ে কিন্তু ব্যক্তি নেই, দল। ঘটনা নেই বিশেষ ভাবে, আ
পুরাণের এক একটা পরিচ্ছেদ বা কয়েকটা পরিচ্ছেদ এক সঙ্গে। ফলে দল
প্রধান। দলে থাকে ব্যক্তিত্বের অভাব। কাজেই পৃথিবীর নয় এরা। এদে
সুষমা অতীন্দ্রিয়, অজাগতিক, আত্মিক, স্পিরিচুয়্যাল। এই ইম্পার্সনালি
এবং স্পিরিচুয়ালিজমের ফলে পুরাণের পাতার পর পাতা দেয়ালের পর দেয়া
পাকা অ্যাবস্ট্রাকট হয়ে থোক্-ঠাস্, 'সলিড্' হয়ে অপেক্ষা করছে আমাদে
অনুসন্ধানী দৃষ্টির। খুঁজে বার করতে হবে; ভাষ্য করতে হবে; বলতে হবে '
যে, কর্ণ রথের চাকা টানছে; ঐ যে রাম বালিকে লক্ষ্য করেছে, ঐ যে না-ন
ও রাবণ নয়,—কালনেমী, নাকি কার্তবীর্যার্জুন?'—এমনি পদে পদে আবিষ্কারে
মজা। সময় চায় এরা। দৌড়ে চলে যেও না। দাঁড়িয়ে দেখো। দেখবা
জন্য সময় নিয়ে এসো। নিয়ে এসো ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, ভরতমুনি
ব্যাৎস্যায়ন।

এমনটা একমাত্র দেখা গেছে মোজেয়েক-এর কাজে। কিন্তু, তারও কে
মিল এর 'টেপ্স্ট্রী'র সঙ্গে। এতো বিশাল টেপস্ট্রীও সহজে মেলে না। ভিয়েন
মারিয়া থীরেসার প্রাসাদে সবচেয়ে বড়ো টেপষ্ট্রী দেখেছি,—তাও এর অর্ধেক নয়

পরিশ্রান্ত আমি। মী-কেয়ো মাদুর বিছিয়ে দিলো। ইতি—

জামাইবাবু

১৭

কল্যাণীয়াষু,

গায়ে বাতাস লাগছে। মী-কেয়ো পাখা নিয়ে পাশে বসলো। আমি বললাম যখন সময় হবে তোলা কথাটা কিন্তু শেষ করতে হবে।—

সঙ্গে সঙ্গে মী-কেয়ো শুরু করলো।

বসবে আসনে? পারবে? সাধ্য আছে? আমি রাজী। আমি কিন্তু সত্যিকার কুমারী আচ্ছাদনে ভূষিতা নই। বলেই ফিক করে হাসে। না থেমে বলে, আমার তখন বয়স দশ, দিদির বয়স বারো ছুঁই ছুঁই। কদিন ধরে বাড়িতে খুব ঘটা। আমরাই যে তার কেন্দ্র, সেটা বুঝলাম আমাদের আদর-যত্ন, প্রসাধন এবং নতুন কাপড় জামার বাড়াবাড়িতে।

দিদির একটু বয়েস হয়ে গিয়েছিলো। বারো-চোদ্দোয় এ উৎসব খুব গরীবদের ঘরে হয়। কিন্তু দিদির সমবয়সীদের অনেকেই এই বয়স পার হয়ে গিয়েছিলো। তাদের কাছে দিদি সব শুনেছে! আমায় বলেছে ভাবিস না, রক্ত পড়বে কিন্তু লাগবে না।—সত্যিই তাই। রক্ত দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু লাগে নি।

মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হোলো। পুরুত আছেন। আমার পুরুৎ ছিলো কম বয়সী। দিদির পুরুৎ ছিলো বুড়ো, আমাদের গ্রামের মান্য।—একজন পুরুতই দুজনার কৃত্য করে না। বছরে একজন পুরুৎ একবারই এ ক্রিয়া করতে পারেন। তাই নিয়ম। বছরে দুবার কুমারীর রক্তপাত একজনের পক্ষে নিষিদ্ধ।

সকালের দিকেই বাজনা বাজিয়ে প্রসেশান ক'রে মন্দিরে গেলাম। শেষ অবধি মা ছিলেন। সবাই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে খুব গান বাজনার মত হোলো। পরে মার হাত থেকে আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রমণী। আমাদের নিয়ে মন্দিরের ভেতরে, কিন্তু আকাশের তলায়, পাঁচিল ঘেরা আবডালে নতুন মাদুরে শুইয়ে দেওয়া হোলো। সারোং খানা খুলে ফেললো। ভাবলাম কী বা হবে। একটা বাঁশের পিচকিরীতে কী একটা জল নিয়ে দুই জঙ্ঘার মাঝ দিয়ে এমন ভাবে জলটা চালিয়ে দিলো যে খুব ভেতর অবধি ঠাণ্ডা অবশ হয়ে গেলো। তলপেটে কেউ যেন বরফ দিয়ে দিলো।

তারপর কাপড় পরে মন্দিরে এলাম। পুজো হোলো। আমাদেরও পুজো

হোলো। জঙ্ঘার মাঝেও পুজো হোলো। বার বার শ্রমণ সেখানে প্র
করলেন। এবং আমি এটা আজ বলতে পারি শ্রমণের চোখে তখন আমিও ন
ছিলাম না, এবং যোনিও কোনো রতিরঙ্গের ক্ষেত্র ছিলো না। সে পুজো পুজো
শক্তির পুজো। জন্ম সৃষ্টির আদি পুজো।

বরাবরই কিন্তু শ্রমণী সঙ্গে। তিনি তখন জঙ্ঘা বেশ উন্মুক্ত করে ধে
ধরলেন। যখন পুরোহিত আঙ্গুল ঢোকালেন কোনো বোধই হোলো না
আঙ্গুল বার করলেন ; দেখলাম রক্ত। আবার আমায় বাইরে আনলেন। আর
বাঁশের পিচকিরিতে এবার গরম কিছু দিয়ে ধুয়ে দিলেন।

এখন বুঝি প্রথমটা ছিলো আফিং জল। অসাড় করে দিলো ; বা অ
কিছু। দ্বিতীয়টা কোনো বিষক্রিয়া প্রতিরোধক। কিন্তু কোনো আঘাতই বুঝিনি
—একটুও কিছু মনে হয়নি।

এখনও এ প্রথা চালু আছে গভীরে গভীরে। এধারে আর নেই। বাড়ি
ফিরে সেদিন এবং পর পর তিনদিন খাওয়া দাওয়ার সাথে খুব নাচ গান। ে
মনে আছে। প্রথা প্রথা। যে জগতে সভ্যতম জাতের মধ্যেও সুন্নৎ আছে ।
জগতে প্রথা মাত্রেই সামাজিক সংগঠনের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। আমরাই অশ্লীল
দেহের একটা অঙ্গ নিয়ে খোলা-ঢাকা, বেচা-কেনার ভণ্ডামীতে পড়ে আছি।

এমন সহজ সাবলীল ভঙ্গে সব কথা বলা হোলো ; আমি একমত না হ
পারি নি।···কিন্তু কোথায় একটু কুণ্ঠা লেগে ছিলো। সব শোনা হোলো ন
অন্য কথাটা আর উজিয়ে জিগ্যেস করতে পারলাম না। সেটা বাড়াবাড়ি হোতে

খাওয়া শেষ করে উঠলাম প্রাচীর দেখতে।

সবই রিলীফ। কিন্তু অন্য ধরণের রিলীফ। বায়নের রিলীফে যথে
গোলাই দেখেছি। এ রিলীফ সে অনুপাতে অগভীর। অগভীর হলেও ।
রিলীফে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য উৎকর্ষ দেখেছি।

গভীর রিলীফে আলো পড়লে গোলাই করার সার্থকতা আলো ছায়ার প্রা
ফলনে বেশ ভোগ করা যায়। মামাল্লাপুরমের পাহাড়ের গায়ে গঙ্গাবতরণ
ব্যাপারটায় যথেষ্ট গোলাই। ঠিক সেই অনুপাতে গোলাই কিন্তু গুহার ভেতরে অ
আলোর পরিবেশে নেই,—যেমন মামাল্লাপুরমের লিঙ্গ শিবের পিছনের মূ
মহিষমর্দিনীর মূর্তি, ইল্লোরার কৈলাসনাথের গুহার (বোধহয় ১৯ নং গুহ
প্রাচীরে মিথুন মূর্তির সারি।

আঙ্কোর ওয়াৎ এর বারান্দাগুলো পরিক্রমার বারান্দা। তাই প্রায়শঃই ঢাক
এই ঢাকার তলায় দ্যাল ভীত কাজ। ছাদেও কাজ আছে, কিন্তু সে বে
অলঙ্করণ। ছাদও সব অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেড়। মূর্তিগুলোর বিশেষত্ব

lো ত্রৈমাত্রিকতায় নেই (যেমন আছে বায়নে)। তবে এর প্রচণ্ড উৎকর্ষ আঙ্গিকে, প্রযোজনায়, সংস্থাপনায়, লিপিকুশলতায়। কোথাও থমকে যায় নি ; থাও কোনো সংশোধনের চেষ্টা নেই। অনাবিল, অনর্গল, স্বভাব-প্রফুল্ল রেখার রেখায়, পল্লবিত ছন্দে, জীবনময় উৎসারে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতির দক্ষতায় ত্রজ্ঞতায়—এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

পশ্চিমের দিকের দ্যালটা ধরা যাক। এক একটা ছবির পুরো প্রসার সত্তর টরও বেশী লম্বা। উচ্চতা সতেরো ফুট। তিন স্তরে বিন্যস্ত ছবি. যদিও য়বস্তু এক। আঙ্কোর ওয়াতের সমসাময়িক সমাজের চিত্রে রাজসভা এবং রাজার ্যকর্ম। দক্ষিণ দিকে আছে স্বর্গ ও নরকের ছবি। লোকেরা মদ খেতো এবং পদের নরক ভয় করতে হোতো। বশীকরণের প্রথা খুব চালু ছিলো। এটির াব দুর্বিষহ। এর-সংসারও ভাঙ্গে। কিন্তু জবর ক'রে যে প্রেম হয় না এ মও জানো, আমিও জানি। সৌন্দর্যকে যতই বীরভোগ্য বলা হোক, প্রেম াৎকারে পাওয়া যায় না। তৃতীয়টি বড় মজার। পণ্ডিতদের স্ত্রীর প্রতি র দেওয়া স্রেফ নরকের পথ পরিষ্কার করা। পণ্ডিতরা অবশ্য অপণ্ডিতদের ার প্রতি নজর দিয়েও স্বর্গে যেতেন কিনা তা লেখা নেই। থাকলে, হয়তো পদে পড়তাম।

এ নিয়ে কথা উঠলো। মেয়েরা স্বাধীনা, অনাবৃতা। বেশ ; কিন্তু তাদের ড় ছিলো কতটা ? কেমন করে কথাটা উঠেছিলো মনে নেই। কিন্তু উঠে লো। আমি কোথাও পড়েছিলাম শঙ্খদ্বীপের মেয়েদের দু-চার রাতও যদি রুষ ছাড়া হয়ে শুতে হোতো তারা আর্তনাদ করতো আকাশ ছোঁয়া—এভাবে রাত কাটানো যায় ? আরও পড়েছিলাম যে যত্র তত্র দিনে রাতে ঐ বিলাসটি লে তাদের 'না' বলার কোনো কথাই উঠতো না। আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে সপ্তাহের মধ্যেই নাকি প্রসূতির উক্ত বিলাসের তাগাদা এসেছে। অবশ্য া কথা। পরখ করা তো যায় না। আমার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসাও করা র নি। কিন্তু তিনি নিজেই যা বললেন অনেকটা বোঝা গেলো।

যখন চীনদের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হোলো, এ দেশের য়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিলো। ওদের দেশে যে তো ধরকাট এ বিষয়ে তা কারুর অজানা নয়। চীনের সমাজ মুসলমানী ভারতের াজের মতো এক চাকার গাড়ি।—মেয়েরা অচল চাকা। স্পেয়ার হুইল হিসেবে নেক ক'টা থাকলেও, সমাজে চালু নয় কোনোটা। চীনী মেয়েরা কখনও সমান র সইলোনা, বইলোনা। কাজেই এদেশের নারী প্রাধান্য চীনের কলমকে বিষে র দিলো। তাই ওরা যা-তা লিখতো। লিখে, ওদের মেয়েদের দাবিয়ে খতো।

আসলে কাম্বোজে বংশবৃদ্ধি বেশী। খাদ্য, আবহাওয়া, এবং নিশ্চিন্ত জীবনে
ফল। কাপড় জামার বেশী দরকার নেই; মাথা গোঁজার ঠাঁই সবার হ
যায়; জনসংখ্যা বা প্রজাবৃদ্ধি কাম্বোজের সমস্যা নয়। চাষবাস, মাছ, নারকো
অজস্র। জীবন ধারণটা সীমিত ভোগ হলেও অসীম দুর্ভোগের অধ্যায় নয়।

মেয়েরা তাই উল্লসিতা, দীপ্তা, চকিতা এবং লাস্যময়ী। তা ছাড়া পুরুষপ্র
সমাজে পুরুষের যেমন যৌন ব্যভিচার সহজে হয় না। মেয়েধর্মী সমাজে কেব
যৌন ব্যাপারে দেহের একাধিপত্য নিয়ে তকরার করাটাকে না-মেয়ে-না-ছেলে খু
পরিশীলিত ভদ্র ব্যবহার বলে মনে করে। আসলে মেয়েরা ছেলেদের মতো স্বাধী
এ ব্যবস্থাটাই—চীনাদের চক্ষুশূল। এবং চীনের কড়চার বাইরে এ সব ঘৃ
কথা কেউ বলে না।

তবে যৌন জীবন তো এ দেশে সীমিত। কেননা আমরা তাড়াতাড়ি বুড়ি
যাই। যৌবন এ দেশে অতিথির মতো আসে, অতিথির মতো প্রচুর আদ
পেয়ে চলে যায়। কাজেই দাম্পত্য জুটির মধ্যে দেহ নিয়ে রঙ্গে আম
অকৃপণ, অবাধ। তাছাড়া গরীব দেশে মিনি পয়সার ভোগ বলতে-ত
ঐ একটি। জীবসৃষ্টি এ আনন্দের প্রত্যঙ্গ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম দিকেও বারান্দার দ্যালে নীচু রিলীফের কাজ। ঝুঁকে বুঝে দেখতে
হয়। সামনে সারি সারি থামের ফাঁক দিয়ে আলো আসে, জলও আসে
জলের জন্য মেঝের মধ্যভাগে নালী। আলো সত্ত্বেও ভালো করে না দেখলে এ
অতি অপরূপ কৃতি বোঝা যায় না। বারান্দার বিস্তার স্বল্প। পিছনে স
দেখা যায় না, তাই পাতার পর পাতা পড়ার মতো খুঁটিয়ে দেখতে হয়
একটা লম্বা পটের মতো যেন, সত্তর ফুট লম্বা পট। তাতে তামা
কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যে হাতি, ঘোড়া, নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল। অসাধার
বাস্তব পরিকল্পনা।

কিন্তু বারবার ঘুরে আসি পূবের বারান্দায়; গ্যালারী বললেই ঠিক হয়
কী মনোহর।—কী ভীষণে সুন্দরে, সম্ভবে অসম্ভবে মিলন! দৈত্যরা ধরেছে
বাসুকীর ভীষণ কেন, অতিভীষণ (অথচ কী সুন্দর ভঙ্গী) ফণার দিক; আ
দেবতারা লেজের দিক ধরে হিমশিম। জোরে যেন কম পড়ে যাচ্ছে। মাঝে
মন্দরে আসীন বিষ্ণু, চাপ দিয়ে 'ব্যালান্স' ঠিক করছেন। মন্দর দাঁড়িয়ে আছে
যে কচ্ছপের পিঠে সে কচ্ছপটি যদি দেখতে পদ্ম, দেখেই বলতে এ সত্যই কোনে
লোকোত্তর প্রতিভারই অবতার। এই যে মূক প্রাণীগুলোর মধ্যে ভাব ও ভাষা
রূপ এনে ফেলা এই তো শিল্পকর্মের প্রাণ। নীচে কতো মাছ, কতো জলচর
কতো জলের ফুল। সমুদ্র যে! ক্ষীরোদ সাগর! অপূর্ব ছন্দ রচনা ক
আছে হাঙ্গর, কুমির, তিমিঙ্গিল।

সূর্যবর্মণ শিকারে চলেছেন দক্ষিণে দেয়ালে। কী ভীষণ সে জঙ্গল। াঢ়, নিবিড়, অতিদীর্ঘ নানা গাছে আচ্ছন্ন। নিজে হাতির পিঠে; হাতিতে াওদা। শ্যাম কাম্বোজে হাতি খোদাই, হাতি আঁকায় শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত। মাপ-পতেমোকে এতো জানে না, যতো জানে হাতিকে। রাজহস্তী তো রাজহস্তী। ী তার ভঙ্গী, কী তার সজ্জা, কী তার হাওদা,—এবং শত শত অনুচরদের সঙ্গে ানুপাতটি ঠিক মানানসই।—নরকের চিত্রেও হাতি পাচ্ছি। স্বর্গের চিত্রে পাল্কী াঞ্জাম, ছত্র, পাখা, চামর।

মী-কেয়ো নিজে থেকেই বললো, বেলা দুটো হয়ে গেছে। এখানে তোমার াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেয়ে বিশ্রাম করবে। জীপ এখান থেকে চলে াবে।

তারপর?

কেন, তুমি আর আমি।

My delight and thy delight
Walking, like two angels white
In the gardens of the night···আপত্তি আছে?

আমরা কি white angels মী কেয়ো? gardens of the night ামাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয়।

তবু এ night আমার-তোমার। আমিও নির্ভয়। ত্বমিব পথিকঃ প্রিয়ো া। জীপ চলে যাবে। তোমার কুকুর আসবে। আসবে বুড়ো দাপ্‌সান্‌।

দাপসান্‌? দাপ্‌সান্‌কে চেনো তুমি?

এ জঙ্গল। সকলকে সকলে চিনি আমরা। খেয়ে নাও।

* ● *

খুব পেট ভরে খেলাম। কিন্তু সত্যিই আমরা দুজন। যারা খাবার নিয়ে সেছিলো, এসে শুধু বাসন নিয়েই গেলো না, দেখলাম ধীরে ধীরে, বিশ্রাম, াওয়া, থাকা, সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলো।

আরব্য-উপন্যাস নয়। সত্যিকার মানুষ এরা। সত্যিকার আমি। কিন্তু িছুই বুঝতে পারি না।

শ্যামের মেয়েদের সৌন্দর্য দেখে বহুগুণী বহু ভাষ্য রেখে গেছেন। সে ৌন্দর্য এদের চুলে, চোখে, গড়নে। নাতিদীর্ঘ শরীরটি উঁচু করে ধরার কটি ভঙ্গী, যেন রজনীগন্ধা। খালি পায়ে চলে; তাই চলার গতির মধ্যে াক নীরব ছন্দ। চলন্ত জীবন্ত শান্তি; নেই প্রখরতা, প্রগল্‌ভতা, চাঞ্চল্য। কটু হয়তো বিষণ্ণ লাগে; কিন্তু ঠিক মতো কথা বললে প্রতিবচনের ঘাটতি িতিবেদনে পুরে ওঠে।

খাবারের সঙ্গে কিছু ছিলো। ঘুমের সঙ্গে লড়ে লড়ে শেষ পর্যন্ত কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি চমৎকার বিছানায়, এবং এই প্রথম, মশারীর মধ্যে।

কখন উঠেছি কোনো হুঁস নেই। কিন্তু দিন শেষ হয়ে গেছে। রাত নেমে এসেছে। ঝিঁঝিঁর ডাকও যত প্রচণ্ড, তেমনি জোনাকীর মেলা।—

এখন রাত কতো? জঙ্গলে রাত মালুম হয় না।

কতো মনে হয়? নটা বেজে গেছে। ওষুধটা খাও। তারপর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়বে।

এখানে? একা?

না এ রাতটা আমিই থাকবো। মাত্র একটা রাত। ভয় কি? উত্তর সাধিক বলেও তো মনে করতে পারো। আপত্তি আছে?

তাই ভালো। গল্প শুনবো।

আমাদের গল্প এখন পৃথিবীর সব কাগজে। কাম্বোজ আর শীহানুক যাচ্ছো তো তানলে-শাপ্ হ্রদে। দেখবে গ্রামে গ্রামে উৎসব।

*　　　　*　　　　*

বাইরে একটা গোল। অন্ধকারে কী যেন নড়ে উঠলো। সেই কুকুরটা। আমি মনে করতে লাগলাম কে যেন বলেছিলো কুকুর আসবে, দাপ্সান আসবে।

দাপ্সান এসেছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে। একজন মী-কেয়ো। অন্যটি এসেই জড়িয়ে ধরেছে। কী চিনতে পারলেনা দাদা?

এক নিঃশ্বাসে আমার জগতে আমি ফিরে এলাম। বললাম, তুই? কণিকা?

তীব্র আবেগে চোখে জল এসে গিয়েছিলো। চলে গিছিলি, কেন রে?

বুঝতে পেরে কণিকা বললো,—না গেলে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো ব্যবস্থা হোতো না। আঙ্কোরে তোমার খোঁজে সরকারী লোক গেছে। যাক খুঁজে পাবে না। এখন তুমি আঙ্কোর থেকে নব্বই মাইল দূরে।

মী-কেয়ো বললো, কথার সময় নেই। অনেকটা পথ নৌকোয় গিয়ে তবে জীপ। এখুনি বেরুতে হবে। গ্রামের সবাই সাহায্য করেছে,—করবে। এখানে তুমি আমাদের সবার পরম সম্মানিত অতিথি।···আচ্ছা তুমি কি দিল্লীতে এখানে আসার দরবার করতে ভিয়েৎনামের দূতাবাসে গেছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু···

একটা ভিয়েৎনাম দূতাবাস থেকে অন্য ভিয়েৎনাম দূতাবাসে গেছিলে?

ঠিক তাই। আশ্চর্য। জানলে কী করে? ওরা ভিসা দিলো না। বললো —এখনও সব ঠিকঠাক হয় নি। কিন্তু···কী আশ্চর্য!

কে বললো,—এখনও ঠিকঠাক হয়নি।

জানি না। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম দূতাবাসটি কোথায়?

সেখানে একজন পেট্রল ভরাচ্ছিলেন। দেখে মনে হোলো খুব বিশিষ্ট কেউ। গাড়িখানায় ফ্লাগ থাকলেও ঢাকা ছিলো। কথা বলার পর মনে হোলো,—

কী?

ভিয়েৎনাম দূতাবাসের বিশিষ্ট কেউ। দেখলাম সব খবরই দিলেন।

উনিই দূত মশাই। অন্য ভিয়েৎনামের সেই যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছিলেন। এবং সেই খবরের যোগাযোগ হয়ে গেলো যখন সোয়ো বোম্রো এসে খোঁজ খবরে লেগে গেলো।

আমার মুখে হাত রেখে মী-কেয়ো বললো,—আর নয়।

আর তোমাকে যে আমি কিছুই বলতে পেলাম না মী-কেয়ো। আবার দেখা হবে না এ সত্যটাও মেনে নিতে পারছি না।—পা বাড়ালাম। সময় নেই।

ও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় বললো,—

Nothing begins, and nothing ends,
That is not paid with moan ;
For we are born in other's pain
And perish in our own.

* * *

প্রায় দু-মাইল পথ অন্ধকারে মাত্র চাঁদের আলোর দয়ায় পার হয়ে এলাম। কুকুরটা, দাপসান, দুটি মানুষ আর ঐ কণিকা। আমার জন্য একটা ডুলী মতো। মানুষ দুটি সেই জন্য। তখনও আমি যথেষ্ট দুর্বল।—

আমি কোনো কথা বলতে পারছি না। গত তিন দিনের ঘটনা আমায় ঠেসে ধরেছে। কিন্তু মী কেয়ো এক সমস্যা হয়ে রইলো। আমার দৃঢ় ধারণা আমি মী-কেয়ো-কে কোথায় আগে দেখেছি। ওযে আমার এতো কাছাকাছি এতো সহজে এলো এর নিশ্চয় একটা প্রাক্তন-পর্ব আছে।···কিন্তু কী করে তা সম্ভব? কে-ও?

অন্ধকারে একটি ছোটো নদীর কিনারায় এলাম। নৌকোয় উঠলাম। পাৎলা সরু নাও। ছই থাকলেও আছে একগাদা বিচালীর ভার। গন্ধে চলেছে।

হঠাৎ যেন একা হয়ে গেলাম।

আমি শুয়ে আছি। পাশে কণিকা তখনও বসে।

না বলে পারি না,—মী-কেয়ো। ও কে? কী যে আমার মনে তোলপাড় করছে তোদের বোঝাতে পারবো না। ওকে আমি যেন কোথায় দেখেছি। ও আমার চেনা। কিন্তু তা সম্ভব কী করে?

চমকে ওঠে কণিকা। সত্যি ওকে চিনতে পারো নি তুমি?

আমিও উঠে বসি। কে? কে-ও?

মণি-শ্রীকে মনে পড়ছে না? মোনি-সেরী? নাচের মেয়ের মা?

ঠিক ঠিক। অবিকল সেই মুখ, কণ্ঠ। কিন্তু কে ও?

মৌনি সেরির ছোটো বোন। তার কথা মৌনি সেরি বলে না।

তবে তুই জানলি কোত্থেকে?

তোমার কাণ্ড কারখানা সবই তো সর্বাহ্নিকে বললাম। সে-ই বললো। সেই বলা থেকেই সর্বাহ্নির মনে সব যোগাযোগের ব্যবস্থা পাকা হোলো। সেই সংবাদেই মী-কেয়ো তোমার জন্যে এতোটা করলো।

কিন্তু মণি-শ্রী বলেছিলো তার বোন নেই।

মণি-শ্রীর বোন আছে। দুই ভাই আছে। ও কাম্বোডিয়ান। কিন্তু ওর জীবনের ধারা যে খাতে বয়েছে তাতে ব্যাঙ্ককই ওর উপযুক্ত নরক। ওর মেয়েকে ও কোনোদিন পাবে না। দেশেও ও কখনও ফিরবে না। কাজেই ওর কেউ নেই।

মণি-শ্রীর বোন? ছোটো বোন? কী আশ্চর্য রকমের পণ্ডিত মহিলা। অদ্ভুত.! অদ্ভুত! আমি ভাবছিলাম আরব্য উপন্যাস বুঝি।

মী-কেয়ো এ তল্লাটের সবার বড়ো পুরাতত্ত্ববিদ এবং বিদুষী। ও তো শ্রমণদের পড়ায়, শ্রমণীদের শেখায়। ওর নাম সারা কাম্বোজে।

চুপ করে রইলাম।

একটু পরে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো উদাত্ত বাণী—

সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালো লাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারই ওপরে তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা,—
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।

*　　　　*　　　　*

সমস্ত নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। শুধু শব্দ ছপ্ ছপ্। দূরে বিস্তর ঝোপের পাড়ে দু-চারটে চালা মাচানের ওপর। জোরে মোরগ ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মোরগ ডেকে উঠলো পর পর। ধীরে ধীরে অবসন্ন কণ্ঠে বলি কণিকা, তোমার বাবা ইংরেজ কবির ভক্ত ছিলেন বলেছিলে। কে-সে?

ব্রাউনিং বাবার প্রিয় কবি। এলিয়ট। কিন্তু বাবা আবৃত্তি করতেন ব্রাউনিং

শোনাবে ব্রাউনিং? শোনাও না।

কোথা থেকে? সব তো জানি না।

এই সময়টাকে ভাষা দাও।—যেখান থেকে হয়। অসহ্য। বেন এজ্‌রা!

কিন্তু কণিকা শান্ত হয়ে আমার মাথার ভেতরে আঙ্গুল চালাতে লাগলো

তারপর ধীরে ধীরে ওর বাবার প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। শুনতে শুনতে ঝিম এসে গেলো। শেষ দিকে তখনও শুনছি—

Look not thou down but up!
To uses of a cup,
The festal board, lamp's flash and trumpet's peal.
The new wine's foaming flow,
The Master's lips aglow!
Thou heaven's consummate cup, what needst thou with earth's wheel.

* * *

ভোর হয় হয়। ঘুম ভেঙ্গে গেছে। নৌকো ঘাটে বাঁধা। ঘাট ঠিক নয়। গ্রাম কাছে নেই। তবে মনে হোলো দূরেও নয়।

খুব জোরের সঙ্গে একখানা নৌকো আসছে। আউট-বোর্ড লাগানো সত্ত্বেও ঝরঝরে মাছধরা নাও। স্তূপ করা জাল। চার পাঁচ ঝুড়ি মাছ। দুটো জালার মতো ঝুড়ি। নৌকোখানা আমাদের দিকেই আসছে।

তখন দেখলাম সর্বাহ্নিকে। দাঁত বার করে বার বার মাথানীচু করে। প্রণাম করে। পাকা জেলে। জেলের টুপী মাথায়,—বাঁশের ছোটো বোনা টোকা।—

কোনো অসুবিধা হয়নি দাদা?

হলেই বা তুমি কি করবে? ঝগরুটি গলায়, বললো কণিকা—দাদাকে খেতে দিতে হবে। ওষুধ দিতে হবে। রাতেও দাদার জ্বর ছিলো।—কণিকা কখন উঠে এসে বসেছে।

তীব্র বেগে নৌকো চলেছে। মাঝে মাঝেই অন্য নৌকো দেখছি। পাল খাটানো নৌকোই বেশী। বেলা নটা আন্দাজ তীর দেখা যেতে লাগলো। দেখা যেতে লাগলো গ্রামে গ্রামে উৎসবের সজ্জা, গানের ফোয়ারা, পতাকা, বেলুনের ভীড়। সাজসজ্জায় চমক। শিহানুক ফিরে এসেছেন। উৎসবে মাতোয়ারা শত শত গ্রাম।

নৌকো চলেছে। কেউ কোথাও প্রশ্ন করছে না।

হঠাৎ একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠে কে যেন কী ভাষণ দিচ্ছে। সায়ামীজে ভাষণ, পরে আবার ফরাসীতে, চীনায়, সর্বশেষ ইংরাজীতে। নৌকো থামিয়ে ওরা ভাষণ শুনছে।

হঠাৎ ইংরাজীতে ভাষণ সুরু হোলো।—শিহানুকের সেই প্রসিদ্ধ ভাষণ. পিকিনের ভোজসভায় বুকঠুকে সে ভাষণ দিয়েছিলেন!

শুনছি:—

No ! The Khmer people will never accept an 'American peace' that forces them to give up the liberation of the nine percent of their national territory that is still in the American hands.

No ! The Khmer people will never accept an 'American peace' that will compel the Cambodian Government of the Royal National Union to dissolve itself, and be replaced by a government of so-called coalition and reconciliation, —that is to say, a coalition and reconciliation with the traitors.

No ! The Khmer people will never accept an 'American Peace' that will impose on them an 'in-place cease fire',—that is to say, an actual partition, a division for long years, if not for ever, of Cambodia into two parts, or two states, or two governments, or two administrations······

না-'ফ্রী-ওয়ার্লড্', না-'থার্ড-ওয়ার্লড্' কোনো তল্লাটের কোনো রেডিও এ ভাষণ প্রসারিত করার সাহস কুড়ুতে পারে নি।···আজ শুনছি। মন ভরে যাচ্ছে আর ভাবছি, 'কে ফ্রী ?'

শুধু সর্বহিং বললো শিহানুকটাও দো-রঙ্গা দালাল।—শেষ লড়ায়ের ময়দানে ওর লাশকেও কাম্বোডিয়া থ্যাংলাবে।

কতোদিন চলবে ?

এখনই তো আরম্ভ।

চেয়ে দেখি মাঝিগুলো খুব ঘুম লাগাচ্ছে।

হঠাৎ কণিকা প্রশ্ন করলো, শুনলাম বর্ডারে তুমি প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলে। কিন্তু এখন বেরুবার পথে আর ভয় নেই। এই হই হল্লায় বেরিয়ে ঠিক যাবে। একেবারে দক্ষিণে গিয়ে কাছাকাছি রেলগাড়িতে চড়িয়ে তবে ছুটি। লিংগামা নাকি দারুণ খেল দেখিয়েছে ? অভিনয়ে মাৎ করে দিয়েছে কুত্তাগুলোকে।

লিংগামা ? সে আবার কে ? কিতাৎ মায়ো তবে কে ? সেই তো খেলা দেখালে। ওঃ ! অভিনয় বোলে অভিনয় ! বাপ্‌স্।

হাসে কণিকা। ওর কী একটা নাম নাকি ? নাকি ওই ওর চালা ? ছিলো নম্-পেনে, উর্বশী পাড়ার মেয়ে। ঢুকে পড়েছে এই চক্রে। এখন হয়ে পড়েছে কুণ্ডলিনীর সহস্রার। কেমন ঠিক বলেছি তো ? ওর বন্দোবস্তেই তো সব

হবে। পারে পৌঁছেই ভিসা পাবে।—সন্ধ্যার পরে দক্ষিণে নামবো পশ্চিম পাড়ে। সেখানে গাড়ি। সেও ওই লিংগামা।

এখনও চলে দুটো জিনিস। আমেরিকান ডলার, এবং মেয়েদের এই আগুন ধরানো ফাঁদ। এ উর্বশীকে মনে রাখবো, প্রণাম করবো। এর পাশাপাশি বসাতে পারি, তেমন মেয়ে চোখে দেখি নি।···হাত তুলে প্রণাম করি।

কেন? মী-কেয়ো? কাল তো ভেঙে পড়েছিলে।

ভেঙে পড়বার মতোই বিস্ময় ও। অভিজ্ঞতা। কিন্তু মী-কেয়ো অন্য ধাতুর প্রকৃতি। মনীষা, বিদুষী, হৃদয়বতী। যেন রবীন্দ্রনাথের 'সাবিত্রী' কবিতাটি। অদ্ভুত। এ কী গো বিস্ময়!···কিন্তু কিতাং-মায়ো? হে পরমেশ্বর! যেন আগুনের মালসা।···ওরে বাপরে।

কেন? কেন? কিছু হয়েছিলো নাকি?···খিল খিল হাসিতে ফেটে পড়লো কণিকা।—বলো না দাদা কী হয়েছিলো? ওঃ, তোমায় মাতাল করে মেয়ে মানুষ, —সে নেশার কথা মনে মনে ভেবেও খুশী আমি রাখতে পারি না! কী মজা।

নৌকোটা লাগিয়ে দুজন নেমে গেলো গ্রামটায়। মানুষজন এলো একটু পরে। তার পরেই চার পাঁচটি মেয়ে। সবাই এসে ফলের ডালায় কমলালেবু বাছার মতো কণিকাকে ধরে, হাত বোলায়, নেড়ে চেড়ে দেখে, আর আনন্দে ডগমগো হয়।—এক গাদা খাবার এনেছে। আমি খেলাম সদ্য ফাটানো ছানা; কমলা-লেবুর পায়েস, কয়েকখানা মাছভাজা। ডাব তুলে নিলাম অনেক। আর এ জল খাচ্ছি না। আজও কফি খেলাম না।—

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবো ঠিক 'বন্দরে'। সর্বহিহ্র অন্য দিকে মন নেই। প্রতি জায়গায় প্রত্যেকের সঙ্গে ওরা জানাশুনো। কতো বিস্তৃত যে ওর প্রভাব চাক্ষুষ করে অবাক হয়ে যাই। অত্যন্ত ব্যস্ত ছেলে। অত্যন্ত সজাগ মন। সবল, নিরাপোষী প্রতিপক্ষ। সংশপ্তক।—তীরে তীরে ও ধর্ম প্রচার করছে, মরতে হয় মরো। কিন্তু বিদেশী সাহায্যের থলির লোভে বেশ্যাবৃত্তি চলবে না।

বিকেলের দিকে গ্রামের পর গ্রামে থিক থিক করছে লোক। দারুণ হৈ হল্লা উৎসব। নারকোল পাতার গোছা, নারকোল ফুলের ঝারি, পদ্মফুল, পামের মোচাকে খুলে দিয়ে তার ভ্রূণগুলো মেলে দিয়েছে চামরের মতো। ঘট আছে; আছে অজস্র ধূপ; মাঝে মাঝে তোরণ।

সবার মুখে শিহানুক আসার কথা। কতো যে জনপ্রবাদ শিহানুককে নিয়ে। দেখলাম শিহানুকের মাকে সকলে সাক্ষাৎ দেবীর মতো মান্য করে। বার বার—শিহানুকের কথা উঠছে রেডিওতে; বক্তৃতাটা বার বার দিচ্ছে।

হঠাৎ আমার মন বিষণ্ণ হয়ে যায়।

এ বিষণ্ণতার কাছে আমি ঋণী। বলতে পারো বিষাদ হলেও এই বিষা আমায় ভাবায়। ভাবায় যে একদা এমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনেছি জওহরলালের নারিম্যানের, সুভাষের, মানবেন্দ্রনাথের ভাষণ। সে কণ্ঠ থেমে যায় নি। জানতা যে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

তবু জানতাম এতোটা উদ্দীপনা যখন এসেছে, এগিয়ে যাবো আমরা। রুখে কে? ভারতের পেটে ভাত পড়বে; বাস্তুহীন মানুষের মাথার ওপরে ছাদ থাকবে পথে খাঁচামুটে ডালার ভেতরে শুয়ে থাকবে না; ফুটপাথের পাশে বসে রিকসাওল সানকীতে ছাতুগুলে খাবে না; স্লাম উঠে যাবে; রাতের কলকাতার ফুটপা লক্ষ লোক শুয়ে থাকবে না; প্লাটফর্মে বাচ্ছা হবে না; ব্রীজ-কালভার্টের তলা তরুণী রান্না চাপাবে না। ভিক্ষার অন্নকে মানুষ ঘৃণা করবে; কাজকে মানু সমাজে আসন দেবে; সাধুসন্তদের পুণ্যলোক থেকে নেমে এসে মানুষ বাস্ত জগতে আত্মবিশ্বাসে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে!

তাই এই দৃশ্য আজ আমায় ভাবিয়েছে। সেটা বোধহয় ১৯৫১! তখনং আকাশে রেশ বাজতো "তোরা সব জয়ধ্বনি কর"। আমি নেহরুজীকে চিঠি দিয়েছিলাম হতাশায় জ্বলে উঠে,—"এখনও আশা রাখি। ভরসা হারাইনি শুধু ভয় লাগে ভাবতে ভারতের ইতিহাসে আপনিও না চিয়াং কাঈ শেক্ হয়ে যান!" সে জয়ধ্বনি মুছে গেলো পদ্ম। 'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সংগী হারা'। অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন···কী হবে ব'লে? সবই তো জানো।

দেখছি কাম্বোজ আনন্দে মাতোয়ারা। শুনছি কাম্বোডিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নায়ক ডক্টর থিউ সম্পানের বক্তৃতা—"১৯৫১ মনে করুন আপনারা। শিহানুক —ভিল্ আমাদের একমাত্র বন্দর নগরী। সেই যে হাইওয়ে নম্বর চার-এ আমরা খাট্টা করে দিলাম দুষমণের দাঁত, মনে করুন বন্ধুগণ, নম্-পেন্-এর পথ মুক্ত হোলো। ইয়াঙ্কী কুত্তা লন্‌নোল তার সাঙ্গাৎ দোস্তদের ভিক্ষের জোটানো ভাড়াটে সিপাহী লেলিয়ে আমাদের ঠেকাতে পারে নি। হাজার হাজার সৈন্য ওদেরই রসদ-গোলা-বারুদ নিয়ে, গাড়ি ভরে যোগ দিয়েছে মুক্তি সংগ্রামে।···"

পুর-শৎ (শতপুর?), বাতাং-বাং, সাম-রং, শিয়েম-রীপের মাঝামাঝি জায়গাটা "তোন্‌লে হ্রদের বুক" বলে পরিচিত। হ্রদটায় বড় বড় চার চারটে নদী এসে পড়েছে। দক্ষিণ দিয়ে এক হয়ে মিশে চলে যাচ্ছে মে-কং এর নাম নিয়ে। নম-পেন ছিলো এই ত্রিবেণীর খাসমহল। তাই আজ এই খাশমহলে উৎসবের শেষ নেই।···কিন্তু তবু এ মাটির প্রতিটি মাঝি, প্রতিটি নৌকো, প্রতিটি চাষা, প্রতিটি কুমোর, কামার, তাঁতী—সংশপ্তক, গেরিলা, অস্ত্রহীন সৈন্য। প্রতিটি নৌকো আজ সেজেছে। প্রতিটি প্রাণ বদান্যতায় হয়ে গেছে দাতা কর্ণ।

রাত দশটার পর ঘুম ভাঙিয়ে আমায় যারা তুললো তাদের চিনি না। যত্ন করে নিয়ে চললো প্রায় বিশ-ত্রিশ মাইল। রাত একটায় এলাম একটা ছোটো স্টেশনে। গাড়ি আসছে। ব্যাঙ্কক যাবো।—

জিজ্ঞাসা করি কণিকারা কোথায়? একটি তরুণ জবাব দিলো ওরা তো তখুনি নম পেনের গাড়ি ধরেছে। আপনি এখন থাইল্যাণ্ডে। গাড়িতে চড়ুন। এই আপনার টিকেট, আর এই কিছু টাকা। ব্যাঙ্কক কাল বেলা দশটায় পেঁৗছে যাবেন।

কিন্তু হোটেল ভিক্টোরিয়া এসে দেখি কণিকা-বাবু ঠিক বসে আছেন।

এ ছাড়া নাকি উপায় ছিলো না। দুজনে একসঙ্গে আসা যেতো না। কেন? কে বলবে তা।

কিন্তু এ মুহূর্তে সিঙ্গাপুর যাবার কথায় এক কণিকা দশ কণিকা হয়ে উঠলো। আমি যাবো সিঙ্গাপুর? তুমি পাগল? তুমি যাও। ঐ ছাতার উপনিবেশী শহরে যা পাবে আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। হ্যাঁ. যেতে কোয়ালালাম্পুর, জাকার্তা, সোরিবায়া,—নিশ্চয় সঙ্গ নিতাম। এখন যাবার জায়গা পর্তুগীজ তিমোর। কিন্তু আমি যাবো হংকং। হংকং আমায় ডাকছে।—

তুমি কিন্তু হংকং-য়ে পেঁৗছেই ফোন করবে। তাজমুল নম্বর দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বো।

কণিকা তার পথ পেয়ে গেছে।

কণিকা গাড়িতে উঠে বসার আগে আমায় প্রণাম করতে গেলো। আমি ওকে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় চুমো খেলাম। সাবধানে থাকিস। দেখা হবে।

ইতি—

জামাইবাবু

১১

কল্যাণীয়াষু,

পদ্মদি,

আমি সিঙ্গাপুরে এসেই প্রথমে বেছে নিলুম শহরের কাছাকাছি বিশাল হোটেল 'সী-ভিউ'। এবং এয়ার পোর্টেই ভেবে চিন্তে বেছে নিয়েছিলাম একটি ট্যাক্সী-চালক। সুন্দর তকতকে অত্যন্ত সুসজ্জিত ভারী একখানা মার্সেডীজ বেন্জ্। চালকটির নাম রামশরণ। বাড়ি শাহারণপুর। সিঙ্গাপুরে আছে সেই আজাদ হিন্দ্-এর সময় থেকে। আমাকে ওর কাগজপত্র দেখালো। সেদিনের সেই ছবি, তরুণ রামশরণ, মাথায় তের্ছা মিলিটারি-টুপী। অত্যন্ত প্রতিভা দীপ্ত মুখ। সেই কাগজ পত্র দেখানো যেন ওর একটি স্বতন্ত্র পরিচয়। অবশ্য এ সব হোলো সী-ভিউ হোটেলের সুইমীংপুলের পাশে। এয়ার পোর্টে রামশরণকে আমি বেছে বার করেছিলাম। এ রামশরণ ভুঁড়িওলা একশো নিরান্নব্বই পাউণ্ডের মাল, গালে ঝুলছে চর্বির থলে। গোঁপ জোড়া চমৎকার।

রামশরণকে বললুম, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। দেখি টাকা ভাঙিয়ে আনতে পারি কি-না। সঙ্গে কাম্বোডিয়ান আর থাই মুদ্রা ছিলো। বদলাতে গেলো। ট্রাভেলার্স চেক হোটেলে ভাঙানোই ভালো। কিন্তু জায়গাটা সিঙ্গাপুর,—ভারতীয় অনেক,—ভাবলুম যদি ভারতের টাকা বদলে দেয়। বদলানে-ওলাটি ভারতীয় আমাদের দিশী জুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গুজ্রাতী দালাল নাক সিঁটকে বললো, ভারতের টাকা বদলাবো না।

রামশরণ হাসে। এরা হোলো "মনি লেণ্ডার"। হংকং, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুরে যেখানে সেখানে এন্তার "মনি লেণ্ডার"-এর সাইনবোর্ড ঝোলানো দেখতে পাবেন। শার্ক ওরা, শার্ক! কিস্সু মানে না। দয়া, ধর্ম, আইন, পুলিস, কিস্সু না। ঘাড় বুঝে কোপ মারে; কোপ বুঝে ঘাড়-এর ধার ধারে না।—

যখন "সী-ভিউ"-তে এলাম তখন বেলা দুটো হবে। রামশরণ বললো আপনি মালপত্র রেখেই নেমে আসুন। মৌসুম ভালো, বাজার, বাগান আর বন্দর দেখিয়ে আনি।

তা হলে আর সিঙ্গাপুরের বাকী থাকে কী?

খুব ভোরে উঠতে পারবেন?

চারটে ?

না অতো নয় ; ধরুন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ। সিঙ্গাপুরে মানুষ যা দেখার । দেখে না। যা দেখে তা বম্বেতেও দেখা যায়। আপনাকে তা'লে দেখাই ঙ্গাপুর। মনে থাকবে।

এখানকার নাইট ক্লাব কেমন ?

হাসলো রামশরণ। এই তো আসছেন ব্যাঙ্কক থেকে ; যাবেন হংকং-এ এর ধ্যে সিঙ্গাপুর জোলো, পান্‌শে।—

বলছো জ্বলন্ত কড়া থেকে উনুনে পড়ার মাঝের ঠাণ্ডাটুকু এই সিঙ্গাপুর ?

আরও ভালো, যা এখানে আমরা আপোষে বলি ; যাদের ভাগে ব্যাঙ্কক্‌-হংকং ই তাদের সিঙ্গাপুর নিয়েই কাটাতে হবে।—

রামশরণ অপেক্ষা করছিলো। আমি বললাম, রামশরণ,—তুমি বরং ঘণ্টা ই ঘুরে এসো। ওপরে আমার জানলা দিয়ে অতি সুন্দর একটি সুইমীং-পুল দেখলাম। মানুষ জন যা আছে তাতে স্নানটি রঙ্গীন হলেও হতে পারে—

বলেন কী কর্তা ? দিল্লীর কদর দান আপনি। হিল্‌মটন্‌ খাওয়া হজমী ক্তি আপনার। বেলা দুটোয় ঢুকবেন সুইমীং পুলে ? ছিঃ ছিঃ জনাব। বে ফিরে আসুন। সন্ধ্যের আগ আগ সময়ে সুইমীং পুল। আর আমিও ী চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করবো নাকি ? কিশোরের আম্মাকে খবর দিয়ে আসবো। মামিও ঢুকবো সুইমীং পুলে। এখানে জবর শিক কাবাব ঐ পুলের ওপরেই াজে। আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো।—এখানে পথে ঘাটে এর নাম খুব। রা ভাজে তারা ফ্যামিলীকে ফ্যামিলী লেগে যায়। শিক-কাবাব বলে না। লে 'মাত্‌তে'। স্বাদ যেমনই হোক, যে দেয় তাকে দেখে সব ভুলতে হয়।—

কিন্তু রামশরণ তুমি তো গেস্ট্‌ নও। সুইমীং পুল ব্যবহার করতে দেবে কী ? জানো ?

কেন আমি গেস্টের দোস্ত হয়ে গেস্টের গেস্ট হতে তো পারি। ডিনার হলের তো না হয় আমার সুট পোষাক নেই। কিন্তু সুইমীং পুলের মতো স্যুট আমার আছে।

কিন্তু এরা তো সবাই তোমায় শোফার বলে চেনে !

আপনি যে দিল্লীর শোফার ন'ন তাতো জানে না জনাব। আচ্ছা আপনার খারাপ লাগলো কথাটা। বেশ ! আমি যদি বলি আমার পিসতুতো দিদির ঙ্গে আপনার শাদী হয়েছে।...ও সব হয়ে যায় জনাব। আমি আজ সুইমীং পুলের ধারে বসে শিক কাবাব খাবোই। ইমান কবুল।

শুধু শিক কাবাব খাবে, নাকি আরও কিছু ? আমি কিন্তু আর কিছুতে নেই।

সে কি জনাব! এই না আপনি নাইট ক্লাবের খোঁজ নিচ্ছিলেন? যদি ভাজা মাংসের সঙ্গে তাজা মাংসই না পাতে নিলেন, যদি শিক-কাবাবের সঙ্গে হুইস্কীই না নিলেন,—তবে কাবাবের তো কেবল রৈলো শিক। তবে আবার নাইট ক্লাব কেন?

তুমি বুঝি শরাব ভালোবাসো?

উহুঁ! সে কথা সচ্চী নয়।—হুজুর, শরাব আমায় ভালোবাসে। আর এতো ভালোবাসে যে নাইট ক্লাবে আমি যাই-ই না।—কিশোরের আম্মা সাথ দেয়, ঘরে বসে বসে আমরা তোফা নাইট ক্লাব করি। আলোর বাল্ব বদলে লাল করে দিই। জয় গুরু। জয় গুরু।

* * *

গাড়ি যে পথ দিয়ে নিয়ে চলেছে তা যেমন পরিষ্কার তেমনি সাজানো। সিংগাপুর বলতে শহর আর শহরের আশে পাশে সমুদ্র এবং দ্বীপ; এবং সংলগ্ন কিছু কিঞ্চিৎ রাবার-বাগান নিয়ে জায়গা;—সমুদ্রের খাড়ি সিংগাপুর শহরকে বেড় দিয়ে আছে। উত্তরে এককালের রবরবা রাবার চীন, উলফ্রাম-এর রাজত্ব ছিলো জোহোর। জোহোর-বারু (সুর-পুরী) ছিলো এই সিংহ-পুরীর (সিংগাপুর) চাংগা সোদর ভাই। সমার সেট মম্ এর বহু কাহিনী এই পাণ্ডব-বর্জিত নাগকন্যা দেশের বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা। সে বৈচিত্র্য দিয়েছে ইয়োরোপের লম্বশাটপটাবৃত হুঁকোমুখো হ্যাংলা হেংলীর দল। ঐ সুয়েজখালটি পার হলেই শোলার হ্যাট আর পাইপের পাল্লায় পড়ে ঐ হতভাগাগুলো যেন চুনে থেকে তিমি বনে যেতো।—

ওরই মধ্যে একজন জাঁদরেল নাম স্যার স্টানফোর্ড রাফ্ল্স্। স পাপিষ্ঠ-স্ততোধিকঃ! উনি শুধু অংরেজই ন'ন্। বোম্বেটে, জুয়াড়ী, নরহন্তা ডাকু-সভ্যতার (?) একটি উদ্‌গার। না; আমায় ভূতেও পায় নি; নেশাও করি নি গালও দিচ্ছি না। ওয়েস্ট ইণ্ডীজ বলে আজব লম্পট-দুনিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কী হচ্ছিলো আর কী হয় নি তা আমি এখানে বিশ বছর বাস করে হাড়ে হাড়ে জানি।—পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এই সিদ্‌নে পর্যন্ত—এই ছন্নছাড়া একদল সাদা অখাদ্য নীতিহীন মস্তান বিয়ে জানেনি, পরিবার জানে নি, আইন, শৃঙ্খলা, নীতি, ধর্ম কিস্‌সু জানে নি। কেবল জেনেছে ধেনো, ধনী আর ধন,—প্রয়োজন বোধে নিধনও।—হামলে পড়েই ওরা সব নিতে চায়। বিছানা আর ভাঁড়ার ঘরের বাছ বিচার নেই।—হঠাৎ বড়লোক হবার নেশাটাই ওদের কাছে দারুণ ষাঁড়-পুরুষ আর পাঁড়-মোদো হবার নেশারও বড়ো। এই যে ইয়াঙ্কী ষণ্ড-অমর্কদের উবুড় হয়ে পড়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ, সাউথ আমেরিকায় "উব্‌গার" করার ছিদ্রপথে শনি হয়ে ঢোকার রেওয়াজ,—এটাই সূক্ষ্ম ভাবে সেকালের বোম্বেটে বৃত্তি।···

সেই দুনিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর ঝুলিঝাড়া পচা মাল এই রাফল্‌স্‌। উনিই
ক লণ্ডন জুলোজিক্যাল সোসায়টির পত্তন করেন। উনি শাক ক্ষেতে বকরার
া মালাক্কায় এসে ঢুকলেন তখন পর্তুগীজ বোম্বেটে, আর মুর-রা এক জোট
ছে। আরকানীদের সঙ্গে সাঙ্গাৎ করেছে। সুন্দরবন, বরিশাল, চাটগাঁ
ক একেবারে মালাক্কা প্রণালী, সুমাত্রা, বোর্নিও—ওদের প্রতাপে থর থর।
ন হাতে মুঘলরা ভারতবর্ষকে এদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।
ন্তু যখন য়োরোপে ঈস্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানী খাড়া করার হিড়িক বয়ে গেলো,—
ন ওলোন্দাজ, স্পানিশ, পর্তুগীজ, দানিশ,—সবাই হুড়মুড় করে পড়লো
সোনার দেশে,—নাম ছিলো যার সুবর্ণগ্রাম, সুবর্ণদ্বীপ, স্বর্ণলঙ্কা, কর্ণ-
র্ণ, সৌভদ্র। শঙ্খদ্বীপ. বর্হিদ্বীপ, শ্যাম, মলয়, যব, সৌলভ—নামগুলোই
র লক্ষ্মীর বসতি।—মুরদের অত্যাচারে এরা বাধ্য হোলো মুসলীম ধর্মকে
ীকার করতে। মুসলিম উপনিবেশের ফলে আরব সভ্যতার তো কিছুই পেলো
এরা, কারণ আরবরা সত্যি কমই এসেছে এই বাবদে, অন্ততঃ সভ্য আরব
াদাদী, ইস্পাহানী, তুরানী,—এরা তো নয়ই। কিন্তু ওমান তটের কুখ্যাত
ম্বেটেরা মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আল্লা-হো-আকবর করে চলে যেতো।
ন্দু কি করতো? শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রাখতো।
গু নিষেধে স্মৃতিশাস্ত্র একটা জীবন্ত পদ্ধতি ও ধর্মকে গলাটিপে বার
র দিলো।

ফলে, এরা মনে, প্রাণে, সংস্কৃতিতে, শিল্পে ভারত ও আরবের এক সুন্দর
িলিত সংস্করণ। এরা যা কিছু করে তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণও
মন, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, গণেশও তেমন। শ্যাম এবং ক্ষ্মের যদি শিব-শক্তি,
ভরবীতন্ত্র এবং শক্তি দেবীর পীঠ হয়, এ দিকটাকে বলা যায় পুরুষ প্রধান
বতার পীঠ।

ধরো, সাউথ ব্রীজ রোডের ওপর যে প্রসিদ্ধ শিব মন্দিরটি, তার বিশাল
পুরম্‌, তার দ্যালের ওপর অত্যন্ত সুস্থকায় ষাঁড়ের সার; তার তোরণ পথে
উচ্চ রৌপ্য যূপ; তার পাশে বিচিত্র বাজার, ফুলের বীথি, আচারের, ঝালবড়ার
কান,—এ সবই তো দক্ষিণ ভারতের।—এমন কি সুদূর জাপানে টোকিওর
কুজী হোঙ্গাঞ্জী বুদ্ধ মন্দির—তাও হিন্দু স্থাপত্যের মিলনের ফলেই অপরূপ।
ন্তু কী আশ্চর্য প্রতিভাধর সেই স্থপতি যে এতো দূরে বসেও স্বপ্ন দেখেছে
রতের বুদ্ধকে। জাপানের মাটিতে শান্তিতে বসতে দেবার জন্যই সেই বুদ্ধের
পেই মিশিয়ে দিয়েছে জাপানের নিষ্ঠা, ভারতের আকৃতি এবং ধ্যানের গাম্ভীর্য।

ঐ পোড়া র‍্যাফ্‌লস-এর কী দায় এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে মাথা
মায়? সেজন্য ছিলো ওয়ারেন হেস্টিংস, প্রিন্সেপ্‌, কার্জন, উড্রফ্‌,—যাঁরা

আসলে শাসক হয়ে আসা সত্ত্বেও মাত্র এ দেশের সভ্যতার প্রতিভায় আত্মহারা হয়েছিলেন।

র‍্যাফল্‌স্‌ কিন্তু ছিলো ক্লাইভের গোত্রের। মুর-বোম্বেটেরা যখন মালায়ার প্রতিটি তীর, প্রতিটি বন্দর, প্রতিটি দ্বীপে আগুন জেবলে, গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করেছে, বাণিজ্য-শাসন-ব্যবস্থা সমস্তই যখন লুপ্ত হতে বসেছে, যখন জাতীয় অধঃপতন তার তলানীতে এসে ঠেকেছে, তখন র‍্যাফল্‌স্‌ ইংরেজের ছাতা ধরলেন স্থানীয় জমিদার-সামন্তদের মাথায়। এই সময়েই ঘটে ইতিহাসের সেই এক অবিশ্বসনীয় বিস্ময়, আরব্য উপন্যাসের বাস্তব সংস্করণ। শ্বেতহস্তীর শুঁড়ে জড়ানো রাজপুরুষ নির্বাচনের কাহিনী সত্য হয়।—এখানেই বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াকের মানুষরা ইংরেজ জেম্‌স্‌ ব্রুক-কে 'রাজা' করে দেন। আজও সেই 'রাজা'র বংশরা সারাওয়াকে রাজত্ব না করলেও রাজা হয়েই আছে।

পিনাং, মালাক্কা, লেবুয়ান, সিঙ্গাপুর, এই চারটি নিয়ে একটি পেল্লায় উপনিবেশ। দুনিয়ার 'শকুন-গিদড়' ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো। 'ছোঁ' মেরে কে কতো নিতে পারে। যেখানে সেখানে ভালো বন্দর। যেখানে সেখানে গা ঢাকা দেবার জঙ্গল।

এই যে পথ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে এর যেদিকে তাকাও সমুদ্র, জাহাজ এবং জাহাজ-বন্দর সংশ্লিষ্ট লোহার জালের বেড়ার মধ্যে ছিমছাম সুন্দর সুন্দর ইমারত কিন্তু ছাঁদটি নিতান্তই ঔপনিবেশিক ; ফাইলের জেলখানা। পথের মাঝে সরু এক ফালি সবুজ দ্যালের মাথায় মৌশুমী ফুলের গাছ। দ্যালের দুধারে পথ দ্যাল মানে একফুট থেকে দেড়ফুট। কখনও কখনও তারও কম।

একটা জায়গায় একটা স্টেশনের মতো, যেন পোড়ো স্টেশন। বিশাল বাস স্ট্যাণ্ড। শত শত বাস। হাজার হাজার গাড়ি বহু বিস্তৃত জায়গায় স্রেফ 'পার্ক' হয়ে আছে।

কারণটা রামশরণ বোঝালো। ছোটো কিন্তু ভারী ব্যস্ত সিঙ্গাপুর শহর গাড়ি নিয়ে তার ভেতরে ঢোকা চক্রব্যূহে ঢুকে অভিমন্যুকে সাহায্য করার মতো।—অথচ সিঙ্গাপুরে নিত্য যারা যাওয়া-আসা করে ও করছে তারা উত্তরের জোহোর পিনাং, পাহাং—এমন কি কুয়ালালাংপুর থেকেও আসছে। সিঙ্গাপুর বিশাল বন্দর নগরী। এই বন্দরটি ১৯৪২-এ জাপান নিয়ে নেবার ফলেই ব্রিটিশ-সিংহ ম্যাঁও করে পালাতে বাধ্য হন। ১৯৪৫-এ জাপানের শাসন গেলো। কিন্তু সে থেকে আরম্ভ হোলো দস্যুদলের উৎপাত। মালয় যেন ছারে খারে যায় যায় নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য পশ্চিমী ইংরিজী কাগজগুলো আর তাদের মালায়া ফেউগুলো চিৎকার তুললো—ও সবই কমুনিস্টদের কাণ্ড। তখন এই এঁটো সামন্তশাহী সর্বত্র যা করে বেড়িয়েছে, তাই করলো। কতকগুলো পেটোয়

শিল্পপতি, জমিদার আর ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্কার নিয়ে সরকার গড়ে মালায়াকে 'স্বাধীন' করলো,—মালায়া ফেডারেশন : পেরেক, সিলাঙ্গোর, নেগ্রীসেম্বিলান, পাহাং, জোহোর—ইত্যাদি। প্রত্যেকটি সমৃদ্ধ ধনাঢ্য প্রদেশ। প্রত্যেকটিতে বিলিতি টাকা খাটছে। প্রত্যেকটি লম্বশাটপটাবৃত দালাল। কিন্তু মানুষগুলো থাকে খায় ভালো। পরিশ্রমী। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা,—পরিবার-ভক্ত, পরিবার-কেন্দ্রিক। সকলেরই একটা ধর্ম আছে। এটা বোধহয় বোর্জোয়া পরিবার-প্রীতির অবদান।

আমি একটা আনারসের কারখানা দেখতে গেছিলাম।—সেটা জোহোরে। জোহোর-সিঙ্গাপুর ফেরী চলছেই। কারখানা মানে পাহাড়ের তলায় গাঁ। গাঁয়ে বিরাট বাগান। আনারসের কাঁড়ি। এবং সে আনারসের মিষ্টতা আমি বোঝাতে পারবোনা। চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া, ফুটখানেক লম্বা ফলার প্রায় চৌকো দাও যেন ক্ষুরের মত শান। তাই দিয়ে খোসাগুলো কেটে ফেলছে মুহূর্তে। রয়ে গেলো চোখ। স্রেফ একটু কাৎ করে ধরে সেই দাওয়ের ধারে স্ক্রু মতো একবার ঘুরিয়ে দিচ্ছে চোখের এপার, আরবার ওপার। একেবারে সাফ। ওপর আর নীচটা ফ্ল্যাট কেটে ফেলছে টিনের কৌটোর মাপে। তারপর সেই আনারস ফালি হওয়া, টিনে রসভরা, টিনে আনারস বসানো, তাকে এয়ার টাইট করা সবই যন্ত্র করছে।

সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে জোহোর বারো মাইল। মাঝে সিঙ্গাপুরের 'নদী' অর্থাৎ সমুদ্দুরের খাঁড়ি। পূব দিকটা দিয়ে ভারী ভারী জাহাজ ঢোকে। দু-দুটো ন্যাভাল বেস্ এবং এয়ার বেস! বলে ভাসমান এয়ার পোর্ট।—পশ্চিম দিকে বড় জাহাজ ঢোকে না। কারণ যখন ঐ সেতু বাঁধে তখন হিসেব না করে বেঁধেছিলো। সেতু প্রায় ৬ ফার্লং লম্বা। ফেরীও চলে। এতো পথ, আর সারা সিঙ্গাপুর দ্বীপ, মানে এদিকে ১৪ ও-দিকে ২৬ মাইলের জনতা সব তো এসে ঢুকবে এই দক্ষিণের শহরে, যেখানে কেপেল হারবার, হার্বার ডক্স্, রেল স্টেশন! কাজেই এখানে গাড়ি রেখে বাসে করে শহরে যায়। বিরাট ব্যবসা এই গাড়ি রাখার।

স্টেশনটি সেকেলে। তবে আমাদের স্টেশনের মতো দু মাসেই নোংরা হয়ে যায় না। এদের 'রখোয়ালী-খবরদারী' ছিমছাম।—

জানো বোধহয় সিঙ্গাপুর, কেন—সারা মালায়াই এককালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজরা শাসন করতো। তখন সিঙ্গাপুরে ৫০০ ঘর লোকও ছিলো না। কিন্তু পূর্বে হংকং পশ্চিমে সুয়েজ যেই না হোলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো সিঙ্গাপুর। সারা সিঙ্গাপুরের ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে অর্ধেকের বেশী থাকে সিঙ্গাপুর শহরে। এক কালে সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বট্যানিক্যাল

গার্ডেন্‌স্‌, বলতো, শহরের বাইরে অনেক দূরে। এখন দেখছি চীনা-টাউনের পর থেকে যত পুরোনো বাড়ি, পুরোনো সিঙ্গাপুর ভেঙে চুরে রসাতলে মাল্‌টি-স্টোরি স্কাই স্ক্রেপার হয়েই চলেছে। বট্যানিকাল গার্ডেন্‌স্‌ পর্যন্ত শহর।

পথটার নামই কেপেল রোড। বন্দরের নাম কেপেল হারবার। বিরা এলাকা জুড়ে বন্দর যেই শেষ হোলো অমনি আরম্ভ হোলো এম্পায়ার ডক কেপেল হারবারের সামনে সারি সারি ছোটো ছোটো দ্বীপ বিকেলের রোদে ঝকঝ করছে। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি সেই দ্বীপগুলো ফ্যাক্টরীর চিমনীতে ভরতি; একটা দ্বীপ ভরতি পেট্রলের বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক। আল্যুমিনিয়ামে রংয়ে রোদ পড়ে সারা দ্বীপটাই যেন ঝকঝক করছে।

র‍্যাফল্‌স্‌ প্লেসে নদীর ধারে রাফ্‌ল্‌সের মূর্তি।—কিন্তু নদী ভরতি নৌকো মাঝ দিয়ে দু-দুটো সেতু। এখানে দাঁড়ালে সিঙ্গাপুরের সরকারি ইমারতগুলো বাহার দেখা যায়। সত্যিকথা বলতে কি সিঙ্গাপুর দেখা মানে চারভাগ। এ হোলো এই নদী আর বন্দর, এবং সরকারি ইমারত, বিচারালয়, পার্লামেন্ট, সি হল।—দূরে ঐ রেলওয়ে স্টেশন। দ্বিতীয়টা শপিং সেন্টার। র‍্যাফল্‌স্‌ প্লেস এ ছাড়াও নতুন একটা শপিং সেন্টার হয়েছে সেখানে আমেরিকানদের ধাঁচে স আর্কেড এবং সুপার মারকেটের জাঁকজমক। ঐ পথটাই ওপরের দিকে গেছে নাটক, নাচ, গানের জন্য থিয়েটার-শেক্‌সপীয়ারিনা। এর সংলগ্ন লাইব্রেরি এব স্পোর্টসের ব্যবস্থা থাকলেও স্টেডিয়াম আলাদা, এবং খুব বড়ো।—তৃতীয় বিভা পড়বে বট্যানিকাল গার্ডেন্‌স্‌ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। বট্যানিক্যাল গার্ডেন্‌স্‌ খ সুন্দরভাবে সাজানো। এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাছাকাছি হওয়ায় উভয়তঃ লাভবান স্টানফোর্ড রোডে না হয়ে যদি মিউজিয়ম আর লাইব্রেরি এদিকে হোতো আ খুশী হতাম। ওগুলো ঐ কোর্ট আর ক্যাথিড্রালের কাছে যে কী করছে জা না।—পুরাকালে ও'রা যাই করে থাকুন, ইহকালে ও'রা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এ সুবৃহৎ গ্যাঁড়াকলের নিকেল মোড়া চক্‌চকে 'পুর্জা'। প্রথমটিতে বিচার দ্বিতীয়টিতে আচার। এই দুটির মধ্যে আমরা বেচারারা নিতান্ত লাচার হ আকচার চচ্‌চাড়ি হয়ে যাচ্ছি!

ম্যুজিয়মটি প্রধানতঃ প্রাণীবিদ্যার সংগ্রহ হলেও সারা মালায়েশিয়ার মধ্যে নানা বর্ণের মিশ্রণ চলেছে তার একটি নিপুণ সংগ্রহ।—এশিয়ার তিনটে ভাগ একটা আরব, একটা দ্রবিড় এবং একটা মোঙ্গোল। এর মধ্যে সোরগোল আ নিয়েও যেমন, 'দাস' বা 'আদিবাসী' নিয়েও তেমন। তারও ভেতরে এসে জুটে মুর, স্পানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ এবং ওলোন্দাজ। কিন্তু আরব বা দিলে এই মালায়াশিয়ায় দারুণ রেটে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলে মিশ্রণ হ

নানা উপজাতি, নানা মেজাজ, নানা আদর্শ, স্বপ্ন, অধিকার, ব্যবসায়ের কথা উঠেছে।

ফিরে আসছি। রামশরণ নিয়ে ওঠালো সিংগাপুর পাহাড়ের ওপর। নদীর ওপর দিয়ে হারবার পার করে ইলেকট্রিক এয়ার-কার যাতায়াত করছে যাত্রী-হজামৎ করার জন্য। হেসে বললাম, রামশরণ, প্লেন চড়ে চড়ে আর এ সবের মোহ নেই। কিন্তু নীচে ঐ যে বাগানখানা দেখা যাচ্ছে ওখানে যেতে পারলে হোতো।—

রামশরণ বললো বাড়িটা ভারতীয় ব্যবসায়ীরই বটে। কিন্তু কতোদিন যে ঐ ঠাট থাকবে কে জানে ?

কেন বলো তো !

ও গাড়ি চালিয়ে নেমে এলো পার্কের পাশে একটা ছোটো দোকানে। একখানা দুখানা করে পব পর ছয় সাতখানা সুন্দর রং করা কাঠের দোকান। সামান্য টুকিটাকি খাওয়া, পানের ব্যবস্থা—কোকাকোলা ইত্যাদি। তবে ডাব, লেবু, আনারসই বেশী।—রুটির দোকান আছে। খবরের কাগজ, কমিকস্, নানারকম টুকিটাকি বই, পিকচার পোস্টকার্ড।

সামনে লন্। লনে ঢাকা এবা না ঢাকা বেঞ্চি জুড়ে মানুষ মনমতো খাচ্ছে, গালগল্প করছে।

রামশরণ একটা বীয়ার নিলো। আমি ডাব চাইলাম। কিন্তু কী ডাব ! আমি জীবনে অতো মিষ্টি জল তো খাইই-নি, সামনে কেটে না দিলে বিশ্বাস করা কঠিন আলাদা কোনো মিষ্টি যোগ করে দেয় নি ! জলও এতো পরিমাণ যে শেষ করতে আমার বেশ কষ্ট হয়েছিলো।—

রামশরণ বললো, সিঙ্গাপুরের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ চীনা। খাটে, ব্যবসা করে, ব্যাঙ্ক করে, ক্ষেত-খামার আছে,—আর ঐ নৌকো সাম্পান। নৌকো বাড়িতে জন্ম মৃত্যু হাজার হাজার। তারপরেই ভারতীয়েরা, আজকাল আবার পাকিস্তানীও বলতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

আমি বলি, কেন ? বাংলাদেশী, বাঙ্গালী ?

রামশরণ হেসে ওঠে।—

বলছিলেন, কেন ? চীনারা যে রেটে বাড়ছে, এবং চীন কম্যুনিজ্‌ম্ যেভাবে, দৌড়ুচ্ছে ভারতীয়দের ঠাট থাকবে কি-না কে জানে। মিশে যেতেই হবে।

কিন্তু আমরা ফিরে আসি হোটেলে। আসার পথটা রামশরণ বেছেছিলো ভালো। সেই চীনাপাড়া, চায়না টাউন। একটি ঘটনা মনে থাকবে।—আমার সেইদিনই মরে যাওয়া উচিত ছিলো। এর আগে বার দুই আরও মরেছি। সে গল্প এখানে করবো না। সিঙ্গাপুরের চায়না টাউনে মরার কথাটা বলি। কারণ

—অবশ্য বুঝতেই পারছো,—একটি মেয়ে। তোমরা মারলেই মরি। নতু
নয় কিছু।

ভাবছো, আপনার আর অন্য কারণে কী নেশা হবে যে মরতে বসবেন
ভাবো। তোমার চিন্তা শক্তির বাইরেও অচিন্ত্যনীয় যে সব শক্তি আছে তা
ওপরেই আমার ভরসা বেশী। কিন্তু মেয়েটি ছিলো একেবারে স্মার্ত মতে গৌরী
আঠ ছেড়ে নয় হবে।—কিন্তু প্রকৃতি যখন বাদ সাধেন তখন কালধর্ম ল্যাজ তুলে
ত্রিলোকে ধাবমান।—

ঘটনাটা বলি শোনো।

জানোই আমি ফোটো তুলতে বড়ো জানিই নে। দেশ বিদেশে যাই। ফোটো
একেবারে তুলবো না তা কি হয়? কিছু কিছু ফোটো তুলে থাকি; বাতিক
আরও তুলতাম। বই লিখবো ভ্রমণের; ছবি থাকবে না। যেন প্রমাণ বিহী
বিচারের রায়; বা নথ বিহীন নাক নেড়ে কাজিয়া। কিন্তু আমাদের বাংল
প্রকাশকরা বলেন ওতে দাম বেড়ে যায়। ছবি চলবে না। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠ
কেনই বা প্রমাণ দাবী করবেন না, এ গোপ্পে-টাও হকীকৎ বলছে, না লাগিয়েছে
ম্যারিনর্স-টেল্; মানে গাঁজা কবলাচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে আমার ধর্ম আমি
বুদ্ধুর মতো পালন কোরে যাই। তোমাদের কাছেই ধরো না, যে সুবিধেটুকু
মাঝে মধ্যে আশাকরি, তাতো তোমরা মিথ্যে করেও ধর্তব্যের মধ্যে ধরো না
তবু তো আমার ধর্ম আমি করেই যাই। আড়ালে ডেকে চুপি চুপি কবিতা
শোনাই, তোমার দিদিকে না বলে সিনেমার টিকিটও কাটি আরও আরও,—কত
প্রকারে কতো লগ্নই তো ভ্রষ্ট করেছো দিদি।

তা, দেখলাম চীনাপাড়াটায় বাজারের খোলতাই হয়েছে। জানলা দিয়ে
কাঠি গলিয়ে তালায় তালায় নানা রঙের জামা-পাজামা শুকুচ্ছে। শুকনো
মাছেব, আরও শুকনো ব্যাঙের মালা দুলছে। নানা রকম পতাকায় ওদের
বিচিত্র চিত্রিত লেখা ঝুলছে। গলি ভরতি ছাতা মাথায় মেয়ে-বুড়ো ছেলে
বুড়ী সবাই নেড়ে চেড়ে দর কষাকষি করে জিনিষ কিনছে। নতুনই বটে। একটু
উঁচুতে দাঁড়াতে পারলে ছবি নেওয়া যেতো। কতো যে রেস্তরাঁ। ওরা গলি
ভর্তি করে টেবিল চেয়ার পাতছে। এর পরে আর এই আলো আর এই ভীড়টা
পাবো না। কোথাও একটু উঁচু জায়গা দেখলাম না।

হঠাৎ নজর পড়লো একটি ফুলের দোকানে। থরে থরে নীচ থেকে ছাদ
অবধি ধাপে ধাপে ফুল। পথের ওপরে একটা কাঠের কাউণ্টার টেবিল সবে
রাখা হয়েছে। বুঝছি এবার ওটাও সাজাবে। জিগ্যেস করতে চাই আমাকে ওর
ওপরে একটু দাঁড়াতে দেবে কি-না। ভাষা জানি না। রামশরণ তার গাড়িটা
কোনো রকমে একটেরে পার্ক করে দাঁড়িয়ে আগলাচ্ছে গাড়ি। দেখি আমার

দিকে পেছন করে সেই আট বছুরে গৌরী বিচ্ছুটি দাঁড়িয়ে। আমি তার কাঁধ ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করছি খুকী, এইখানটায় চড়ে একটা ছবি নিই ভাই? মানে মুখে চোখে একেবারে কাননবালা, ছবি বিশ্বাস, ভানু বন্দ্যো—সব মিলিয়ে দিয়ে হাতের ক্যামেরা ঝাঁকিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বলছি। মানে, বলতে সে আর দিলো কৈ! এক বিরাট বিপুল আর্তনাদ তুলে রড় দিলো ভেতরের দিকে যেন তামাম সৈন্য দল নিয়ে স্বয়ং চেঙ্গিস খাঁ এ ক্ষুদিয়াটার ওপর বলাৎকার করার ঢালাও হুকুম দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একদল চীনাক্ চীনাকিনীর অক্ষৌহিনী কোয়াং মোয়াং করে আমায় ঘিরে ধরে সাবাড় করে আর কি! আমি যখন টেবিলে চড়ছি ওরা ভাবে আত্মরক্ষা করছি। অন্যান্য দোকানের চীনারাও ঝটাপট এসে হাজির যেন মুর্গীর খাঁচায় শেয়াল ঢুকেছে। আমি বাপের পুণ্যে আর তোমাদের শিক্ষায়, মুখের সেই তেলালো নপুংসক হাসিটি একেবারে পেরেক মেরে টাঙিয়ে রেখেছি। নড়তেও দিচ্ছি না। এবং মনোযোগ দিয়েছি ক্যামেরায়। ওরা আমেরিকান ছবিতে পর্যন্ত এমন কোনো মা-কা-লাল মিঃ ফস্‌ডিক্‌-কে দেখেনি যে গোটা পঞ্চাশ চীনাক-চীনাকীর-অনুস্বারান্ত-গাল-গালান্ত সত্ত্বেও ভবানীপুরী শাঁখারীপাড়ার হাসিটি ট্রামে ঝুলন্ত অবস্থায় বজায় রেখেছে। ওরা বাংলা জানলে বলতো এজ্ঞে, আপনার বাড়ি কি সিদ্ধার্থ পালিত নগরীর কোনো শ্রমণাগারে? কিন্তু মন বলছে, ভট্‌চাজ, নামলেই ওরা হালাল করবে। গুরুবল! রামশরণ এসে পড়েছে। তাই না দেখে সেই গৌরী-র নিকুচি-করা মেয়েকে ফির-সে শুধালাম,—ছবি নিতে দিবি খুকী?

আচ্ছা চীনারা হাসলে তুমি বুঝতে পারো? কাঠের চীনা, চীনামাটির চীনা, পেতলের চীনা যখন দুহাত তুলে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসে বুঝতে পারি। কিন্তু অফিসে ঝুলধরা ধোঁয়া পড়া এদের হাসি তো ভাই বুঝলাম না। রামশরণ বললে, জয়গুরু! জয়গুরু! পালান হুজুর। পালান। ওরা আপনার ক্যামেরা ভাঙবে! কী প্রমাদ! বড় সখের পেন্‌ট্যাক্‌স্‌।—কিন্তু তাড়া কুকুরের সামনে পালানো নিষেধ। সামনে দাঁড়িয়ে ঢিল কুড়িয়ে মারার ভাণ এরা দুপেয়েরা ধরে ফেলবে। আমায় ততক্ষণ ওরা টানাটানি করা সুরু করেছে। এবং স্থানে অস্থানে গুঁতাচ্ছেও। ওরা আবার জিজুৎসুর কী সব চর্চা করে। ভেবে চিন্তে আমি হঠাৎ খুব জোরে হাউ মাউ কাঁউ করে কেঁদে উঠলাম। লরেল হার্ডির ছবিতে মাঝে মাঝে মেয়েলী গলায় কেঁদে লরেল বাজীমাৎ করেছিলো। সেই কথা স্মরণে আনলাম।

ভাই পদ্মদি, ভাই,—বিশ্বেস করবে না। ওরা সরে দাঁড়ালো। আমি পিছু

হটলাম পিছু পায়ে। ওরা জায়গা দিলো। আমি আরও জোরসে কাঁদলাম। চিৎকার করে উঠলাম রামশরণ রে !! আরও জায়গা পেলাম।

গাড়ি এসে গেছে। আমি ঝপাং করে তার ভিতরে। বিশেষ ক্ষতি হয়নি একজন কেবল তার চা ভরা কাপটা আমার ঘাড়ে চলকে দিলো তার বেশির ভাগঃ গাড়ির বাইরে। ভেতরে যা সামান্য পড়েছিলো আমি চেখে দেখি নি। কারণ জানোই আমি চা খাই না। কফি খাই।

তারও পরে কী আর কফি না খেয়ে থাকা যায়! রামশরণ বললে, জয়গুরু, জয়গুরু! খুব ফাঁড়া গেছে ভাই-সাব্। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না ভাই সাব! কী বোলে আপনি ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন? আর ওরাই বা অমন ছেড়ে দিলে কেন?

আমার গুমোর আমি ভাঙিগ কেন পদ্ম-দি। আমি বলে দিলাম,—বাংলা ভাষার হিকমতই এই। জাপানী লেন্সের চশমা জানো? যদি সুরুজ নারায়ণের তেজ জবরদস্ত হয়ে আসে, আপ্-সে সে লেন্স্ মুখ কালো করে; দেখতে কষ্ট হয় না, অন্য রঙিগন চমশা পরতে হয় না। যদি সুরুজ নারায়ণের মুখ অন্ধকার হয়, সে চশমা সঙেগ সঙেগ চাঁদ পারা মুখ করে দন্ত বিকশিত করে হাসে; দেখতে কষ্ট হয় না। জানো তো সে চশমার লেন্স্?···বাংলা ভাষাও তাই। কারুকে যদি সুবিধে মতো শালী বলতে পারো সে তোমার সঙেগ কামিখ্যে অবধি পালাতে রাজী। আবার অসুবিধার সময় যদি গিন্নী বলেও ডাকো তোমায় কামিখ্যের ওপারে সিঙগাপুরে তাড়িয়ে ছাড়বে। বাংলা ভাষায় যদি পলিটিক্স্ করতে, বুঝতে, তামাম তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্র একদিকে, আর বাংলা ভাষার সাধন মন্ত্র 'হিং-টিং-ছট্' মন্ত্র অন্য দিকে।—

শুনেই রামশরণ আঁকু-পাঁকু।—কী মন্ত্র বললেন? কী মন্ত্র?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম,—মন্ত্র কী অমনি বলতে আছে রামশরণ? বললেই তো আমি হয়ে যাবো গুরু, তুমি হয়ে যাবে চেলা।—তোমায় বীয়ার ছাড়তে হবে, নারিয়েল-পানি ধরতে হবে! চলো, কফি খাই। একটা দোকান দেখো।—

সে কি দোকানে কেন কফি খাবেন? চলুন বাড়ি আমায় যেতেই হবে; নৈলে কিশোরের অম্মা ঘাবড়াবে। ট্যাক্সী চালাই তো। ঠিক সময়ে না ফিরলে ভাববে একসিডেন্ট। তাই ফিরি।

কিসের অ্যাক্সিডেন্ট? গাড়ির বাইরের অ্যাকসিডেন্ট না ভেতরের অ্যাক-সিডেন্ট?

রামশরণ হাসে। বলে প্রথম প্রথম যখন ট্যাকসি চালাতাম ঐ দারুণ লোভ

ছাড়া যেতো না। এক এক সময়ে এমন এমন হুরী এসে বসতো, চলে যেতাম জোহোরের রবার ক্ষেতে। কিন্তু শিক্ষা হয়ে গেলো একবার। কিশোর কী মাঈ নিজে তখন জোয়ান। ক্যানিংহাম সাহেবের বাগিচায় ও ঘাস নিড়োয়। আমি গেছি জোহোরের সেই বনে। মেয়েটার টান ছিলো জবর টান। ওমা, হঠাৎ মনে হোলো বনের একটেরে একটা কুঁড়ের ধারে আমার অন্য ট্যাক্‌সি খানা! কাছে গিয়ে দেখি কিশোর কী মাঈ দিব্যি এক জওয়ান পংজাবীর সংগে শেখী মস্করায় লদ্‌ লদ্‌। আমায় দেখে কোথায় হকচকিয়ে যাবে। তা নয়, বললো এসো এসো আমার মুগলে আজম্‌, আমার সরতাজ, আমার দিল বাগিচার বুলবুল এসো। তা একা কেন? তোমার হুরী ছুঁড়ি কোথায় গেলো। তাকেও নিয়ে এসো। মাছের ফ্রাই আর…

আমি তো দাদা থ'। বলে কী!

সেই শিক্ষা হয়ে গেলো। আর ও পথে নয়। দাদা বিয়ের বয়স পুরুষের পেরোয় না। যদি আর বিয়ে করেন, কখ্‌খনো রোহতকী জাঠ বিয়ে করবেন না। ওরা মেয়েই নয়। ছটা পুরুষের মালমশালা দলে মোলে ব্রহ্মাজী একটা রোহ্‌তকী মেয়ে গড়েন। তওবা!

কাণে হাত দিলো রামশরণ। জয়গুরু!

কিন্তু বাড়িটি সুন্দর। শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে ক্রাঞ্জী নদী আর সেংগা এয়ার পোর্টের মাঝে বিস্তর ফৈলাও এক আনারসের বাগান। সাহেবের বাগান। তার পাশে রবারের গাছ ঘেরাও রবারের ছোটো বাগান। সাধারণ টেবিলের বুকের মাপের রবারেব মোটা মোটা চৌকো চৌকো চাপ্‌। ঝুলন্ত বাঁশের ওপরে টাংগানো এধার থেকে ওধার।—গাছগুলোর গায়ে ইংরিজী 'ভী'-র মতো করে কাটা। নীচে একটি করে কাপ রাখা। রস ক্ষরে ক্ষরে তাতে পড়ে। ওপর থেকে কাটতে কাটতে নীচে অবধি আসে। দূরে দূরে দূরে রাবার গাছের কুঞ্জ! একটা কুঞ্জ আর অন্য কুঞ্জের মাঝে খালি জায়গা। ঢলঢলে তকতকে সবুজ। কোথাও কোথাও সেই সবুজে সব্জীর চাষ। তার পরে এক জায়গায় নারকেল গাছের বন। কোনো গাছ একতলা ডেড়তলার বেশী উঁচু নয়।—আর মাঝে একখানি সুন্দর বাড়ি বটে। তবে আমরা যেমন মাদুর করি, খড় দিয়ে ওরা গড়ে মোটা মোটা মাদুর। সেই মাদুর থরে থরে বসিয়ে দেয় বাঁশ এবং কাঠের বরগা-কড়ির ওপর। মনের মতো কোরে কেটে তার শ্রীবৃদ্ধি করে। খুঁটোর ওপরে বাড়ির পাটাতন। ঝকঝকে পরিষ্কার পালিশ করা কাঠের। কাঠের দরজা জানালা ল্যাকারের রংগে ঝিকঝিক করছে। জালির কাজ আর জালির কাজ। তার ভেতর দিয়ে আলো ছায়ার ঝিলমিল নারকোল গাছের পাতার ঝিলমিলের সংগে

মিশে যায়।—বাড়ির তলায় মোটরের জায়গা। কাপড় ধোবার ব্যবস্থা। দূরে পুকুর। পুকুরে ঘাট। আরও দূরে খাল। খাল গিয়ে মিশেছে ক্রাঞ্জীতে। এই ছবির মতো বাড়িগুলোর মালায় নাম কাম্পোং। কাম্পোং আমাদের বাংলা-বাড়ির চেয়ে অনেক শক্ত, অনেক সুন্দর অনেক গোছগাছ।

আমরা উঠে গিয়ে বারান্দা ঘেরাও ছাদ ঢাকা পোর্টিকোয় বসলুম।

সত্যিই রামশরণের স্ত্রী রোহ্‌তকী ধাঁচের পোখ্‌তো মহিলা। বেশ বোঝা যায় বহু ধক্‌ সামলেছেন, সামলাতে পারেন। বৌকে ডাকলো। বৌও খুব হাসে। শাড়ি পরেছে বটে, কিন্তু গহনা সবই রোহ্‌তকী গহনা। চুলের বাঁধনটাও তাই।

দুই মেয়ে আমার। বলছে রামশরণের স্ত্রী পারওয়তী। জান্‌বী (জাহ্নবী) আর জমুনা (যমুনা)। কিন্তু এরা তো জান্‌বী বলতে পারে না। বলে জোয়ান। বিচ্ছিরি লাগে। আমার মেয়ে বেশ মোটাসোটা বলে ঠাট্টা করে।

আমি বলি,—তা নয়। তা নয়। ওরা জোয়ান্‌ মানে তাগড়া জানবে কী করে? জোয়ান্‌ এক খুব বড়ো খৃষ্টান যোগিনীর নাম। জোয়ান-অব্‌ আর্ক একজন খুব নাম করা ফরাসী লড়াকু মহিলা। অংরেজের দাঁত খট্টা করে দিয়েছিলো।

ওঃ! তাই বলুন! রামশরণের দিকে চেয়ে বললো, আচ্ছা তুমি তো এ কথা আগে আমায় বলতে পারতে! সাধ্‌ওয়াইনের নামে কতো হেরাফেরি ভেবেছি। তওবা! জাহ্নবী-যমুনার মা পার্বতী খুব খুশী।

কফির পর যখন সুইমীংপুলে ফিরে এলাম তখন চাঁদ উঠছে।—সারা পথটাই কায়দা করে রামশরণ সমুদ্রের ধার দিয়ে এনেছে। কুইন এলেজাবেথ ওয়াক্‌-টি এতো সুন্দর সাজানো যে মেরিন ড্রাইভ্‌কে-ও মনে হয় দুয়ো রানী। আগাগোড় পথটায় রেলিংয়ের পাশে জলের ধারে বেঞ্চি পাতা। জোরালো আলোয় রাতে যেন দিন হয়ে আছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট চওড়া পথ আগাগোড়া রঙীন টালী ছাওয়া। মাঝে মাঝেই ঘেরাও টব দিয়ে। টবে ফুটে আছে আশ্চর্য সুন্দর সবই প্রায় ট্রপিক্যাল ফুল।—তার পরের সারি গাছ। পাইনও আছে তার তলায় চেয়ার, টেবিল। দামী জায়গায় দামী কণ্ট্রাক্টর দামী রেস্টুরাণ্ট চালাচ্ছে। তুলনায় বম্বের বর্সোবা বীচ্‌, বা জুহু—কিছু নয় কিছু নয়।

আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। সত্য বলতে কী সকলেই সকলের দেশ ভালোবাসে। সে কথা বলছি না। আমি বলছি বহু দেশ দেখার পরে আমি আজ বলতে পারি টুরিস্ট-এর পক্ষে ভারতবর্ষের মতো এতো জানবার আ

দেখবার দেশ আর নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের রসে দুটো পরস্পর বিরোধী মনোভাব। একটি হোলো নির্বেদ ; অন্যটি 'কৃপণতা'।

হঠাৎ রেগে যেও না। দেশের নিন্দা যে করে সে মায়ের নিন্দা করে। কিন্তু মায়ের ভার নিয়ে যারা মাকে ভিখারিণী সাজিয়ে রাখে তাব প্রশংসা করাকে নরক মনে করি। আমাদের কে কবে যেন বলেছিলেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী ঋষিরা ঐ ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা আর ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, যত্র বিশ্বম্ভবত্যেকনীড়ঃ প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমের গান গেয়েছেন। ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করি হে ঋষি আপনি কী মহাভারতে ময়-নির্মিত সভার বর্ণন পড়েন-নি ? হরিবংশে যাদবদের বনভোজনের বর্ণন পড়েন নি ? রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ভরতের সৈন্য সম্বর্ধনার বর্ণন পড়েন নি ? পড়েন নি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণন, রামের অভিষেকে নগরবাসীর সাজসজ্জার বর্ণন ? বলতে ইচ্ছে হয় দাক্ষিণদেশের মন্দির নগরীগুলোর স্থাপত্য, কোণারক, হালিবিদ, মৈশুর, তাঞ্জোর, শিবকাঞ্চী, ইল্লোরা—এদের বর্ণনার সমৃদ্ধি, সাজসজ্জার পারিপাট্য,—এমন কী অজন্তার চিত্রমালায় সাধারণ সমাজের যে রূপ বিবৃত,—এ সব কী ত্যক্তেন ভুঞ্জীথার নির্বেদ ? এই সেদিনের কাশ্মীরী মনীষা অভিনবগুপ্তের বসবার ঘরের যে বর্ণনা পাই, কাদম্বরীতে যে সমাজ পাই, বুদ্ধ-চরিতে, মুদ্রারাক্ষসে সমাজের যা চিত্র পাই,—তার ভিতরে ত্যক্তেন ভুঞ্জীথার দণ্ডীস্বামীপনা কোথায় ? এ নির্বেদ, এই প্রাচুর্যের প্রতি অবহেলা ধীরে ধীরে মানুষকে, সমাজকে, মনকে, স্পৃহাকে, উৎসাহকে অবক্ষয় থেকে অবসাদে, অবসাদ থেকে অনাস্থায় সর্বনাশে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে যে ভারত 'সকল দেশের রানী' হতে পারতো, সে আজ শব্দার্থেই ভিখারিণী। ভণ্ডের মার দশা।

সিঙ্গাপুর চিরকেলে দালাল-নগরী। জাহাজ জাহাজ মাল রপ্তানী, জাহাজ জাহাজ মালের খালাস, জাহাজের পর জাহাজের আনাগোনা,—এই তো সিঙ্গাপুর। নৈলে এর আছে কী ? আনাগোনার মাঝের ফাঁকটুকু সৌখীন ফাঁক, বিশ্রামের ফাঁক। ও ফাঁক টাকায় ভরা যায়,—মদ, মেয়ে, জুয়া, লা-পরোয়াঈ দিয়ে। ঐ বাবদে মেয়েমানুষ, নানা প্রকারের, নানা দেশের, নানা বয়সের মেয়েমানুষের আশ্চর্য সুন্দর বাজার সিঙ্গাপুর। এর দালালদের ব্যবস্থাও আশ্চর্য। ব্যাঙ্ককে মেয়ে পাও, বেশ্যা পাও চুনোপুঁটির দরে। বাজারে যেমন পচা মাছ, শাক, কুমড়ো-ফালির ভাগা সাজানো থাকে।—কিন্তু সিঙ্গাপুরে মেয়েবাজার চলে টেলিফোন ধরে। টাকাকড়ির হিসেবই নেই। তোমার দোস্তী শেষ হলে তুমি জাপানী মুক্তো দিলে, না বেহরীনের মুক্তো দিলে তাই নিয়ে কথা। মণির মালার

পাথরগুলো জোহানেসবার্গের, না রটারডেমের, না সীয়েরা লীওনীর। সোনা দিতে চাও দাও। কাল এসোনা। কাল প্রিন্স রহিম আসছেন কুয়াইৎ থেকে। তার উটের গলার জন্য মোটা দানার মুক্তো কিনতে চান। উটনীর পায়ের নখের তদ্বিরের জন্য ভালো ফরাসিনী খিদমৎগার্ণি চান। এই সব ব্যবস্থার জন্যে এসেছেন। খাটাখাটুনী, ধকল। একজন সঙ্গিনী দরকার, মুক্তো থেকে মানিকুয়োর সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন।

এই পাটেরই একজন হুরী হাস্‌সানা তুফায়েল্‌। নিজেকে বলেন মিশরের রাজবংশের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিলো পারস্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাগ্নের সঙ্গে। ভুল করে সেই ভদ্রলোক হাস্‌সানার পানপাত্র থেকে মদ খান। কী যে হোলো। বাঁচলেন না। অথচ মদটা তিনি আনিয়েছিলেন প্রেয়সীরই জন্য। হাস্‌সানার সেই বাবদে আফশোষ খুব। বাঁচলে কী যে তাঁর ক্ষতি হোতো কে জানে। সিড্‌নী ব্যারাট কম বড়োলোক নয়। নর্মান হেগার্থোকে লোকে অর্বুদপতি না কী বলে। সেই নর্মান, সিড্‌নীকে ভয় খেতো যেন তৃতীয় পক্ষের গিন্নী সিড্‌নীর সঙ্গে হাস্‌সানার সম্পর্ক বালির ওপর প্রাসাদের সম্পর্ক। বালি সরে গেছে। প্রাসাদ 'সি-ভিউ' হোটেলের সুইমীংপুলের তীরে বিকিনীতে বিকিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা রাবার ম্যাটের ওপর।

বুঝলাম তুখোড় রামশরণ এই চালটি কখন টেলিফোনযোগে চেলেছে জলের মধ্যে এক ফাঁকে রামশরণ বললো,—এরা কখনও কারুর কাছে টাকার প্রত্যাশা করে না। কী যে এদের মন্ত্র জানি না। এরা ঠিক বুঝে নেয় কোন্ বোয়ালের কাছে কী কামড় আশা করা যায়।

আমি বললাম, যে মন্ত্রে টিকটিকি জানে কোন্ পতঙ্গ তার ভোজ্য ; নাগিনী বোঝে কোন পথে খরগোশ যাবে। ওটা খাদ্য খাদকের প্রীতি।

আপনার ও বাবদে বিশেষ কিছু আছে বলে তো আমার মনে হয় না তবে কেন ?

হাসলাম।

হাসলেন কেন ?

বলবো না। তোমার বৌদির নিষেধ। উনি বলেন আমার ঠোঁটে বিষ।

বৌদি বোধ হয় এখনো জ্বলেন।

এখন উনি তোয়াক্কাই করেন না। নিজেই নাগকন্যা বনে গেছেন।

তবু বলুন।

ভাবছিলাম আমি মালদার কিনা তা হাস্‌সানাও বোঝে বলছো ; আবার তুমিও কিন্তু বোঝো। তুমি ঝানু ট্যাক্‌সীচালক। বড়ো হোটেলের ট্যাক্‌সী চালক !

জয়গুরু ! জয়গুরু ! এ বাঙ্গালী দাদা। এ আপনার ভুল। ট্যাক্সিওলা
রা টুরিস্ট দুয়ে খায় আর হাস্সানারা যারা টুরিস্ট দুইয়ে শান জমায়,—জাতে,
াতে, রুজীতে তারা এক দাদা, এক। শুনুন হাস্সানাকে বলে দিয়েছি আপনি
াত গুণতে জানেন। ব্যস্, ওর হাতটা একটু দেখে দেবেন।

রাতে হাত দেখা ? সে কী করে হবে।

আরে দাদা, ওদের যা কিছু হতে হয়,—সবই তো ঐ রাতের ব্যাপার।
াচ্চা কী কিছু হয় ? সব ঝুঠা, সব ঝুঠা।

বললাম, না রামশরণ সব ঝুঠা নয়। সব ঝুঠা হয়ে গেলে বিশ্বনাথের
রবার উঠে যাবে।—

রামশরণ তো থ'। হাঁ করে চেয়ে রইলো আমার মুখের পানে।

আমি তার অল্পক্ষণের মধ্যেই রাবারের ভেলা ফেলে দিয়ে সাঁতরে ও ধারের
সেগো—পামগুলোর তলায় বসেছি।—

তখন মনে পড়ে যায় কণিকার কথা। এ সময়ে সে থাকলে রামশরণ অন্য
চালে কথা বলতো। আমারও ফুরসৎ হোতো না হাস্সানা-মী করা;
হাস্সানারও সাধ্য হোতো না কণিকা-গণ্ডী পার হয়ে আমার শাকের ক্ষেতে নোলা
বাড়ানো। কণিকা সত্যিই বোন্। মিষ্টি বোন্।

হাস্সানা হাত মেলে দিয়েছে।

আমি কায়দা করে বলি,—আগে কেউ হাথ তোমার দেখেছে দেবী ?

দেবী ? দেবী কী ?

আরবী ভাষায় বলে বুৎ।

হাস্সানা বলে আরবী ভাষা জানো তুমি ?

মিষ্টি মানুষ কখন কোথায় মেলে কে জানে। গ্লাসগো যেতে যেতে এক
গাঁয়ে ঘোড়া দেখে নেমে পড়লাম। তার মধ্যে অতি সুন্দরী এক ঘোড়া দেখে
তার কাছে যেতে না যেতে বান্ধবী বলে,—ওদিকে যেও না। স্তীফানী অত্যন্ত
বদ মেজাজী। কিন্তু সেই স্তিফানী যখন বিল্লীর মতো আমার আদরে ঘন
ঘন উল্লাস জানিয়ে পা ঠুকে লেজ আছড়ে আমায় পিঠে বহন করতেও রাজী
হোলো,—বান্ধবী বল্লে আশ্চর্য ! কী করে বশ কর্লে ?

আমি বল্লুম সুন্দরীদের বশ করতে হয় সুন্দর ভাষায় মর্মের কাঞ্চীবন্ধন
আলগা করে দিয়ে।—তখন ঘোড়ার কানে ঘোড়ার ভাষায় কথা বলেছি।—তুমি
তো আরবী। বুৎ বোঝো ?

ও বল্লে,—আমার এমন কিছু নেই যা আগে কেউ দেখেনি। তুমি বলো
তুমি আগে কখনও হাত দেখেছো ?

হাতখানা চেপে মুঠোয় বেঁধে বলি, এ যদি হাত হয়, আগে যা দেখেছি

সব হাতা ; আর এ যদি পাখি হয়, আগে আগে যা দেখেছি সব—সব মুর্গী ।—কিন্তু কেউ কি কখনও তোমায় বলেনি ভিজে হাতে পোড়া কপাল যতো তাড়াতাড়ি দেখা যায় আগুনের শিখায় লকলকে লাল কপাল ততো তাড়াতাড়ি দেখা যায় না। আগুনের ভাব শুকনোর সঙ্গে ।—

হেসে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। আমিও ঝাঁপালাম। ও বললো,—আগুন থাকুক। এখন জলের ভাব যার সঙ্গে তাই চলুক। রামশরণ শিককাবাব নিয়ে অর্থাৎ 'সাত্তে' নিয়ে হাজির। ভাসা টেবিলে প্লেট, প্লেটে ক্যাচ্-আপ-টম্যাটো সস্। কাঠিতে গাঁথা মাংস। খেতে খেতে গল্প চলতে লাগলো। সে গল্প নিয়ে পরে বই লিখবো। এখন উঠতে হবে। ঘরে গিয়ে পোষাক আশাক করে ডিনারে বসতে হবে।

লেট্ ডিনার। খাওয়াচ্ছি আমি। টেবিলে হাস্‌সানা নেই। ওকে নিয়ে অন্য টেবিলে জনৈক চীনা-কাৎলা বসেছেন।

ওঃ! বলতে ভুলে গেছি হাস্‌সানা কী পোষাকে এসেছিলো।—বলতে যদি পারতাম, মানে বলার যদি সাহস হোতো, অল্পকথায়ই বলা যেতো। বেশী থাকলেই তো বেশী বলার দরকার! বলে কাজ নেই। কে শুনে ফেলবে। কী বলবে। কী মনে করবে। জীবন ভোর আর করলাম কী পদ্ম, কেবল ক্যারাক্টার সার্টিফিকেটই তো সংগ্রহ করে বেড়ালাম। তবে একটা কথা বলবো পরে আবিষ্কার করেছিলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়।

খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে নেমে গেলাম। সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। সী-ভিউ থেকে মাইল দুই দূরে সেই বিরাট বাস-মোহানা যেখানে বোধহয় পৃথিবীর সবসে বড়ো পার্কিং ব্যবস্থা, অন্ততঃ জমির ওপর।—সেখানে চড়ে বসলাম জোহোরের বাসে। এবং বাস বদলালাম ক্রাঞ্জী নদীর মোহানায় এসে। সেখানে নিলাম ট্যাক্সী।

অতো সকালে তার বাড়ি আমায় পেয়ে রামশরণ তো অবাক। আমি বললাম, —আমার প্রোগ্রামটা একটু পালটেছি রামশরণ।—ভাবছি জোহোরে যাই। যা-দেখার দেখে ফিরতি পথে মন্দির, বাজার সেরে বিকেলের প্লেনেই চলে যাই হংকং। এখানে আর কী দেখার আছে। সকালে আবার ঐ হাস্‌সানা যদি ঘাড়ে চাপে···

খুব খুশী পারওয়তী। ও তৈরী হচ্ছিলো কাজে যাবে। সিঙ্গাপুর করপোরেশনে পথের বাগান নিড়োবার কাজ ওর। সকালে তিন ঘণ্টা, বিকেলে দু-ঘণ্টা। আমাকে দহী বড়া আর পালং-কপির পকোড়া খাওয়ালো। সিঙ্গাপুরে সব ভারতীয় খাদ্যই পাওয়া যায়। এগুলো অবিশ্যি পার্বতী বাড়িতেই করেছিলো।

সিঙ্গাপুর আর জোহোরের মাঝে যে পুল সেটা নিরেট-ই বলা চলে।
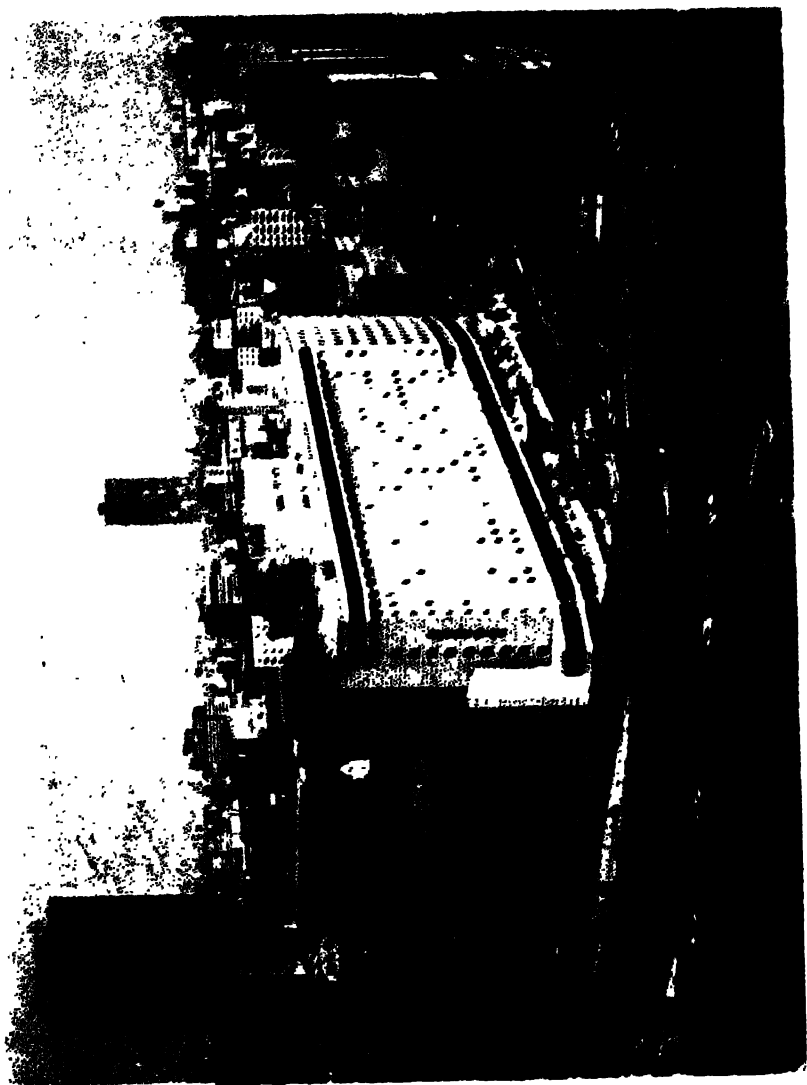
টোকিও শহরের একাংশ।
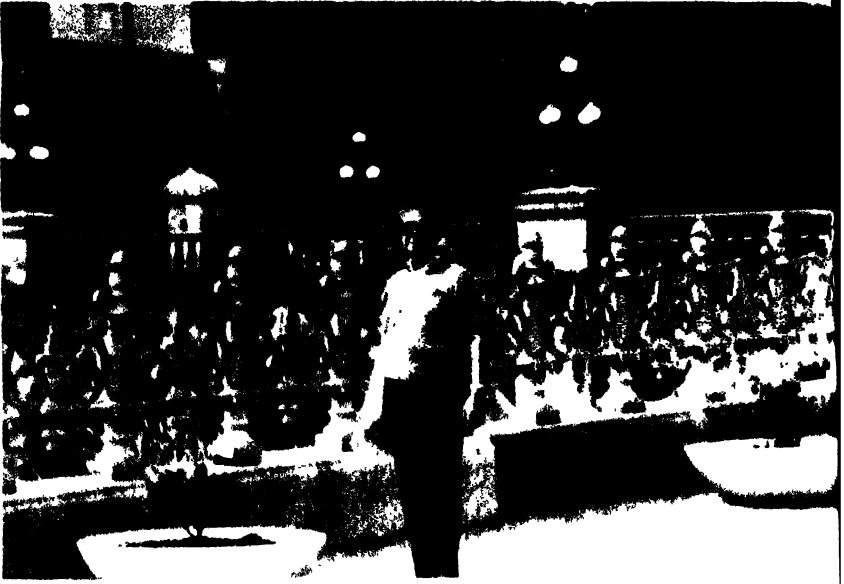
টোকিও রাজপ্রাসাদের
সামনে সেতুতে লেখক।

হিঞ্জার বাজার সড়ক।
টোকিও—জাপান।

াশাপাশি বাসও যাচ্ছে ; ট্রেনও। কিন্তু নিরেট করে বাঁধার ফলেই পূবে শ্চিমে সমুদ্রের জল খেলা করে না। পশ্চিমে তাই বন্দর নেই। জলের ভীরতা কম। পূবেই সেই সব বড় বন্দর যেখানে জাপান খতম করে দিয়েছিলো াক কোপে হাওয়াই আড্ডা, 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপাল্স্' নামক সেই ্সিদ্ধ দুটি যুদ্ধ জাহাজ। আর কেটে দিয়েছিলো জোহোর-সিঙ্গাপুরের প্রাণ-্বাহ,—জল, পানীয় জল। সিঙ্গাপুরের পানীয় জল আসে জোহোর থেকে। ়েই পুলটি,—বলে 'কজ্-ওয়ে' দেখতে ভারী সুন্দর, কিন্তু একটু নাক চেপে যেতে ়ে। পাম্বাম্ থেকে রামেশ্বরমের মাঝের 'কজওয়ে' সে হিসেবে অপূর্ব সুন্দর।

জোহোর বাহরু আর সিঙ্গাপুরের তারতম্য উত্তর কোলকাতা আর দক্ষিণ কোলকাতা,—মানে কোনো তারতম্যই নেই। দেখবার মতো একটি জিনিষ। সুলতান মসজিদ্। কিন্তু লক্ষ্ণৌ ইমামবাড়া দেখার পর ও আর কী দেখা। ়েরদ্রাবাদে অমন মসজিদ্ পর পর অনেক কটা।

সিঙ্গাপুরের নদীতে ফিরে এলাম। নৌকায় ভরতি। নদীর পারে তখন কর্মব্যস্ত জনতা। থানা, পোস্টাফিস, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, লাইব্রেরী, সিটিহল,—সবই তো পর পর। তার মধ্যে পুরোনো শপিং সেন্টারের চৌক। মাঝে একতলা উঁচু সজ্জিত পার্ক। চারদিকে পথ। পথের ওপর গাড়িবারান্দা ঢাকা বড়ো বড়ো দোকান। বেশির ভাগই ভারতীয় দোকান। পুরোনো ভারতীয়। তারা সিঙ্গাপুরেরই বাসিন্দা হয়ে গেছে। 'ক্লিফোর্ড পায়ার' খুবই ব্যস্ত বন্দর। যাবতীয় আন্তঃদ্বীপ মালায়ান যাতায়াত, ইন্দোনেশিয়ান ফেরী সব এইখানে। বহু যাত্রী দক্ষিণ থেকে এসেও গাড়ি রেখে জাহাজে চড়েন। এপার ওপার কেবল গাড়ি আর গাড়ি। কতো রকমের। লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাপানী গাড়ি অন্য সব গাড়িকে কাৎ করে দিলেও দুটি গাড়িকে আসন ছেড়ে দিতেই হচ্ছে ; মার্সেডিজ্-বেনজ্ এবং রোল্স্ রয়েস্! মাঝে মাঝে যাকে বলে ব্যাক-ওয়াটার্স। যারা ত্রিবেন্দ্রাম-কোচিন-বাঙ্গালোরের পথে গাড়িতে গেছেন তাঁরা মালায়ালেমের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাক-ওয়াটার্সের অপার সৌন্দর্য ভোগ করেছেন ; ভারতবর্ষ বড়ো দেশ। সেখানে এ সৌন্দর্য বড় হারে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর জায়গা ছোটো। কিন্তু জোহোর-সিঙ্গাপুর ব্যাক-ওয়াটার্সের সৌন্দর্য একটুও কম নয়। সিঙ্গাপুরের তীরভাগ এমন বেশীরকম ব্যস্ত যে এর কোণায় কোণায় বন্দর আর বন্দর। তবু ব্যাক-ওয়াটার্স যেখানে যেখানে সেখানে সেখানেই সমৃদ্ধ গ্রাম। চালা-ঘর, টিনের ঘর, টালির ঘর,—কিন্তু মেছোরা, চাষীরা, মাঝিরা সমৃদ্ধ। ব্যাক-ওয়াটার্স ভরা নৌকোয়। তীর ভরা কর্মব্যস্ততায়।

মন্দির রোডে বিরাট সেই গোপুরম্। কিন্তু আমার দেখা চাই বাজার। ষব মন্দির লিঙ্গরাজ। তার চতুর্দিকে নানা মন্দির। শিবের পরিবার তো

আছেনই, গণেশ, সুব্রহ্মণ্যম্,—পার্বতী,—তাছাড়া বিষ্ণু, গরুড়, বামন ও বরা
অবতার। হোমের জায়গা আছে। ব্রাহ্মণরা শতরুদ্রীয় এবং শুক্লযজুর্বেদে
রুদ্রাধ্যায়টি নিত্য পাঠ করে। কৈলাস-ইলোরায় যে অহল্যাবাঈ স্থাপি
পাতালেশ্বর শিবের মন্দির আছে ভূগর্ভে, সেখানেও কন্নাদ ব্রাহ্মণরা রুদ্রাধ্যা
পুটিং করে নিরন্তর পাঠ করেন।—

বাজারটি দেখলে মনে হয় যেন এই বসেছে, এই উঠে যাবে। পর পর কাঠে
চৌকী। ওপরে কোনো না কোনো উপায়ে আচ্ছাদন। যখন তখন বৃষ্টি। বর্ষাক
বলে কোনো বিশেষ কাল নেই। এই বৃষ্টি এই রোদ,—লেগেই আছে। একশ
ইঞ্চি বৃষ্টি হয় সিঙ্গাপুরে। এখানে পংজাবী সলওয়ার কামিজ, অতি সস্
দামী শাড়ি, মালায়া-সারং কামিজ, চীনা বগলকাটা কলার উঁচু ছিটের জামার স
গোড়ালী থেকে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু পাজামা আর চপ্পলী, কখনও কখনও কাঠে
চপ্পলী, সবই পাওয়া যায়। বৌদ্ধই হও, যাই হও, মাছ, শুকনো মাছ, ধোঁয়া-ধরা
মাছ, শোরের মাংস, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, খরগোশ, কচ্ছপ, হাঙ্গর-
সব মাংস পাওয়া যাবে! মুর্গী আর ডিম অথৈ। শাক-পাতি আনাজ দ
অঢেল। ঘুরে ঘুরেই আসতে হয় নৌকোয় ঢাকা সিঙ্গাপুর নদীতে।

হোটেলে ফিরলাম একটায়। ওপরে গিয়ে শাওয়ার সেরে নীচে দরওয়ান
চাবি দিয়ে বললাম মালপত্র নামিয়ে আনতে। আমি রামশরণকে নিয়ে ডাইন
হলে খেতে ঢুকলাম! মনে মনে কী জানি কেন খুশী, হংকং যাচ্ছি; কণিকা
পাওয়া যাবে। কিন্তু সন্তর্পণে খুঁজতে হবে।—

সিঙ্গাপুর থেকে হংকং ঘণ্টাদেড়েকও লাগে না। হংকং পেঁছুলাম ত
বেলা সাড়ে পাঁচটা। খুব রোদ। আবার এক রামশরণের খোঁজ করতে হ
কিন্তু না,—প্লাজা হোটেলের নিজের গাড়িই আছে। কোনো হাঙ্গামা নেই।

হোটেলে এসেই ফোন করলাম। কোনোই সাড়া নেই।—টেলিফোন অফি
ফোন করে জানলাম কোনো অনির্দিষ্ট কারণে ফোন সাময়িক ভাবে বন্ধ। ব্যাপা
সিকিউরিটি থেকে করা।

তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেলেও হোটেল কাউন্টার থেকে খোঁজ নেওয়াবার চে
করলাম যে ঐ নম্বরের ঠিকানাটা কী? ম্যানেজারের মুখ গম্ভীর। শ
বললো,—মাত্র অল্প সময়ের টুরিস্ট। জাপান যাচ্ছেন। আমার উপদেশ
মানেন ও তল্লাটে যাবেন না। সমস্ত তল্লাটটা আউট অব বাউণ্ডস্। বো
ফেটেছে। তার তালাশী চলছে।

বোঝো, আমার মনে তখন কী তোলপাড়! পরে বলবো বাকীটা। এ
বরং তোমায় ভাবি। কণিকা থাক। কেমন? ইতি—

তোমাদের জামাইবাবু।

১২

চরিতাষু—

পদ্মদিদি, কোথা থেকে মন ভরে জুড়ে বসলো কণিকা।—কণিকা অবশ্য ানা দেয় নি। কিন্তু তাজমুল তো দিয়েছিলো। ভাবছি তাজমুলকেই লিফোন করবো কি-না। অনেক ভেবে সাধু সঙ্কল্প হোলো, মায়া বাড়াবো। জঞ্জাল ঘাঁটবো না। তা ছাড়া হিত বিপরীত তারও হতে পারে, মারও।—

কিন্তু আদো এরা মনেই বা আসে কেন? পথে তো একাই বার হয়েছি। কা ঘুরে দেখার মধ্যে অবশ্য একটু আধটু এলো-মেলো বিষণ্ণতা আছে। যে ানো ভোগ একান্ত নিবিড়ে হয়তো ব্যক্তিগত ঠিকই, কিন্তু উৎসবে-ব্যসনে বন্ধু ঙ্গের প্রয়োজনীয়তা চাণক্য পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন। যে কোনো 'ভোগ'-এ গ অপরিহার্য। সঙ্গী থাকায় ভোগ বাড়ে। দুঃখ কমে।—স্মৃতি তো স্পষ্ট লে শিকার, শিকারের মাংস, রোস্ট, পোলাও—এ সব একা একা ভোগ করবে। বন্ধুসঙ্গ চাই।

কিন্তু সে সঙ্গী কণিকা নয়। হঠাৎ সর্বহির সঙ্গ পেয়ে যাবার পর কে ওর মন যেন হয়ে গেছে কবির রচা চণ্ডালিকার প্রকৃতি। ওরও মন আজ ই ঘরকন্নায়।—ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান ও শুনেছে। মন ারনা ঘরে।—চলে গেছে দুর্গমের বিভীষিকার পথে।

এবং সেই বাবদে ওদের পক্ষে হংকং একটি স্ট্রাটেজিক ঘাঁটি। হংকং তো শুধু একটি দ্বীপ নয়। চীনের শরীর খাবলে ব্রিটিশ সিংহ দু চারটে টুকরো মে রেখেছে। তারই একটি 'ভিক্টোরিয়া'। বলে আসল হংকং দ্বীপটাই োজতম পাড়ার মধ্যে গণ্য; আর তার ওপারে 'হংকং হারবার' পার হয়ে উলুন। তৃতীয় অংশ এদেরই ভাঁড়ার ঘর 'নিউ টেরিটরিজ'। আজও যাও, খবে আসল চীনারা কেমন চাষবাস করতো এবং আজও করে। তা ছাড়া োটো ছোটো দ্বীপ অসংখ্য। ভিক্টোরিয়া খাঁড়ির পশ্চিম মুখে দ্বীপটির নাম োর-কাটনীর দ্বীপ! এ দ্বীপ ভরতি এখন ফ্যাক্টরি।

হংকং দ্বীপটি কিন্তু ভাঁওতায় হড়প করা। খোদ হংকং দাগাবাজী কোরে। কাউলুন' জুলুম কোরে; নিউ টেরিটরিস' বেনেলী সওগাত কোরে;—৯৯ রের লীজ। লীজ এবার শেষ হবে। মাও-সী-তুঙ্গ-এর লাল চীন বোধ হয়

সে লীজ্ আর বাড়াবে না।—এখান থেকেই লোকে ফিরে এসে বলে চীনের বড
অবধি গিয়েছিলাম। গেলে কী হবে—ঠোঁট আর কাপের দূরত্ব যতই কম থা
থাকার মানেই স্বাদে বঞ্চিত।

ঐ যে হড়প, দাগাবাজী, ভাঁওতা, জুলুম, বেনেলী সব বললুম, বল
জামাইবাবুর তো মৌকা পেলেই গালাগাল। কাজেই নিজের বদনামে চুনক
করার আশায় তোমায় বলি।

আগে এদের কাস্টম্স্-এর ব্যাগ খোঁজা প্যাণ্ট চাপড়ানো হয়ে যাক।-
ধরেছিলো এখানে দুটো ফিলিপিনো মেয়েকে। ফিলিপিন পাসপোর্ট তাদের
আসলে তারা মালাক্কা-র মেয়ে। কে কোথায় কী বলে দিয়েছে। ওদে
হ্যাণ্ড ব্যাগের মধ্যে যা ছিলো তা থাকে বে-পাড়ার নিকৃষ্ট বার-মেড্দের কাছে
সেই ঢলাঢলি করেই ওরা মাৎ করবার তালে ছিলো। কিন্তু ওদের ঊরুর সঙ্গে
স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা ছিলো পিস্তল, এবং পিস্তল ছিলো প্লাস্টাসিনের মতো ক
এক পদার্থের মধ্যে ঢোকানো। তা ভেদ করে নাকি ইলেকট্রনিক্ ডিটেক্টার
খবর আনতে পারে না।···যাক্, · ওরা প্লেন হাইজাক করার জন্যই যে প্লেনে
চড়ছিলো, এই মতটাই সব চেয়ে বেশী চালু।—পুলিসে নিয়ে গেলো। উচ্চৈঃস্বরে
কী সব স্লোগ্যান দিতে দিতে তখনকার মতো ওরা মিলিয়ে গেলো।

কাজেই উত্তেজনা।

কিন্তু—দি কিং ইজ ডেড্; লং লিভ্ দি কিং! উত্তেজনাই কি, কী-ই ব
কি? প্লেন তার চলা থামায় না। সময় যায় নদীর প্রায়, কাহারো মুখ চাহে ন
হায়। সেই বেল্ট্ বাঁধা, সেই সরবৎ, লজেঞ্জস্, ল্যাভেণ্ডার ভেজানো গর
টাওয়েল। সেই সব সুন্দরী খেচরী বিদ্যাধরী। শুধু পটলচেরার পরিবর্তে
কোমল আলুচেরা চোখ। কুচকুচে কালো চাহনী। মসৃণতর দীপ্ত ত্বক
মাথা ভরতি কালো চুল, মোমে ঢালাই ঠোঁট, আর টেপা টেপা নাক। কিন্তু
আশ্চর্য সজীব, প্রখর, নিপুণ এবং মাপা-জোখা বরফী-কাট্ ব্যবহার।—পূ
দিকে যতো আসছো দেখছো মেয়েরা শরীর ঢাকছে বেশী।

ঝকঝকে রোদ। সিঙ্গাপুর যেন রুপোর থালায় সাজানো সবুজ পাতা
ভেট। এ নৈবেদ্যের এ পাশ ও পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খাঁড়ি নয় যেন সোনাবহ
প্রাণ, প্রাণবহা সোনা। ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ। ভীড় করে ব
আছে এ্যালমুনিয়মে ধোঁয়া অগুন্তী পেট্রল রিজার্ভয়ার ট্যাঙ্ক।—বন্দর ভ
জাহাজ দেখে আমার হিংসে হয়। বম্বে ছাড়াও একটা তোফা বন্দর য
আন্দামানে কোথাও হোতো,—আন্দামানের কাছে নিকোবারের ছোটো দ্বীপগুলো
যদি টুরিস্ট ডেভলপমেণ্ট হোতো···কতো যে স্বপ্ন দেখি! দেশকে আ
সত্যিই ভালোবাসি পদ্ম। ভালোবাসার গায়ে দন্তক্ষত, নখক্ষত,—তারই না

ংসে। দেশকে গালাগাল দিই অন্য দেশকে হিংসে করি বোলে ; অন্য দেশকে ংসে করি নিজের দেশ ভালোবাসি বোলে।

নৈলে ইংরেজ আমার কে ? য়োরোপই বা কে ? ওদের ওপর আমার রাগ ন হতে যাবে ? তবু হয়। কেন হয়, বলি।—

এই হংকং-এর কাহিনীটাই ধরো। অবশ্য সর্বত্র একই কাহিনী পাবে। রাওয়াক, বোর্ণিও, মালায়া, রেঙ্গুন-বার্মার রাজা থিব্‌অ,—এমন কি আর্কটে হম্মদ আলি, চাঁদা সাহেব, মারাঠাদের মধ্যে বাজীরাও-ফড়নবীশ, মুর্শিদাবাদে রাজ এবং মুর্শিদকুলি খাঁর ব্যাপারে। এক ঢং, এক ধাঁচ। ভাঁওতা, পেঁ্যচ, টবন্দী, ঘরভাঙগানো, বিভীষণের কাঁধে চেপে লঙ্কা দখল। রামকে তো কই য়তান বলিনি। কারণ জয় করে রাম বিভীষণকে রাজ্য দিলেন। জয় করে কৃষ্ণ গ্রসেনকে রাজ্য দিলেন।—

শোনো তবে হংকং-এর ব্যাপার।—

যখনকার কথা বলছি তখন হংকং কে-ই বা জানতো। কুল্যে ৫০০ জনও কতো না। আসল চীনেরা এ জায়গার পাত্তাই দিতো-না। প্রাগৈতিহাসিক গ থেকে হংকং-য়ে মানুষ বসবাস করে এসেছে ; কিন্তু এর রবরবা সত্যি নবিংশ শতাব্দীর সেই বেধড়ক য়োরোপীয় 'তৎপরতা'র (বলতে যাচ্ছিলাম স্করতার ; আইনে বাধে !) সময় থেকে। কিন্তু চীন-সভ্যতা কবেকার জানো ? থিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা,—অব্যাহত যার ধারা শিল্পে, মননে, কারিগরীতে, নীষায় নিরন্তর প্রবহমান—সেই মহাভারতের যুগ থেকে,—ধরো সাড়ে তিন জার বছর আগে থেকে।

তুমি মুখ হাঁড়ি করে চেঁচাবে,—সে আর কতোই বা আগে ! কেন ? মামাদের মহেঞ্জোদাড়ো জামাইবাবু ? হ্যাঁ, মানছি। কিন্তু কী বলছি বোঝো। মেরিয়ান-রা তো আরও এক হাজার বছর পিছিয়ে ব্যাবিলোনকে কেন্দ্র রে ফৈলাও এক মন্দির সভ্যতা, সংস্কৃতির নজীর রেখে গেছে ; এবং এই সুমেরু ভ্যতা যে দ্রাবিড় সভ্যতারই শাখা এ কথা বলার মতো পণ্ডিতেরও অভাব নেই। এবার আরো পিছিয়ে যাও, বেশ যাও ! কোনো বাধা নেই। কিন্তু গেলেও চীনকে ধরতে পারবে না। চীনের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

ঐ যে বল্লাম 'অ-ব্যাহত', ঐটেই মূল কথা। পদ্মদি, আমরা চীনের কোনো তিহাসই এমন পাই না যখন চীন কৃষ্টিতে, বিকাশে এগিয়ে নেই। ও যেন জন্মেই সভ্য। এবং তা অব্যাহত ভাবে ক্রম বিকশিত। হঠাৎ থেমে গেছে রাম, ব্যাবিলোন, সুমের, সিন্ধু, হারাপ্পা-মহেঞ্জোদারো, ক্রীট ;—কিন্তু থামেনি চীন। অব্যাহত, অকৃপণ চীনের অবদান। প্রায় ছশো বছর ধরে চীনেরা, বনে ঋষি-যুগে' ছিলো। সত্যযুগই বলতে পারো (২৮০০—২২০৫ খৃঃ পূঃ)

এ যুগে কৃষি, চিকিৎসা আর পূর্ত বিজ্ঞানের বিকাশ। তার পরে শিয়া-যুগ শাং-যুগ,—যে সময়ে ওরা কাঁসার ঢালাই, পিতলের কারিগরীর অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব হাজার বছর নাগাদ অন্য যুগ এলো। সে সময়টা একটি ছোট্ট পরিসরের চী-ন্ বংশ রাজত্ব করে, যার মধ্যে রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ শি হোয়াং-তাঈ এলেন সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবরের মতো কৃতিত্ব নিয়ে শাসনে আনলেন শৃঙ্খলা,—বিরোধে আনলেন রাজনীতি। বিশাল চী সাম্রাজ্যের মধ্যে যতো সামন্ত নরপতি ছিলো, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে, সা দান, দণ্ড-প্রয়োগে চীনকে একচ্ছত্র করে তুললেন। শাসন কেন্দ্রীভূত হোলো ঐ যে চীনের প্রাচীর,—ওটা এই সময়েই তোলা হয়, বুনো অসভ্যরা খামো ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুঠ লাঠেরা করে নিতো। তাদের ঝামেলার হাত থে চীনকে বাঁচাবার জন্য ঐ আখাম্বা দ্যাল। এও খৃষ্ট পূর্বের ব্যাপার।

তার পর খৃঃ পূঃ ২০০ নাগাদ হান্ বংশ এলো। এরা মন দিে ইতিহাস, নথীপত্র, দস্তাবেজ রাখার ওপর।—এই নথীর ওপর নির্ভর করে উত্ত কালের তামাম আন্তর্জাতিক বখেড়ায় সার্বভৌম চীনের অধিকার সাব্যস্ত করা চ আসছে। কিন্তু তখন থেকেই চীনে লাগলো উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের বিরোধ ;—এ তা চললো সান-ইয়াৎ-সেনের সময় পর্যন্ত। আমাদের দেশে যেমন 'ছাতু' আ 'ভেতো', পাহাড়ী (অসমিয়া) আর সমতলবাসী, হিন্দুস্তান আর দক্ষিণ ভার নামক রকম রকম আত্মঘাতী কলহ। বিশাল দেশ এবং বহুভাষী দেশ হলে মৌকাবাদ রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা এমনি জুয়াতেই মশ্‌গুল থাকে। এটা ইতিহাসের অভিশাপ।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে চীন বেরিয়ে এসে পুরো তিনশোটি বছর ধ (৬১৮—৯০৬) কেবল করে গেছে জাতীয় উন্নতি, শাস্ত্রে, বিজ্ঞানে, মন যন্ত্রশিল্পে, উৎপাদনে, শিল্পে, রণ নীতিতে।—এই সময়ে হঠাৎ হাল —মোঙ্গোলরা,—১২৭৯—১৩৬৮, পুরো একশো বছরও নয়।—মিং-বংশ এ সেই মোঙ্গোল তাড়ায়। ৯৬০ থেকে ১২৭৯-র মধ্যে সুং-রা চীনের যা উন্ন করে যায়,—১৩৬৮-র পর মিং-রা সেই উন্নতি ও শক্তি অব্যাহতই রাখে। কি যে ধাক্কা মোঙ্গোলরা দিয়েছিলো তার ফলে দক্ষিণের দিকে আশ্রয়ের তালা শরণার্থীদের প্রবসন আর থামেনি। এই প্রবসনের প্রকোপেই থাই-য়ের সেই শৈলে বংশের পতন। এই প্রবসনের প্রকোপেই হং-কংয়ের জলা, পাথুরে জায়গাতে চীনেদের বসবাস।—

এই মিং-দের সঙ্গেই মোকাবেলা হোলো য়োরোপীয় সওদাগর (?)দের ইংরেজরা কেবল গুতায়, কবলায়, নালিশ করে, সালিশ ঠোকে।—মতলব জ ঘোলানো। কী করে ছুঁচ হয়ে এই ভূখণ্ডে ঢুকে পড়া যায় ; তা হলেই ফা

য়ে কায়েমও হওয়া যায়।—কিন্তু চীনেরা ইংরেজ হারামীপনার সব খবরই রাখতো। ওরা এই শাদা উইপোকায় বিশ্বাস করেনি। সওদাগরী করো, করো। মাল আনো, বেচো, কেনো,—ঘরের খোকা ঘরে ফিরে যাও।—তার বেশী আত্মতাই,—না; চীনে নয়।

কিন্তু তা নয়। ওরা চায় জায়গা। মালগুদাম আর থাকার। বসত করবো। ফ্যাক্টরি করবো! মনে পড়ছে মাদ্রাজ, কালিকট, সুতানটি? মনে পড়ছে বাগবাজারের কেল্লা? ব্যবসা দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। কিন্তু চীন সরকার বানিয়াদের বানিয়া ছাড়া অন্য 'গোত্র' বলে আমলই দেন না। তখন চীন সরকারের চোখে এই য়োরোপীয়গুলো অতি অসভ্য, শীল-বর্জিত, অমার্জিত রুচির 'বুনো-বর্বর' ছাড়া (সত্যিই) কিছু নয়। কোথায় চীনের গণিত, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প, সমাজ,—আর কোথায় ঐ খেয়ো-খেয়ী করা একমুঠো দুর্গন্ধ মানুষ,—না জানে চানের মর্ম, না জানে রান্নার তত্ত্ব, শৌচ করতে বালি কাঁকড় ব্যবহার ছাড়া কিছু জানে না।—তবু শাদারা ফৈলাও হতে চায়। এ শহরে ও শহরে ওদের মাঝে মাঝে উৎপাতের মত দেখা যায়। চীনের আব্রু নিয়েই ওদের টানাটানি। কাজেই ১৭৫৭-তে চীন আইন বেঁধে দিলো ক্যান্টনের বাইরে,—খবরদার কোনো ফিরিঙ্গী যাবে না।—যা করো ঐ ক্যান্টনের মধ্যে, চীন সরকারের নজরের ওপর।

ব্যস,—লেগে গেলো যাকে বলে 'কশ্-মকশ্'! ইংরেজরা কেবল ক্যান্টনে আবদ্ধ থাকতে বিলকুল অস্বীকার তো করলোই, প্রয়োজন হলে স্বার্থ "রক্ষা"র জন্য চীনের আইনের ওপর খাঁড়া তুলতেও তৈয়ার। অথচ এরাই নাকি পৃথিবীর পার্লামেন্টের "জননী"! ওরা লেখে ইতিহাস; আমরা পড়ি; পি. এইচ-ডি হই। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হামলা করে হঠাৎ ইংরেজ কান্টন দখল করে বসলো তো বটেই,—জুলুম করতে লাগলো। কী জুলুম কল্পনা করতে পারো? এমন ধুরন্ধর ডাকাত পাবেনা গো পাবেনা।—ওরা চীন থেকে যতো শিল্প সম্পদ, সোনা, জওহারাৎ, পশম, রেশম, চা, চিনি, মসালা নিয়ে যাবে,—তার বিনিময়ে "দাম" বোলে যা দেবে, তার নাম "অহিফেন",—কেবল আফিং। আফিং ছাড়া কিছু নয়।—ভারতবর্ষে তখন তুড়ুম ঠুকে আফিং আর নীলের চাষ। এবং সেই আফিং জলের দরে কিনে সোনার দরে বিক্রী। বিক্রী নয়; বিক্রী তো তাকে 'করা' হয় যে কিনতে চায়; এ 'কিনতে' নয়,—'নিতে', বিনিময়ের ব্যবসা করতে "বাধ্য" করা। তোমরা দেবে সিল্ক, সোনা, হীরে,—আমরা দাম দেবো না; দেবো আফিং, আমাদের দামে। চীন সরকার তা মানবে কেন? কাজেই যুদ্ধ বেধে গেলো। চুয়েম্পী শহরের সন্ধিতে তখন চীন সরকার বললেন, ইংরেজ অন্য কোথাও বাণিজ্য করতে গেলে চীনের আইন মেনেই করতে হবে। তবে যদি

চীনাদের মধ্যে কেউ আফিমের বদলি চৈনিক মাল বাণিজ্য করতে চায়, সে জন্য ঐ হংকং দ্বীপ রইলো। যে ইচ্ছে বাণিজ্য করুক, যা ইচ্ছে বাণিজ্য করুক, চীন সরকার বাধা দেবে না। বাধা দেবে যদি চীনে ঢুকতে চায়।—হংকংয়ের বাইরে ও ব্যবসা চলবে না। ১৮৪১ থেকে ব্রিটিশ নৌবহর রয়ে গেলো হংকং-এর বন্দরে। আর কয়েকদিন পরেই চীনের রাজসভায় ইংরেজ দূত বলেছিলো যে হংকংয়ের দেখাশোনা রক্ষণাবেক্ষণের ভার বদান্য ইংরেজ সরকার নিজেই নিতে রাজী হয়েছেন! হংকং ব্রিটিশ কলোনী সেই থেকে।

এর পরে "কুলি" সংগ্রহ আর আফিং নিয়ে তকরার। আফিং-য়ের বাক্স যে বাক্স—সব ফেঁকো পানী মেঁ! সেই আবার তকরার। এবারে কাউলুন চলে এলো। চলে এলো পশ্চিমের আরও একটি দ্বীপ। তারপরে সেই আরব আর উটের গল্প। কাউলুন বাড়তে লাগলো। আরও চাই;—চীন দেবে না রফা হোলো ৯৯ বছরের লীজ। এই হোলো, "নিউ টেরিটোরিজ্"। স্টারলি ইন্‌লেট থেকে নিয়ে শাম-চুন নদীর প্রবাহ ধরে পূবের জলা "ডীপ-বে" অবধি সীমানা। তার পরেই চীন। হংকং থেকে ট্রেন যায় "লো-উ"-শহর পর্যন্ত "লো-উ"-র পর চীনের সীমা। প্রখর পাহারা এই বর্ডারে। কিন্তু পুরো "নিউ টেরিটরিজ" এলাকাটাই চীনাদের চাষবাসের এলাকা। শহর হংকং ও বন্দর হংকং-য়ের আঁচ এতে বিশেষ না লাগলেও ফ্যাক্টরি অনেক।—

ইতিহাসে সে যুদ্ধটার নামই "আফিম-যুদ্ধ"। কিছুতেই আফিং বন্ধ করতে পারে না চীন। আফিং ধরিয়ে দিয়েছে। যে কোনো মূল্যে নেশাখোর আফিং নেবেই। ছেলে-মেয়ে বেচা কিছু নয়। তারও চেয়ে জঘন্য, নৃশংস কাজ করেছে নেশাখোরেরা। জেরবার হোলো চীনারা। কতো আত্মহত্যা, কতো রাহাজানি, কতো নরহত্যা যে এরা করলো,—সম্রাট সব শুনছিলেন। অমাত্যরা গর্জাচ্ছিলেন। চীন সম্রাট ব্যবস্থা করলেন, দেশে কোনো নেশার জিনিষ বাইরে থেকে আর আসবে না।

কিন্তু ইংরেজ গুপ্পী-মার মারতে লাগলো। অন্যান্য য়োরোপীয় জাহাজে মারফৎ আফিং বেচতো। চীনা জলদস্যু ও ডাকাতদের দিয়ে আফিং স্মাগ্‌ল করার ফলে ইংরাজের লাভ বেড়েই গেলো। ফলে, ১৭৯৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত ৩৫ বছরে চীন যেন সসেমিরা। একটা দুরন্ত দুর্ধর্ষ দেশ, যারা এশিয়া য়োরোপ পুরো জিতেছিলো, যারা রোম সাম্রাজ্য উপড়ে ফেলে দিয়েছিলো, যারা য়োরোপকে শেখালো বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ, ঢালাই, ছাপাখানা, কাগজ তৈরী—কতো বলবো,—সেই জাত,—ধুঁকছে আফিমে। লিন্-জী-সু হঠাৎ ক্যান্টনে চড়াও হয়ে দাবী জানালেন,—যাবতীয় আবগারী নেশার ভাঁড়ার,—সব খালি করো। জলে ফেলো।—

আর বেদম প্রহার। পালা, পালা, পালা। ক্যান্টন, সাংঘাঈ, থেকে নিয়ে যতো শ্বেত সদাগর যতো বন্দরে সেই আফিং-যুদ্ধে জড়ো হোলো এই দ্বীপে। দ্বীপের নাম হংকং। তারপরে ওদের হংকং-এ খেদিয়ে এনে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চীন এক চার্টার দিলো লিখে। বললো, হে শ্বেত লুন্ঠকের দল যা বাণিজ্য করার ঐ'হং-কং-এ করো। ব্যস।—আর চীন নয়। ভাগো য়হাঁ সে।—

ভাগো বললেই ভাগো? চ্যাংড়া কখনও ভদ্র হয়? ইংরেজ ক্যান্টন দখল করলো। হুমকী দেখালো ক্যান্টন জ্বালিয়ে দেবো।—

কিন্তু এই সব গোলমালের সারাংশ ইংরেজ বুঝলো (যেমন ভারতে পরে বুঝতে হয়েছিলো ১৮৫৭-র গুঁতো খেয়ে)—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কম্মো নয় চীন হড়প করা। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বনে গেলো। কোম্পানীর হাঙ্গামা ইংরেজ সরকার নিলেন—১৮৩৪-এ!

হংকং-কে কেন্দ্র করে ওরা চীনা 'ক্রীতদাস' জাহাজ জাহাজ পাচার করতে লাগলো। তখন তো ক্রীতদাস প্রথা আইনত বন্ধ। কিন্তু 'রংরুট' বলো, 'কুলি' বলো, ভাড়ায়-খাটা মুচলেকা লেখা মেয়াদী নৌকর বলো; দালাল, ছেলেধরা লাগিয়ে ওরা মনীষ-কিষান-কামীন জোটাতে লাগলো, আর পাচার করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দালালরাও শাঁসমল-জয়মল হয়ে উঠলো। কিন্তু চীনে তখন দুর্ধর্ষ এক রানী, মাঞ্চুদের ৎজী-শী। এই মাঞ্চুরা ১৬৪৪ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রাজত্ব করলো। শক্ত হাতে রাজত্ব করা সত্ত্বেও য়োরোপীয় লালসা দালকুত্তার মতো চীনের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে শেষ করে। এর মধ্যে বাণিয়াগিরি, আফিং, লুঠ-বাণিজ্য ছাড়াও এরা মোটা হারে চীনাদের খৃষ্টান 'করতে' লেগে গেলো। রাজপরিবারের মধ্যেই এই বিষ আসছিলো। অস্বৈরণে অস্থির হয়ে রানী লাগালেন পাদ্রীদের বেদম মার। ঠ্যাঙ্গাও আর ঠ্যাঙ্গাও। ধর্ম ধর্ম করে কেবল ষড়যন্ত্র আর দেশকে ফকির করার মার পেঁচ হোলো শেষ। সেই হোলো বোক্সার যুদ্ধ। এবং সেই ভাঙ্গন শেষ হোলো সান্-ইয়াৎ-সেন যখন ১৯১২-তে অক্ষম কিশোর খৃষ্টান রাজাকে সরিয়ে প্রজাতন্ত্র কায়েম করলেন। তারপরের ইতিহাস ইয়াঙ্কী-ইংরেজ আর চিয়াংকাইশেক। জাপানীরা এসে সে বুনিয়াদও হিলহিলে করলো। আর যেই জাপান সরলো, ব্যস্,—গণতন্ত্র বোঝে কে! কিন্তু ঐ হং-কং রইলো ইংরেজের ব্যবসায় কেন্দ্র—শুল্ক রহিত। এখানে জিনিস কেনো। দুনিয়ার তামাম মাল। কোনো শুল্ক নেই। তাই ভীড় এখানে বেণের।

জায়গাটি কিন্তু সুন্দর। আসল চীনের সঙ্গে লাগাও হংকং শহর। কিন্তু ইংরেজরা ঘ্যান ঘ্যান করে যে জলের ওপার থেকে চীনা দস্যু, চীনা স্মাগলার কেবল হানা দেয়, থানা মারে। রোজ রোজ লড়াই। তার চেয়ে ওপারের

কাউলুঙ্গ উপদ্বীপটুক দিয়ে দাও না। আমরা দেখে নেবো কারা আসে, হামলা করে। গেলো সেটা। এখন আসল হংকং দ্বীপটাতেই আছে সরকারী দপ্তর বলো, রাজধানী বলো। ভিক্টোরিয়াতে ঐ সব পাবে। আর জল পার করে উত্তরে যাও,—ব্যস্ ঢালাও বাজার। সোনা থেকে সোনামুখী, ঘড়ি থেকে ঘোড়া, ছুঁচ থেকে জাহাজ,—জামাই চাও, চোর চাও—পয়সায় যা খরিদ করতে পারো প'চিশের জায়গায় পাঁচ দিয়ে কিনতে পারো, যদি জানো ;—নৈলে পাঁচের মাল প'চিশে হর্দম বিকুচ্ছে। হংকং-য়েই বড়ো বড়ো ফ্যাকটরী আছে বড়ো বড়ো কোম্পানীর মাল গুম্‌চুপ এন্তার "তৈরী" করছে। 'ক্যানন্' নাকি ফোটো জগতের এত্তা বড়া নাম, অমেগা ঘড়ি, 'কে' কোম্পানীর জুতো, জর্মণ জাইস্-আইকন্, ফ্রেঞ্চ পারফিউম্ কতো বলবো। কিন্তু সবই হংকং-এই তৈরী হচ্চে। বাইরে যাচ্ছে। সোনামুখ করে সবাই কিনছে। গ্যারান্টীর কাগজ নিয়ে যখন কোম্পানীর কাছে যাচ্ছো,—ব্যস্ চুরি, নকল, ধাপ্পা ধরা পড়ছে।

কাজেই হংকং-য়ে অস্‌লি বড়ো দোকানে মাল কেনাই বিধেয়। ওরা সবই HKTA মার্ক বহন করে। Hong Kong Tourist Association-কে (HKTA) জানালে ওরা ঠগী ধরে দিয়ে গুণোগারী পূরণ করে দেয়, যদি,—HKTA মার্কা দোকান থেকে কেনা হয়। নৈলে 'দর' করতে হবেই। আমি ১২৫ এর মাল ৪৫ বলে পেয়েছি ; ৪৬০ এর মাল ১৫০-তে পেয়েছি। খুব ঘুরতে হবে ; খুব দেখতে হবে ; খুব ঘুঘু, ঝুনো চালু হতে হবে। তবে। যারা দুদিনের জন্য যায়, তারা ঠগে, ঠগবে, ঠগছে। কিন্তু হংকং-এ যে যায় সে কেন যায় ? বলো ! ঐ কিনতে। হংকং-এ সোনা, মুক্তো —সস্তা।

কিন্তু কেনার সব বাজার ঐ কাউলুনে। সেটা চীনের লাগা মহাদেশের অংশ। তার দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া-হারবার, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। না দেখলে সে বন্দরের ঐশ্বর্য সমারোহ বোঝানো যায় না। লক্ষ লক্ষ লোক, নৌকোতেই বসবাস করছে। 'স্টার-ফেরী' বলে ফেরী সার্ভিস মাত্র ১৫ পয়সায় প্রতি দশ মিনিটে পারাপার করিয়ে দিচ্ছে এক সঙ্গে হাজার লোক। বোট চালু ভোর চারটে থেকে রাত একটা। এ ছাড়া সম্প্রতি সমুদ্রের তলা দিয়ে গাড়ি চলার সুড়ঙ্গও হয়েছে। কিন্তু পার্কিং-এর যা হাঙ্গামা, তাই সবাই ঐ ফেরী নেয়। ফেরী লাগে গিয়ে শহরের একেবারে অন্তস্তলে। ঘাট থেকে নেমেই ধরো এসপ্লানেড, কি বড়বাজার। তা বোলে কিন্তু ডালহৌসী নয়! সে পাড়াটা ভিক্টোরিয়ায়।

সব চেয়ে মজা হংকং-এর এয়ার পোর্ট কাই-তাক্। কোনো হাঙ্গামা নেই। কোনো কিস্‌সুই চেক নেই। সোজা চলে যাও; সোজা বেরিয়ে এসো। বেরুবার সময়ে 'চেক্' হয়ে যাবার পর মনে হোলো হংকং ডলার বদলাই নি। কোনো হাঙ্গামা নেই। কাস্টম্‌স্‌-কে বলে ভেতরে আবার চলে গেলাম। কাজ সেরে ফিরে এলাম।—

মনে মনে ঐ এক ভাবনা মনের মতো একটা ফুমী থানারাৎ বা রামশরণ পাবো কী? দরকার হোলো না। হোটেল প্লাজায় আমার সীট রিজার্ভড্‌ ছিলো, এবং প্লাজার নিজের বাস সার্ভিস আছে। ঐ সমুদ্রের তলার টানেল দিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্লাজায় এসে গেলাম।—প্লাজায় এসেই কণিকার খোঁজ, এবং চক্ষু ছানাবড়া। মনকে তবু বলি, মন হাল ছেড়ো না। ও মেয়েকে ধরতে হবেই।—

প্লাজা বিরাট হোটেল। সত্যিই বিরাট। কিন্তু খানাঘরগুলো কায়দা করে ছোটো ছোটো করা। চটপট চান সেরে, স্যুট বদলে সিল্ক স্যুট পরে খানাঘরে এসে দেখি চমৎকার একটি ভীড়। সবাই যেন বিশেষ সেজে। সবাই যেন একটি বয়েসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমার বয়েসী দু-চারটি দম্পতী ছিলেন না তা নয়; কিন্তু সবাই এশিয়ান্। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়ান, ফিলিপিন। আমি যে ওদের খুব বুঝতে পারি তা নয়; কিন্তু চীন আর জাপান বোঝা যায়। বাকী সব ঠারে ঠোরে ধরতে হয়।—

আবার ভাবলাম ফোনটা আবার করি। কিন্তু এ-ও ভাবলাম, এ বেলাটা একাই ঘুরি। ঐ নম্বরের ফোনে খোদিয়া লেবা থাকা বিচিত্র নয়। মন, সাবধান। খারাপ লাগলে তখন ফোন করলেই হবে।—একটা ট্যাকসি নিয়ে স্টার ফেরী। স্টার ফেরী নিয়ে এলো কাউলুন অর্থাৎ সেণ্ট্রাল হংকং। আমাদের হোটেল একেবারে বাঁশ পাড়ায়, অর্থাৎ অভিজাত-বংশ।—ভিক্টোরিয়াতে টাইগার হিলের গা ঘেঁষে।—আমার জানালা দিয়ে সমস্ত হংকং খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। জয়গুরু বোলে বেরিয়ে তো পড়লুম—

হোটেলের সত্যিকার বড়ো দরজার বাইরে এসে দেখি কেবল ট্যাক্সি। সুমুখেই পাহাড়ের গা। ... হুৎ বাড়ি বসানো তার গায়ে। কী মনে হোলো। এ সবই তো তৈরী ফিটিং করা ব্যবস্থা। অন্য ব্যবস্থাও আছে। ভেতরে ঢুকে লাউঞ্জ পার করে ডাইনিং হলে গিয়ে জুৎ করে একটা কোণ ধরে এক কাপ কফি নিয়ে বসলাম। আমার পরণে র' মটকা সিল্কের বুশ-শার্ট মেশানো স্যুট।—পায়ে বালুজা থেকে সদ্য কেনা জুতোর মতো জুতো। শাঁসমল হয়তো দেখাচ্ছিলো না; তা ব'লে কাণমল-ও দেখাচ্ছিলো না। হয়তো কারুর জামাই-বাবু তা বোলে জামা-ই সার ছিলো না।—

ভাবছি কী স্ট্রাটেজী অবলম্বন করলে ট্যুরিস্ট হবার হাত থেকে অব্যাহতি পাবো।—পিছনে একটা প্যাসেজ। সরু হলেও কার্পেট ঢাকা। কাজেই ক্লোক-রুম নয়। অথচ অনেকেই যাতায়াত করছে ঃ বেশির ভাগই যাচ্ছেন। আসছেন কম। উঠে ঐ পথ ধরলাম। সেই পথে হোটেলের পিছনের আসল ঘিঞ্জী চীনা-পথে এসে পড়লাম।

এখানে সবই গিস্ গিস্। ফাঁকা পাবে কোথায়? ৩৯৮½ বর্গমাইল কুল্যে; তার মধ্যে হংকং দ্বীপটি মাত্র ২৯ বর্গমাইল; আর কাউলুন এবং পাথরকাটা-দ্বীপ মিলিয়ে ৩¾ বর্গমাইল। বাকী ৩৬৫ বর্গমাইল ছেড়ে দাও —চাষবাস, ফ্যাক্টরী, জলা—মানুষ কম।—ঐ ৩৪ বর্গমাইল জায়গায় বাস করছে দু-লাখের বেশী লোক!!! তার মানে প্রতি বর্গমাইলে বাস করছে প্রায় ৬ হাজার লোকের কাছাকাছি। সাড়ে পাঁচ লক্ষের মতো মানুষ ঠিকানাহীন বসতি জবরদখল করে বসে আছে। তা বোলে শ্যাল-দা নয়। ঐ যে সমুদ্র, নৌকো, নৌকোয় বসতি,—ও এক মস্ত বাঁচোয়া। তা বোলে নৌকোর দাম বা ভাড়া—দারুণ। সরকার পরখ করে দেখে বাস্তবিক বাস্তুহীনকে বাড়ি করার জমি দান (!) করেন! একজন অফিসিয়ালকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে বললেন, তোমাদের সরকার ছোটা-দিল্, কৃপণ। এতোদিন ইংরেজের ঘর করেও বাণিয়ার হিসাব জানলো না। একটা মানুষকে বিনা পয়সায় সরকার যখন জমি দেয় তখন কীই বা দেয়। ঐ মানুষ যখন বাড়ি করবে, বসত করবে, গুজোরা করবে—হয়ে উঠবে সরকারের সম্পদ, সরকারকে পদে পদে ট্যাক্স্ দেবে। আর ওদের জমি না দিলে যা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ত দিয়ে যা পোষা হয় তার নাম নোংরামী, আলস্য, ক্ষোভ,—জাতির সরকারি নিপুণতার প্রতি অনাস্থা,—এমন কি বিদ্রোহী মনোভাবও; এবং ঐ বিদ্রোহী মনোভাবের মুকাবেলা করার জন্য পুলিস-রে, সিপাহী-রে,—রক্তপাত, আদালত —পেল্লায় খরচ। শান্তির খরচটাকে বড়ো করে না দেখে লড়াইয়ের খরচ বাড়িয়ে লাভ কী? যে সরকার এ তত্ত্ব না জানে সে আবার সরকার কী?

দেশের বাইরে না এলে এ সব তত্ত্ব খোলাখুলি বলতো কে, শুনতে কে। গিস-গিস্ তো করবেই রাস্তা। ঘন ঘন বাস চলছে। ঘন ঘন ঘনতর হয়ে মানুষ চলছে। ঘন থেকে ঘনতর দোকানগুলো ঘন ঠাস ভর্তি মাল —খাদ্য-রে, বস্ত্র-রে, খেলা, লীলা, সোহাগের নানা আড়ম্বর, যন্ত্রপাতি,—বই ছবি,—কী নয়, কী নেই। মাথার ওপরে, তস্য ওপরে, তস্য ওপরের ওপরে কেবল খুপরি, জানলা, দরজা,—বড়বাজার তুলাপট্টী, দালাল পট্টী যেমন কিন্তু কেবল ঝোলানো। আঁকশী বাড়ানো সব ডাণ্ডা। ডাণ্ডার পর ডাণ্ডা তা থেকে ঝুলছে কাঁথা, টুপী, কাপড়, জামা, শুকনো ব্যাঙ, পাঁপড়, ম্যাকারুনী

—কী নয়। হবে না কেন? ঘর বলতে তো ৬ ফুট বাই আট-ফুট! এবং সূর্যালোক সেখানে ভাদ্দোর বৌ, ঘোমটা টেনেই আছে।—

এবং দেখছি যত্রতত্র খরগোশ। খরগোশের ছবি; খরগোশের সং, মানুষ-জন, এমন কি সুসজ্জিত মহিলারাও মাথায় টুপী পরেছেন, খরগোশের কাণের ইঙ্গিতময়। জামায়-পোষাকে খরগোশের ছাপ। মনে পড়লো এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়েই স্বাগতম্ জানানো সেই 'দ্বীপটির'-সবুজ লন্: রূপালী ফোয়ারার লাগাও একটা রকারির ওপর সাজানো পেল্লায় এক খরগোশ।—

একটা গুজরাতি বৃদ্ধা একটা কোণ ঘেঁষে পকোড়া ভাজছিলেন। অবশ্যই পকোড়া কিনলাম। শুধু খাবার আগে বললাম,—দেখো দেশ থেকে বেরিয়েছি বহুদিন। পথে কাম্বোডিয়ায় রক্তামাশায় ধরেছিলো; তোমার চেহারা, দেশী রক্ত, আর পকোড়ার গন্ধে কিনে তো ফেললাম। খাবো? কী বলো?

হাত থেকে বুড়ী প্রায় কেড়ে নিলো পকোড়া। কী সর্বনাশ! এরা এ দেশে সাঙ্ঘাতিক লঙ্কা খায়। আমরা গুজরাতিরা অবশ্য মিষ্টি দিয়ে রাঁধি। —কিন্তু এতো তা নয়। এ খেলে তোমার আঁতের ছাল-চামড়া তুলে ফেলবে। সর্বনাশ। তোমায় জল জিরা দিচ্ছি। বোসো এই প্যাকিং বাক্সটার ওপর। দাঁড়াও একখানা কাগজ পেতে দিই। নৈলে তোমার জামা নোংরা হয়ে যাবে। —তোমায় তো এখন অনেক দূর যেতে হবে।—জামা কাপড় সাবধান।

সেই বুড়ীই তখন নানান খবর শোনালো। মাও-সী-তুং এর চীন থেকে প্রথম যখন লোক আসা সুরু হয়, তারপর থেকে বন্ধ আর হয়নি।—কাজেই হংকংয়ে মানুষ ছ' লাখ থেকে চল্লিশ-লাখ! জাপানী আসাতে যারা পালিয়েছিলো তারাও সব গুটিগুটি ফিরে এলো। আর চীনেরা তো সর্বদাই ঘুরছে। ওদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ যেমন নেই,—চলা-র নিমন্ত্রণও ওদের দরকার নেই। এগিয়ে যাচ্ছে, যায়, যাবে। স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্। ভাষা কান্টনী, কিন্তু আরও তিন রকমের চীনা ভাষাও চলে।—ইংরিজী হোলো ব্যবসার ভাষা। পিজিন্-ও চলে।—শহরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট হাজার মানুষ শুধু কমন্-ওয়েল্থের,—তবে ভারতীয় ও পাকিস্তানীই বেশী। এখন আবার 'বাংলা দেশ' হয়েছে।—হাক্কা, তান্কা, হোক্লো,—আর ক্যানটনীজ,—এই চার রকমের চীনা-ম্যান। ওদের গাঁকে গাঁ থাকে ঐ নিউ টেরিটরিজে। ধর্ম বলতে ওরা সব মুখে বলে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু তাও, খৃষ্টান আর হিন্দুও বড়ো কম নয়। এই যেখানে বসে কথা বলছি এটা কটন্ট্রী ড্রাইভ এবং ম্যাকডোনেল্ রোডের মোড়। এখান থেকে নিয়ে ঐ যে স্টার-ফেরী ঘাট আছে তার মধ্যেই পাবে হংকংয়ের সরকারি অফিস, আইন-আদালত, ব্যাঙ্ক। এই তো হংকং। ওপারে তো কাউলুন। বাজার, মেয়েমানুষ, টাকার খেল।—যাও না দেখে

এসো গে! টাকার রেলা টাকার খেলা। এক নিমেষে দক্ষযজ্ঞও ছাই করে দিতে পারে ঐ সর্বনাশী কাউন্টার।

ঐ খরগোশ কেন?—মাসে মাসে চীনেদের সোহাগের জন্তু বদলায়। কেন না ওদের বারো-মাস বারোটা জন্তু দিয়ে।—

বুড়ী মুখে বলছে। খরিদদারও আসছে। ব্যাগে ভরে বুড়ী সব গুছিয়ে দিচ্ছে। সবাই নিয়ে যাচ্ছে। ঐখানে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে না। পারৎপক্ষে ওরা যত্র তত্র খায় না। কোথাও বসে, বা কোথাও নিরিবিলিতে খায়।—আমেরিকায় স্টীক আর হট-ডগ মানুষ চলতে চলতেই কামড় দিতে দিতে চলেছে।—

…বলদ, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া, বাঁদর, মুর্গী, কুকুর আর শোর। এই বারো মাস। এর মধ্যে ওরা তো খায় সব কটাকেই। তবে বাঘ খায় কি-না জানি না; কুকুর খায়। আর ড্রাগন নাকি এখনও ধরতে পারে নি। ধরলে কী করবে জানি না।—এই ওদের মাসের নাম। এবং প্রতি-মাস নিয়ে ব্রতকথার মতো ওদের কথা আছে। বারো মাসে বারো ব্রত আমাদের আছে কি নেই জানি না,—এদের আছে।

আমি বলি, আমাদের পনের দিনের পনের তিথির পনেরো ব্রত আছেই,—শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষ ধরে বেশীই আছে। এই খরগোশ কথা কী?

সময় আছে দেখছি তোমার। রাত হোয়ে এলো। দেখবে কী?

যে দেখে তার রাত কি, দিন কি? বুড়ী কি, ছুঁড়ী কি!

ওমা তোমার রস আছে দেখছি। আরও জল জীরা দেবো? কেমন লাগলো? একা কেন? বৌ কই?

ঘাটের পরে বৌ-য়ের আঠা শুকিয়ে যায়।

আর বরের?

বুড়ী হাসে যেন ষোড়শীর হাসি! মনে মনে ভাবি,—ঠিকই, ধূমাবতীও তো শক্তি।

তা বলে আর কী করবো। দেখছোই তো জল-জীরার বেশী কপালে নেই। পকোড়াও চললো না।

চললো কি চললো না বড়ো কথা নয় গো। ইচ্ছের চাগানীই চাগানী।

যা বলেছো! লোভই কাম। কামের ক্ষেমতা গেলেও লোভের কামড় যায় না।

সার কথা। সার কথা! বুড়ী সায় দিয়ে গল্প শুরু করলো।

খরগোশের গল্প শরৎকালের গল্প। এদেশে অক্টোবার মাস হোলো বছরের প্রথম মাস। দশই অক্টোবরে এদের বর্ষারম্ভ। উৎসব দারুণ। বলে "টেন্-টেন্"। আসলে কিন্তু চন্দ্রের পুজা।

হ্যাঁ। চাঁদ তো মূন, দেবী। ওদের অন্য দেশে—ভূমধ্যসাগরের দেশে ডীনাসের পুজো,—আমাদের লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পুজো। এই এক দেবীর পুজো শরৎকালে সব জায়গায় হয়। নতুন নতুন গাছের পুজো হয়। নব পত্রিকায় ন-রকম গাছের পুজো হয়। মেয়েদের পুজা। চন্দ্রচূড়, চন্দ্রশেখরের গিন্নী শশীশেখরা।

ওমা! তাই নাকি! এতো তো জানতাম না। এ দেশে এটা মেয়েদের পুজো; মেয়েরাই আদিখ্যেতা করে। সব তোমায় বলতেও পারবো না।—ওরা বলে জরদের- খরগোশ। থাকে চাঁদে। চাঁদে অবশ্য আরও অনেকেই থাকে। চীনেরা তাই বলে। কিন্তু খরগোশেরই মান। বুদ্ধ এক বুড়ো সাজলেন। ক্ষিদেয় প্রাণ যায়। তিনটি প্রাণী এক সঙ্গে বসে জটলা করছে। বুদ্ধ গিয়ে খেতে চাইলেন।—শেয়াল ছিলো। সে দিলো একটা চুনোপুঁটি ধরে। বাঁদর ছিলো। সে দিলো একটা ফল। খরগোশটা কি করলো জানো? বললো এসো। এক জায়গায় আগুন জ্বলছিলো। বনভোজনে কারা এসেছিলো। খরগোশ শিকার করে রেঁধে খাবার সখ। তা এ খরগোশটাকেই তাড়া করে ছিলো। সবাই মিলে সারাদিনেও ওকে ধরতে পারেনি। কিন্তু সেই চতুর খরগোশই ওদের ফেলে যাওয়া আগুনে কাঠ খড় ফেলে জ্বালিয়ে তুললো আগুন। তারপরে ঝপাং করে তার ওপরে লাফ। নিজেকে পুড়িয়ে বুদ্ধকে (বুড়োকে, ভিখিরীকে) খাওয়ানোর মহৎ ত্যাগের পুরস্কার ঐ চন্দ্রের বুকে শান্তিতে বাস। এটা চাঁদের মাস, তাই এ মাসে খরগোশ নিয়ে এতো হৈ হৈ-রৈ রৈ।

মনে মনে ভাবি ত্যাগ এবং আতিথেয়তার সম্মানে যে জাতি এতো বড়ো মাসব্যাপী উৎসব করে তাদের দেশে য়োরোপীয় হিংস্র, দন্তুর স্বার্থপরতার করাল ছায়া। এদের মিল হবে কেন? হলে হবে হাঙ্গরের সঙ্গে মাছের যা মিল। U. N. O., SEATO, NATO, Warsaw Pact,—হোক্ গে, হোক্ গে! ত্যাগ নৈলে আবাব বন্ধুত্ব! মানবতার বোধে উদ্বুদ্ধ নয় যে প্রাণ, তার আবার ভালোবাসা! ছোঃ! ধীরে ধীরে বুড়ির কাছে জানলুম চীনা পাঁজীতে এটা ৪৬৭৩-তম বছর!! মানে অব্যাহত মানুষ চার হাজার ছশো তিয়াত্তোরটি বছরের সভ্যতাকে হাতে পাতে গুণে চলেছে!! এর মধ্যে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় কতো রাজা-রাজ্য উঠলো পড়লো; কতো নতুন বর্ষের পত্তন হোলো, মিলিয়ে গেলো; তবু ঐ ৪৬৭৩ বছর আগেকার পাঁজী আজও চলেছে। মনে মনে গর্ব হয় এমন একটা জাতের দরবারে ঢোকার সিংহদ্বারেই দাঁড়িয়ে আমি। রাজনীতির ফেরে সেই দেশেই আজ আমার প্রবেশ নিষেধ। যে দেশে আমার দেশের অতীশ, ধর্মপাল আসছেন শুনে স্বয়ং রাজা অর্ঘ্য

নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। শীলভদ্র বহুকাল চীনে থাকার পর ভারতে আসার সময় চীনে তো কান্নাই পড়ে গেছিলো। তিনি ফিরে যখন গেলেন রাজ্যময় সপ্তাহব্যাপী উৎসবের ঘটা! হায় রে সেদিন; হায়রে ভারত! বুদ্ধের জীবনী, ফা-হিয়েনের কড়চা, য়ুয়েন চোয়াং-এর কড়চা,—যা থেকে ভারতের ইতিহাস জোড়াতাড়া দিই,—সবইতো আমাদের চীন দেশ থেকেই বয়ে আনতে হয়েছে। কী দেশ! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় খৃষ্টের ১৭৬৬ বছর আগে ৬০ দিনের পরিক্রমা গুণে এক বর্ষ গণনা চালু ছিলো চীনে !!

বুড়ীই আমায় বুদ্ধি দিয়ে দিলো খাওয়ার। যেখানে সেখানে যেন না খাই। এরা সর্বভুক।—ক্যাণ্টনীজ, সাঙ্ঘানীজ, পেকিনীজ, জেব্‌চুয়ান্, চিউ-চাউ, মোঙ্গোলিয়ান,—আরও আরও রান্নার রকমফের এখানে। তোমাদের ঐ গে-লর্ড-ও আছে, আবার আমেরিকান শেরাটোনও আছে। ইংরিজী খানা তো আছেই। তুমি দিম্-সুম্-খেও। ঐ স্টার ফেরীর মুখেই মস্ত দোকান। ঢালাও ব্যবস্থা। একটু হয়তো নোংরা মনে হবে। বাঁশের বাটীতে খেতে দেবে।—মেয়েরা বাটী নিয়ে ঘুরবে। তোমার যা ইচ্ছে নাও, খাও। তারপর বাটী গুণে দাম নিয়ে যাবে। টাটকা ভালো খাবার। কেবল জায়গা দেখেই নাক সিঁটকিও না। কাণ্টনীজ রান্নাটাই চীনা রান্না বলে য়োরোপে। সাঙ্ঘাই-য়ের খাবারে ভাজা বেশী। মশলাও বেশ্। পিকিনীজ খাবার খুব ঝাল মশলাদার আর রান্না করে অনেকক্ষণ ধরে। পিকিনের হাঁস প্রসিদ্ধ। ভাত পাবে না এখানে। রুটি। মাদ্রাজীদের মতো ঝালই ঝাল। দই, শিমের বিচী, শিম। সাঙ্ঘাইয়ের মতো; কিন্তু অতোক্ষণ ধরে রান্না নয়। তোমরা কতো মশলা খাও জানি না। পাঞ্জাবীরা কিন্তু মশলাদারই ভালোবাসে। ওরা চিউ-চাউ রান্না খেতে ভালোবাসে। নুনে, তেলে, মশলায় গরগরে রান্না।

আমি বলি দিম্-সুমই ভালো।

না না; কাণ্টনীজ আর সাঙ্ঘানীজ চেখে দেখো। মোঙ্গোলীয়ান রান্না তোমার চলবে না। সে হোলো বড় বড় জন্তু রোষ্ট করা। এটাই এ রান্নার বিশেষত্ব।—একবার রোষ্ট করে নাও; দশ বিশজন তিন-চার দিন ধরে কাটো, খাও।

আর একটা দিকের খবর জানতে চাইছিলাম। কিন্তু আজ থাক। অন্ধকার হয়ে আসছে। স্টার ফেরী পার করে কাউলুনে যাই। বাজার শুনেছি অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।

রাত? রাত আবার কোথায়? কাউলুনে তো রাতই দিন! বন্ধও কিছু হয় না। রাত দুটো অবধি তো ফেরীই চলে। তারও পরে ফিরতে চাও, মোটর বোট চলছে। আর কাউলুনে যাচ্ছো। আর কোনো খবর দরকারই

(ম)বে না। ওখানে গেলেই লাল বাতি, দালাল, বাজনা, হ্যাণ্ডবিল,—সবই পাবে ; সব খোঁজ পাবে।—চোখ-কান বন্ধ করে রাখলেও চোখ কানের ভিৎরে এসে সেঁদুবে।

*   *   *   *

সত্যিই বলেছিলো বুড়ী। ফেরী অবধি তো বাসেই এলুম। পনেরো সেণ্ট।—দোতলা প্র্যাকটিক্যাল বাস। পয়সা দিয়ে ঢুকে যাও।—বেশী চড়া যায় না।—স্টার ফেরীর পথে দেখবার যা আছে রাতে দেখা যাবে না। কাজেই সোজা ফেরীতে চড়লাম। স্টীমার ভিক্‌টোরিয়া খাড়ির বুকে পড়তেই প্রত্যক্ষ করলাম হংকং বন্দরের মহিমা। গিস গিস্‌ করছে কতো রকমের যে জল যান। বড়ো বড়ো জাহাজ থেকে ডিঙ্গী। তেলের জাহাজ থেকে পালের, বৈঠায়, পেট্রলের।—সিঙ্গাপুর দেখলে বেশ বড় মনে হয়। কিন্তু এ বড়ো সব বড়ো মনে হওয়ার বাইরে। ভীড় ভীড়। জল যেন জলই নয়। বাজার, সংসার, চলাচল, চুরি, হত্যা, পুজো, পার্বণ, জন্ম, মৃত্যু, শোক, হর্ষ—সব এই জলে। একটু দূরে এলেই হংকং তার বিশ্ববিখ্যাত সৌন্দর্য নিয়ে গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভিকটোরিয়া পীক্‌, টাইগার হিল, গায়ে গায়ে এক-সে-এক সেরা বাড়ি,—একদার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দেওয়া জড়োয়া গায়ে দিয়ে আজও রাজ্যেশ্বরীর স্বপ্নে মশগুল।—

কনট্‌ রোড্‌টা দক্ষিণের পাড়ের ওপর। ফেরীর পরের বড় রাস্তাটা। তারপরেই দ্যে-ভুঁ রোড। স্টার ফেরীর পাশেই বিরাট সিটী-হল। তার পাশে ন্যাভ্যাল হেড কোয়ার্টার্সের শানদার ইমারত। প্রিন্সেস বিল্ডিং, কনট্‌ সেণ্টার, জার্ডিন হাউস্‌, সুপ্রীম কোর্ট সব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ছাপিয়ে যাচ্ছে হিলটন হোটেল, হোটেল মান্দারিন,—আর ব্যাঙ্কগুলো। টোকিও ব্যাঙ্ক, চায়না ব্যাঙ্ক, ফার্স্ট ন্যাশনাল, হংকং-সাংঘাই। লাল নীল আলোর ঘটা। সেই সৌন্দর্য নেই মানাহাটানে, ভিনিসে, পা-রী-ঈতে। সিঙ্গাপুরের ত্রুটি তার টাইগার হিল নেই ; তার দাইনে বাঁয়ে হারবার নেই! রাতে ভিক্টোরিয়া হার্বার থেকে এই অতিশয়োক্তিতে আভূষিত মনোহরণী ব্যভিচারিণী নগরীর চাকচিক্য দেখে ভেতরে ভেতরে আমি যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠছিলাম ঃ—আফিং খাইয়ে কোটি কোটি লোকের সর্বনাশ করে একদা যে ভূরি ভোজ করেছিলে বন্ধু, আজ সে থালা-বাটী তো তোমায় অবশেষে ছেড়েই দিতে হোলো জাপানকে, জর্মনীকে, আমেরিকাকে। হে আমার দু-কান কাটা বণিক বন্ধু, তবু বলবে আমেরিকা তোমার তিন পুরুষের কেউ ; আর জাপান, জর্মানী-কে তুমি হারিয়ে দিয়েছো?

যতোই কাউলান, মানে আসল চীন ভূখণ্ডের দিকে এগুচ্ছি, যতোই চীনের বাতাস গায়ে লাগছে মনের গভীরে শির শির করে এই কথাগুলো

নাড়া দিচ্ছে। এ আমার স্নায়ুর দোষ। আমি মাস্টার হয়েও মাস্টার হয়ে থাকতে নারাজ। বুড়ী পকোড়া বেচছে। মানুষ পকোড়া কিনে জীবন রক্ষা করছে! আর সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে লক্ষবাতি হাজার বাতিতে সাজানো এক একটি বাজখাঁই ইমারত।—তারা জুড়ে আছে হারবারের বুক; ছড়িয়ে আছে হারবারের এদিকে,—ওদিকে।—এ শহরে এক এক রাতে জুয়ার আড্ডায় বিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের—লেন দেন হচ্ছে। কোনো কোনো রাতে কোটিও পার হয়ে যায়।—এক রাতের খরচা দিলে ভারতে এক বছরের শিক্ষা-বিধান করবার খরচা অনায়াসে পাওয়া যাও।

কিসমেট বলে 'ক্লাব' আছে। প্রতিটি টেবিলে খানা আনছে তিন-চারটি মেয়ে। পরনে তাদের কিছু নেই বললে বটপাতা কাঁঠাল পাতার কাছে মিথ্যেবাদী হতে হয়। কিন্তু ওপর তলায় কিছু নেই। চুলও মাপসই কাটা; কারুর কারুর আবার পুরুষদের মতো করে ছাঁটা। অনেকে মেয়েদের মধ্যেও পুরুষই খুঁজে বেড়ায়। এ হংকং! এখানে জুয়া চলেছে হাজারের দানে। বিল যখন আসবে খাওয়া-দাওয়ার, খিদ মতের,—তখন কার গায়ের কোন কোন জায়গায় তোমার কতোবার কতোক্ষণ কী আন্দাজ ছোঁয়া লেগেছে,—তাই নিয়ে বিল! আশ্চর্য যে এখানেও অনেকেই স্ত্রী, শালী নিয়েও যান্। দানস্কাউ ক্লাবও তাই। এখানে জাপানী, কোরিয়ান, পংজাবী, সিংহলীও পাবে। —ক্লাব টোকিও,—ইগনিস্, কোকুসাই, লা-রোণ্ডা, ক্লাব দাইচী, ক্লাব মিকাডো, ডিফেন্স বার,—এমন কী প্লে-বয় ক্লাবই রয়েছে। হংকং মানে কাউলুন; কাউলুন মানে বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত। জাপানেও এ সবই আছে; কেবল সেখানকার ব্যবহার, আচরণ, ভদ্র, সুন্দর, রুচিসঙ্গত। এ ধরণের বেলেল্লাপনা কেবল য়োরোপীয়ান কলোনিয়ালিজ্মের নিজস্ব ব্যাপার। সেটাই গিয়ে অর্শেছে আমেরিকার মতো জগাখিচুড়ী শেকড়হীন একটা ভুঁইফোড় সমাজের মধ্যে।

দুটো একটা ক্লাবে যাবো, ইচ্ছে আছে। আমার দুর্ভোগ,—বউ সঙ্গে নেই। মদ খাই না। জুয়া খেলি না। ভাড়াটে মেয়ে যে জুটিয়ে নোবো, তাও হিম্মতে বাধে। তবে যদি বলো ঐ হাস্‌সানা, বা কিতাং মায়ো—সতি কথা বলবো পদ্ম,—ওদের যখন দেখি, পাই, কাছাকাছি আসি,—চণ্ডীর একটি পংক্তি জ্বল্ জ্বল্ করে,—বিদ্যাঃ সমস্তাঃ তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। বিদ্যায় অবিদ্যায় সেই চিতিরূপেণ সংস্থিতা দেবী। সেই মা। ওদের রঙ্গও তো তাঁরই রঙ্গ। মা-কে স্বৈরিণী বলে গাল দেয় জগন্নাথ মন্দিরে, তিব্বতে।—ওদের কাছে আমি যেন আরো জোর পাই। আর সে অধিকারও ওরাই দেয়। এ আমি বারবার দেখেছি।—

বাক্ পিকিং রোড ধরে নাথান রোডে এসে পড়েছি। হংকং-এর নাথান

াড কলকাতার চৌরঙ্গী ইন্-টু চৌরঙ্গী প্লাস কনট্ প্লেস (নয়া দিল্লীর)।
ক্ রোড, হ্যাঙ্কাও রোড, এ্যশ্লী রোড—ঠাসা দোকানে এবং কানমলায়।
াথান রোড আর চাথাম রোড সমান্তরাল পথ। মাঝের পথগুলোই দারুণ
াস্তা, তপ্ত খোলা ; পড়েছো কী খই। 'বীজায় নেম্যতে'। আর জন্মাবে
। বীজত্ব খতম। এখানে লুটিয়ে দাও এক লাখ এক রাতে থাকে তো।
; থাকে তো দালালের খাতায় নাম লেখাও।

আমি ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি—স্যুট্ চাই ?
িবশ ঘণ্টায় ডেলিভারী।…মুক্তোর জড়োয়া সেট্ ? গ্যারাণ্টি ! ক্যানন্-রেঞ্জ
-হাফ প্রাইস্—হোম ডেলিভারী—ঘড়ি নেবেন ? আরও জীবন্ত সওদার কথা
ুনছি। তুমি ছোট্ট বোনটি। সে কথা তোমায় শোনাবো না। "প্রথমভাগ"-
র লেখকের মানা আছে।—যাদের ঐ বাবদে বর্ণপরিচয় নেই তাদের পক্ষে
সব আবাহন সোজা বিসর্জন। ভরা পকেটে এসো, নাঙ্গা পকেটে ফেরো।
নাবিধ ছবি সহ, ঠিকানা সহ উর্বশীর বাসর শয়নের ঠিকানা ! বলছে,—
ব দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেবে। নার্ভ জগতে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ঢুকে পড়ি কফি হাউসে। সেণ্ট মেরিস কলেজের মোড়। মনে হোলো
খানে কফি পাবো, বিলের পয়সা দেবো ব্যস্। মাঝের আনুষঙ্গিক কিছু
াই। বিশেষ যখন কলেজ পাড়া।

কিন্তু ঢুকে দেখি ময়ূরের দলে একমাত্র দাঁড়কাক আমি-ই।—আমার মতো
ধ্যবয়সী বুড়োরা ব্যাঙ্ককে আসে এক নয় আর্থিক ব্যবসায়ে, নয় কামিক
পব্যবসায়ে,—পারমার্থিক ব্যাপারে কেউ আসে না। বসলাম একটা একানে
টবিলে। সুবিধে কফি এবং কফির সঙ্গে টুকিটাকি খাবার ছাড়া কিছু
াই। বেশ গভীর এবং চকচকে আপ্ হোল্স্টারি করা তুলতুলে নরম গদি
াঁটা সোফা আঁটা ঘরে সারি সারি টেবিল। একবার বসতে পারলে তোমার
াথাটি ছাড়া সর্বাঙ্গ যেন ডুবে গেলো। প্রতি সোফায় যারা যুগল-বেঁধে
সে, কারুর বয়স পিটিয়েও চব্বিশ-পঁচিশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।
ামার আবার সারা জীবন গেলো এদেরই ভালোবেসে। বিদেশেও যদি কোন
াসপাতালে আগুন লাগে দেখে তোমার মন যা করবে, একটা ভরা খামারে
াগুন লেগেছে দেখলে অন্য চাষার মন যেমন করবে,—হই না কেন বিদেশী,
ই তরুণ তরুণীদের এখানে ড্রাগ নিয়ে এমন বসে থাকতে দেখে কী মনে
চ্ছে। যে মেয়েটি কফির পাত্র নিয়ে কথা বলতে এলো তাকে জিগ্যেস করলাম
টা ভাষা জানে, এবং আমি যে ইংরাজী জানি ধরলো কী করে। মেয়েটি এশিয়ার
াটটা ভাষা জানে ; য়োরোপের তিনটি। আমি যখন হোটেলের মেন্যু পড়ছিলাম
াখনই বুঝে নিয়েছিলো আমার ভাষা।—আমাকে একটা ভাজা গরম কিছু

এনে দিলো। ওদের দেশের স'স্ দিয়ে। পুরোটাই প্রায় ভেষজ-উদ্ভিদ্।
ওদের দেশের-মানে চীনের সস্ এবং বুনো ফুলের সঙ্গে ঘুষো চিংড়ির গুঁড়ো
ফেটিয়ে পকোড়া। আমি খেয়েই বলি সাংঘাঙ্গ রান্না! মেয়েটি জিগ্যেস করে
জানলেন কী করে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি জানলুম কী করে তুমি আজ
সকালেই চুল ধুয়েছো আর সল্ট-বাথ নিয়েছো।—মেয়েটি জুৎ হয়ে বসছে
দেখে দুটি ছেলে এসে বসলো।—ওরা আপোষে কথা বলে। কিছুই বুঝি
না আমি। কিন্তু পুরো চল্লিশটি বছর ধরে ঐসব চকচকে চোখের ভাষ
পড়তে হয়েছে। বুঝলাম ওরা আরও জানার জন্য ব্যস্ত। একেবারে ব্যাং
আশুলো চিবোনো চীনের মতো ইংরিজীতে বেঁটে ছেলেটি বলে কী করে
জানলে? আমি বললুম, বেশ তবে আরো বলি,—আজ সন্ধ্যায় তুমি এখানে
বসে আছো ঠিকই। কিন্তু তোমার মন পড়ে আছে সিনেমায় যাবে তারপর
ডান্সে, তারপর, তারপর, তারপর···পর পর তারপর। তারপরে আর তারপ
থাকবে না। সকাল হয়ে যাবে।

ওঃ! সেই সদ্য যৌবনদীপ্ত দলা দলা জীবনের পিণ্ডগুলো যেন খোঁ
খাওয়া আগুনের মতো দপদপ করে উঠলো। তুমি কিন্তু আজ বাড়িতে ন
খেয়ে এসেছো। কেন জানি না। পয়সা আনো নি, ভুলে গেছো। বললা
ছেলেটিকে। ছেলেটি বললো গরীবও তো হতে পারি! গরীব তো নওই
বরং দারুণ কাৎলার ব্যেটা ক্যাৎলা। তোমার বাবার বিস্কুট ফ্যাকটরী আছে
তাই নয়?

দেখতে দেখতে আমায় নিয়ে ভীড়। আর আমি রুখতে পারি না। দু
কাপ কফি এবং আরও আরও কী সব খাওয়ার পর ওরা আমার সঙ্গ নিলো
ওদের বোঝাতে হোলো যে-মেয়ে এলিজাবেথ আর্ডেনের শ্যাম্পু আর বাথ্স
সলট ব্যবহার করে তাকে যদি কফির দোকানে দেখি বলতেই হয় কেউ দিয়েছে
এবং আমি যদি তা দিনে দিনে ব্যবহার করে রাতের সাজ গোজ করে বেরি
পড়ে থাকি তা হলে সেই রাতের নায়ক এখনও আসবে বলেই প্রতীক্ষা। এ
মধ্যে মেয়েটিকে কবার ঘড়ি দেখতে হয়েছে। বাইরের দিকে চাইতে হচ্চে ঘ
ঘন। খবরের কাগজের সিনেমার পাতাটাও তো ওর কোলের ওপরই। কাজে
কেউ আসছে এটাই সম্ভব। অথচ দেখো পোরে আছে ড্যান্স হলের জুতো
—কাজেই একটু আধটু চান্স্ নিয়ে এসব কথা বলায় দোষ কী? অ
কিছু না হোক রসসৃষ্টি তো হয়ই। বড় জোর ভুল করবো। ক্ষতি কী
পাকা ব্যবসায়ী গোয়েন্দা তো নই! আর তোমার গায়ে দামী য়াম্-য়াম এ
শার্ট। পরণে সিল্ক প্যান্ট। তুমি আবার আভাবের তাড়ায় গোগ্রাসে খাবে
লক্ষ্য করেনি টয়োটা-র যে চাবিটা নিয়ে খেলা করছিলে সেটা লেটেস্ট অ

টোম্যাটিক মডেল। তেমন গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু একখানাই। এবং
রে গায়ে বেকারি-বিস্কুটের প্রতিধ্বনি তো স্বাক্ষরিত। খুব ভাবতে হয়নি।
কিন্তু ওরাও যখন বললো নাইট ক্লাবে যাবেন? আমি হতাশ হয়ে বলি,
খন তো চাঁদের ক্লাবে জ্যোৎস্নার নাচ চলেছে। তবে আবার নাইট কী?
লো না হেঁটে বেড়াই। এখানে তোমরা হাঁটো না?

তা হোলো না। গাড়ি করে সফরে বেরুনোই ঠিক হোলো। ওর সেই
াড়িতে আমরা বোধকরি সাত-আটজন ছেলেয় মেয়েয়।—পথে চীনা-ওস্তাদ ব্যাঞ্জো
াজাচ্ছে। ফুটপাথে চীনা গণৎকার দারুণ ব্যবসা জমিয়েছে। বছরে এদেশে
শ লক্ষ টুরিস্ট-ই শুধু আসে। চীনের মতো দারুণ নিট-পিটে, হিসিবী,
মতব্যয়ী দেশের গায়ে গা ঠেকিয়ে কাউলুন-হংকং পা ছড়িয়ে আরামে সর্বগণ্যা
ুল্ক পণ্যা রম্ভা ঘৃতাচীর মতো নিপাট সাজ-সজ্জায় ডগোমগো হয়ে বসে
াকবে,—আর মানুষ হা-হন্যে হয়ে আসবে না,—তা হয় না। বোটে, জাহাজে,
ট্রনে, প্লেনে,—আসছেই মানুষ আসছে। নিত্য নওরোজের মাতনে যোগ দিচ্ছে।
—রাতে ওদের মোটর 'টানেল'-এর ভেতর দিয়ে বার চারেক ঘুরলো, পাহাড়ে
ড়লো, বন্দর ঘাটায় গেলো। অবশেষে ওরা বীকন হিলে চড়ে পাহাড়ী পথ
রলো। নামলো এসে সমুদ্রের ধারে ধারে হ্যাং-হাও-তে এসে। ওরা চলে
াবে এখান থেকে। আমায় একটা ওয়ালা-ওয়ালায় চাপিয়ে দিলো কাউলুনে
াতে পেঁাছে দেয়। ওয়ালা-ওয়ালাকে বলতে পারো জলের ট্যাকসী। সাড়ে
তন ডলারে সারা ভিক্টোরিয়া হারবার ঘুরিয়ে নামিয়ে দিলো ঐ স্টার ফেরীরই
ারে। ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখি সেই চ্যাথাম রোডেই এসেছি।—মিনিট
াঁচেক হাঁটার পর শেরাটন হোটেলের জগদ্দল কার-পার্কটা চোখে পড়লো।
ুঝলাম নাথান-রোডেরই নীচের দিক এটা। হলিডে-ইন রেস্তরাঁর পাশেই বিরাট
আর্কেড। ঘুরি আর জিনিষপত্র দেখি। এখানে বেশ কয়েকটা দোকানেই
সিন্ধী, গুজরাতী, পঞ্জাবী। বাংলাদেশীও (আগে ছিলো পাকিস্তানী) আছে।
একটা দোকানে ঢুকে পড়ি। টেলিফোন নম্বর ছিলো। রিং করি।—কিন্তু
মিস্টার কে—নেই সেখানে। একটি অল্পবয়সী ছেলের গলা। সে না জানে
তাজমুল, না কণিকা।—কিন্তু আমি নাথান স্ট্রীটে। হাঁটতে হাঁটতেই
'কলোনী'তে গেলুম। চুংকিং ম্যান্‌সন্‌সে ঐ নামের কেউ নেই। চিওং হিং
বিল্ডিং আছে, হ্যাস্কী এ্যাভিন্যুর মোড়ে।—সেখানে রাওলপিণ্ডি হাউস পেলাম
ঠিকই।—কিন্তু তাদের পাত্তা নেই।—

আমার টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কেনার ছিলো। ঐ প্রসঙ্গে বুঝে নিলাম
হংকং-য়ে দর দাম নিয়ে যা রটনা, সেটা অতিশয়োক্তি নয়।

ক্ষিধে পেয়েছে। রাতও হয়েছে। হোটেলে গেলে সেই আমেরিকান রান্না

চৈনিক বলে চালাবে। অগত্যা স্টার ফেরীতে ফিরে খাবার চেষ্টা করতে
পিকিং রোড পার করে স্টার হাউসের দিকে আসতে মস্ত এক খোলা খাবা
জায়গা। রাস্তার কোণ। দু দিকই খোলা। ভেতরে সংখ্যাহীন টেবিল চেয়া
থিক থিক করছে। একটা চেয়ার টেনে একটু বাইরের দিক দেখে বসি
সত্যিই মেয়েরা ট্রেতে করে খাবার নিয়ে আসে। দিম-সুমও দিলো। বাঁশে
বাটী থেকে কাঠি দিয়ে খাও। আমি ফর্ক'ই চেয়ে নিলাম।

খাওয়া ভালোই হোলো। ফেরী পার হয়ে হোটেলে ফিরেই ঘুম। খ
ঘুম পেয়েছিলো।—

কিন্তু ঘুম ভেঙেছিলো বেশ ভোরে। আমি তৈরী হয়ে নিয়ে ধাও
করলুম ভিকটোরিয়া পীকে। ঐ সেই পেছনের পথ ধরে একটা বাস নিলাম
বাস আমায় সাংঘাই ব্যাঙ্কের মোড়ে পীকে চড়ার পাহাড়ের পাদদেশে নামি
দিলো।—পথ বেশ সুন্দর, চওড়া, বড়ো। বাস যাতায়াতও করে। আ
কিন্তু পায়ে হেঁটে ওঠার জন্যই ব্যস্ত।—একা চলতে স্পীড আপনিই বে
যায়। কিন্তু বয়সের হাঁফ ধরেই।—কাজেই ধীরে ধীরে উঠি। একেবা
একা। এবং কুয়াশায় ঢাকা ভিক্‌টোরিয়া হার্বার। ওপারের পাহাড় এ
এপারের পাহাড়। মাঝে সমুদ্রের খাড়ি। ডান দিকে সূর্য উঠেছে ঘণ্টাখানে
হবে। কিন্তু বাঁদিক একেবারেই ঘোলাটে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনে
'আর্জানো' গাছ। বুনো গাছ নেই বললেই হয়।—কী যে নিস্তব্ধ জগৎ,
সুন্দর তকতকে পথ। ঠাণ্ডা বাতাসটি যেমন হাল্কা তেমনি সজাগ। বাতাস
লক্ষ্যে পড়ে,—এমনই শান্তি।—

কিন্তু ওপরে ওঠার পর আমার মন হঠাৎ খুব বিষণ্ণ হয়ে গেলো। আমা
একজন প্রিয় বান্ধবী আছেন। খুবই প্রিয়।—তিনি আমাকে বহুকাল আ
বলে বলে একখানা রোম্যান্টিক বই পড়ান,—'লভ্‌ ইজ্‌-এ-মেনি-স্প্লেণ্ডার
থিং'। বইখানা পড়ার পর আমিও তাঁকে পড়তে দিই 'এ লীফ্‌ ইন
স্টর্ম''। দুটো বই-ই আমেরিকান-চীন লিখেছেন, এবং দুটোই হংকং নিয়ে
কিন্তু পরে ঐ বইখানা আমি সিনেমায় দেখি। ফলে হংকং-এর এই পীকটা
একটা দিক, একটা গাছ আমায় পেয়ে বসলো। ঘণ্টা দুই খুঁজে সেই গাছটা
আমি পেয়ে গেলাম। ঐ জায়গাটায় ফোটো তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা হয়ে ব
শেষ হয়।—হঠাৎ সেই গাছ, সেই গল্প, লেখিকা সেই মেয়েটি, তার কম্যুনিজম
এবং আমার সেই সখীর কথা মনে হোয়েছিলো। খুব স্পষ্ট করে তারা মনে
ওপর তলায় এসে আকাশভরা আলোর তলায় না দাঁড়ালেও,—নীচের-নীচে
তার-নীচের তলায় তারা চিরকাল বসেছিলোই। নাড়া দিচ্ছিলো। কেন

হঠাৎ খুশীর পেয়ালার কপালে বুদ্বুদটি ফেটে যেতে দেখে মনের চোখ হংকং হারবারের মতো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কে বলবে। মনে হয় কেউ আসুক।

সে সকালে কেউ এলো না।—দুটো একটা ছবি নিলাম।—ব্যর্থ। কুয়াশা আর ভেদ হয় না।—পীকে চড়ার ট্রাম আছে। এক (হংকং) ডলার ভাড়া। মস্ত খোলা জায়গা। চারধার থেকে ফোটো নেওয়া যায়।—দোকান পাট, রেস্তরাঁ সব আছে।—রেস্তরাঁর গা ঘেঁষে সুসজ্জিত বাগান। ছাদে বাগান করতে চীনারা ওস্তাদ। এখান থেকে সারা হংকং দেখা একটা বিলাস, যদি কেউ সঙ্গে থাকে।—টাওয়ারটা হংকং হারবার থেকে তেরোশো আশি ফুট উঁচু।—

বেলা একটু বেড়েছে। কয়েক ঝাঁক টুরিস্ট এসে পড়ে আমেরিকা য়োরোপের গন্ধ ছেড়েছে। রোদের দিকে এক ছবিওলা ঝপাঝপ ছবি আঁকছে, বিক্রীও করছে। আমি কেবল টাঙ্গানো ছবিগুলোরই ছবি নিলুম। এসে বসলুম বাসে। বাস নিয়ে গিয়ে নামিয়ে যেখানে দিলো সেখান থেকে স্টার ফেরী জাস্ট্ অ্যাক্রস্ দি রোড্! কিন্তু রোডটি খুব পেল্লায় বলে রোডের ওপর দিয়ে পুল তৈরী করা হয়েছে। শেষ না হলেও লোকে কিছু অংশ ব্যবহার করছে। বিশাল পুল। শুধুই মানুষ চলাচলের। মাঝে মাঝেই দাহিনে বাঁয়ে সিঁড়ি। কোনোটা নামছে এ পথে, কোনোটা সে পথে, কোনোটা রেল স্টেশনে, কোনোটা জাহাজ ঘাটায়।

এবং কোনোটা—নামছে স্ট্যাচু স্কোয়ারে!

স্ট্যাচু স্কয়ারে অনেকেই বসে আছে। গল্পগাছা করছে। সিমেণ্টে বাঁধানো বাগানের কেয়ারী করা, ফোয়ারা দিয়ে সাজানো জায়গায় কয়েকটি মডার্ন আর্ট নামক অ্যাব্স্ট্রাক্ট্।—বলছি না পা-রী-ঈর কারুজেল্ বা ত্যুলারীজ্-এ সাজানো সেই সব হেলেনিক স্বপ্নালু অবয়বের অনুকৃতিই একমাত্র আর্ট, এবং ঐ পেশী-চমৎকৃত নগ্ন খেলাই সর্বত্র থাকা উচিত। কিন্তু কী দোষ করেছে রদেনস্টীন, রদ্যাঁ—এমন কী হেনরী মুর? এই যে জ্যামিতিক বৃত্ত এবং কোণ দিয়ে রচা সিমেণ্টের পাহাড়ের মাঝে মাঝে শূন্য শূন্য ফাঁকা গোল—এ থেকে আর্ট সংগ্রহ করতে গলদ্ঘর্ম হতে হয়। অন্ততঃ সকালবেলা, বাচ্চাদের ছুটোছুটি, মানুষের অবসর বিলাস,—তার মধ্যে যেন এ বেমানান। কোর্ট অব জাস্টিস্, সাংঘাই ব্যাঙ্ক, প্রিন্সেস বিল্ডিং প্রভৃতি প্রখ্যাত ইমারতগুলি এইখানেই।

এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলুম নিকটস্থ টাইগার হিলে।—'টাইগার বাম্' জানোতো? সেকালে চীনের জিন্ডান আর টাইগার বাম্ ছিলো একালের বোরোলিন আর ডেটলের মতো সর্বরোগহর দাওয়াই। এ্যাসপিরিন, কোডো-পাইরিন, ভিক্স আর হর্তুকীর মিলিত কাজ করবে একা ঐ টাইগার বাম

চীনের 'বীচাম্‌স্‌ পিল্‌'। টাইগার বামের আবিষ্কর্তা মিঃ অ-বুন্‌-হ। আরও দু-একটি অমনি সর্বরোগহর দাওয়াই বার করে 'হ'-সাহেব কোটি কোটি টাকা আয় করে টাকা নিয়ে কী করবেন ভেবে পান না। সেই টাকা বহু সদ্ব্যয়ে ব্যবহার করেছেন তিনি। তার মধ্যে হংকং-এর ডিজনী-ল্যাণ্ড এই টাইগার গার্ডন্‌স্‌।

গেটের কাছে টাইগার বাম বিক্রী হচ্চে। একটা জার তুলে প্রাচীন কালের সেই বিজ্ঞাপন পড়ি। কী আছে এতে?—কর্পূর, লবঙ্গের তেল, পিপারমেণ্ট, মোম, পেট্রোল, মেন্থল, কাজুপেট তেল। আরাম হয় কী কী রোগ?—সব লিস্ট করা। ঠগবার জো নেই।—গেঁটে বাত, মচকে যাওয়া লচকে যাওয়া, লদকে যাওয়া, মশা-মাছি-বিছা-মাকড়সার কামড়;—হাগা, না-হাগা ঘুম, না-ঘুম, চুলকোনা, খোস-পাঁচড়া, কোমরের বাত, আর তোমাদের প্রসিদ্ধ মাথাধরা—সবরোগে ধন্বন্তরী।

ঐ টাকায় তিনি যথেষ্ট দান ধ্যান করে গেছেন। উইল করে গেছেন,—তাঁর রেজিস্টার্ড দাওয়াই বেচার মুনাফার শতকরা ষাট অংশ, ধরো দুই তৃতীয়াংশ দান খয়রাত করতে হবে স্কুলে, হাসপাতালে, শিশুসদনে, বৃদ্ধসদনে, নৈসর্গিক গোলমালে বিপন্নদের সাহায্যে। এটা মুখ্যতঃ চীনে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দিতে হবে।

বলে টাইগার হিলের বাগান সাজাতে খরচ হয়েছে সেকালের ষোলো মিলিয়ন ডলার। পয়সা লাগে না ঢুকতে।—হ সাহেব কিন্তু খবরের কাগজের মালিক ছিলেন। এখনও সেই খবরের কাগজের দপ্তরে এক মু্যজিয়ামে হ'র নিজের সংগ্রহ করা অত্যন্ত মূল্যবান শিল্প সম্পদ দেখতে পাওয়া যায়।

টাইগার হিলে জাপানের ও চীনের প্রসিদ্ধ রূপকথার জীবজন্তুগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করে এমন কোরে রাখা যে হার্টের রুগীর পক্ষে না যাওয়াই ভালো। চীনেতে চীনারা চীনা-সিঁদুরের রংটি বড়ই ভালোবাসে। থাই-ল্যাণ্ডের লালটা গাঢ় আলতার লাল। এ হোলো মেটে-সিঁদুর কিন্তু যেন জ্বলছে।—ঢুকেই এক বৃহৎ শার্দূল বিক্রীড়িত। উনি নাকি স্বয়ং বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন। তুমি গেলেও চুমো ছাড়া কিছু খাবেন না। (এমনিও হয়তো তোমায়-আমায় খেতো না। কারণ চীনেরা চাঁব ভালোবাসে না)। এর ভেতরে বিশ্রাম বোলে, রেস্তরাঁ বোলে, মুজিয়াম বোলে যে কখানা বাড়ি আছে মনোহর। বিশ্রাম এবং ভোগের ব্যবস্থা ভেতরে না যতো কুঞ্জে কুঞ্জে তার ঢের বেশী।

আর মনোহর!! একা একা কাঁহাতক মন-হারিয়ে কাঁদি বলো। তোমার মন হারাবে আমি খুঁজে দেবো, আমার মন হারাবে, তুমি খুঁজে দেবে, তবে না

এ সব দেখার মজা। ঘুরে ফিরে ঐ নাথান স্ট্রীট ছাড়া যেন আমার গতি নেই।—সেই কামিখ্যের পথে গাড়িতে গান শুনিয়েছিলাম,—এবার মরে ভ্যানিটি ব্যাগ হবো, সর্বদা মুখ খুলে রাখবো, বগল দাবায় থেকেও তবু প্রিয়ার বাজার দেবো কিনে!—কিন্তু নাথান স্ট্রীটে যখন তোমায় নিয়ে ঘুরবো তখন গানটা আমায় ফিরে বাঁধতে হবে। এবার মরে শো-কেস হবো; হীরে মোতিতে মুড়ে রবো;—পথ চলতি প্রিয়ার আমার আড় চাহনির শিকার হবো।—কিন্তু ভেতরে ঢুকে কেনা? নাঃ। সেকি আর হবে গো? তোমার হাসপাতাল যা দেয়, আর আমার কলেজ যা দেয় দুই ঝাড়ু মেরে এক করলেও নাথান্ স্ট্রীটের জুরীথ জুয়েলারি বা স্টীভেন্সনে ঢুকতে লারবো।—দু-দশ হাজার ডলার নিয়ে গেলেও ওরা বলবে, অরিএন্টাল শো হাউসে যান; যা খুঁজছেন পাবেন। এবং দোরের বার অবধি পেঁৗছে দেবে, অবশ্য অন্য কারণে!

কিন্তু এখন আমার মতলব অন্য। আমি দৌড় লাগাই উত্তরের ট্রেনে। চলে যাই ঐ নিউ টেরিটোরিজ, লো-উ। বাস নিলুম উত্তরে তাই-পো যাবার। গেলুম। কিন্তু বাসে যাওয়ার যে মজা সে বাবদে বিশেষ সুবিধে হোলো না। বাসের পথ রেল লাইনের ধারে ধারে। আর পথের দুধারে কেবল ফ্যাক্টরী আর হাজার হাজার বস্তি। বলে রেফিউজী। আসলে নিও-কলোনিয়ালিজ্ম্ আর মালটি-ন্যাশন্যাল ক্যাপিটালিজমের উদ্গার।—শিউং শুই পর্যন্ত এসে দেখি খুব ভুল করেছি। বিমান দপ্তরে টোকিওর সীটই বুক করিনি। শিউং শুই রেল স্টেশন থেকে কাইতাক্ এয়ার পোর্টে টেলিফোন করা গেলো। ভোর ছটায় প্লেন। ভালোই হবে। ওরা টোকিও তাকানাওয়া প্রিন্স হোটেলে সীটও বুক করিয়ে দিলো।—নিশ্চিন্ত হয়ে স্টেশনেই খেয়ে নিলুম। এখান থেকে ট্যাক্সী নিয়েই লো-উ যাচ্ছি। ট্রেনও যায়। কিন্তু এটা বর্ডার এলাকা। ট্যাকসী থামতে পারে যত্র তত্র। সামান্য সাড়ে তিন মাইল পথ। প্রচুর চীনা পরিবার প্রায় মুচেল্কা লেখা দাসের মতো দু-তিন পুরুষ ধরে ফ্যাকটরীর কীট হয়ে কাজ করছে। পৃথিবীর এমন কোনও কোম্পানী নেই যার ফ্যাকটরি এখানে নেই। সুইস্ ঘড়ি, ক্যামেরা, জর্মন ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক সামান, ইংরেজের বিস্কুট থেকে বই, কার থেকে প্লাস্টিক্স্ সব এখানে। আমেরিকান কোম্পানীর ছয় লাপ। জাপান, ডাচ, ফ্রেঞ্চ—সবাই এখানে। বড়ো বড়ো প্রিন্টারি; কাগজের কল; কাপড়ের মিল। বই সব ছাপছে এখানে। আর কাঁচা মাল হিসেবে রপ্তানী হচ্চে পৃথিবীর সর্বত্র। "হাতে"র কাজের শিল্প যন্ত্র থেকে হুড় হুড় করে বার হচ্ছে।—ওর মধ্যে কেবল পে-মেণ্ট টাই বাই হ্যাণ্ড।—প্লাস্টিক, নাইলন, সিল্ক,—যত রকমের 'কাপড়' হতে পারে।—

আর চীন বর্ডারের পাশাপাশি দোকানে নানা জিনিস যা 'আসল' চীনের

বলে বিক্রী হচ্ছে। আসল চীনা বলে যাদের সঙ্গে কথা বলছি,—সবই 'মেড্ ইন হংকং'। দূর থেকে চীন দেখলাম এই যা।—কিন্তু লাভ হোলো চীনের গাঁ দেখা। ফিরতে রাত হোলো।—ফেরার পথে ক্ষোভ, জীবনে চীন, তিব্বত যেতে পারবো না। অথচ আমি কারুর কোনো অনিষ্ট চাই নি।

স্টার ফেরী পার হবো। টিকিটের দোরেই দীর্ঘকায় এক পাঠান। অনেকক্ষণ আমায় দেখছিলো। হঠাৎ বললো, আপনি কি দিল্লীতে থাকতেন?

আমি চেয়ে চেয়ে হেরে গেলাম। কে তুমি?

গুল মহম্মদ! আপনার স্কুলের বাস চালাতাম।

মনে পড়ে গেলো। জুম্মা মসজিদে থাকতো। দিল্লী-সিমলা করনেওলা যে সব পাঠান কুলি ছিলো তার একজন। আমি ওকে বাসের কাজে বহাল করেছিলাম।—ও হংকং স্টার ফেরীর উর্দী পরে টিকিট চেক করছে।—দেখে মনে হয় ভালোই আছে। পাকিস্তান ওর ভালো লাগে নি। চলে এসেছিলো পাকিস্তান প্রথম যখন হিন্দোস্তানে হমলা করেছিলো তখনই, বিরক্ত হয়ে। ও ভারতে আসার জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে হংকং-য়ে এসেছে।—বললো, এখনও মনে হয় জুম্মা মসজিদের কাছে যদি শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পেতাম। দিল্লীর লোভ, হিন্দোস্তানের লোভ বড়ই লোভ।

আরও একঘণ্টা পরে ওর ছুটি। আমি সেই হোটেলে ফিরে চান করে ডাইনিং হলে বসেছি। আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ও এসেছে। বললুম, আমি তো এ দেশের ভালো খাবার জানি না। তুমিই অর্ডার দিয়ে আমায় খাইয়ে দাও।

গুল মহম্মদ বলে,—সে অর্ডার দেবে বিল কিন্তু তার।

এই দারুণ সুবিধের কথাটা তুমি আমাদের দিল্লীর সেজো-কে, আর কলকাতার পদ্মকে শিখিয়ে দিও। ওরা বরাবর অর্ডার দিলো; আর পার্স খুলতে হোলো আমাকে। এখানে এসে ওদের ঐ নিয়মটা আর ভাঙ্গতে চাই না। ওদের শাসানো নিয়ম আমি কোনোটাই ভাঙ্গিনি এ পর্যন্ত।

গুল মহম্মদ খাওয়ালো উত্তম।—খরচ লেগেছিলো চৌত্রিশ ডলার। হংকং-এ টিপ্‌স্ নেই। যা ধরা হয়,—সব বিলে।

এইখানে গুল মহম্মদকে বললুম কথাটা। ঠিকানাও বললুম। ও বললো —আগে বললেন না! কাল পাঁচটায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। ওই পাড়াতেই আমার বাস। কদিন আগে এক বাঙ্গালীবাবু ঐ পাড়া থেকে লা-পতা হয়ে যাবার পর খুব হাঙ্গামা গেছে। এখন ও পাড়ায় যারা থাকে তারা আগে ছিলো পাকিস্তানী। এখন বাংলা-দেশী। কিন্তু আমার সঙ্গে ওদের ভাব এই কারণে

যে আমি পাকিস্তান ছেড়ে আগেই চলে এসেছি। ঐ ভদ্রলোক, যার নাম বললেন, তিনি কাপড়ের দালাল। আমি জানি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, চলো তোমার সঙ্গে যাই তা হলে। কিন্তু ও বারণ করলো। এতো রাতে আমি হিন্দুস্তানের বাঙ্গালী। ও পাড়ায় বাঙ্গালীর খোঁজ করছি জানতে পারলে হাঙ্গামা বাড়বে।—চীনের বর্ডার থেকে বাঙ্গালীর যাওয়া আসা হংকং সরকার এখন মোটেই বরদাস্ত করবে না। বরং যদি আপনি জেগে থাকতে পারেন, খোঁজ নিয়ে ফোন করবো।

ঘুম সে রাতে আমার যে কতো হয়েছিলো বুঝতেই পারছো।—একটার সময়ে ফোন বাজলো। কথা কণিকাই বলছে।—অথচ বলছে না। মাঝে মাঝে কাঁদছে। তাজমুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে বোধহয় লোপাট হয়ে গেছে। কণিকার দাদা বর্ডার পার হয়ে গেছে। " ···তোমার খোঁজ আগেই পেয়েছি। তুমি ছেলেদের সঙ্গে নিউ কাউলুন, হ্যাং-হাও,—মা-অন-শানের পাহাড়ে গেসলে। —তারই মধ্যে একটি ছেলে তোমার ফোটো নেয়। সেই ইনস্টাণ্ট ফোটো সে-ই আমায় দেখায়। কিন্তু আমি নিজেই এখন কড়া নজরে। দাদা, টাকার অভাব আমার নেই। আমার অভাব শুধু একটা দাদার। আমি এখনও আশা করছি তোমার সঙ্গে দেখা করবো। করতে পারবো। যদি এয়ার পোর্টে যাবার পথ না পাই, শোনো-এবার বানান করে বললো,—চিঠি দেবো। চিঠিতে কেবল কিছু অঙ্ক থাকবে। তুমি সেটা ঢাকায় চাচাকে পাঠিয়ে দেবে।—চাচার ঠিকানা তো তুমি জানো। তাজ দিয়েছে।

কিন্তু কণিকা,···

না দাদা, টাকা আছে। আর আমি সংসারী হতে পারবো না। ভায়ের কাছে আমায় যেতেই হবে।

আমি সে চিঠি পোস্ট করে দিয়েছিলাম।

যদি থেকেও যেতাম কণিকার দেখা পেতাম না। মন তবু ভার হয়।—ক্ষণিকের অতিথিরাই অকরুণ। মিলন ছলে বিরহ আনো।—ইতি

তোমাদের জামাইবাবু

১৩

সুচরিতাষু

ভাই পদ্মদি,

শেষ হয়ে গেলো কণিকা। ওরই কথা প্লেনে বসে বসে ভাবছিলাম। হংকং থেকে জাপান মাত্র ঘণ্টা তিনেকের দূরত্ব। জাপানী প্লেন। জাম্বো, কিন্তু অনেক গোছানো; অনেক তৎপর। ভীড় মালুমই হয় না।

আমার পাশের দুটো সীটই খালি। সুমুখে এক আমেরিকান দম্পতী। ভদ্রলোক আমারই বয়সী। বাইরে রোদে জলে কাজ করে করে চামড়া যেমন ঝলসে কুঁচকে যায়,—তেমনি। তা ছাড়া নিয়মিত কড়া মদ্যপানের ফলাফল তো হবেই। মহিলাটি কিন্তু যেন বেশী তৎপর। কার্ড ইত্যাদি ভরা ছাড়াও বেশীর ভাগ কথাবার্তা তিনিই বলছিলেন। বয়স সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলার তৎপরতা বেশ উত্তেজক; মাদকও হতে পারে।

হঠাৎ সেই মহিলাটিই নিজে থেকে জানালেন আমার পাশের সীট দুটো যদি খালি থাকে এসে বসতে চান। আমেরিকানদের পক্ষে এটা খুব অস্বাভাবিক না হলেও একটু যেন কেমন লাগলো। ঝাঁ-করে কার্ডখানার ওপর চোখ পড়তেই দেখি 'সীউল্' ;—মানে সাউথ কোরিয়ার মাল। স্কুল মাস্টারও নয়, চেয়ার-বাঁধা নেকটাই-কর্মচারীও নয়। সার্ভেয়ার, বিল্ডার, এঞ্জিনিয়ার, বড় জোর আর্কিটেক্ট্। হ্যাঁ;—কোরিয়ায় দারুণ রেটে রেল লাইনের কাজ চলেছে।—তার মানে রেল-লাইন পাতার এঞ্জিনিয়ার।

আমি বললুম—বড়ই একা একা বোধ করছি। আসুন। কোরিয়ার গল্প শুনবো।

স্বামী-স্ত্রী, অথচ স্বামী নেহাৎ কনজার্ভেটিভ। পেন্টাগানের বিপক্ষে রা-টি কাড়তে ভীমি খান। স্ত্রী আমেরিকান ফরেন পলিসির ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিচ্ছে। ভদ্রমহিলা ভালো শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এই কোরিয়া আসা বাবদই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বই লিখেছেন খান পাঁচেক।

আমার সীটের সামনের টেবিলে রাখা বইখানার মলাটের পিছনের ছবি দেখে ভদ্রমহিলা বললেন,—আরে এ ছবি তো বাপু তোমার। হ্যাঁ! তোমারই। দেখতে পারি বই! কী সর্বনাশ। দু ভলুম এই বারোশো পাতার রিসার্চ

কেবল শিব-শক্তির ওপর? তাই টোকিও? বেশ বেশ। ওদের দেশে ধর্মতে প্রকৃতির পুজো;—এবং তা প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশকেই ধরে রেখেছে। তত্ত্বতের লাসা সরায়ে যেটা গাড়ুলে ব্যাপার শিণ্টোয় সেটি সূক্ষ্ম।

মিঃ থেল্‌ম্যান হঠাৎ বলে উঠলেন, লিলিয়ান, লিলিয়ান,—এই তোমার আরম্ভ হোলো। ভদ্রলোককে তুমি বখিয়ে ছাড়বে।

লিলিয়ান আমার দিকে চেয়ে বলেন,—তুমি ঠুন্‌কো মাল ছিলে; তাই বখেছো। এ হোলো ভারতের মাল। ডেভিডের কথা কিছু মনে কোরো না ভাই। এখন ও আবার কেঁচিয়ে কুমারী লজ্জার ছেঁড়া ঘোমটার তলায় ঢুকে পড়তে চায়। দ্বিতীয় কৈশোর। আমিও তাই 'মা' হয়ে গেছি।—জাপানের শিণ্টো-তে খুব ফ্যালিক-সাধনার প্রভাব জানো তো! হিন্দুরা বলে তন্ত্র। রুশে বলে ফ্রী-ম্যাসনস্‌!

কিন্তু জেনারাল ম্যাক্‌-আর্থার নাকি কী আইন কোরে শিণ্টো-ইজ্‌ম্‌ জাপান থেকে তুলে দিয়েছে।—আমি টিপ্পনীর খোঁচা ছাড়লুম।

লিলিয়ানের দাঁত বাঁধানো। পয়সা খরচ করে বাঁধানোর ফলে নিশ্চয় এ প্রকৃতি-টি জানেন যে একটু গলা উঁচু করে আধা চোখ বুঁজে হাসলে ওঁর কণ্ঠের দীঘল সৌন্দর্য ওঁকে হঠাৎ ফোটা পদ্মের মতো ভরন্ত করে তোলে। হাসির শব্দটিও বহু পরিচর্যাকরা পালিশে জ্বলজ্বল্‌ করে।

তাই নাকি? তাই নাকি? আমেরিকান সরকার তো পর্ণোগ্রাফী, নীল ফিল্ম—সবই আইন করেই বন্ধ করেছে। আইনের ঘটা কম ঘটা নয়। তোমাদের দেশেও তো শুনি গাঁজা-মদের বিপক্ষে আইন আছে। কালো-বাজারী দৌলতের লোভই এমন যে দেবতারাও ও বাজারে সওদা না করে পারেন না।

তাহলে বলছেন যে আজও চলে শিণ্টো ধর্ম জাপানে? (আমার অবস্থা চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া গোছের)।

শুধু চলে? বড়ো বড়ো মন্দির আছে। য়াকো হোমার কাছে আজীমা-র (Azima) মন্দির, নাগোইয়ে (Nagoyei City)-তে দোসো-কোঞ্জী-দেইমিও-জীন্‌দেবের মূর্তিটি দেখো। না, না; ও আমি মানি না। এতে লজ্জা যে করে সে ভণ্ড, বদমায়েস। এই যে তন্ত্র, এর প্রভাব প্রচণ্ড। শিণ্টো-ধর্মই জাপানের কৃষ্টি। জাপানী মানেই শিণ্টো ধর্ম। ঐ যে 'ক্যানন্‌' কোম্পানীর ক্যামেরা কেনো, ঐ 'ক্যানন্‌' নামটি কি? টোকিও আসাকুসা মন্দিরের দেবতা ক্যানন্‌। বিগ্রহটি সোনার, এবং সাধারণের দৃষ্টি-গোচর নয়। কেন নয়, এ কথাটি স্মরণ কোরো। ওর আকার প্রকার টুরিস্টের ক্যামেরায়ও দারুণ খিটকেল। অথচ দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। জীব জগৎ রক্ষা করার অপরিহার্য প্রাকৃতিক কবচ। প্রাচীন মন্দির। সম্রাট নিজে পুজো দিতে যান। বুঝে নাও

ম্যাক আর্থার, এবং তার আইনের ইতিবৃত্ত। আসাকুসায়ই রাঈওন্‌কাকু টাওয়ার আছে, টোকিওর উচ্চতম ইমারত বলতে পারো, তিহাত্তর মিটার।—উয়েনোর মন্দিরও তাই। বৃহৎ মন্দির; অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এর প্রসার। মন্দিরের নাম তোষোগু। সাৎসুমা-র প্রসিদ্ধ মূর্তি এর কাছেই। সেইজী-শ্রাইন্‌ তো ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের কাছেই। কামাজাওয়ায় অলিম্পিক পার্ক আছে। লক্ষ্য করে দেখলে এমন মন্দির পাবে না যেখানে শিণ্টোর প্রভাব নেই। তোমাদেরও তো শুনতে পাই অঙ্কুশ-ধারী এক দেবতা শিবের সঙ্গে সঙ্গে সব মন্দিরে আছে। হাতির মতো।

হ্যাঁ গণেশ। সব মন্দিরে।

তবেই দেখো। বজ্র আর অঙ্কুশ কিসের মুদ্রা না জানো, তিব্বতে যাও!

থামানোই দুষ্কর। খুব জানেন এবং আরও খুব খবর রাখেন ভদ্রমহিলা। এই বেলা আরও জেনে নেওয়া দরকার। কী এক ফাঁকে আমি নাম নিয়ে ফেলেছি ল্যাকফাডিও হার্ন, ম্যাগ্‌নাস্‌ হার্শফেল্‌ড্‌, এডুয়ার্ড সিলোন্‌—এর। ব্যস, আর কোথায় আছো!···

"······ওরা কী পুরুষ? ওরা কী মানুষ? গাধা-কে বক্‌রা বলে, চাঁদ স্ত্রীলিঙ্গ, তা বলতেও ভয় পায়। অথচ ভিনাস-আফ্রোদিতের গা চুলকে দিতে বললে বর্তে যায়। ভিক্‌টোরিয়ান প্রুড্‌স্‌। পেডাণ্টিক্‌। ও সবে দরকার কী বাপু নিজে যাও। নিজে দ্যাখো। ম্যাক-আর্থারের নিকুচি করেছে। জাপানের জাতীয় ধর্ম শিণ্টো ছিলো আছে থাকবে। রুখবে কে? ঐ ধর্ম মিশরে, গ্রীসে, ভারতে, চীনে,—চালাকী নাকি? ঐ ধর্ম তোমার আমার সৃষ্টি সংসারের। ভিক্‌টোরিয়ান প্রিগ্‌! ভয়ে মরে বিদেশে ওদের রাজত্বে না চীড় ধরে। ব্লিম্পস্‌। স্বয়ং যে ক্রশ্‌ চিহ্ন, তা-কী? বাগার্স্‌!

ডেভিড থেল্‌ম্যান গম্ভীর হয়ে বলে,—কিন্তু লিলিয়ান্‌ তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো।

চুলোয় যাও তোমরা পাষণ্ড, নচ্ছার, ভণ্ড পুরুষেরা। নোহার নৌকোর গল্প করবে···

লিলিয়ান, লিলিয়ান। ইনি ভারতের ঋষি। বিদ্বান্‌, পণ্ডিত। এঁর কাছে ও সব কথা থাক্‌;—অন্য কথা পাড়ো।

আচ্ছা বলুন, আপনাদের পুরাণেও নোহার গল্প নেই?

মনু এবং মাছের,—

না-না-না। স্রেফ বিষ্ণুর অর্ঘ্য-বাধা হাত হোলো নৌকো, তার ওপরে শিব তার মাস্তুল বসিয়ে পাল বাঁধলেন।···বিষ্ণু-তো যোনিরই প্রতিরূপ।···জলে বীজ

ড়লো। পদ্ম তাই ধরে রাখলো। সেই পদ্মে সূর্য কিরণে পুষ্ট হোলো…
ঠক বলছি না?

হাসি। না হেসে উপায় কী। বিদুষী যদি রসিক হন তার কথা শুনতে ভালো লাগে।

না, না! হাসি নয়। ডেভিড বলবে আমি গাঁজা। ও শুধু বলে। পড়াশুনায় তো দরকার নেই। চার্চে গিয়ে শোনে যীশু নাকি বীজহীনা কুমারীর সৃষ্টি। এই সব গল্প শুনে ভণ্ডামী সেরে হ্যাটে টাকা ফেলে আসে, আর ইদিকে কোরিয়া থেকে বার্লিন পর্যন্ত বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

লিলিয়ান, লিলিয়ান!—

আর বলুন তো, বলুন ঐ যে জলে পদ্ম, পদ্মে বীজ, বীজে সূর্যের কিরণ —ও কি? গপ্‌প? শুধু গপ্পো? তবে আমার পেটের মধ্যে যে জল, জলে যে ফুল, ফুলে যে বীজ, বীজে যে সৃষ্টি তা-কি? নোহার নৌকো-মাস্তুল-মাছ-দুনিয়ার দম্পতী সংগ্রহ—এসব কী জানে না ঐ বুড়ো খোকা বলতে চান? প্রিগ্‌। চার্চের পালিশ করা উল্টো কলার।

আমি রুখে দিতে চাই। আরও অন্য কথা শুনতে হবে।—বলি, ঐ নিয়েই তো ওসাইরিস্ আইশিস্‌—ঈশ,—ঈশানী,—শিব-বিষ্ণু,—

হ্যাঁ হ্যাঁ! চীনে য়াঙ্গ-য়ীন্‌, 'শিঙ্গ্‌-তে'—শিংমু…লিলিয়ান যোগ দেন।

আপনি কিন্তু পড়েছেন খুব! বলি আমি।

ডেভিড বলে পড়েছেন? ঘুরেছেন, দেখেছেন,—কী না করেছেন! হ্যাটে টাকা উনিও কম ফেলেন নি!

হেসে লিলিয়ান বলেন, স্কাউণ্ড্রেল! কনুয়ের গুঁতো দেন ডেভিডকে। মানে বলতে চাও ওদের মন্দিরে আসনে বসেছি! তাই তো? যদি ঘটেই থাকে তাতে কোনো দোষ নেই! রুশের চার্চে বরাবর ছিলো। হিন্দুর তন্ত্রে আজও আছে। যার শক্তি আছে, যে সাহসী,—তারই পথ এই। হিপী দেখছো না? দেখছো না বাজারে বাজারে এই নিয়ে বিকি-কিনি?…যাচ্ছো জাপানে দেখবে। বছরে ত্রিশ লক্ষ ভ্রূণ হত্যা, আর যৌন আনন্দের কতো নরম, গরম ব্যবস্থা। ইকেবুকুরু-র ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জেনেটিকস্‌ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে সৌদা কোরো। —চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি ঐ ক্যানন্‌-মন্দিরের ক্যানন্‌ কথাটা শুনতে চাইছিলাম। আপনি তো চেপে গেলেন।

চেপে যাবো না? আমার বিবাহিত স্বামী, চার্চের খাতায় দস্তখৎ করা স্বামী ডেভিড লজ্জায় লজ্জায় শুকিয়ে যাচ্ছে।—তোমরা ওপরে দেখো স্বর্গ; নীচে দেখো নরক। কেন? ওপরে উঠতে চাও সিদ্ধি পেয়ে, অধঃপতন হয়

অসিদ্ধ হলে। কেন? এই ওপর নীচের ভাগটা পেলে কোথায়? ভেবেছো তলিয়ে? মানে সূর্যের ভুবন আকাশ; উনি ওপরে। আকাশ পুরুষ। পৃথিবী তো মেয়ে। পড়ে আছে, কেবল প্রসব করবে।—মেয়ে আর পুরুষের এই যে রীতি এ থেকেই পুরুষ হোলো বীর, পুরুষ হোলো স্বর্গ; ওপরে যিনি তিনিই স্বর্গের মালিক···যত্তো সব পৌরুষের একষেঁড়ে দাপট!··জাপানী প্রকৃতি শক্তি 'কোয়াঈ-ইন্'-কে বৌদ্ধরাও মানে। কেবল শিণ্টোরাই নয়। কোয়াঈ-ইন (Kwai-Yin)কেই বলে 'ক্কোআন্-ওন্' (Qwanwon) তাই থেকে ক্যানন (Canon)। ঐ ক্যানন্-শ্রাইন্, Canon কোম্পানীর এত্তাবড়া নাম। আবার বলছো, শিণ্টোইজ্ম্ ম্যাকারথার উঠিয়ে দেবে!—চালাকী নাকি? যাবে তো য়াকোহোমা। যেয়ো আরও পূবে, উত্তরে, গ্রামে, পাহাড়ে। কতো ইল্লোরা কতো শিউকোটি, কতো পুজো দেখতে পাবে।—এবং এই সব মন্দিরে সেবাদাসী দেবদাসী—ভাড়া করা আজও যায়।—মেয়েরা গিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করে ধন্য হয়। সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী মেইজীর (মন্দিরে) পুজো দিতে এখনও যান এ মন্দিরের বাগান দেখতে দেখতেই চার পাঁচ দিন কেটে যাবে।···জাপান যাচ্ছো কিনবে তো কিছু বটেই। দেখে শুনে কিনলে যা বলছি তেমন ঠাকুর দেবতাও কিনতে পাবে।—কেন? জাপানী নভেল পড়ো নি? আকচার এই সব ঠাকুর দেবতাদের নানাবিধ রুচির ইঙ্গিতের পরিচয় পাবে।

আমার অসুবিধা হচ্ছিলো। ডেভিড বেচারী চোরের মতো বসে।—ওকে নেড়ে দেবার আশায় বললাম,—আপনি কি ছুটিতে যাচ্ছেন? কোরিয়া লাগলো কেমন?

খাবার দিয়ে গিয়েছিলো। জাপ এয়ার লাইন। উত্তম সে উত্তম, খাবার —ডেভিড পাক্কা চীনাদের মতো কাটি দিয়ে খাচ্ছিলো।—লিলিয়ান সেই দিকে কটাক্ষ করে বলে,—ঐ দেখুন না,—কোরিয়া কেমন লাগলো। কাঠি দিয়ে খায়; কমন বাথে নায়; মাসাজ-বাড়ি গিয়ে গা দলায়। কোরিয়ান মেয়েদের সঙ্গে ডেভিডের জমে ভালো। কোরিয়ার সব হাল ও বলে দেবে।—জিগ্যেস করো না কেন!

অগত্যা আমি বলি, আপনি কিন্তু ডেভিডকে কোণঠাসা করে ফেলছেন।

কোণেই তো ও। ও কোণেরই! ও যেদিন বাইরে আসবে সেদিন ও আর রেল লাইনের কনট্রাকটর থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে।—ওকে দাও মদ, আর কোরিয়ান মেয়ে। তারপর দেখো ওর পৌরুষ!

নর্থ কোরিয়া আর সাউথ কোরিয়ার তফাৎ কী? আমি তো থাইল্যাণ্ড কাম্বোডিয়া দেখে এলাম। ভিয়েৎনামের ভিসা যদিও পেলাম না। খানিকটা বুঝি। তবু ভাবছি কোরিয়ায় অবস্থা কী! কোরিয়ার ভাগ আমেরিকা, কম্যুনিজম্; না চীন-রুশ?

বলো না ডেভিড্। বলো।

ওরা দুজনেই হাসতে লাগলো। ডেভিড লালে লাল।

ডেভিড এবার ধরা পড়া ছোটো ছেলের মতো হাসতে গিয়ে বিষমও খেলো। তাই না দেখে লিলিয়ান ওর মাথায় বুকে রহস্যমদির হাত বোলাতে লাগলো। এবং আমার দিকে দুষ্টুমী ভরা চোখে চেয়ে বলতে লাগলো কোরিয়ার মেয়েরা এটা প্রায়ই করে। এবং দেখা গেছে ডেভিডের বয়সী যুবকদের বিষম-খাওয়া হুঁচকী ইত্যাদি হঠাৎ বিপাকের জট ছাড়াতে এ প্রক্রিয়াগুলো বেশ কাজে দেয়। ম্যাসাজ যদি দেহমন দিয়ে তেমন ভাবে কেউ করতে পারে নার্ভগুলো তুলতুলে হয়ে যাবে যেন জলে ভেজা তোয়ালে, দুধে ভেজা পাঁউরুটি।

আমি আর না বলে পারি না,—বেচারী ডেভিড তো রীতিমত স্যার গ্যালাহাড্। নীরবে প্রেয়সীর অত্যাচার সহ্য করে।

ম্যাসাজ করিয়ে আসার পর তোমার গিন্নীর দরবারে তুমি বুঝি করতে না? দাও না ঠিকানা! চিঠি লিখবো। এমন হঠাৎ বিপদে পড়লে তোমার গায়ে মাথায় এখনও হাত বোলাবার ব্যবস্থা হয় কি-না। হিঁদু মেয়ে নৈলে তোমাদের শিব-মন্দির সাজাতো কে?

ডেভিড বাঁচালো আমায়। বললো,—নিশ্চয় হয়; হয় না কি আর? কিন্তু তা বোলে দাঁত বাঁধানো বুড়ীর নয়।

জানি জানি। ভারতের মেয়েদের দাঁত আমাদের মতো আলগা নয়। কিন্তু ডেভিডের গায়ে মাথায়ও বুড়ীর হাত এমনি প্লেনে নেহাৎ স্ট্রাপে বাঁধা পড়ার পরেই লাগে।—নৈলে দাঁত ডেভিড আগেই পরখ কোরে নেয়।

কোরিয়ার ভেতরে এখন ভীষণ গোলমাল চলছে। বললো ডেভিড। ও বুঝলো আমার ও কথা শোনার ইচ্ছেটা জবর।

কোথায় চলছে না। পৃথিবীতে যেখানে যেখানে গোলমাল সেখানে সেখানেই তো আমাদের ডেমক্রাসীর খাঁড়া, ডেমক্রাসীর জল্লাদ। কিছু না হয়, কেটে দুখান করো। ভারতবর্ষে তো এমার্জেন্সী। বাংলাদেশে কী হয় দেখো। অ্যাঙ্গোলাও ঐ প্যালেস্টাইনের মতো দুভাগ-বা-তিনভাগ হবেই।

কোরিয়ার ভাগ তা হোলে আপনার ভালো লাগে নি?

ভাগ আর কই? একটা জেনারেশন কে জেনারেশন দিন গুণছে মোকা কবে পাবে। পেলেই খেদিয়ে তাড়াবে দেশ ভর্তি ঐ সব বিদেশী টাকার আড়ৎদার ব্যাঙ্কগুলো। শিণ্টো ধর্মে দেবতার মন্দিরে গিয়ে তন্ত্র সেরে আসা এক জিনিস, আর লাল-পাড়ায় গিয়ে টাকা রোজগার করে বুদ্ধের গায়ে সোনার পাত্তি লাগানো অন্য জিনিস।—কেউ অভাবে, কেউ স্বভাবে করে ঠিকই; এ ছাড়াও কোরিয়ার বহু মেয়ে ঐ পাড়ায় বাস নিয়েছে অন্য কারণে। কোরিয়ায়

যখন খুন খারাবী হবে সে জাপান অবধি ধুইয়ে দেবে। জাপানের ইতিহা
যদি জানতে, বুঝতে জাপান কেন কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া চায়।

মাঞ্চুরিয়া চায় জানি অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু কোরিয়া কেন?

যে কারণে তোমরা কাশ্মীর চাও; পাকিস্তানও অনুমোদন করো না; প্রয়োজ
হলে আফগানিস্তানও চাইতে পারো,—কারণ তোমরা হকদার।

কেন বলুন তো?

কারণ ইসলামের আগে ওসব দেশেই তো ছিলো সংস্কৃত ভাষার কৃষ্টি
মায় পারস্য, বৈখাল পর্যন্ত। তোমাদের এক সম্রাট নাকি চিরজীবন সামার
কান্দেরই স্বপ্ন দেখতেন। কৃষ্টির কান্না বুকে কেঁদেই সারা হয় না; রক্তে
কণিকার মধ্যে কাঁদে। ঐ যে ঘুণ দালাল কিসিংজার, সেদিন জর্মনীতে ও
জন্মস্থানের চার্চে এতোকাল পরে গিয়ে সেই চার্চের স্তুতির ধ্বনি শুনে কেঁ
ফেলেছিলো।

ওগো কৃষ্টির কান্না বড় করুণ কান্না।

কিন্তু কোরিয়ায় এ কান্না কাঁদবে কে?—আমি প্রশ্ন করি।

কে? জাপানের আসল আদিবাসীদের যদি ছেড়ে দাও—

যেমন আপাচে (রেড্ ইণ্ডিয়ান)-দের যদি ছেড়ে দিই আমেরিকান আ
কেউ থাকে না।

ডেভিড বলে, আমরা তবে কী?

তোমরা?—শাসায় লিলিয়ান,—তোমরা তাই নিগ্রোরা যা, চীনেরা যা,—
এমন কি ভারতীয়দের, এশিয়ানদের আমেরিকায় প্রবেশে বাধা দেবার অধিকা
যদি কারুর থাকে তা আপাচেদের। ওরাই আসল আমেরিকান। তোমাদে
কোনো অধিকার নেই বাধা দেবার। তোমরা আমেরিকান নাকি? মেক্সিকা
আজটেক, আপাচে আর এস্কিমো, এরাই হক্কের আমেরিকান। আমরা সাদা
তো জুলুমবাজ।—ঐ একই সূত্রে কোরিয়ানরাই আসল জাপানের জাপানী।
জাপান কৃষ্টি কোরিয়ার দান। বেঁটে-খাটো জাপানী, যারা চোখে ভালো দেখতে
পায় না, যাদের মুখের দু-ধারে দুটো চোখের তারা আড়াআড়ি করে থাকে,
তারাও আছে; পাশাপাশি আবার লম্বা, সুঠাম জাপানী, পোখ্তো চেহার
তারাও আছে। এরাই কোরিয়ান। জাপানের কৃষ্টি কোরিয়ারই কৃষ্টি। কোরিয়া
পারতো তো জাপানই নিয়ে নিতো; কৃষ্টিতে নিয়েই-ছে; কিন্তু কোরিয়া পারে
না তাই জাপান চায় কোরিয়া। জলের চেয়ে রক্ত বেশী ঘন।—পারতো তো
আপাচে আমেরিকা নিতো। ভারত নিতো আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিংহল,
ব্রহ্ম, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া! সাম্রাজ্যবাদ যাই বলুক, ইতিহাসে এরা সব ভাই
ভাই। এক কৃষ্টি।

আমি একটু ভয়ে ভয়েই আমার বিদ্যের পুঁজি হাতড়াই। বলি,—কিন্তু লিলিয়ান,—কোথায় যেন পড়েছি বলে মনে পড়ছে জাপানের খাটো মানুষগুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরাই খাটে-খোটে, জমি আর হাতের কাজ নিয়ে ঘাম ঝরায়। খনিগুলোয়, জাপানের বিশাল মাছের ব্যবসায়ে, চিংড়ি থেকে তিমি, হাঙ্গর, —এবং সেই ভুবন বিখ্যাত মুক্তোর ব্যবসায়—ঐ বেঁটে খাটো লোকগুলোই তো ঘাম ঝরায়। জাপানের দই, মালপো, ঘি খানেওলারা ঢেঙ্গা, সুশ্রী, জোয়ান, জবরদস্ত। খাটো নয়। খাটোগুলো শুঁটকি খেকো ভাত-সর্বস্ব বাংলা।

কোথায় তা নয়? ভারতবর্ষে কী? ঢেঙ্গা শাসায়, খাটো খাটে। এই নিয়ম। আদিবাসী আর পঞ্জাবী, তোমাদের বাংলায় ট্যাগোর বংশ, আর সান্থাল; —ঐ মরাঠাদের মধ্যে নানা-ফড়নবীশ, বাজীরাও, নানাসাহেব,—আর শিবাজীর মাওলীরা—কতো তফাৎ!

অবাক হয়ে বলি, কতো পড়েছো লিলিয়ান? কতো জানো!

ডেভিড বলে,—নৈলে আর বলছি কী। বিছানায় কি আর কেউ এন্‌সাই-ক্লোপিডিয়া জড়িয়ে আদর করে? কপাল রে ভাই, কপাল।

আমরা দুজনেই হেসে উঠি।

টয়েনবীর দৌলত। দুনিয়া ভর,—বেঁটে মানুষ আর ঢেঙ্গা মানুষের হাতাহাতিতে ঢেঙ্গা মানুষের সর্দারী যেন কায়েমী স্বত্ব। এটাই রুখতে পারা যায় কি যায় না তার পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে মস্কো থেকে পিকিন পর্যন্ত। বেঁটে খাটোরা ভিয়েৎনামে, গিনি-বিসাওতে, মোজাম্বিকে ঢেঙ্গাদের ঠুকে দিয়েছে।—জাপানে যারা বেঁটে খাটো তারাই ঐ মালায়া ইন্দোনেশীয়ার জনস্রোত। মালায়া, মালক্কা থেকে জাপানে এসে পড়েছে আদিম যুগে। ওদের ওপরে দাঁও মারলো কোরিয়ার এরা,—কিন্তু রক্তে কোয়িয়ানদের আর্য সংস্কৃতি একেবারে নেই বলতে পারি না।

বিস্ময়ে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করি,—আর্য?

আর্য তো বলিনি,—বলেছি আর্য সংস্কৃতি! ইংরেজকে ভয় করি না; কিন্তু ইংরিজী পালিশ লাগানো ভারতীয় সরকারী-কর্মচারী অতি বিষাক্ত জিনিষ। নিগ্রোদের ভালো-লাগে; কিন্তু ইয়াঙ্কী-চলানো কালা সাহেবগুলো যেন যমের অরুচি। গ্রীন বেরেট ঠেঙ্গাড়ু পল্টন, ইয়াঙ্কী সরকার তা' দিয়ে আর্জায়,—তার মধ্যে এই কালা-ইয়াঙ্কীই বেশী। কোরিয়ায় আর্য-সংস্কৃতি জানতে চাও? ধরো,—জাপানের লিপি। এটা তো আগাপাশতলা সংস্কৃত বর্ণমালার কাছে, বিশেষ করে হ্রস্ব-ব্যঞ্জনের মিলের বাবদে পালনে একেবারেই দেবনাগরীর কাছে ঋণী!

বুঝছি না।

টোকিও পেঁছে গেলো ; বুঝবে কখন ? আমরা যাবো সাউথে। টোকিও
থাকলে বুঝিয়ে দিতাম। য়ুনিভার্সিটিতে এই ভাষাবিদ্যার চার্ট আছে।

সোরবোনেরটা আঁকা। এটা আলোর ওপর ঝলকায়। সুইচ টিপলেই ধ
যায়। জাপানীরা ইলেকট্রনিক্স দিয়ে প্রায় সারা জীবন যাত্রাটিকেই অটোম্যাটি
করে ফেলেছে। একশো বছর পরে 'জাপানী মানুষ' না বোলে লোকে বলা
'জাপানী-যন্ত্র'।

বুঝিয়ে বলুন। এটা নতুন খবর।

তোমাদের যে ক-কা-কি-কী-কু-কূ-ইত্যাদি চার্ট করা বর্ণমালার নিয়ম সে
আরবী বা রোম্যান অক্ষরে অসম্ভব। ঐটা কোরিয়ার বর্ণমালায়ও পাই। শ
চয়নে চীনা প্রভাব থাকলেও লিপিবিন্যাসে সংস্কৃত চাতুর্য। সংস্কৃত, পা
শব্দও বৌদ্ধ ধর্মের মারফৎ তিব্বতের মারফৎ এসেছে। মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরি
বহুকাল তিব্বতীদের কব্জায় ছিলো। আজ পাশা পালটেছে মাত্র।—প্রাচ
জাপানে সাহিত্য বলতে যে পুরাণ-কথা পাওয়া যায় তা-তো কেবল শ্রুতি
কোরিয়া থেকে লিখন এলো ; তবেই শ্রুতি পেলো লিপির টান। কাজে
জাপানের নাড়ীর টান হবে কোরিয়ার ওপর। এতে আর আশ্চর্য কী
কোরিয়ানরা আজও চীনাদের ঘৃণাই করে। বলে ওদের মধ্যে সত্যকার সভ্যত
বড়ই অভাব। ক্ষিধেয় হা-হা করতে করতে বংশ বংশ ধরে চীনাদের রা
পুষ্ট হয়েছে মাত্র দুটি অধ্যবসায়,—খাও, আর বংশবৃদ্ধি করো।—এটা ভা
সত্য ; আংশিক সত্য। আসলে ঐ উত্তরের মাঞ্চু আর দক্ষিণের সিং-দের ম
কুরু আর পাণ্ডালের লড়াই।—নৈলে চীনা সংস্কৃতি দারুণ ব্যাপার।

আমি ফের-সে বিদ্যে জাহির করে ফেলেছি।—কিন্তু এখন তো স
কম্যুনিস্ট। আর তো পংক্তি বিভাগ, শ্রেণী সংঘর্ষ নেই। তবে আবার এ-
কেনো ?

আবার হাসে লিলিয়ান।'

হাসি দেখে ডেভিড টিপ্পনী কাটে, জলের চেয়ে রক্ত ঘন।

কদিনের বা কম্যুনিজম মিস্টার ফিলজফার ? কোরিয়া জাপান তত্ত্ব চ
হাজার বছরের তত্ত্ব, গড়িয়েছে দেড় হাজার বছর ধরে ; রক্তে ওদের ঘৃণ, ে
পালিশ করে কতই আর চাকচিক্যময় সমতা আনবে কমরেড ? কম্যুনিজম্ শ্রে
ভাঙ্গে এটা যেমন সত্য, স্বার্থ শ্রেণী গড়ে এটাও তেমন সত্য। যদি স্বার্থ
বাদ দিয়ে সমাজ গড়তে চাও, সেটাই সত্যযুগ, স্বর্ণ-যুগ, স্বর্গ। সে যু
হতে হবে সব মানুষকে দেবতা ; স্বার্থহীন মানুষ। তার যে দেরী আছে ভাই
এখনকার কথা এই যে ১৯৬০-এ সীউলের সেই ছাত্র বিপ্লবের পর সিংঘমা

ু-তো পট্‌কালেন। চুং-হী-পার্ক সত্তর বছরের বৃদ্ধ পোসুম য়ুনকে খেদ্‌ড়ে
য় এখন প্রেসিডেণ্ট।—কিন্তু ছাত্র বিপ্লব এ পৃথিবীময় যখন যেথায় দেখো,—
ণ্য করবে যে তার ধারা একই। এই তো ভারতেও বিহারে, বম্বেতে, গুজরাতে
া গেলো। ওর মধ্যে ভাড়ায় খাটা দেখ্‌তাই ছাত্র কজন খোঁজ করোগে যাও।
পুতুল নাচের সুতো ধরা অনেক দূরে। ধীরে ধীরে উত্তর কোরিয়া চীন
ক সরে গিয়ে মস্কোর দিকে দৌড়ুচ্ছে। উত্তর কোরিয়াই দক্ষিণের সঙ্গে মিলে
ত চাইছে, এবং সে জন্য চীনকে বাদ দিতে চাইছে, কারণ অবিভক্ত কোরিয়া
নও চীনের পাশে যাবে না, রুশের দিকে যেতে হলেও চীনের দিকে যাবে না।
রণ? জলের চেয়ে রক্ত ঘন। বুঝছো? দক্ষিণ কোরিয়া একটু চীন-ঘেঁষা
ন মনে হচ্ছে; সেটা ইয়াঙ্কী বিষের প্রতিষেধ হিসেবেই চালু। যদি হোতো
র কোরিয়া, পারতো কী ডেভিড তার বিদ্যের গাধাবোটে চড়ে কোরিয়াকে দেওয়া
মেরিকান ডলারে থাবা মেরে মিলিয়নেয়র হয়ে ফিরতে? অরিগনের মেডফোর্ড
রে কনট্রাকটরি করতে করতে জান বেরিয়ে যেতো। আজ ওর ছেলে মিলিয়নেয়র
জামাই মিলিয়নেয়র,—কেবল আমি রিটায়ার্ড স্কুল মাষ্টারণী!

ভুল!—চেঁচিয়ে ওঠে ডেভিড্। নহী সাব্, বিলকুল ভুল! রিটায়ার্ড?
রিটায়ার্ড? তুমি রিটায়ার্ড?—শুধু টায়ারিং। স্কুল মাষ্টারণী নও;
লেও না। যা ছিলে, তা আজও আছো,—একখানি কার্টেন লেকচারার।
ং প্রতিমাসে ঐ লেকচার শোনার জন্য আমাকে আমার ইয়াঙ্কী মুখ্যুমীর হারেই
টা ফী গুণতে হয়।

চোখ মচকে সঙ্গে সঙ্গে লিলিয়ান বলে,—তা বোলে তোমার সোহাগের
রিয়ান কুইন্ রিজু-তাকি-কে হপ্তায় যা দিতে,—আমার মাসের রেটও তার
য় কম। অবশ্য লেকচারের দাম ইণ্ডাস্ট্রীর দামের চেয়ে চিরকালই কম!
পনী কাটলো বুড়ী।

বাঁধো বাঁধো সীট বেল্‌ট্!

আমি লিলিয়ান এবং ডেভিডকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বলি, কথা
চ্ছ ওরেগনে এবার যাবো না; কিন্তু কখনও যাবো না এমন আশা খুবই
। ওয়াশিংটন, ভাঙ্কুবার, মিনিসোটা আকচারই যাচ্ছি। ঊটা, ওরেগন,
রিজোনা গেলেই হোলো। গ্রে-হাউণ্ডে চড়তে ভালোই লাগে আমার। কিন্তু
আর চোখের দেখা না-ও হয়,—মনে ঠিক রাখবো।

ডেভিড, এই সব কথা ত্রিশ বছর আগে যদি কেউ তোমায় সামনে রেখে
মায় বলতো—

ঘুঁষিয়ে হার্ট ফাটিয়ে দিতুম।—এখনও আমি খুব বিশ্বাস করি না। কিন্তু
ম যখন আমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছো, তখন মাঝে মাঝে তোমার ত্রুটি

বিচ্যুতিতে আমার দিকে কিছু জমাই পড়ে যায়। ভালোই লাগে। খরচের বো
কমে যায়। তা ছাড়া ভারতীয় মিষ্টিক্‌কে ঘুঁষুতে ভয় লাগে; কখন কো
এক জীন্‌ ছটকে এসে বলে—ঘাড়ে চাপবো! এই ভালো।

* * * * *

টোকিও-তে সব চেক্‌-চাক্‌ নিমেষে শেষ। ডেভিডকে বললাম টোকি
মতো বিরাট এয়ার পোর্ট, কিন্তু কী ছোট্ট ব্যবস্থা। এর তুলনায় কেনেডি এয়
পোর্ট—বাস্‌রে। আমস্টার্ডাম, কপেনহাগেন,—প্যারী-ঈর নতুন ডি-গল্‌ এয়
পোর্ট—ওঃ, হাঁটতে হাঁটতে জান যায়।

আমাদের কথা আর বোলোনা। যা করবো পেল্লায় রেট-এ। আমেরিক
হট্‌ ডগ্‌ দেখেছো? যেন স্টীম্‌ রোলার। আমেরিকান বীফ স্টীক্‌? যেন ক্ষু
পাহাড়। আমরা আমেরিকানরা বেশ্যা পাড়া করবো,—সে বাবদে কু
দ্বীপটাই কিনে ফেলার মৎলব; রেড-পাড়া হয়ে যাক। তোমাদের সেণ্ট টমা
জ্যামায়কার মণ্টোগো বে;—এ সব কী? রোমান্‌ এম্পায়ার, ব্রিটিশ এম্পায়
ছিলো। আমরা পৃথিবীজোড়া নতুন-এক এম্পায়ার করছি,—ডলার এম্পায়ার
ব্যাঙ্ক করে মানুষে। আমরা আমেরিকান ইওরো-ডলার ছেড়ে সারা য়োরোপে
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই বানচাল করেছি। উপস্থিত ইংলণ্ডটাকেই আমেরিকার ডলা
উপনিবেশ করছি। যা করি ঢালাও, ফৈলাও করে করতেই আমরা ওস্তাদ
আমরা আড়ম্বরনবীশ জাত! ভাল্‌গার একজিবিশনিস্ট!

লিলিয়ান বলে জাপানীরা ছোট্টো ছোট্টো, নীচু নীচু সৃষ্টি দিয়ে জিনিষ
সুন্দর, রুচিকর করতে ওস্তাদ। দেখবে যখন টোকিও ঘুরবে। এমনভা
শহর সাজানো কোথাও ভীড় মনে হবে না, কোথাও ওয়ালস্ট্রীটের অন্ধকা
নিউ-ইয়র্কের শ্বাসরোধ করা জগদ্দল ইমারতী শান পাবে না; অথচ মাল্‌টি
স্টোরী ইমারতের অভাব নেই টোকিওতে।···নীচু হতে হতে এখন ওরা টোকি
শহরটাকেই মাটির তলায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।—যাচ্ছো, টোকিও, মারুনুচ
য়োয়োগী, শিবুইয়া, শিঞ্জুকু, কাসুমিগাসেবী, গিঞ্জা—এ-সব এলাকা দেখবে
ব্যবসায়, মানুষে, সমৃদ্ধিতে এ-সব এলাকা গিস্‌-গিসে এলাকা। ওয়াল্‌-স্ট্রী
মানাহাটন্‌, মেডিসন স্কয়ারের সঙ্গে টেক্কা লড়ে। কিন্তু মনেই হবে না ভী
অগোছালো, নোংরা। সব ছিমছাম, ফিটফাট, ছোটোখাটো, নিঃঝঞ্ঝাট। ওে
স্বভাবই গুছিয়ে রাখা। জাপানী মানেই গোছগাছ।

বাইরে আসতেই সেটা মালুম হোলো। তাকানাওয়া প্রিন্স হোটেল আম
হোটেল। যাত্রী বেরুবার পথেই "পুছতাছ"—বুথ গোটা চার পাঁচ। ডাক
যেন। "আসুন। কোথায় যাবেন বলুন!" বলতেই বোর্ড দেখালো। বোত
টিপে দিলো। তাকানাওয়া প্রিন্স হোটেলের বাস সাত নম্বর গেট। সেখা

ওয়েটিং রুম। দ্যালে লেখা : "বসুন। প্রতি ৩০ মিনিটে বাস্ আসছে। টিকিট সংগ্রহ করে রাখুন বাইরে কনডাক্টারের কাছ থেকে।" সংগ্রহ করে এসে বসলুম। একটি হাওয়াঙ্গী প্রবাসিনী কোরিয়ান যুবতী তার বাচ্চাকে নিয়ে হিমসিম। বাচ্চাটা হঠাৎ আমায় পেয়ে বসলো। ফলে মেয়েটি তার ন্যাপকিন ইত্যাদি বদলে ঠিকঠাক হয়ে নিলো। তার নিজেরও একটু ভেতরে যাওয়ার দরকার ছিলো।...একজন মহামার্তণ্ড আমেরিকান হিপী যুবক রেগেই খুন। তাকে নাকি চোদ্দবার তালাশ করেছে। সর্বাঙ্গে তার বোঝা, ব্যাগ, ঝোলা ঝুলছে। চুলগুলো মাথা ছেড়ে চারদিকে দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। সে নাকি ইণ্টারন্যাশন্যাল বিজনেস ম্যান।...হাওয়াঙ্গী যাচ্ছে।.. তার ডলার জাপানের ভালো লাগে, তবে তাকে হেনস্থা করা...দেখে নেবে সে...এ জল গড়াবে...সে আমেরিকান · ইত্যাদি ঝড়ের মতো বকে গেলো।—বললো, আমেরিকায় জাপানী এলে আমিও দেখে নেবো। আমি আমেরিকান! আমায় ক্ষেপানো? ভেবেছেটা কী?

বাস এসে গেলো। ঝকঝকে বাস। প্রিন্স হোটেলে দু-হাজার দুশো চল্লিশটি সীট। বিশাল হোটেল। কিন্তু মনে হয় না বড়ো। সেই জাপানী ঠাটে আয়তনের আতিশয্য সবিনয়ে মিশিয়ে রাখার গৌরব।

জাপানে প্রথম দিনটা আমি একটা গাইডেড টুর নিলাম। ভাবলাম দেখা যাক পারি কি-না। কিন্তু এখানে আমার লাভ হোলো দুটি। একতো প্রথম যে মেয়েটি আমার সীট বুক করলো, এবং প্রথমেই একটা ট্যাকসী করে নিয়ে চললো। তার আবাহন, হাসি, ঝরঝরে কথাবার্তা—মনকে একেবারে চাঙ্গা করে দিলো। বুঝলাম জাপান সত্যিই একটি সভ্য দেশ। পরে বুঝলাম চারটি হোটেল থেকে ট্যাকসী নিয়ে যাত্রী একটি হোটেলে সমবেত হয়ে বাস র্ভাত করে। বললো, এতে বাসের পথ আর ট্যাকসীর পথের গতিবেগের তারতম্যের সুযোগ নেওয়া যায়, যাত্রীদের সুবিধা হয়।—বুঝলাম টোকিও তথা জাপানের ছিমছাম গোছগাছের একটি সুলুক সন্ধান—একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম,—আমার হাতের তেলো গালের চামড়া যতো না পরিষ্কার করে রাখার তাগিদ আমার, তার চেয়েও বেশী তাগিদ জাপানীদের পথঘাট, ফুটপাথ, বাড়িঘর দোরের আশপাশ, সদর পরিষ্কার রাখায়। একটা গ্যাস-স্টেশনের আঙ্গিনায় যে কোনো সময়ে আলপনা দিয়ে ঘট বসিয়ে ছাঁদনাতলা করা যায়। অতিশয়োক্তি নয়। এদের চোখে কলকাতা যে কী নরক বলে দিতে হবে না। আমাদের খুবই খারাপ লাগে কলকাতাকে নরক বললে। বুঝি। কিন্তু কলকাতার গর্ব যারা করবে সেই কল্‌কাতিয়া মানুষ কলকাতায় আর কটা? আর বাকী যারা, তাদের কলকাতা বোলে টান হবে কেন? মরা তিমি মাছের গা থেকে চর্বি যারা কেটে নিচ্ছে তাদের দরদ কী

দরদ ? সে তুলনায় টোকিওর জাপানী কলকাতাকে কেন রেহাই দেবে ? তারা শহরকে রানীর মতো করে সাজায়, গোছায়, খিদমৎ করে।

টোকিওর হৃদ্‌পিণ্ড দপ্‌দপ্‌ করে তোকাইদো এলাকায় টোকিও স্টেশনে। ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার স্পীডে ওসাকায় যায় হিকারী একসপ্রেস্‌,—পৃথিবীর দ্রুততম ট্রেন। টোকিও স্টেশনে নিত্য দশ লক্ষ্য যাত্রী যাতায়াত করছে! আড়াই হাজার গাড়ি নিত্য ছাড়ছে। প্রতি চল্লিশ সেকেণ্ডে একখানা গাড়ি ছাড়ছে —মানে ভীড়ের কথা বলছি। হওয়া উচিৎ। বিশেষ এই স্টেশনের সামনেই বৃহৎ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। আশ্চর্য স্টোর। তার চেয়েও আশ্চর্য ইকেবুকুর স্টেশনের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। এ-পার থেকে ওপার। দিল্লীর লালকেল্লার দ্যালও যেন ছোড়দা হয়ে যায়।

কিন্তু পথ ডিঙিয়ে একটি মানুষ দৌড়ুচ্ছে না। ফুটপাথে একটি মানুষও স্থিতিশীলতায় পিছিয়ে, পড়ে, শুয়ে, বসে নেই। পথের ধারে চটের দ্যালের পাশে ইঁট পেতে কেউ রাঁধছে না ; দ্যালের দিকে মুখ করে কেউ প্যাণ্টের বোতাম খুলছে না ; ফুটপাথের সারা বুক দুর্গন্ধে ভেসে যাচ্ছে না।—হঠাৎ রুক্ষ্ম চুলের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে কোনো কিশোরী কোলে শিশু নিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ছে না,—বাবু পয়সা দে ; খোকা-দালাল দৌড়ুচ্ছে না,—বাবু ট্যাকসী চাই ? এনে দেবো ? সর্দারজী বলছে না, যদি তালতলা যেতে চাও তবেই এসো, নৈলে চুলোয় যাও।—ঘেয়ো রুগী ঘা দেখাচ্ছে না ; সন্ন্যাসী বন্ধ্যার দাওয়াই দিচ্ছে না ; চাঁদপাল ঘাটের রকে গামছা পড়ে বুড়ী তেল মাখছে না ; নেংটী পরে বিশুদা ডন বৈঠক করছে না। এ সব নেই।

জাপান দেখে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর কোনো শহরে যদি বাস করতেই হয়,—ব্যবস্থাও দরকার। ব্যবস্থা যদি রাখতে হয় শাসন দরকার। শাসন যদি কায়েম রাখতে হয় পোষণ দরকার। পোষণ যদি ঠিকমতো করতে হয় শোষণ বন্ধ করতেই হবে।

তা বলে কী জাপানে শোষণ কম ? অমন ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ আর কোথায় ? কিন্তু জাপান তো আর মিং-সুং-দের চীন নয়। এখানে এঁদের স্বদেশ প্রীতিই ঐ সম্রাট, এবং যে সম্রাটের আসন কায়েম খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে অব্যাহতভাবে অদ্যাবধি। মাক-আর্থারের সাধ্য হয়নি সেটা বন্ধ করে ; পার্লহারবারের পরেও কারুর সাধ্য হয়নি সম্রাটকে ছোঁয়। এই সেদিন আমেরিকা রাষ্ট্রের বন্দ্যনীয় অতিথি হয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ঘুরে এলেন। আমেরিকান সমাজ এবং আমেরিকান কাগজ তা নিয়ে ভণ্ড বিদ্রূপধ্বনি তুলে ঘাউ ঘাউ করে উঠেছিলো। কিন্তু হাতি যখন চলে তখন আচমকা দুটো একটা শব্দ শোনা যায় একটু অন্যরকম জীবদের কাছ থেকে। তার সবটাই স্পর্ধার নয়, ক্রোধেরও নয়।

াতঙ্কই তার প্রধান কারণ ? আমেরিকার বাণিজ্যের সঙ্গে জাপানী বাণিজ্যের বাঝাপড়া এমন ধারায় প্রবহমান যে আমেরিকার কাগজে পত্রে জাপান সম্বন্ধে ঘউ ঘেউ থাকবেই ; না থাকাই আশ্চর্য।

এই সম্রাটের প্রাসাদই প্রথম দেখতে এলাম।

প্রাসাদের আর বর্ণন কী দেবো ? প্রথম ও প্রধান কথা এটিকে প্রাসাদ বলে নেই হয় না। মানুষ প্রাসাদ মানে জানে উঁচুর দিকে উঠে যাওয়া আকাশ ফাঁড়া এক দুর্লঙ্ঘ্যনীয় ব্যাপার। এ প্রাসাদ যেন বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে গঁুজে াখা টালি ছাওয়া কয়েকটি ছাদ। এই বিস্তৃতিই এ প্রাসাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ্যাল দিয়ে নয়,—উঁচু দিয়ে নয়,—লঙ্ঘকের বাধা দিয়ে নয়,—বিস্তার দিয়ে এর াধা। যাকে যেতে হবে দুস্তর বিস্তার পার হতে হবে। যেন গড়ের মাঠের মাঝে নপালের পশুপতিনাথের মন্দির ঢংয়ের বাড়ি। চারধারে তার পাইনের লিপি- লেখা, শাখা প্রশাখায় চিত্র বিচিত্র। মালীরা যুগ যুগ ধরে এই গাছের শাখাদের ীচের দিকে নামিয়ে এনে মাটির কাছাকাছি রেখে রহস্যঘন জাল বিস্তার করেছে। প্রাসাদ ঘিরে পরিখা। পরিখায় টল টল করছে জল। জলে শাদা শাদা রাজহংস। এ প্রাসাদের পরিচয় এর প্রাচীনতা। এ প্রাসাদের আভিজাত্য সম্রাটের স্বয়ংসিদ্ধ এবং অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা, যে প্রতিষ্ঠার বিস্মিত রোমাঞ্চই মানুষকে দেবতার মর্যাদা দিয়েছে।

যে ছেলেটি আমাদের গাইডেড্ টুর দেখাচ্ছিলো তার বক্তৃতার ধরন য়োরোপের সেই টেপ-করা 'নিউট্রাল' পানসে মাল নয়। শ্রীনুকুচি মাইত্তো আমাদের টুর প্রদর্শক টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্ট্রনমীর ছাত্র। ও বললো তারার থেকে তারার দূরত্ব মাপতে পারি বলতে পারি, দেখতে পারি,—কিন্তু এ বাসে যে মেয়েটি আমায় দেখে লোৎ-পোৎ হয়ে যাচ্ছে, আমার ডেট হয়ে তাকসুরা হোটেলে ইসেকাৎসু লণ্ঠনের আলোয় সিকি মোতো বা ফুজী মুক্তোর মালা দুলিয়ে নাচতে না পেয়ে শুখিয়ে যাচ্ছে, তার হৃদয় থেকে আমার হৃদয়ের দূরত্ব যে কতো তা বলতে পারবো না ; ঐ বাবদে গ্রীক এবং ইতালিয়নরা আমাদের চেয়ে অনেক দক্ষ গণৎকার। —তবে বলতে পারবো তার ইচ্ছে, স্বপ্ন, বাসনার জানালা থেকে আমার পকেটের দূরত্ব ভাইস প্রেসিডেণ্ট রকফেলার থেকে এই বাসের টুর গাইডের।—

এই ধরনের কথায় কথায় নুকুচীমাইৎ-তো আমাদের মাৎ করে রাখলো। ও প্রথমেই বললো আমরা জাপানে খাড়া হয়ে হাত বাড়িয়ে হাতে হাত ঝাঁকানোটা বদ্ ছাড়াও বিপজ্জনক মনে করি। জাপানে থাকাকালীন এ বিপদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দেওয়া আমি আমার কর্তব্য মনে করি। মানে,—আমাদের জাপানে কে-যে কারাতে জানে, কে জুজুৎসু এ ধরবার একমাত্র উপায় হাতের কাছাকাছিও না আসা। নিজের হাত বুকের কাছে বা মাথার কাছে তুলে নিজেই

ঝাঁকানোটা আমরা গাছ ছেড়ে মাটিতে নামার সময়েই ছেড়ে দিয়েছি। জাপানে যখন থাকবেন, কোমর থেকে শরীর ভেঙে নীচু হয়ে অন্যের পায়ের জুতোর প্যাটার্ন-টা দেখে নেবেন ; পছন্দ না হয়,—নিজেরটা দেখবেন। দেখবেন কার জুতো পালিশ করা পরের মোড়েই দরকার।···খবরদার মাথা যদি অপরপক্ষের আগে তোলেন,—বড়ই অপমানকর। একটু অভ্যস্ত হলেই বুঝতে পারবেন কে মাথা তুললো।···এ বাবদে পথের মাঝে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকার রেকর্ড আছে,—ন'ঘণ্টা ! আজ সময় হয় তো দেখাবো এক জোড়া বিনয়ী বৃদ্ধকে যাঁরা পারাপারি করে একবার এ নীচু অন্যবার আর নীচু হয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করছিলেন। এ উঠে দেখে ওর ঘাড় কাৎ ; লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘাড় পুনশ্চ কাৎ করলো ; ততক্ষণ ও উঠেছে। দেখেছে অপরটির ঘাড় কাৎ, তৎক্ষণাৎ সে নীচু। আমি ছিলাম। তাই ন' ঘণ্টার পর তাদের বিনয়ের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ দিয়েছি। যেতে চান, চলুন ! তবে বৃদ্ধ যদি বিনয় দেখান, দেখাবেনই,—টুর খতম।

একটি মেয়ে বলে, কেন আপনিই তো আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে নুকুচী বলে,—হ্যাঁ, আমি আপনার দিক থেকে চোখ ফেরাই আর কী। আবার কবে দেখবো কে জানে !

এই ধরনের টুর গাইড পেলেই প্রবাসে প্রবাসীত্ব বাসি না ঠেকে ভালোবাসি বাসি ঠেকে।

আমরা ভারতবর্ষের লোক। আমাদের অভিজ্ঞতার দৌড় একদিকে হিমালয় অন্য দিকে ঐ বম্বে, কলকাতা, দিল্লী—ব্যস্ ফুরিয়ে গেলো। মাঝে মাঝে বড় মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ, আওরঙ্গাবাদ। কাজেই টোকিও যে কী তা বোঝাতে গেলে আমার দশা হবে মার্কো পোলোর মতো। "মিথ্যেবাদী মার্কো"—এ আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলো মার্কো-পোলো কারণ সে বলেছিলো গাছের মাথায় 'থার্মোফ্লাস্ক' ফলে, তাতে জল ভরা, গাছের গায়ে পশম জন্মায়, মাস্তুলে ছেঁড়া মাদুর টাঙিয়ে দিলে জাহাজের গতি বেড়ে যায়। নারকোল, তুলো আর চীনে শাম্পানের পাল যে কী তা ইতালির লোকের না জানা থাকায় মার্কো মার অবধি খেয়েছিলো স্বদেশবাসীর কাছ থেকে। হেরোডোটাসের গপ্পের কোনো 'অপ্পো' নেই !! কিন্তু হকীকত এই যে—

অগর ফিদৌস্ বররুয়ে জমীনস্ত্··· ··

যদি, পৃথিবীতে স্বর্গের ডিসিপ্লিন এনে ফেলা যেতো তার নাম হোতো টোকিও।

সমস্ত জাপানে, পথে ঘাটে, পার্কে, শৌচাগারে, অফিসে, ক্ষেতে, গ্রাম গ্রামান্তরের সামান্য চাষীর ঘরেও,—সুন্দর ও সংযতকে এরা পুজো করে অন্ত

থেকে। জীবনকে করেছে শিল্প ; নিয়মকে করেছে ধর্ম।—শিক্ষাকে করেছে সমৃদ্ধির সেবাদাসী ; সমৃদ্ধিকে করেছে জাতীয় গৌরব।

তাই এদের আচারে নিয়মে কতগুলো ব্যবহার আছে যা আমাদের অবাক করে। কয়েকটার উল্লেখ করি।

স্নানাগারে আমরা যাই স্নান করতে। এটাই জানি। এটাই স্বাভাবিক। জাপানী কিন্তু স্নান সেরে তবে স্নানাগারে ঢোকে।—স্নান করে স্নানাগারে ঢোকে—শুনলেই অবাক্ লাগে। সে কেমন? সে কেন? যদি ভাবিও,—এর সমাধান করতে পারি না।—অথচ ব্যাপারটা খুবই সমীচীন।—

জাপানে সব স্নানাগারেই ব্যবস্থা স্নানের। স্ত্রী-পুরুষ বলে কোনো স্তর বিভাগ নেই,—কারণ মন্দিরেও তা নেই। স্নানও তো পূজার মতোই শৌচ; একটা অন্তরের শৌচ, একটা বাইরের। মস্ত ফুটন্ত জলের চৌবাচ্চা। সবাই ঢুকছে তার মধ্যে। ঘর ভীত বাষ্প কুণ্ডলী। ঘামে, গরমে, বাষ্পে,—স্নায়ু-কোষগুলো যেন ঝলসায়।

কারুর গায়ে ঘা ; কারুর দেহের অস্থি-সন্ধিতে নোংরার দুর্গন্ধ, কেউ তেল-কালির কাজ সেরে আসছে ; কেউ নর্দামা সাফ করে আসছে ;—এরা সবাই জলে ঢুকলে জলের অবস্থা কী। জাহাজে জাহাজে বড়ো বড়ো সুইমীং-পুল পেয়েছি। শাদা-গুলোকে দেখেছি রঙীন টেনী পরে এসে ঝপাং ঝপাং করে লাফাতে তারই মধ্যে। পচাৎ পচাৎ করে থুতু ফেলতে। পর্তুগীজরা তো এ বিষয়ে খাজা মাল। জলের মধ্যে আরও সব কী কী করে সে জল চেখে দেখিনি। তার ধারে কাছেও যাইনি। ফ্যাশনকে কখনও প্যাশন করিনি।

কিন্তু জাপানী সমস্যা পূরণের কায়দা স্বতন্ত্র। স্নানাগারের পুলের বাইরে সারি সারি ফোয়ারা। সেখানে গিয়ে আগে বেশ করে সাবানে জলে (গরমে-ঠাণ্ডায়) স্নান-নামক কর্মটির ধৌতি পর্যায় সেরে এসো। সেই কর্মটি সাঙ্গ হলে তারপর এসে ঢোকো পুলে। আর হাত নাড়ানাড়ি, নাকঝাড়া, গলা খাঁকারি, পচাৎ পচাৎ নেই।—হুড়হুড় করে দারুণ গরম জল বয়ে যাচ্ছে। তার গতিবেগ ত্বকের স্পর্শেন্দ্রিয়-কোষগুলোকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। জল গভীর নয়। পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ো। জলে শরীর ঢেকে যাবে। মাথাটি ঠেকনো দিয়ে রাখতে পারো জলের ওপরের ধাপে। শক্ত লাগে, তোয়ালে গুঁজে দাও, রাবারের বালিশ গুঁজে দাও। এবং চোখটি বুজে পড়ে থাকো, বা "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে" আওড়াও। স্রেফ পড়ে থাকো, পড়ে থাকো। অবগাহন স্নানে যে স্নায়বিক রোগ ধ্বংস হয়ে, স্নায়ুর উত্তেজক বিষক্রিয়াব ধৌতি হয়ে যায়, প্রত্যক্ষই দেখতে পাবে। জলে কোনো ময়লা নেই। স্নান কোরে স্নানালয়ে প্রবেশের এই সমস্যাপূরণ।

হ্যাঁ,—আর একটি কথা যা মনে ছুঁক ছুঁক করছে বলে দিই। ঐ জলে এতো

তাপ, জলের বাইরে এতো শীতল দ্রবতা, যে ঘরটি, বিশেষ করে পুলের ওপরটা বাষ্পের আবরণে ঢাকা। কাছেই যদি হেনরী কিসিংজার, এলিজাবেথ টেলর, ক্রিশ্চীন কেলাব,—হাঁদার শাশুড়ী, কি পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নী একেবারে মা-কালীর পোষাক পরেই পড়ে থাকেন,—কে দেখবে, কী দেখবে,—তার জন্য দৃষ্টির যে স্বচ্ছতা এবং মনের যে সময় তা কৈ! মহাভারতের সত্যবতীকে যখন পরাশরজী বাগে পেয়ে নৌকোয় চড়িয়ে একটা জলাদ্বীপে লম্বা হলেন,—সেই কিশোরী অনার্যটিই বিদ্বান সেই আর্য-সন্তানটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—ব্যাপারটি য হচ্ছে তা বলাৎকার, ব্যবহারটি যা হচ্ছে তা ব্যভিচার, দিনমানে যা অকর্তব্য অশাস্ত্রীয় তাও করা হচ্ছে,—হোক। ব্রাহ্মণের পক্ষে সাতখুন মাপ স্বয়ং মনুই হয়তো করে গেছেন। কিন্তু রমণীসুলভ লজ্জাটির দফা গয়া কোরে পরাশর যা পাবেন তা তো ছোবড়া। এ লজ্জা ঐ কন্যা রাখবেন কোথায়?—তখন পরাশর বাষ্প-কুহেলি সৃজন করে সেই বরাঙ্গকে দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন। বাষ্পের এমন আবরণশীলতার প্রসিদ্ধি আছে।

ইম্পিরিয়ল হোটেল আর্কেড, ওকুরা আর্কেড, হিলটন আর্কেড, কাসুমিগাসেকী হোটেল প্যাসিফিক আর্কেড বা টোকিও সেণ্ট্রাল স্টেশনের সামনে দাইমারু ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর-এর যে কোনোটায় তুমি যাও,—অবশ্য অন্ততঃ এক থেকে দেড় লাখ টাকার কম থাকলে ঢুকেও লাভ নেই। বেরিয়ে আসবে ক্যারম-বোর্ডের স্ট্রাইকার যেমন ও পারের দ্যালে ঠোকর খেয়ে বেরিয়ে আসে। আমার কাছে নিরানব্বই হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা অবধি ছিলো। তাই ঢুকতে সাহস হয়নি। তোমার দিদি সেই যে কখন ব্যাগ থেকে পাঁচটি টাকা—। যাক্। তুমি আবার যা! সাতখানা করে লাগাবে। তিনিও তাঁর অভ্যেস (তিনি বলেন অধিকার) ছাড়বেন না। দেখবে, ঐ সব দোকানে যা সব মাল দেখায়,—তার ডিজাইনের মধ্যে গ্রাহকের এবং ব্যবহার-কর্তার সুখ সুবিধার জন্য কতো চিন্তা, পরিশীলন করা গবেষণা। এদের চোখে ও মনে সুখবৃদ্ধি করা মানে কি জানো,—তোমার আমার আলস্য বৃদ্ধি করিয়ে, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বারোটা বাজিয়ে কী করে বুদ্ধিকে ঘরজামাই কোরে বুদ্ধু করে দেওয়া যায়। সুখ মানে আলস্যবৃদ্ধি; স্বাচ্ছন্দ্য মানে জাপানীযন্ত্রের ছন্দে গা এলে দেওয়া।

বাস চলেছে হোঙ্গোদোরি ধরে সাকুরাদা দোরী দিয়ে। সাকুরাদা আর কাসুমিগাসেকীর মোড়ে দু পাশে জাপান সরকারের মন্ত্রীভবনগুলো! কোক্‌কাঈ গিজিদোম্ টোকিওর বড়ো বড়ো পথের একটি মোক্ষম কুন্ডলিনী চক্র। নাড়ীর সঙ্গে নাড়ী জড়িয়ে ওপরে নীচে পাকের পর পাকে এ এক নিদারুণ মোড়। বৈদেশিক মন্ত্রী, অর্থনীতি মন্ত্রী, পূর্ত, পুলিশ, স্থাপত্য; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিক্ষা—কোনটা নন—সব মন্ত্রীর দপ্তরে দপ্তরে—'ছয়লাপ' বলতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু ছয়লাপই নয়। অত্যন্ত গোছানো। অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক অপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত, অনাস্থায় অবস্থিত। বরং কাছাকাছি লাল রংয়ের 'কাসুমিগাসেকী'র ত্রিশ তলা ওপরে তিন তলা নীচের ইমারতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টোকিও নাকি ভূমি-প্রকম্পনের স্থণ্ডিলের মধ্যেই পড়ে। কাজেই এ স্থাপত্যের স্পর্ধাকে সলাম না দিয়ে যাবে কোথায়।

হঠাৎ যেন সবটা ফাঁকা হয়ে গেলো। কোনোদিকে কোনো বাড়িঘর দোর নেই। সব ঝকঝকে তকতকে সাজানো। মাঝে মাঝেই বনানী, জল, ঝর্ণা, আর ছাঁটাই করা গাঢ় সবুজ পার্ক। পাইন, প্রুস, কপূর, চেরী। পাইনই বেশী। কোনো পাইন উঁচু নয়। সবই আট ন ফুট উঁচু। কিন্তু ডালগুলো পঞ্চাশ, ষাট ফুট মাটির সঙ্গে প্রায় ছুঁয়ে সবুজ স্বাক্ষরে যেন আকাশের প্রণতি টেনে এনেছে আলোর অঞ্জলি বয়ে মাটির নরম বুকে। এ স্তরের রচনা জাপানী মালীরা বহু পরিচর্যার সাধনায় আয়ত্ব করেছে।

আমরা রাজপ্রাসাদের দিকেই এগুচ্ছি। তাই এতো নরম, এতো সাজানো, এতো পরিষ্কার, এতো নির্জন, এতো মনোরম।

রাজার প্রাসাদের সিংহদ্বার কাঠের। তা হলে কীহয় ওকী আজকের সিংহদ্বার নাকি? অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই পবিত্র প্রাসাদে বোমাবর্ষণ হয়েছিলো। বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো যুবরাজ থাকাকালীন জাপানের বাইরে ঘুরতে যান। রাজবংশের পক্ষে প্রাসাদের বাইরে জনচক্ষুর গোচরে আসা এই প্রথম। এই তো সেদিন হিরোহিতো সপত্নীক আমেরিকা ঘুরে গেলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্রাটের দেবত্ব পদের কিঞ্চিৎ ছাঁটাই হয়েছে। বাইরেও বার হন, বিদেশেও ঘোরেন ; বইও লেখেন। ১৯৪৬ খৃীষ্টাব্দ থেকেই সম্রাট পার্লামেণ্টের অনুমত্যানুসারে রাজ্য চালান। রাজ্যে কিছু কিছু কম্যুনিজম্‌ও চলছে। কিন্তু সেটাকে জাপানী খেলনার মতো জাপানী কম্যুনিজম বলাই সঙ্গত। জাপানের কম্যুনিস্টরাও সম্রাটকে মানে, এবং ঠিক "দেবতা" না বললেও,—মানে-সম্মানে ঐ 'সম্রাট্' পদবীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করাটাকে জাতীয় শ্লাঘার বিষয় বলেই মনে করে। কম্যুনিজ্‌ম্ জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে। কিন্তু জাপানী মাত্রেই 'জাপান' বলতেই অজ্ঞান। কাজেই জাপানী কম্যুনিজম-এর ভবিষ্যৎ যদি কিছু থাকেও সেটা সম্রাট এবং জাতীয় শান-শৌকৎ-এর গরিমাকে বেকসুর বে-ওয়াদা বে তকল্লুফ মেনে নিয়ে,—তারপর!

এই প্রাসাদ যুদ্ধের পর তৈরী হতে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড খরচা হয়েছে। এখনও সমাপ্ত হয়নি। নির্মাণ কার্য হয়েই চলেছে। চলবে,—কারণ গাইড জানালো এই বিশাল বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক পয়সাও রাজ্য সরকার দেন না। তবে এ রক্ষা হয় কি করে? সারা জাপান থেকে নিয়মিত 'শ্রমদান'

হয়ে থাকে। আমাদের বোর্জোয়া দেশে আমরা বলতাম 'বেগার' দেওয়া। জাপানী কম্যুনিজ্‌ম্‌ বলে "শ্রমদান!"

এই জাপানী জাতটা—মানে যাদের জাপানী বলি ওরা দক্ষিণ সমুদ্র থেকে আগন্তুক,—পলিনেশিয়াই বলো, মালায়ই বলো। এসে যাদের সঙ্গে বসবাস করেছে তারা এশিয়ার বাসিন্দা,—ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন কোরিয়া থেকে তারা এসেছিলো। আজ যেমন য়োরোপ-ইংলণ্ড থেকে সরে পড়া আমেরিকানরা এসে য়োরোপ-ইংলণ্ডকেই হড়প করার অধ্যবসায়ে লিপ্ত তেমনি জাপানীরাও কোরিয়াটাকে ওদের বগলদাবা করার শুভ অধ্যবসায়ে সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে লিপ্ত। চীন-কৃষ্টিই জাপানকে প্রভাবিত করেছে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জমিদার আর সামন্তরাই সম্রাটের কলকব্জা নাড়াতো। ইংলণ্ডের "গোলাপ-ফুলের লড়াই"য়ের পর সপ্তম হেনরীর সময়ে যেমন সামন্ত পুরুষদের দমন করা হোলো অষ্টম শতাব্দীতে জাপানেও সামন্ত পুরুষদের দমন করে কেন্দ্রে সম্রাটের ক্ষমতা হোলো সার্বভৌম। তা মুখে তাঁকে সার্বভৌম বলা হলেও ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সামন্ত রাজারাই প্রকৃত মালিকিয়ানার ফুটানীতে ফুটে গেছেন। ঐ সময়ে একটি জাঁদরেল সামন্ত পুরুষ,—য়োরীতোমো,—বাকী সব্বাইকে দাবিয়ে 'শোগান্‌' অর্থাৎ মহাসেনাধ্যক্ষ হয়ে সম্রাটকে সামনে রেখে নিজেই শাসনভার হাতে তুলে নেন। এমনটাই চীনেও হোতো; হোতো সিক্কীম, ভূটান, নেপালেও। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এর অন্ত হয়। ততদিনে য়োরোপের সংস্পর্শে এসে গেছে জাপান। ১৫৪২-এ প্রথম য়োরোপীয়ানরা জাপানে আসে।—কিছু পর্তুগীজ—সঙ্গে ওলোন্দাজেরা। ১৫৪৯ সেণ্ট ক্‌সেভীয়র-এর চেলা চামুন্ডারা এখানে খ্রীষ্টধর্ম আনেন। এখন জাপানে প্রতি দুশো লোকের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান, এবং সে সব খ্রীষ্টানও শিণ্টো-ধর্মের আনুগত্য না করে পারেন না। তারপর গোলেমালে শুরু হোলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। নোবুনাগা, হিদেয়োশী এবং তোকু-গাওয়া এই তিন সামন্ত বংশের মারামারি কাটাকাটিও শেষ হোলো, সঙ্গে সঙ্গে 'শোগান'-শাসনের ছাতাও ভাঙ্গলো।—এর মধ্যে য়োরোপীয়ান লোভীদের খপ্পরে পরে চীনের অবস্থা, পর্তুগীজদের হাতে টীমোরের অবস্থা, আমেরিকার মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু-সভ্যতার বিনাশের খবর জাপানে পেঁাছে গেছে। জাপান বুঝেছে খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে যারা ঢোকে তাদের আসল দৃষ্টি সিংহাসনের ওপরে। মন্তেজুমার দুর্দশা, ইন্‌কা-রাজের দুর্দশার খবর ক্রমশ চারিয়ে যায়। ফলে স্পানিশদের তো জাপানে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়ই; অন্যান্য য়োরোপীয়দের অপস্বভাবের প্রতিও জাপানী বিমুখতা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে জাপানীদের পক্ষে জাপান ত্যাগও বন্ধ হোলো। জাপান পৃথিবীর অগোচরে দিন যাপন করতে লাগলো। ১৮৬৭ তে শোগান-দের শেষ সেনাপতি সম্রাটের কাছে

আত্মসমর্পণ করে। সম্রাট শক্ত হাতে জাপানের প্রগতিতে হাত দেন। কিন্তু শোগান-ই হোক যাই হোক সম্রাট-ও-সিংহাসনের মর্যাদা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে সেই পঞ্চম শতাব্দী থেকে। এই রাজভবনের দ্বার হতে পারে কাঠের, কাঠ বদলাতে পারে দফায় দফায়। কিন্তু ঐ দরজাটি ঐ মাটি কামড়ে পড়ে আছে পনেরশো বছর।—এটি কম কথা নয়।

গাইড এই সব বোঝাচ্ছিলো বটে। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাল্কা সুরও বজায় রেখেছিলো কারণ 'সম্রাট', 'সাম্রাজ্য' কথাগুলো আর অ্যাটমিক ইলেকট্রনিক দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না।—বলছে বটে ছেলেটি,—যে নিজে ভাবতে দ্বিধা বোধ করে যে একজন বীজজাত মানুষই কি করে দেবত্বের বিগ্রহ হতে পারে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলছিলো যে তার বাপ আজও এই দেবতারই নামে প্রার্থনা করেন।

তুমি কী বাপু সেই প্রার্থনায় যোগ দাও?

আমি তো দি-ই; জাপানের প্রতিটি চাকুরে, প্রতিটি সৈন্যও দেয়। আমাদের দেশে যারা কম্যুনিস্ট প্রতিপক্ষ, পার্লামেণ্টেও যারা ক্ষমতার সঙ্গে কথা বলে তারাও জানে ও মানে 'সম্রাট' এবং 'জাপান' একটি দেহের দুটি চোখ। কাণা জাপানের লড়বার ক্ষমতা নিশ্চয় কমে যাবে।

জারের রুশও তাই মনে করতো এককালে।

সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলো ছেলেটি। রুশের জার আর জাপানের সম্রাটকে এক করে যারা ভাবে তারা জাপানে টুরিস্ট হবার যোগ্যতাও ধরে না। জাপানকে দেখতে হলে তার প্রাণস্পন্দনকে বুঝতে হবে। এবং আজও এই পরিখার বেড়ের মধ্যে যে নিরাভরণ আতিশয্যহীন কাঠের প্রাসাদটি আছে তারই মধ্যে জাপান রক্ষা করে তার প্রাণস্পন্দন।

পরিখাটি নির্মল জলে ভরতি। শাদা হাঁস আর নীল জল, সবুজ ছায়া আর গভীর সেতু মিলে প্রাসাদ যেন ছবির মতো নরম স্নিগ্ধ। একটুও অতিশয়োক্তি নেই, দর্প নেই, আড়ম্বর নেই।

সে সব আছে ভিতরে।—এবং আছে যে সেটা বেশ অনুভব করেই বুঝতে হয়।

ঘুরে ফিরে সব দেখার কথাই ওঠে না। একটি ঘর দেখলাম। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জর্মনীতে প্রাচীন সামন্তদের প্রাসাদ দেখাবার একটা রেওয়াজ এসেছে। এতে কোরে সে সব শহরের মুনিসিপ্যালিটির আয়ও বাড়ছে। কিন্তু সে সব 'কাস্‌ল্‌' বা প্যালেস-এর-যে কোনো একটি দেখা মানেই সব কটি দেখা। এ-ঘর একেবারে অন্য জিনিষ। সিংহ দেখে যে চোখ অভ্যস্ত তার চোখে হঠাৎ ধরা শোলার কাজের দেবী-মুকুট: পালকের রোদে ভরা কক্‌-অব্‌-দি-রক।—যখন

দেখতে দেখতে চাইছি পরম শত্রুপক্ষের আক্রমণের সমারোহ, তখন হঠাৎ যেন রোদ মাথায় করে জেগে ওঠা শঙ্খচূড়ের ফণার ভীষণ চমৎকার বলিষ্ঠ ক্ষমতা। মানে বলতে চাইছি যে, এ প্রাসাদে হ্রস্বতা, তীক্ষ্ণতা, স্বল্পতার সঙ্গে শুচি, নিষ্ঠা, শিল্প, সাধনাই যেন প্রাণবান্ ও সংহত। যেন স্থলপদ্মের তুলনায় রজনীগন্ধা। হীরের ওজনের পাশে মুক্তোর স্নিগ্ধতা!

পদ্ম, এই যে দেশে দেশে মানুষের রচা বস্তুপিণ্ডের ঐশ্বর্য সম্ভারের গৌরব দেখলাম,—তার মধ্যে কটা এমন সৃষ্টি দেখলাম যা আমার অন্তরের অন্তরতমকে জ্যোতিতে, রসেতে, সুরেতে ভরিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরে; এবং ধরে বিশ্বের করে দেয়? আবার এমন সমৃদ্ধিই বা কটা দেখলাম যা আমার আকাঙ্ক্ষাকে আরও লালসা-ক্লিন্ন, আমার কামনাকে ভিখারী করে তুলে নিজের প্রতি নিজের মর্যাদাবোধকে বোদা করে দিয়েছে? ভার্সাইতে, ল্যুভ্-এ, লণ্ডন এলবার্ট হল-এ, ভাতিকানে,—এমন কি কায়রো মুজিয়ামে গিয়ে মনে হয়েছে,—এ সব এ ভাবে না হলেও পারতো; এগুলো হওয়া অন্যায়। কিন্তু রদ্যাঁ-র স্টুডিওতে তোমার দিদিকে নিয়ে গোটা একটা দিন সূর্যকে সাক্ষী করে ঘুরেছি। যখন বেরিয়ে এসেছি তখন আমি মানুষ থেকে মানুষতর।

শুধুই যা সম্ভার, শুধুই যা আড়ম্বর,—তা দেখলে আমি যেন মুষড়ে যাই। কারুর গোঁফের ছাঁট, সে গোঁফ চোমড়াবার শিল্প, বা তার গায়ে ঢেলে দেওয়া গন্ধ শুঁকে, দেখে আমার কী? আমার অন্তরাত্মার কী? ঠিক এই কথাটা মনে হলো নিজুবাসী পুলের ওপর দিয়ে হেঁটে, সেই ক্রাইসেন্থিমামে জ্বলজ্বলে টলটলে রোদ সবুজের স্রোত পার করে মিনামি-তামারি হলে ঢুকে।

এ হল সত্যিই আশ্চর্য। তলাটা রঙ্গীন পাথর টালির। কিন্তু সে টালি এমন পালিশ করা যে পুরো ছাদটার শোভা, মায় বালব, ঝাড়-লণ্ঠনের সার আর ছাদের রং সবই প্রতিবিম্বিত মেঝেয়। এই প্রতিবিম্বনই এ হলের তোফা। বিলেতে আমেরিকায়, মুঘল-পাঠানে, ইরাণে কার্পেট নিয়ে জাঁক। এ যেন কার্পেট না নেওয়ার জাঁক। নিরাবরণকে সুন্দর করে দেখানোই যেন শিল্পের চরম কামনা।

আর এ হলের একটি দেয়ালে প্যানেলের ঢঙ্গে একটিই চিত্র। উথল-পুথল সমুদ্র বাঁধা পড়েছে দু তিন চাঁই পাথুরে দ্বীপের মধ্যে; আর একটি মাত্র ঢেউ ধেয়ে আসছে সেই পাথুরে চাঁই ঢেকে ফেলার তাড়া বুকে নিয়ে।—কিন্তু এই জলধি তরঙ্গের ভাষাই জাপানের পরিচয়। যেন এই জাপানী জল-তরঙ্গ ভাসিয়ে দেবে অন্য সব বাধা।

এখান থেকে মেইজী শ্রাইন (মন্দির) বেশী দূরে নয়। কিন্তু সেকালে যা ছিলো মেইজী শ্রাইন্-এর বিস্তীর্ণ এলাকা, একালে সেটা হয়ে গেছে দু-টুকরো মাঝের অংশটা এখন বসতি। এটা 'পশ্' পাড়া। পৃথিবীতে এতো দামের

মি আর নেই। মাঝে বড় রাস্তা মেইজী-ডোরী। পূর্বভাগে অলিম্পিকের সিদ্ধ ময়দান, পুল, জিমন্যাস্টিক আখড়া, ন্যাশনাল স্টেডিয়ম। কিন্তু 'সময়-থকো' ইমারৎ বোলে যদি কোনো ইমারৎ থাকে, সেটি হোলো মেমোরিয়াল পিকচার গ্যালারি। তাকে দূর থেকে প্রণাম করে বলে এলাম,—আবার আসবো। সময় নয়ে আসবো। তে-রাত্তিরে সারা টৌকিও শহর জানা যায়। তিন মাসেও তামায় জানার স্পর্দ্ধা আমি করি না। এখানে পেগু প্যালেস এককালে শ্রাইনেরই অংশ ছিলো ; এখন রাজবাড়ির অংশ।

আর পশ্চিম দিকটায় শ্রাইন্। মেইজী-মন্দির এমনিতে অমিতাভেরই মন্দির, কিন্তু এর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন প্রতীক মূর্তি শিন্টো ধর্মকে বিধৃত করে রেখেছে। দু-এক জন নবীন সন্ন্যাসীরা দেখলাম এ বিষয়ে আলোচনা করতে পিছিয়ে গেলো। জাপানীরা শোনে বেশী ; বলে কম। কায়রোয়, দিল্লীতে, কলকাতায় পথে-ঘাটে মানুষ বলছে আর বলছে। ভীড়, আলোচনা, একটা "পয়েণ্ট" প্রতিপন্ন করা। বাজারে চিৎকার, স্টেশনে ফাটাফাটি ; জাহাজঘাটায় হল্লা। জাপানে যেন কারুর কিছু বলার নেই। চোখে দেখো, মনে বিচার করো এবং যেটা করবার করো। হল্লা,—নৈবচ। মুৎসোহিতো ছিলেন জাপানের সম্রাট, শান্তির আধার। তাঁর শান্তির বাণী বহন করে এই শান্তি-মন্দির মেইজী।

মেইজী-ডোরী, শান্তি-পথের ধারে একটি ছোটো সমাধি, অশান্ত সেনাপতি তোগো-র। এই তোগো রুশ-সৈন্যদের দাঁত খাট্টা করে দিয়ে, পোর্ট-আর্থার দখল করেন ১৮৯৬তে, তোগোর কীর্তির ফলেই শাদা-পৃথিবী প্রথম এশিয়ার কোনো একটি দেশকে একেবারে অপদার্থ মনে করে যা-মন-চায়-তাই করতে সাহস করে না। মেইজী-ডোরীর বড় রাস্তা বয়ে দক্ষিণে এসে পথটা ঘুরে পূবে গিয়ে টৌকিও-টাওয়ারের সুমুখে সাকুরাদা-ডোরির সঙ্গে মিশ খেয়ে এক মহা বিপ্লব বাধিয়েছে।

জানো, জাপানে, চীনে, কোরিয়ায় গৌরবের একটা বিশিষ্ট মাধ্যম ও প্রকাশ,—সেতু, যাকে বাংলায় বলো 'ব্রীজ্' ; আমরা মেড়োরা বলি পুল। আমাদের দেশে কেন,—সারা য়োরোপে সেতু নিয়ে ঢলাঢলি নেই। ঐ যে লন্ডনের বিবমিষাগুলো ছিলো ওগুলো তো দিল্লীর কোড়ীয়া কী পুল, পুল বঙ্গেশ, কাশীর ডেঁড়শী-কে পুলের মতো বাজারের আড্ডা, টাউটের আড্ডা, খুনে, ফেরেপবাজ, বাজারু মেয়ের আড্ডা।—এ কালে ওরা চাইছে ভালো পুল করতে। প্যারী-র সেণ্ট মদ্লীন, দোর্-সে, নতাদের্ম, অস্টারলী সেতুগুলোর জাঁক দেখানো হয় বটে, কিন্তু সেতু বাবদে রোম্যানরা ছিলো প্র্যাকটিকাল। ওদের গৌরব হোলো 'আর্ক' বা খিলান দেওয়া পা ফাঁক করা কীর্তি-দ্বার। আমাদের বুলন্দ্-দরওয়াজা তা বলে ঐ বস্তু নয়। য়োরোপীয় আর্চ বা দরওয়াজার তলা দিয়ে পথ যাবে। কংগ্রেসের গান্ধীভজা দিনগুলোয় পথে পথে আমরাও

তোরণ সাজিয়েছি।—জাপানের এই "তোরণ" গৌরবের তোড় দেখিনি বটে কিন্তু সেতুগুলোর রচনায় ওরা কেরামতি যা দেখিয়েছে তা মনোরম।—নিজুবাস তো স্বয়ং রাজমহলের পরিখার ওপরের সেতু। এমনি সেতুর অলঙ্কার পরাে উয়েনো পার্কের শিনো-বাজু সরোবরের ওপর। কাচিদোকিবাশী সেতু, কিওঃ সেতু, মান্নেন্‌বাসী সেতু—সারা জাপানের গৌরব।

আমার মনে হয় এই সেতু-গৌরব থেকেই ওদের মাথায় আসে পথ-গড়া গৌরব। ঐ যে পথে পথে সন্ধিস্থল এবং পথের এধার থেকে ওধারে পারাপা এটা ওরা সেতু-বিধিতেই করেছে। কিওসু বা মান্নেনবাসী সেতু-র সরল-গম্ভ সৌন্দর্যের কাছে ঐ বালি, হাওড়া সেতু—থাক; আর বোলবো না। তোম মুখের নামেই ফুল, তাকে হাঁড়ি করে তোলায় লাভ কী? না হাসলে তোম কী যে দেখায়! ভয় পাই। হামামাৎ সেচু আর তোকিও এয়ার পোর্টের মে মনো-রেল সেতু, তানিমাচী ইণ্টারচেঞ্জের মোড়ে সেই বিশাল রাডার ক্রশি নাগাতাচো, শিবা, তাকেবাসী বা জিম্বোচো-র মোড়—এ সব জায়গায় যেন পথে জাল। পথে, হাইওয়ে, এক্‌স্‌প্রেস-ওয়ে, মনোরেল,—সব মিলিয়ে যে জটাজা তার ফেরে ফেরে কবরীবন্ধের লাস্য, প্রেয়সীর কণ্ঠে মুক্তার মালার দ্যুতি এ গৌরব। দেখলে প্রথমেই সালাম জানাতে ইচ্ছে হয় জাপান মানসের সৌন্দ বোধকে, তারপর এঞ্জিনীয়ারিং স্কিল্‌কে। যন্ত্রকে এরা চাপা দিতে দেয়নি মে প্রেয়। সেতুগুলো যখন জলে ভাসে মনে হয় বাজুবন্দ, বাউটী, অনন্ত, বাল কে বেঁধে দিয়েছে অবাধ দুরন্ত যৌবন সরসীকে; আর সেই সেতুই যং সিমেণ্টের বুকে, মোটরের স্রোতের তলায় ভাসে মনে হয় "চলা যেন বাঁধা আ অচল শিকলে।"

"ন্যাচুরাল এডুকেশন পার্ক" যেন কষে একটি থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়ে প্যারী-র বহু প্রগল্‌ভিত এবং প্রকম্পিত—"মিউজিয়ম অব ম্যান"কে। বিশ পার্কের মধ্যে বায়োলজী, জুলোজী, বটানিক্‌স্‌ ছাড়াও নানা গবেষ সিদ্ধান্তের প্রদর্শনী। দেখতে গেলে অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ লাগে। টাওয় সকলে গেলো! আমি টাওয়ারে ওঠার খুব পক্ষপাতী নই। কিন্তু টোকি বন্দরটি এখান থেকে দেখা যায় বলেই উঠলাম, এবং স্বীকার করলাম না এ ঠকতাম। এমনি টাওয়ার ওয়ার্লড ট্রেড সেণ্টারের ইমারত, তোকিও দেনরি (ইম্পীরিয়ল হোটেলের পাশে), সান-আই বিল্ডিংস। টোকিওতে সৌন বিনয়ের; আমেরিকার শান ও শৌকত স্পর্ধার।

তাই ওদের গৌরব পার্কে, সেতুতে,—এবং থিয়েটারে। নিচিগেকী থিয়েট ন্যাশনাল থিয়েটার, তোকিও অপেরা, কোকুসাই থিয়েটার, কাবুকীজা থিয়ে প্রত্যেকটাই যেন এক একটি প্রদর্শনী। ভিয়েনা অপেরা, মস্কো অপেরা, প্যা

অপেরা নিয়ে নানা ঠমক ঠসক। ওগুলো দেখার পর এটা দেখা যেন চরম দেখে পরম দেখা!

নাইট-লাইফ মানে দর্শনী খরচা করে নারী দেহের ভঙ্গীর প্রদর্শনী দেখার হাট-ব্যবস্থার কথা হংকং-ব্যাঙ্কক-সিংগাপুর অধ্যায়ে বলেছি। তোকিওর গীশা হাউস্, কী-ক্লাব, নিশি-গেকী নামক ভূস্বর্গ-গুলিতে তুমি রম্ভা, ঘৃতাচী, মেনকা, উর্বশী, তিলোত্তমাকে পাবে, এবং তারাও যে খুব ভূমিকা, প্রস্তাবনা, মুখবন্ধে ঢাকা মলাট সর্বস্ব বই নয়,—এটা সহজেই বুঝতে পারবে। এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো এ সব দেহও নানা জনে নানা প্রয়োজনে যেখানে সেখানে খুলেছে, দেখেছে, জ্ঞান আহরণ করেছে। এ ভান্ডার কারুর নিজস্ব নয়। কিন্তু তবু কতো তফাৎ। ব্যাঙ্কক যদি নরকের আগুনে ঝলসানো হয়, টোকিও স্বর্গের সুষমায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। এদের শালীনতা, রুচি, পরিষ্কৃতি, সংযম বিধৃত সজ্জায়, রূপে, প্রসাধনে, গন্ধে, খাদ্যে, রসে, পানীয়ে। অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সুস্থ অঙ্গ চালনাগুলোও পাখির গানের মতো বিনা আড়ম্বরে সহজে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। জাপান বিদগ্ধ দেশ; জাপানে বিদগ্ধ রুচি। এরা পিন্ড নিয়ে লেন-দেন করলেও,—আত্মা এবং মনকে ঠেসে চেপে মরে যেতে দেয়নি। একটা মোটা কথা ধপাস্ করে বলে দিই। কাঞ্চন কন্যাদের কাঞ্চন মূল্য শেষ অবধি পকেট গলায় কী হারে জানি না। গীশা'ঘরে'র প্রবেশ মূল্যই ৮০।৯০ ডলার ইউ. এস্!

আমরা এলাম য়াশুকুনু মন্দিরে। কিন্তু মেইজীর মন্দিরের বাগান, তার কুঞ্জগুলোর সৌন্দর্য দেখার পর য়াশুকুন শুধুই মন্দির। কিন্তু মন পড়ে আছে আকাসুকা কানন্ মন্দির দেখার জন্য। মন্দিরের বিস্তীর্ণ অঙ্গন। উয়েনোতে যে কানেজী মন্দির আছে তার পাঁচতলা প্যাগোডা দেখে নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরের কথা মনে হয়। তিব্বতের পথেও এমন মন্দির দেখেছি। কিন্তু এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ৎসুকোজী হোংগাঞ্জী-মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ ঐ অমিতাভ বুদ্ধ হলেও প্রতীক পুজো যে নানাভাবে চলে বুঝি। হোংগাঞ্জীর মন্দিরের স্থাপত্য দক্ষিণ ভারতীয়, মৈশুরীয় এবং রাজপুতানী মন্দিরের মিলিত সংস্করণ। এ সব মন্দির দেখার পর ভেবেছিলাম আসাকুসার মন্দির দেখে নতুন কীই আর এমন পাবো?

ভুল বুঝেছিলাম।

কানন্ মন্দিরের কথা বলি তবে।—আগেই একটু বলেছি। তবে তা একটুই। ঐ যখন কথা বলছিলাম সিউল থেকে ফেরা মিঃ আর মিসেস্ থেল্ম্যানের সঙ্গে। মিসেস লিলিয়ান থেলম্যান তখন কথা তুলেছিলেন সেই শিণ্টোধর্ম নিয়ে। এবং শিণ্টো ধর্মের মধ্যেই আছে জয়দ্রথ তন্ত্রের সেই শিরচ্ছেদ ক্রিয়া এবং ছিন্নমস্তার কথা, তাতেই পাবে লয় কর্মের কথাও। ঐ যে মাতঙ্গী কালামুখী নিয়ে অভ্যাস

ও উত্তর শৈলের ব্যাপার, ওসব কথা তো তন্ত্রাগম নিজেই বলছে। গায়ত্রী বিসর্জন মন্ত্রও তাই বলছে। রাম পরশুরামকে ঐ উত্তরে পাঠালেন। সেই পার্বতী, শৈল-শিখর বাসিনী শৈলে শৈলে ভ্রাম্যমানা। এসেছেন সেই ককেশাস আরারাৎ, জাগ্রোস্ থেকে পূবে পূবে উত্তরে উত্তরে হিন্দুকুশ, পামীর, হিমালয় কুনলুন ; আরও উত্তরে শান্, আলতাঈ, খিংগান, তবে তো পেলো কোরিয়া পেপীশান্, জাপানের ফুজী। ঐ যে উত্তর-পূব পূবের উত্তরে ঈশান কোণে ঈশানী,—এ তত্ত্বের নিশানী ওই।—কথাই কাহিনী হয় ; কাহিনী কং হয় না!

এই আসাকুসা কানন্ মন্দিরেও শুনেছি সেই পদধ্বনি। আমি দেখি অঙ্গনে বিরাট পিত্তলের হোমকুণ্ডে জ্বলছে জ্বালামুখী ধূপ। হাজার হাজার ভ আসছে। পাশেই হাত ধোবার ব্যবস্থা। হাত ধুয়ে ধূপ কিনে কুণ্ডের বুকে গেঁথে দিচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও আগুন নেবে না। ওরা বলে বৃষ্টি হলে নেবে না। তার কারণ বোধ হয় কর্পূরের আগুন। এই যে জাপানে বিরা যুদ্ধ হয়ে গেলো, ভূমিকম্পে টোকিও মড়মড় করে ওঠে, জলোচ্ছ্বাসে শিহরিত হয়,—না, ও আগুন নেবে না। পুরোহিতেরা বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ধূপদান করেন।

লক্ষ্য করে দেখি ঠিক ; পাশেই অবধূতেরা বসে। দুটি চোখ পরমাবিষ্ট। ধুলায় বসে আছে। কেন জানে না। মন্দিরের চতুর্দিকে দৌড় লাগানো দালান। তার মধ্যে বিশাল গর্ভগৃহ। তারও ভেতরে মন্দিরে বিগ্রহ। জাপানী প্রথায় ধাপে ধাপে সাজানো। এবং প্রতি ধাপে নানা বিগ্রহ। গর্ভগৃহের দরজার বাইরে মেঝেয় কার্পেট মোড়া। তার ওপরে সব বর্ণের, গোত্রের, লিঙ্গের, বয়সের ভক্তেরা হাঁটু দুমড়ে মুড়ে বসে প্রার্থনা করছে কর জোড়ে, মাথা নীচু করে। সিংহাসনে এই তান্ত্রিক উপবেশন প্রথা থাই, কাম্বোজ, চীন, কোরিয়া, জাপান,— সর্বত্র। অনেকক্ষণ আত্মভোলা অবস্থায় কাটলো। উঠে ছবি নিলাম। খুব অন্ধকার বলে ছবি ওঠার কথা নয়। তবু উঠেছিলো। লক্ষ্য করি যে একটি দরজা চেপে মোহন্তের আসন। মোহন্ত গদীতে আসীন। তার সুমুখে একট বাঁশের চোঙ্গায় রাখা বাঁশের কাঠিতে মোড়া কাগজ। এক একজন তার এব একটা তুলছে। সেইটা দিচ্ছে মোহন্তর হাতে। মোহন্ত কাঠিতে মোড়া কাগজ খানা খুলে কী পড়েন। তারপর তাঁর কাছে রাখা একখানা পুঁথীতে রাখ একখানা ছাপা কাগজ দেন। সেইটি মাথায় ঠেকিয়ে পড়তে পড়তে ভক্ত চলে যায়। তখন বুঝি এরা নিত্য বা দিনে চোদ্দবারও আসে। ভাগ্যলিপি গণনা করার প্রথা।

মন্দির সংলগ্ন বাজারটি শুধু বড়ো নয়, খুব বড়ো, এবং তার ধরনটা যে মন্দিরকে নাভি করে মন্দিরের বাইরের চতুষ্কোণ সুবৃহৎ জায়গাটার দ্যালকে সীম

রে অসংখ্য অরা। প্রতি অরা চওড়ায় আটফুট হবে। দুধারেই মনোহরণিয়া, লাভ জাগানিয়া, বিচিত্র বিচিত্র আকর্ষণে দুর্দাম নানাবিধ পণ্য সম্ভার। তার মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরের বাইরের বাজার, কাশী বিশ্বনাথের গলি, কালিঘাট রোডের বাজার, নউমার্কেটের বাজার, চাঁদনী,—সবগুলো এক হয়ে আছে,—প্রভেদ যে এখানে গাল নেই, তকরার নেই, দুর্গন্ধ অপরিষ্কৃতি নেই,—আর নেই ভীড়ের অসহতা। াবারের দোকান, বারবণিতার instant sex এর পসার, বাচ্চাদের খেলনা, ম্যাজিক, তুড়ে খেলনা, ধাঁধার খেলনা, পাখির বাজার, পোষা পশুর,—এ সবের সঙ্গে াচ, গান, কুস্তী, কাপড়-জামা সব আছে। লণ্ডনের লীস্টার স্কয়ারে আর পকাডেলীর মাঝে যতো সিনেমা হল, থিয়েটার দেখেছিলাম ততো নিউইয়র্কে ডওয়েতে দেখিনি। কিন্তু এ তল্লাটের সিনেমা হলের ভীড় আমার সব ভিজ্ঞতাকে মাৎ করে দিয়েছে।

*　*　*　*　*

(১৪)

মন্দিরের বাজার। খেলনার ভীড় তো হবেই। কিন্তু কতো রকমের খেলনা! াপান সম্বন্ধে লিখতে গেলে খেলনা, চা, গীশা এবং ফুল এ চারটি বিষয়ে লিখতেই য়। কী যে ভালোবাসে এরা পুতুলকে। রীতিমত আত্মার আত্মীয় পুতুল। ারিবারের একজন। কিন্তু আমাদের মতো পুতুল জমিয়ে জমিয়ে ধুলো পড়িয়ে ুতুলকে ওরা জরাজীর্ণ কুৎসিত করে তুলতে নারাজ। কী করে পুতুলগুলো?

উয়েনো পার্কে আছে কিরোমিৎসু ক্যানন মন্দির। এখানেও শিন্টো-আচার। র্বদাই আগুন জ্বলছে। এরা বছরে একদিন মন্দিরের বাইরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। শেষ কোনো তান্ত্রিক ক্রিয়ার মতো সাধনার পোষাকে সজ্জিত পুরোহিতরা এই াগুনের চারধারে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করে আহুতি দেন! এ আগুনও তো চিতা। তায় জ্বালানো হয় পুতুল। কেন হবেনা। এক একটা পুতুল যে কোনো শশু মা-বাপের মায়ার ডেলা। সারা বছর ধরে এরা এদের ছোটো সংসারে, চি মনে এই সব পুতুলদের স্থান করে দিয়েছে। তাদের ভালোবেসেছে মা-বাপের ালোবাসার ধূপে চন্দনে। পুরোনো যদি তারা হয়েই যায়,—তাই বলে কি তারা হথায় হোথায় অবহেলায় আবর্জনায় পড়ে থাকবে? বর্ষিয়ানদের কাছে যারা শশু, ঈশ্বরের কাছে তারা পুতুল। আমাদের চোখে যা পুতুল শিশুর চোখে স স্নেহের ডেলা। দুপুর নাগাদ সারা টোকিও থেকে গাড়ি করে, পায়ে হেঁটে,

সকলেই তাদের পুরোনো পুতুল নিয়ে আসে। এই আগুনে তাদের সমর্পণ করে। তারা ভস্ম হয়ে যায়।—এমনি প্রতি শহরে, গ্রামে বছরে একটি দিন পুতুল আহুতির দিন ধার্য আছে।

ছোটো বাচ্চাদের বাপ মাদের দেখলাম হাত জোড় করে মাথা নীচু করে প্রার্থনা করে!—"আমার বাচ্চাদের শোক নিরাকরণ করো। শোক দুঃখ বহনের শক্তি দাও জীবনের সংঘাতের মাঝে দাঁড়াবার যোগ্যতা দাও। ওদের কোলে নতুন পুতুল দাও।"

জাপানীরা পুতুল ভালোই বাসে না শুধু, পুতুলের মধ্যে যে আনন্দের উৎস তাকেও বন্দনা জানায়।

এই সপ্তাহটি বাচ্চাদের জন্য পুতুলওলারাও প্রস্তুত হয়েই থাকে। এই দিনটিতে তারা আর ব্যবসায়ী নয়। তারা অপেক্ষা করে থাকে বাচ্চাদের, পুরোনো পুতুল জমা করে নতুন পুতুল নিয়ে যাও। মা শুদ্ধ। শোক কোরো না। এব পরে সেই পুরোনো পুতুলের পাহাড় নিয়ে যায় প্রতি ব্যবসায়ী য়ুয়েনো পার্কের সেই অগ্নি উৎসবে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই উৎসবটি হয় বলেই এটি আমা পক্ষে দেখা সম্ভব হোলো। শুধু সম্ভব হোলো না, জাপানীদের জীবনধারা একটি রমণীয় অধ্যায় চোখের ওপর ফুটে উঠলো। পুতুলের দিন উত্তর ভারতে দেখেছি,—নাগপঞ্চমী। নাগের পুজোর সঙ্গে নাথ যুগী তন্ত্রের যোগাযোগ গভীর। পুতুল শুধু পুতুল নয়।

এদিকে বেলা হয়েছে। দৈহিক তাগিদের ধাক্কায় ধুলোর পৃথিবীর শরী হয়েছি। তখনই হঠাৎ খেয়াল হোলো আমি একা। আমার সঙ্গীরা কেউ নেই বোধটা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নার্ভাস হয়ে পড়লাম। হারিয়ে গেছি। কী হবে সেই টুরিস্ট বাস কখন ছেড়ে গেছে! রোমে হয়েছিলো ১৯৫৭-তে! আবা জাপানে! কী কর্তব্য? বড় রাস্তায় এসে পড়ে ঘাবড়ে গেলাম। ঘিঞ্জী পথ যেমন দোকান, তেমনি ভীড়। কয়েক মিনিট চলতে চলতেই হঠাৎ হাসি পেলো,— আমি ব্রজ ভট্চাজ্‌—আমি হারিয়ে গেছি কথাটা আমার কাছে হাস্যাস্পদ। তোমা কাছে, তোমার দিদির কাছে,—আমি হারিয়ে গেছি এ কথার মানে হয়তো হয় আমার ঠিকানা যেই তোমাদের অজানা হয়ে যায় অমনি এই হারিয়ে যাওয়া বোধ বিকল করে। কিন্তু আমার কাছে আমি হারিয়ে গেছি, এ কথার মানে কী কোথা থেকে কবে এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় যাবো না জেনেও বুক চিতি এখানে নেপোলিয়ঁ, চার্চিল, স্টালিন ব'নে চলেছি,—অথচ অল্প কদিনের এ জায়গায় বাস চলে গেছে বলেই 'হারিয়ে' ঘাবড়াচ্ছি?

পকেটে আমার প্রিন্সেস হোটেলের ঠিকানা। গাড়ি করবো, বাড়ি যাবো,— ভাবনাটা কী? মোটে আড়াইটে! ঢুকে পড়ি একটা হোটেলে। এখানে খাবা

অর্ডার করার ঝঞ্ঝাট নেই। শো-কেসে প্লাস্টিক বা মোমে গড়া সব খাবারের প্লেট শুদ্ধ নমুনা এবং পরিচয়। আমি আর কোনো উৎকট খাবারের পরীক্ষা নিরীক্ষণ আমার গলদ্ঘর্ম পাকস্থলী দিয়ে করবো না। এখানে না মিলছে কণিকা, না কিতাং মায়ো। দোকানীকে যা দেখালুম তা খেয়ে দেখি ভাত আর রুই মাছের ঝোলই বলবো। ভেতরে আলু, কপি, সিমলা লঙ্কা।

পথে ধরলাম এক ভদ্রলোককে। মশায় গিঞ্জা যাবো। সাবওয়ে বলে দেবেন? ভদ্রলোক সবিনয়ে ঝুঁকে বাও করে আমায় পেঁাছে তো দিলেনই,—সঙ্গে সঙ্গে টিকিটখানাও কিনে দিলেন। মুখগাল ভর্তি তাঁর দাঁতে। সেই দাঁত বার করে এক মুখে অনেক মুখের হাসি হেসে তিনি বিদায় নিলেন।

মনে হয় তোমায় আগে বলেছি যে জাপানী কৃষ্টির একটা বড়ো চমৎকার এই যে ওরা ক্রমাগত ভাবে তোমার অসুবিধার কথা। তোমার মানে গ্রাহকের। নাগরিকের এবং ভেবে ভেবে যাবৎ পারে তার সুবিধাও করে দেয়।—এটা করতে পারে ও করে বলেই যন্ত্র জগতে যন্ত্র ব্যবসায়ে জাপানী পরিবেশন জাপানী বিজ্ঞাপনের নিমন্ত্রণের মতোই লালা ঝরিয়ে ছাড়ে।—বিশ্বাস না হয় কখনও জাপানী বিজ্ঞাপন সাহিত্য সংগ্রহ সম্পর্কে গবেষণা করে দেখো।

দেখো না এই 'সাব্-ওয়ে জার্নি', কী মনো রেল; এদের গাড়ি যে গুরুতর ভাবে লম্বা, দ্রুত এবং প্রায় ১০০% যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। এখন তুমি নামবে ধরো বালি। কোথায় কখন বালি আসবে জানো না। লিলুয়া স্টেশনে গিয়ে নাম দেখলে একদিকে ছোট্ট করে হাওড়া, অন্যদিকে ছোট্ট করে লেখা বালি; মাঝখানে বড় করে লেখা লিলুয়া। মানে হাওড়া ছেড়ে এলে; লিলুয়ায় আছো; পরেই আসছে বালি। বালিতে বালি পেলে বড় অক্ষরে; ছোট অক্ষরে একপাশে লিলুয়া, অন্য পাশে উত্তর পাড়া। এমনি ব্যবস্থা। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

এই ধরণের সুবিধা হোটেলে, রেস্তরাঁয় শৌচাগারে, পার্কে, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে, বাস স্ট্যাণ্ডে, সাবওয়েতে, স্টেশনে, এয়ার পোর্টে। জাপানে এলেই মনে হয় য়োরাপ আমেরিকা "ব্যবস্থা" শিখতে চায় জাপানে এসে চাকরি নিক।—এতো যে পাউণ্ড ডলারের ওঠা-নামায় পৃথিবীর ব্যাঙ্ক সসেমিরা বয়ে গেছে চীনের, বয়ে গেছে জাপানের ইয়েনের।

এই ব্যবস্থা প্রীতির গোড়ার কথা স্বদেশ, স্বজাতি স্বধর্মের প্রতি জাপানের সা-ভিমান প্রীতি ও নিষ্ঠা। এবং এই নিষ্ঠার মধ্যমণি ঐ সম্রাট। জাপানীদের কাছে তাদের সম্রাট শাসন-ব্যবস্থার কেউ নয়। সেই বাবদে, অর্থাৎ পলিটিকো-ইকনমি বাবদে সম্রাট একখানা "শুধু ছবি, শুধু পটে লিখা।" সম্রাটের বাণী, সম্রাটের বেতার ভাষণ, এমন কি সম্রাটের ছবি সাধারণে যত্র তত্র নেই। তাঁকে

আবডালে রেখে তাঁর নামে জাপান কাজ করে চলেছে,—"তুভ্যমেব সমর্পয়ে" বোলে। এ যেন দেহ যন্ত্রে মাথা ; গাড়ির চাকায় নাভি।

আমার সঙ্গে ঐ যে গাইড ছিলো তার সঙ্গে এক বিকেলে এক চায়ের আসরে গিয়েছিলাম। চায়ের আসর, জাপানের চায়ের আসর যেন আমাদের সত্য নারায়ণ পূজো। ভক্তি শ্রদ্ধা তাতে কতো জানি না, কিন্তু আচার-রীতিটাই পুরোদম।

জাপানে চা চীন থেকে গিয়েছিলো। চীনে চা পাওয়া যাচ্ছে খ্রীস্টের জন্মের ২৭০০ বছর আগে। মানে হাড়াপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে যদি কোনো চীনা-রমণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোতো প্রেম জমতোনা, কারণ চা তাকে খাওয়াতে পারতুম না। তা বলে ভারতে চা ছিলো না তা নয়। ভারতের স্থানে স্থানে চায়ের গাছ ছিলো বুনো অবস্থায়। এখন দেখছো ৩-৪ ফুটের বেশী চা-গাছকে বাড়তে দেওয়া হয় না (খুঁটতে সুবিধা হয় তাই), নৈলে স্বাভাবিক ভাবে চায়ের গাছ ৪০ ফুট অবধি লম্বা হয়। গাছ বলেই একে সোমলতা বলা হয় না। নৈলে বেদের মন্ত্র যা ওষধী সোমরাজ্ঞী বহ্বী শত বিচক্ষণা চা হলেও ক্ষতি ছিলোনা।

ঐ চা-করতে গিয়েই চা-কর আর চা-করানী কিনা আমি জানি না। মীরাবাই চা খেতেন কিনা জানি না। এবং তিনি যখন চা-কর রাখো জী লিখেছিলেন তখন ভারতে চা-করা কতো চালু ছিলো আমার অজ্ঞাত। কিন্তু জাপানে 'মেয়ে দেখা'র ঘটায় চা-করণ একটি মোক্ষম প্রক্রিয়া। এখনও বাসর ঘরে তোমরা বর কনেকে নিয়ে ঐ প্রক্রিয়ার খানিকটা করে মজা পাও ; দেখো পরখ করে বরকনের বুক দুরু দুরু করছে কিনা। ঐ সব কী ঘট-টট ঘটা করে ঢাকাও এবং খোলাও নিঃশব্দে বাজী ধরে। ঐ নিঃশব্দ এবং শান্তি ক্রিয়াকর্মগুলো পরিবেশনা ও গৃহকর্মের পরম পরখ-পাথর। জাপানের চা-করণ-ক্রিয়া শীলতার চরম পরিচয়, বিভূতি বলতে পারো। এ জন্য চা-ঘর, চা-সময়, চা-বন্ধু, চা-রীতি একেবারে Strictly পালনীয় ধর্ম। জাপান তন্ত্রের সহস্রারে চা-সিদ্ধ হচ্ছে। পা গুটিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হও।

সেই চা-পার্টিতে আলাপ হোলো জাপানী কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি সর্দারের সঙ্গে। কিন্তু সম্রাট সম্বন্ধে তাঁরও মত,—"ও আছে, থাক্"। মুজিয়মে, জুতে পার্কে মহামান্য স্মৃতি। অনেক আছে। ওখানে থাকলে সম্রাটও আমাদের মহামান্য স্মৃতি। ওর বাইরে এনে বাঘও যেমন গুলি খাবে, ঐ ব্যবস্থাটাও গুলি খাবে। ওখানে থাকলে ঐ নাম এবং ঐ সমীহ দেশের মধ্যে সহজে অনেক ডিসিপ্লিন এনে দেয়। এমনই নেগেটিভ সম্রাটের অস্তিত্ব যে ওয়ার ক্রাইমের বিচারে তোজোর ফাঁসী হোলো। সম্রাটের হোলো না, কারণ 'ডায়েট' (জাপানের পার্লামেণ্ট-বিধানসভা)-ই হোলো সর্বেসর্বা। সম্রাট সেখানে দেবতা। বসে বসে পুজো খান। এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বসতে

আপত্তি করলেই আমরা বসিয়ে দেবো। আমরা জুয়েতে জানোয়ারকে খাঁচায় বা বেঁধে রাখি না। মুজিয়ামে খরচ করি ঢের। সম্রাট আমাদের জাতীয় দায়, জাতীয় সম্পদ। সম্রাট সম্রাটের সম্পত্তি নয়। জাপানে কেবল একটি ব্যক্তিরই ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। তিনি জাপানের সম্রাট। জাপানীরা পুতুল গড়ার ওস্তাদ। এ ওস্তাদীর শ্রেষ্ঠ পুতুল সম্রাট।

এ ধরণের কথা অবশ্য পাকা কম্যুনিজমে খাটে না। কিন্তু আমি তো টুরিস্ট। রাজনৈতিকও নই। ও ঝামেলায় "আমার কাম কি-রে ভাই!"

* * * *

সাবওয়েতে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। উনি সাহস দিলেন। ও'র বাড়ি নিক্কোতে। নিক্কোয় কয়েকটি ভালো মন্দির আছে। কুনী নিকিমোতোর ব্যবসা ট্র্যান্সপোর্ট। আমাদের দেশের সর্দারজীরা যা করেন। বললেন চলুন, কাল তিনটেয় আমি আপনাকে এইখানে ছেড়ে দেবো। আমায় একটা দিন দিন; আমি আপনাকে একটি যুগ দেবো।

হোটেল ছাড়লাম। অন্য একটা জায়গায় বাক্স নামিয়ে রেখে নিকিমোতোর সঙ্গে চললাম। সময় ছিলো না। হড়বড়িয়ে ওর গাড়িতে চেপে বসি। তোকিওর উত্তরে হাইওয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ, নদী, হ্রদ এলাকা দিয়ে। ত্রিভুবনেই মোটর পথ ত্রিভুবন-ছাড়ারা গোত্র ধরেই চলে। এ-ও তাই; কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য লুকোবে কোথায়। মাউণ্ট নান্তাই আর চুজেন্জী হ্রদের নামডাক ফুজীর পরেই। টোকিও প্রবেশের পথে নিক্কোর খ্যাতি কলকাতা প্রবেশ পথে সেকালে কালীঘাটের আর একালে তারকেশ্বরের যা খ্যাতি। নিক্কো প্রায় তীর্থ। তোশোগুর বিখ্যাত মন্দির ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশ পথে তীর্থযাত্রীদের সারা জাপান থেকে ডেকে আনে। নিক্কোর দুই দ্বার, ইরিমাচী এমং দিমাচী 'প্রবেশ' ও 'নির্গম' পথ। মাঝে নদী। আগাগোড়া এ পথের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য আমায় যেন অভিভূত করে রেখেছে। আমি মাঝে মাঝে গান গাইছি. আর তার মানে বলছি। কিন্তু নিকিমোতোর মৎলব আমার কাছে প্রাণায়াম শিখবে, এবং ঐ বাবদে ওর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমরা যে যায়গাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম তার দুপাশে পাহাড়ের গায়ে দেবদারু পাইনের বন। নদীর প্রপাত মাঝে মাঝেই আসছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে বসতির চিহ্ন। আমি শুধাই,—তোমাদের এতো সব ফ্যাকটরী লুকিয়ে রেখেছো কোথায়? শ্যামে তো দেখলাম পথের দুধার নরক করে রেখেছে। তোমাদের দেশে এতো পথ ঘাট পার হলুম, ফ্যাকটরী গেলো কোথায়?

আমেরিকান ধারাটাই বিকৃত, রুচিহীন। ওরা বুনো; ব্যাদ্ড়া। থ্যাবড়া। ওদের দেশকেই ওরা নরক করছে। অন্য দেশ করবে আশ্চর্য কি! আমরা

কিছুতেই পথের ধারে ফ্যাকটরী করি না। ফ্যাকটরির জন্য পথ করি আলাদা। মানুষ যখন বাড়ি ফেরে তখন অন্তত যেন ফ্যাকটরী ভুলে থাকে।

ইমারচীতে বড় বড় কয়েকটা পথ এসে মিশছে। এর পর থেকে নিক্কো-কাইদো পর্যন্ত পথ সাজানো-পাইনের গভীর ঘন সবুজ আলোয় ঢাকা। তার সঙ্গে উত্তর আকাশের রং এসে মিশে সূর্যাস্তের ঢের পর পর্যন্ত সমস্ত মনপ্রাণ আলো করে রেখেছে। ৩৭ কিলোমিটার পথে বিশ হাজার পাইন গাছের সারি। নিকিমোতো বলছে গাছগুলোর কেউ কেউ দু মীটার মোটা, পঞ্চাশ মিটার ঢ্যাঙ্গা। জাপানী তার দেশ সাজাবার কৃতিত্বের কড়চায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে পাইন কাটা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। জাপানে এসে পাইন পেয়েছে গরিমা।

তোটোগু মন্দিরের মধ্যেই আমার থাকার ব্যবস্থা হোলো। সামান্য ঘর এখানে নিকিমোতোর কয়েকজন কর্মচারী থাকে। শেষরাতে ট্রাক নিয়ে যাবে। আমি তখন অনুরোধ করি মন্দির যা দেখবার রাতেই দেখবো। সকালে বেরিয়ে যেতে চাই। নিকিমোতা বললো, গীশা-মেয়ে এখানেও ভালো ভালো আছে গো। উপরন্তু সালফার ঝরণা আছে। ঢের মজা এখানে। তাড়াতাড়ি কী? থাকুন কদিন।—নিক্কোর গরম জলে গরম মেয়ে পাবে বলে স্বর্গ থেকে প্রায়ই এখানে দেবতারা নেমে আসেন। তার গায়ের গন্ধ এর বাতাসে। বুনো মানুষগুলো বলে পাইনের গন্ধ!

কিন্তু রাতেই গেলাম আশ্চর্য সেই মন্দিরের সিংহদ্বারে। ওরা বলে সারা জাপানে এতো শিল্পমণ্ডিত মন্দিরদ্বার আর নেই। থাকুক না থাকুক, আমি অন্তত দেখিনি। রাত বলে কোনো দ্বিধা কোনো বাধা নেই। আলোয় আলোয় ছয়লাপ। গোপুরমে এক ধরণের শিল্প, আর এ একেবারে অন্য ধরণের। প্রবেশ পথে বিশাল মূর্তির প্রাচীন দ্বাররক্ষী। থরে থরে, তালায় তালায়, কার্নিশে কার্নিশে যতো দেখো ততো কারিগরি। মানুষ, ড্রাগন, পাখি, পশু, সাপ—হঠাৎ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ যেটা দেখা যায় সেটা সামঞ্জস্য, সুষমা, নিষ্ঠা, কৃতি। কিন্তু থেমে থেমে দেখলে তখন বোঝা যায় প্রতি ইঞ্চির মধ্যে কারিগরি।

ওপর তলায় আসার পর প্রধান মন্দির, মন্দিরে প্রবেশের পথে সুসজ্জিত গাড়ি বারান্দা, যথারীতি প্রদক্ষিণ পথ, সংলগ্ন সাধুনিবাস, অতিথিশালা সব একে একে চোখে পড়ে। এবং চোখে পড়ে ঐ খোলামেলা অঙ্গনের চারধারের আরেও সব সিংহদ্বার। কারামোন্ গেট, য়োমিমোন্ গেট। কারামোন্ গেটের গা লেগে ১৬০ মীটার লম্বা এক বিচিত্র দেয়াল! হ্যাঁ, চিত্রের বড়ো সে,—বিচিত্র! কাঠের ওপর ল্যাকারের কাজ। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কোনো শিল্প দেখার ক্ষণ জীবনে কটাই বা আসে? তাজমহল দেখে আমার সে বিস্ময় হয়নি ইৎ-মিৎ-দ্দৌলার নরুণ নক্সী কাজ দেখে যে বিস্ময় হয়েছে। তোষোগু মন্দিরের এই সুবিশাল দ্যালের

কাজ (অনন্যতায় স্বমূর্ত) পূব দিকের হলের মধ্যে যেন কেউ সোনা ঢেলে দিয়েছে। এমন কারিগরির সঙ্গে আলো জ্বালা যে জালির এধারটায় গভীর কালো, ওধারে সোনার পাহাড়ে আগুন লাগা। সারা পথটাই সোনা-গালার ঢালাই। তার বুকে চা রং, কফি রং, খেজুর রং, গেরুয়া রংয়ের গালার কাজ। আমি যেন চোখ ফেরাতে পারি না। পদ্ম, এখানে এসে বারবার তোমাদের মনে হয়েছে। সুন্দরের সঙ্গে শুভদৃষ্টিতে হুলাহুলি করার সাথী চাই। জাপানে এলে নিক্কো অবশ্য যাবে।

অলিন্দে দাঁড়ালাম। পাত্লা কর্পূর গাছের পাতা বেয়ে আমাদের চিরপরিচিত চাঁদ মামা তাঁর সোনাও গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছেন। কর্পূরের পাতলা পাতার শির শির শব্দের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্না। আমি গাছের গায়ে অজানিতে হাত দিতেই নিকিমোতো সর্দারজীর মতো বক্তে লাগলো,—সিনামোমাম্ কাম্ফোরা, লৌরাসী বংশোদ্ভব,—চীন জাপানের গৌরব, সম্পদ; মানুষ সমাজের শতকরা আশীভাগ রোগের দাওয়াঈ।

আমি বলি, বাচালকে কী মূক করে দিতে পারে এ ওষুধ?

হেসে ফেলে বুড়ো নিকিমোতো। বলে, সে ক্ষমতাও আছে!

আসল মন্দির পাঁচতলা প্যাগোডা। সুবিন্যস্ত মহা বনানীর গায়ে গা ঠেকিয়ে কর্পূর গন্ধের বাতাসের গায়ে ডুবে থেকে এ মন্দিরে যে দেবতা আছেন তিনি জেগে থাকেন। হঠাৎ বুঝলো নিকিমোতো। বললো, বেশী দেরী কোরো না। আমার কাজ সেরে আমি বাইরে অপেক্ষা করবো। নায়োনিন্দো আর রিন্নোজী মন্দিরে যেতে হবে।—নায়োনিন্দো রাতেই ভালো। এতে সাজ; তাতে নগ্নতা। এখানে মূর্তি; সেখানে প্রাণ!

কিন্তু তখন অন্য মন্দির মনে নেই। দূরে বেদীর ওপর সারি সারি মোমবাতি। বেদীর সামনে হাজার হাজার ধূপ। মানুষ বসে আছে হাঁটু গেড়ে, কোলের ওপর দুটি হাত দুটি পাখির মতো গুটিয়ে। শত শত মানুষ। কেউ গান গাইছে না। কেউ শব্দ করছে না। মায়ের যোনিপীঠ। যোনি পুজাই এর পুজা। সন্ন্যাসীরা নিস্তব্ধ বসে আছে। আর এদিক ওদিক দ্যালে হেলান দিয়ে যারা অর্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় বসে আছে তাঁরাও মাতৃমূর্তি।

ঐখানে বেশ কিছুক্ষণ বসার পর বাইরে এসে দেখি চাঁদ পশ্চিমে চলে গেছে অনেকক্ষণ।

নেশাখোরকে যখন বন্ধু বাড়ি নিয়ে যায় তখন নেশাখোরের আত্মপ্রত্যয়ের দরকার হয় না। কিন্তু গরম খোলায় ছোলা ফেলার পর না ফুটলে যেমন অন্য খোলার বালি তার ওপরে আবার ঢেলে দেয় ভুজুরী, তেমনি নিকিমোতো আমায় এনে ফেললো নায়োনিন্দোর পাহাড়ী ছোট্ট মন্দিরটিতে। এ মন্দিরে

দেয়ালের গায়ে গাঁথা কালো পাথরের গায়ে কয়েকটা দাগ ছাড়া যা আছে তা মন্দিরের গায়ের রক্ত রং। নিকিমোতো বলে চিনতে পারো? আমি আবিষ্ট। আমি বলি, নিকিমোতো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এক পাহাড়ের গভীরে এই চিহ্নে হাত দিয়ে আমি বলেছিলাম আমি যদি আমার দেহ মনের চেয়েও সত্য হই তবে তুমিও এই প্রতীক-কর্দম, প্রতীক-তীর্থের চেয়ে সত্য। এ প্রতীক একে, দুয়ে, তিনে বহু হতে পারে। আমি তুমি দুই হতে পারি। কিন্তু সত্য তো এক। মায়ে-ছেলেতে এক হবার সেই স্নেহ সুধাসমুদ্র তাতে আমায় ডুবিয়ে দাও। একে চিনবো না নিকিমোতো? মনে হচ্ছে তোমায় প্রণাম করি।

* * *

না সে রাতে নিকিমোতো আমায় ঘুমুতে দেয় নি। ঘুমিয়েছিলাম ট্রাকের মধ্যে একটা বিছানায়। এবং জাগলাম তোকিওয় নিকিমোতোর আড্ডায়।

সে-দিনটায় আমায় পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। গিঞ্জার বাজার পায়ে হেঁটে ঘুরতে ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে কাসুমিগাসেকীর ব্যবসায় কেন্দ্র দেখে। এটা ওয়ালস্ট্রীটকে টেক্কা মেরেছে। শিঞ্জিকু ন্যাশন্যাল গার্ডেন আর হিবিয়া পার্কে নিকিমোতোই আমায় নিয়ে গেলো। কিন্তু আমি যেন আর আমি নই।

আমার মনের দরবারে জাপান যেন ফুরিয়ে গেছে। আমি যেন মস্কো থিয়েটারে ফাউস্টের ব্যালে দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। টিকিটে আর অধিকার নেই; মনে আর আকাঙ্ক্ষা নেই; চিন্তায় কোনো স্বতি নেই। মনে সেই দারুণ অশান্তি যার দাহ ছাড়া শান্ততম দীপশিখাও জ্বলে না।

আমি বিকেলের প্লেনে টোকিও ছাড়লাম।

আমার অতি প্রিয় দেশ—ভ্যাঙ্কুবারের সল্‌ট লেক্‌ থাইল্যাণ্ডে যাবো। নানাইমোতে সেই লগ্‌ হাউসটার মধ্যে আগুন ভরা চুল্লীর পাশে সেই মাদুরখানা খালি আছে কী?

বড় ঘুম পেয়েছে।

এবার কিন্তু চিঠি পাবে (যদি পাও) সেই মেক্‌সিকো থেকে। যাবো। তবে চিঠি দেবো সে কথা দিচ্ছি না।—ইতি

—শেষ—